ইতিহাসের আলোকে
আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর

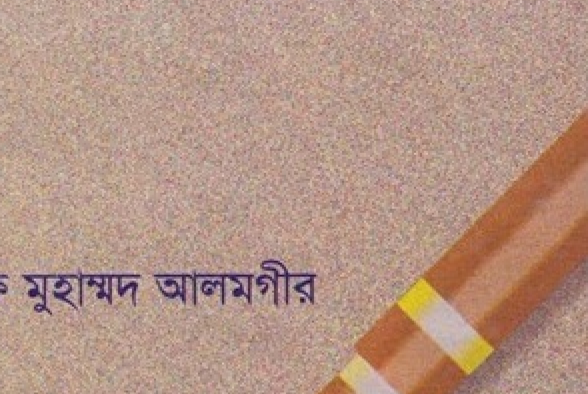

বুক পয়েন্ট
ঢাকা

www.pathagar.com

ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর

বুক পয়েন্ট
৩৮/৩ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।
ফোন ঃ ৭১২১৫৮৩, ০১৭১২-২৯০৫২৫

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
এম. এ. মূসা খান
বুক পয়েন্ট
৩৮/৩ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
২য় সংস্করণ ঃ জুন, ২০০৬, বুক পয়েন্ট, ঢাকা

[গ্রন্থকার ও প্রকাশক কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত]

বর্ণ বিন্যাস
আবদুর রহিম
মধুমতি কম্পিউটার্স
৩৮/৩, বাংলাবাজার

নির্ধারিত মূল্য ঃ দুইশত টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
বাংলাবাজার অফসেট প্রেস
প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

ITIHASHER ALOKE AMADER SHIKHAR OITIJJA-O-PRAKRITI
(The Traits and Traditions of our Education in the light of history): Written by Principal Mohammad Alamgheer in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, February 1987. Enlarged second edition and published by Book Point, 38/3 Banglabazar. Dhaka - 1100 June 2006. Price-200.00 Tk.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার আব্বা-আম্মা, উস্তাদ ও মুরুব্বী
যাঁদের অকৃত্রিম প্রচেষ্টায় ইসলামী আকীদা ও মূল্যবোধ অর্জন
ও সংরক্ষণের প্রয়াস পাচ্ছি।

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার অর্জন ও প্রসারের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন মনীষী যুগে যুগে নানা চিন্তা ও গবেষণার ফল হিসেবে আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটিয়েছেন।

এ দৃষ্টিতে উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের অবদান কি, আর এ অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরাধিকারী হিসেবে আমরা কতটুকু শিক্ষার ঐতিহ্য ধারণ ও সংরক্ষণ করতে পেরেছি — এটাই আমাদের বর্তমান সময়ে বিবেচ্য বিষয়।

এ অনুভূতি নিয়ে অতীতের স্মৃতি মন্থনসহ ভবিষ্যতে ইসলামী শিক্ষার সার্থক রূপায়ণে আমাদের কর্তব্য-চেতনাকে সামগ্রিকভাবে অনুপ্রাণিত ও বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এ গ্রন্থটি লিখেছি। এতে মোটামুটি শিক্ষার ধারাবাহিক রূপ সম্যক উপলব্ধি করানোর জন্যে ৫টি বিষয়ের সন্নিবেশ করা হয়েছে। যথা—

১. শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামের অবদান;

২. আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা সংকট ঃ কারণ ও প্রতিকার;

৩. বাংলাদেশের শিক্ষা ঃ ঐতিহ্য ও ইতিবৃত্ত;

৪. বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ঃ উন্মেষ ও বিকাশ;

৫. আধুনিক বিশ্বে ইসলামী শিক্ষা ঃ আন্দোলন ও এর গতি-প্রকৃতি;

৬. পরিশিষ্ট।

এ প্রবন্ধনিচয়ের সামষ্টিক ধ্যান-ধারণা ও উপলব্ধি প্রত্যেক পাঠককে বর্তমান শিক্ষার আঙ্গিকের উৎস ও বিকাশ সম্পর্কে সামান্যটুকু হলেও সচেতনতা দানে সক্ষম হবে বলে আমার অগাধ প্রত্যয় রয়েছে। বিশেষ করে 'শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামের অবদান' শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামের দৃষ্টিতে 'শিক্ষার' উৎস, বিকাশ, প্রসার ও প্রভাবের ইতিবৃত্ত তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

www.pathagar.com

ইসলামের আবির্ভাব ও পরিপূর্ণতার ধারাবাহিক ইতিহাস অনুসরণ করে 'শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামের অবদান' বিষয়টির সার্থক উন্মোচন আমার পক্ষে যথাযথ সম্ভব হয়নি। কারণ, 'ইসলামী শিক্ষার' ওপর একক ও অবিভক্তভাবে কোন সাহিত্য বা প্রবন্ধ এ পর্যন্ত কেউ লিপিবদ্ধ করে গেছেন বলে আমার জানা নেই। ফলে এর উৎকর্ষ সাধন ; — বিশেষ করে শিক্ষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ গ্রন্থের উত্তরণ উৎকৃষ্ট মানের না-ও হতে পারে। তবে এটা সত্য যে, 'আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান' শিক্ষার ইতিবৃত্ত দেখাতে গিয়ে যেভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তা যে সত্যি নয়, বরং ইসলামই যে শিক্ষার আদ্যোপান্ত জনক, প্রচারক ও পরিপোষক, এ সত্যটুকু ইতিহাসের নিরিখে এ গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্য কথায় গোটা 'বিশ্ব' ইসলাম ও এর অনুসারী মুসলমানদের নিকট শিক্ষার সার্বজনীন রূপ, পদ্ধতি ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য যে প্রকৃতপক্ষে ঋণী এ বিস্মৃত ঐতিহাসিক সত্যটুকু উপলব্ধি করানোর ক্ষেত্রে এ প্রবন্ধনিচয় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের উপর যাঁরা গবেষণা ও অধ্যয়ন করছেন, নিঃসন্দেহে তাঁরা এক্ষেত্রে নবতর দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনা পাবেন। ইকবালের কথায় 'আল্লাহ্‌কে জানা ও চেনা প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগত অধিকার'। এ অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ ও দায়িত্ববোধ সুধী, বিশেষ করে শিক্ষক ও প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করাই হচ্ছে গ্রন্থটির মূল লক্ষ্য।

আল্লাহ্‌ আমাদেরকে 'সঠিক শিক্ষা'র পথ ও পাথেয় প্রাপ্তিতে সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

যে কোন জাতির উন্নতি ও প্রগতি বহুলাংশে তার শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষাব্যবস্থা যদি সঠিক ধারায় অগ্রসর হয়, তবে সমাজ ব্যবস্থা সঠিক ধারায় গড়ে ওঠা সহজ হয়। সমাজ গড়ে ওঠে মানুষ নিয়ে, আর শিক্ষাঙ্গন মানুষ গড়ার কারখানা বলে এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, কিন্তু আজও এদেশে শতাব্দী পুরাতন ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এ শিক্ষাব্যবস্থা যে স্বাধীন যুগের নতুনতর চাহিদা পূরণে পদে পদে ব্যর্থ হচ্ছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সাতচল্লিশের পর থেকে অদ্যাবধি শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু কিছু সংস্কার ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বটে কিন্তু তা ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার মূল কাঠামোর মধ্যে ছিটাফোটা ধরনের। ফলে স্বাধীন দেশের চাহিদার ঈপ্সিত শিক্ষা ব্যবস্থা আজও আমাদের স্বপ্নের বস্তুই রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ শুধু একটি স্বাধীন রাষ্ট্র মাত্র নয়—জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রও বটে। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহ ইসলাম। সুতরাং এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামের একটি নিবিড় সম্পর্ক থাকাটা স্বাভাবিক। এই সুবাদে ইসলামের প্রথম যুগে, উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে এবং এদেশে অতীতে কিরূপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং বর্তমান বিশ্বের শিক্ষা সংকটের স্বরূপ কি, সে সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষার ইতিহাসে ইসলামের অবদান সম্পর্কিত জ্ঞানও আমাদের নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গঠনে বিশেষ উপকারী বলে প্রমাণিত হতে পারে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা সমস্যাও এর পরিণতি সম্পর্কে এই গ্রন্থের প্রণেতা মুহাম্মদ আলমগীর এই তথ্যসমৃদ্ধ পর্যালোচনা করেছেন—একটি নতুন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থখানি আমাদের শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়নে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে এ ধরনের একখানি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে আন্তরিক শোকরিয়া আদায় করছি।

আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
২৭. ১. ৮৭

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গ

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীরের প্রথম সংস্করণটি আমি মনোনিবেশ সহকারে পড়ে তীব্রভাবে এটি উপলব্ধি করেছি যে সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশসহ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিবেশের প্রেক্ষিতে এই গ্রন্থটির আলোচিত বিষয়বস্তু যথাযথভাবে পর্যালোচিত হলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সবাই শিক্ষান্নোয়নে কল্যাণকর অবদান অবশ্যই রাখতে পারবেন। বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের সাথে আধুনিক শিক্ষার তুলনামূলক মূল্যায়ণ শিক্ষা সংস্কারে কত যে অত্যাবশ্যক এই চেতনা উন্মেষের লক্ষ্যেই আমি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ঝুঁকি নিয়েছি।

শিক্ষা-গবেষক, শিক্ষকসমাজ, বিদগ্ধ পাঠকবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সবাই এই গ্রন্থ পাঠে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হলেই নিজেকে এজন্য বড়ই কৃতার্থ মনে করবো। মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাক গ্রন্থকার ও আমার যুগ্ম গ্রন্থস্বত্বে প্রকাশিত গ্রন্থটির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে বরকতময় চিন্তাবুদ্ধির প্রচার ও প্রসারে সাফল্য দান করুন! আমীন।

এম. এ. মূসা খান
প্রকাশক
বুক পয়েন্ট

তাং ১২ জুন ২০০৬ ইং

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ঃ ভূমিকা কথা

'আন্তর্জাতিক শিক্ষা'এর পটভূমিতে লিখিত 'ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ১৯৮৭ সালে প্রকাশ করে। পরে ১৯৮৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত, অর্থাৎ ২০০৬ সাল পর্যন্ত, এই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য ফাউন্ডেশনকে অনেক লেখালেখি ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে অন্তত সৌজন্য হিসেবে হাঁ/না কোন জবাব না পেয়ে রাজধানী ঢাকার বাংলা বাজারের 'বুক পয়েন্ট' প্রকাশনার মালিক জনাব এম এ মুসা খানকে অনুরোধ জানাই। তিনি এর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাতে সম্মত হন। এই দ্বিতীয় সংস্করণটির সদ্য আবির্ভাব। এই পরিস্থিতি থেকে সহজেই আঁচ করা যায় আমাদের দেশে বই পুস্তক প্রকাশনায় আমার মত হতভাগা লেখকদের কী অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতেই না দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় সংস্করণে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধনে প্রায় তিনটি বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে; 'আপটুডেট্' তত্ত্ব-তথ্য সংযোজন ও পুরাতন সংস্করণের পরিমার্জনের মাধ্যমে সম্মানিত পাঠকদেরকে অবহিত করার মানসেই এমনটি ঘটেছে। যেহেতু সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধনের জটিল ধকল পোহাতে হয়েছে সেহেতু এ ধরনের প্রকাশনায় কিছু ভুলত্রুটি থাকা অতি স্বাভাবিক বিধায় সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এ ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যই সদয় দৃষ্টিতে বিবেচনা করবেন বলে আন্তরিক বিশ্বাস পোষণ করছি।

তৃতীয়ত, 'বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ" অধ্যায়ে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়। এর কারণ প্রধানত দুটো ঃ

১. আমাদের দেশে এ সম্পর্কে লেখালেখির জন্য সামগ্রিকভাবে তথ্য সমৃদ্ধ প্রকাশিত কোন রেফারেন্স বই-পুস্তক আমি পাইনি, অবশ্যি আমার সীমিত চেষ্টা ও সাধ্যের ভেতরে।

২. সরাসরি যোগাযোগ করে এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা দানের শীতল মানসিকতা অবলোকন ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা প্রদানের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও কর্তাবাবুদের বিরূপভাব ও উপেক্ষাকরণটিও ছিল মর্মন্তুদ।

এ থেকে স্পষ্ট, জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'শিক্ষান্নোয়নের' সার্বিক তদারকী, পরিচর্যা ও উৎকর্ষ সাধনে, সত্যি বলতে গেলে কী সংশ্লিষ্ট অনেকেরই এক্ষেত্রে সুচিন্তিত প্রচেষ্টা ও সুশৃঙ্খল শ্রম ও অবদান যে নেই তা দ্বিতীয় সংস্করণে হাত দিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। ফলে এদেশের শিক্ষার মান ও কার্যক্রম এহেন

www.pathagar.com

বৈরিতা, অসংগ্রলতা, অনুন্নয়ন এবং শিক্ষান্নোয়ন ও শিক্ষা প্রশাসনের দুর্নীতির হতাশাচ্ছন্নে কৃষ্ণ কুটিল মেঘ গোটা জাতিকে আজও অন্ধ আবরণে বিমূঢ় করে রেখেছে। শুধু কি তা-ই? নানা ধরনের সংঘর্ষমুখী নানা রঙের শিক্ষাক্রমে এদেশের ছাত্র-অভিভাবক সমাজ বর্তমানে 'স্যান্ড-উইচের' মত দশাপ্রাপ্ত হয়ে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানার্জনে প্রায় নির্জীব ও নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। কাওমী মাদ্রাসার সাথে আলীয়া মাদ্রাসার; সরকারির সাথে বেসরকারি ও প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম ও প্রশাসনে বিরূপ ও বিদ্বেষমূলক শিক্ষার সম্পর্ক, বিদেশি মিশনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয় স্বার্থ বিচার্যে প্রশাসনিক অসংলগ্নতা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির শিক্ষাক্রম, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে জাতীয়ভাবে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশক কোন নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম উদ্ভাবনে নপুংশকতা; বরং বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিদ্বেষ প্রতিহিংসায় শিক্ষাগারকে 'যে সহে সে রহে' নীতিতে জিইয়ে রেখেছে। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর সামগ্রিক চিত্রটিতে এর রূঢ় বাস্তবতা পরিস্ফুট করার নির্ভীক ও নৈতিক প্রয়াস রয়েছে ব্যাপকভাবে।

শেষ কথা ঃ দ্বিতীয় সংস্করণের একান্ত লক্ষ্য ; এদেশের বিদগ্ধ দেশপ্রেমিক শিক্ষিত সমাজকে সচেতন করা, যাতে আর যা-ই হোক আমাদের বর্তমান তরুণ ও ভাবী প্রজন্ম প্রচলিত শিক্ষার যাঁতাকলে আর যেন পৃষ্ঠ না হয়, সেই প্রেক্ষিতে নৈতিকতাবোধে উজ্জীবিত হয়ে তাঁরা যেন প্রয়োজনীয় আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ; আমাদের শিক্ষার জগতে বিদ্যমান এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ব্যতীত আদর্শ জাতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই — এই অমোঘ সত্যটি যেন জাতির মেধায় ও আচরণে সক্রিয়ভাবে তাঁরা পরিস্ফুটিত করে তোলেন। উল্লেখ্য, এই নিরীখেই বইটির মূল্যায়ণ উপলব্ধি করে রাজধানী ঢাকার বাংলাবাজারের 'বুক পয়েন্ট' প্রকাশনার মালিক জনাব এম এ মুসা খান দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন বিপুলভাবে, এ কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য নেই আমার। আল্লাহপাক তাঁকে পুরস্কৃত করুন এহেন বদান্যতার জন্যে— এই দৃঢ় প্রত্যয়ই শুধু পোষণ করছি।

যে দৃষ্টিতে এই গ্রন্থটি লেখা; সেই দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটুক সংশ্লিষ্ট সবার, এর সুফল বিকশিত হোক আমাদের মেধা ও মননে, এর সুফল বিকশিত হোক আমাদের এই কিম্ভুতকিমাকার শিক্ষা-পাঁকে নিপতিত জাতীয় জীবন উদ্ধার প্রাপ্তিতে— আল্লাহ আমাদের সহায় হউন–এই প্রচেষ্টা। আমীন!

জুন, ২০০৬ ইং
ঢাকা।

গ্রন্থকার

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

বিশ্বমানবের মূল পাঠক্রম আল-কুরআন ১
বিশ্বমানবের মূল পাঠ্যসূচি আল-হাদীস ৫
রাসূল (সা)-এর আমলে শিক্ষাগার ও শিক্ষার্থী ৮
রাসূলে করীম (সা)-এর ছাত্রদের পরিচয় ১১
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টিতে শিক্ষা ও শিক্ষকের মর্যাদা ১৩
অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে কুরআনের শিক্ষক রাসূল (সা) ১৭
ইসলামে শিক্ষিত জনের দায়িত্ব ১৯
সাহাবা-কিরাম ও মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও শিক্ষকের মর্যাদা ২০
খুলাফায়ে রাশেদার যুগে শিক্ষা ও শিক্ষাকেন্দ্র ২৩
ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্ররূপে কুফা ও বসরা ২৪
উমাইয়া যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা ২৫
আব্বাসীয় যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা ২৭
মুসলিম শাসনামলে স্পেনের শিক্ষা ব্যবস্থা ৩০
আইয়ুবী ও ফাতিমী যুগে মিসরের শিক্ষা ব্যবস্থা ৩৪
ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি ৩৫
কতিপয় মুসলিম মনীষীর সংক্ষিপ্ত শিক্ষাজীবন পরিচিতি ৩৭
মুসলিম রাষ্ট্রে আলিম সমাজের পদমর্যাদা ও প্রভাব ৪০
তথ্যপঞ্জী ৪৪

আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা সঙ্কট ৪৫
আধুনিক শিক্ষা দর্শনের পটভূমি ৫৪
দুটি মহাযুদ্ধের প্রভাব ৫৯
সহ-শিক্ষা প্রসঙ্গ ৬০
ইসলামের দৃষ্টিতে সহ-শিক্ষা ৬৫

www.pathagar.com

আধুনিক শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিতে শিক্ষা ৬৭
আধুনিক শিক্ষার পরিণাম ৬৮
ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি ৭১
আন্তর্জাতিক শিক্ষা সমস্যা নিরসনে কতিপয় মূলনীতি ৭৩
শিক্ষার অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতি ৭৪
তথ্যপঞ্জী ৮০

আর্য যুগ ৮১
বৌদ্ধ যুগ ৮৩
মুসলিম যুগ ৮৪
শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের অবদান ৮৬
মুসলিম আমলে ভারতের শিক্ষা-চিত্র ৯৫
বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার ৯৮
ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা ৯৯
একটি বিস্ময়কর বিস্মৃত দিক ১১৬
মিশনারী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার ১১৮
পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশের শিক্ষা সমাচার ১২৯
বাংলাদেশের শিক্ষা ১৩১
অন্যান্য অন্তরায়সমূহ ১৪০
কিন্ডার গার্টেন ও সমজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গ ১৪৪
বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ঃ সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ ১৪৬
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিবিধ ১৫০
বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা দান প্রসঙ্গ ১৬৪
নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রসঙ্গ ১৭১
বাংলাদেশের শিক্ষায় কতিপয় দুষ্টব্যাধি ১৭২
বাংলাদেশের শিক্ষা ঃ পরীক্ষা প্রসঙ্গ ১৭৫
শিক্ষার্থী সমাজে মাদকাসক্তি ১৮৮
স্কুল-কলেজে শিক্ষার মানোন্নয়নে নতুন নিয়ম জারী ১৯১
বাংলাদেশ জাতীয় সেমিনার ১৯৭৬ : গৃহীত সুপারিশমালা ১৯৪
তথ্যপঞ্জী ২০৪

www.pathagar.com

ব্রিটিশ যুগে মুসলিম শিক্ষা ২০৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২১৫
প্রসঙ্গ ঃ ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ২৩৩
ঢাকা ভার্সিটির জমি সমাচার ২৪৩

পাক-বাংলা আমলে শিক্ষা সংস্কার সমাচার ২৪৫
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ঃ আন্দোলন ও পরিণাম ২৫০
মৌলিক নীতি প্রসঙ্গ ২৬৮
অন্যান্য প্রসঙ্গ ২৬৮
বাদশা ফয়সল ইনস্টিটিউট ঃ প্রথম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৭২
ইসলামী শিক্ষার পরিবেশ রচনা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে মাদ্রাসার অবদান ২৮৪
বিশেষ বৈশিষ্ট্য ২৯২
তথ্যপঞ্জী ৩০৮

আধুনিক শিক্ষার ব্যর্থতা ৩০৯
প্রথম আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন ৩১০
সুপারিশমালা ৩১২
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন ৩২৪
তৃতীয় আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন ৩২৫
মুসলিম বিশ্ব শিক্ষা আন্দোলনে ড. সৈয়দ আলী আশরাফের অবদান ৩৩৩
ত্রয়ী সম্মেলনের ফলশ্রুতি ৩৪১
শ্রেণী বিভাগ ৩৪৪
বিজ্ঞান, শারীয়াহ্ ও শিক্ষা ৩৫১
পাশ্চাত্য শিক্ষার বস্তুবাদী ও ভোগবাদী প্রভাব ৩৫৮
ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন ও দুনিয়া ৩৬০
শিক্ষার শৈল্পিক সত্তা ৩৬৫
তথ্যপঞ্জী ৩৭০

www.pathagar.com

ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ঃ ইতিবৃত্ত ৩৭১
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৩৯০
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৩৯২
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ৩৯৩
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ৩৯৫
ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আই. ইউ. টি.) ৩৯৭
বাংলাদেশ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ৪০০
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৪০৩
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ৪০৮
বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমাচার ৪১০
এশিয়ার প্রথম 'আন্তর্জাতিক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়'........................ ৪১৪

মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি : দেওবন্দ মাদ্রাসা ৪১৭
শিক্ষাদানে দেওবন্দ মাদ্রাসা ও আলীগড় কলেজের দৃষ্টিভঙ্গী ৪২৩
শিক্ষাক্ষেত্রে কতিপয় মনীষীর অবদান ৪২৮
সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাসের শিক্ষা বিষয়ক সংশ্লিষ্ট ভাষণ ৪২৮
দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসীনের অবদান ৪৩০
বিদূষী নওয়াব ফায়জুন্নেছার অবদান ৪৩১
শিক্ষাক্ষেত্রে শের-ই-বাংলার অবদান ৪৩২
শিক্ষা ক্ষেত্রে মরমী কবি সাবির আহমেদ চৌধুরীর অবদান ৪৩৪
শিক্ষানুরাগী আলাউদ্দিন আহমেদের অবদান ৪৩৫
প্রসঙ্গ ঃ স্কুল-কলেজে ২০০৪ সাল থেকে শিক্ষার মান-উন্নয়ন ৪৩৭
জোট সরকারের ৩ বছরে শিক্ষা ব্যবসস্থার উন্নয়ন........................ ৪৩৯
যুক্তরাষ্ট্রে নিরক্ষর শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রসঙ্গ ৪৪৩
Imam Khomeni's (R) Advice to Students ৪৪৫
বিশ্ববিদ্যালয় ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের প্রতি ইমাম খোমেনী (র.)-এর উপদেশ বাণী ... ৪৪৫
On Islamization of Educations ৪৫১
Education Policy Makka Declaration ৪৫৬
তথ্যপঞ্জী ৪৬৪

www.pathagar.com

১ম অধ্যায় শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামের অবদান

বিশ্বমানবের মূল পাঠক্রম—আল-কুরআন ঃ

ইসলাম বিশ্বের শাশ্বত বিধান। এ বিধান আবহমানকাল ধরে প্রবাহিত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমে। আর তদীয় প্রচারক শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়্যত প্রাপ্তিতে ঘটে এর নিখুঁত রূপায়ণ।

আল-কুরআন অর্থই হচ্ছে পাঠ, আবৃত্তি, কথোপকথন ও বক্তৃতা। এক কথায় মানুষের বাকশক্তির সামগ্রিক শিল্পকলা। মূল শব্দ 'কারা' হতে কুরআন শব্দের উৎপত্তি। 'কারা' অর্থ হচ্ছে পাঠ বা অধ্যয়ন। পি. কে. হিট্টির কথায়, "The word Quran itself means recitation, lecture, discourse."

পাঠ ও পঠন রীতির স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ। মিশকাত শরীফে উল্লেখ আছেঃ আসমান-যমীন সৃষ্টির হাজার বছর আগে আল্লাহ্ সূরা 'তাহা' ও 'ইয়াসিন' পাঠ করেন, যা শুনে ফিরিশ্তাগণ মুগ্ধ হয়ে বলেছিল, "সে জাতি সুখী যার উপর এটি নাযিল হবে, সে হৃদয় সুখী যা তা ধারণ করবে, সে জিহবা নিশ্চয়ই সুখী যা তদনুসারে কথাবার্তা বলবে।"

স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি মানুষ। এর চেয়েও শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি আল-কুরআন। কারণ বিশ্বের একমাত্র এ চূড়ান্ত মহাগ্রন্থের বিষয়বস্তুর সার্বজনীনতা, রচনা শিল্প, বাচনভঙ্গি, শব্দ, ছন্দ, বাক্যালংকার জ্বিন-মানব সবারই সাধ্যাতীত। আল-কুরআন নিজেই এর অদ্বিতীয়তা ঘোষণা করেছে নিম্নভাবে, ""সর্বপ্রকার অলৌকিকতার মধ্যে এটাই (আল-কুরআন) সর্বশ্রেষ্ঠ। সমগ্র মানুষ ও জ্বিন একযোগে এর মত (অপর কোন গ্রন্থ) রচনা করতে পারেনি।"

আল-কুরআন আল্লাহ্র সৃষ্টি। আল্লাহ্ গোটা বিশ্ব ও এর অন্তর্ভূক্ত এবং বহির্ভূত সমস্ত সৃষ্টিকুলের একমাত্র অদ্বিতীয় স্রষ্টা। তিনিই প্রথম জ্বিন ও ফিরিশতাদের সৃষ্টি করেন। পরে সৃষ্টি করেন এ বিশ্ব ও অন্যান্য জগৎ। সবশেষে তিনি হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে।

তারপর তিনি শিক্ষা দেন হযরত আদম (আ)-কে দ্রব্যসমূহের নাম, গুণ ও প্রকৃতি। আল্লাহ্ কর্তৃক হযরত আদম (আ)-কে সরাসরি শিক্ষাদান পদ্ধতি থেকেই আমরা Direct Method of Teaching-এর জ্ঞান লাভ করি।

www.pathagar.com

হযরত আদম (আ)-কে তিনিই জিনিসপত্র দেখিয়ে এগুলোর নাম, গুণ ও প্রকৃতি শিক্ষা দিয়েছেন। এ থেকে আমরা পাই Teaching by Demonstration ও Use of Teaching Aids ঃ প্রদর্শনীমূলক শিক্ষা ও শিক্ষোপকরণের ব্যবহার পদ্ধতির ধারণা। এটাই 'শিক্ষার' আদি সূত্রপাত। স্বয়ং আল্লাহ্ হচ্ছেন শিক্ষা-বিজ্ঞানের আদি জনক, শিক্ষক ও শিক্ষার প্রতিষ্ঠাতা; আর হযরত আদম (আ) হচ্ছেন গোটা বিশ্বের প্রথম ছাত্র এবং প্রথম মানুষ, প্রথম নবী, সুশিক্ষিত ব্যক্তি।

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার পরিণামে হযরত আদম (আ) মর্তের জগতে সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন। তিনিই বিশ্বের প্রথম শিক্ষক। আল্লাহ্র নিকট হতে প্রাপ্ত শিক্ষাকে কেন্দ্র করে মহাপুরুষ হিসেবে স্বীয় স্রষ্টা ও শিক্ষকের গুণাবলি ও হিতোপদেশ প্রচার ও প্রদর্শনে তিনি আপন পরিবার-পরিজনকে শিক্ষাদানে ব্যাপৃত হন। শিক্ষা-শিক্ষক-শিক্ষণীয় বিষয় ও ছাত্রের ধারণা এবং জ্ঞানের মৌল ভিত্তি ও বিকাশের সূত্রপাত এ সময়েই শুরু হয়। ইসলামের এ ইতিহাসই আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের ভিত্তি ও দিকদর্শন ।

হযরত আদম (আ) হতে শুরু করে রাসূলে করীম (সা) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীই মানব জাতিকে শিক্ষাদানে জীবনপাত করে গেছেন। শিক্ষাদানের জন্য কিতাব বা সহীফা ছিল তাদের শিক্ষার মূল ভিত্তি। এ কিতাব বা সহীফা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে শিক্ষার মূল-গ্রন্থ বা Text Book হিসাবে সমাদৃত হয়েছে যুগে যুগে। পরবর্তীকালে এসব সহীফা ও কিতাবের মূল নির্যাস নিয়ে বিশ্বমানবের শেষ কিতাব বা Text Book for Man হিসাবে অবতীর্ণ হয় আল-কুরআন। হযরত মুহাম্মদ (সা) ইবনে আবদুল্লাহ্র নবুয়্যতে নবী বা পয়গম্বর মূলত যে শিক্ষক তার প্রমাণ হচ্ছে তাঁকে ও তাঁর পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী বা রাসূলকে কিতাব বা সহীফাসহ শিক্ষাদানের জন্যে মর্তে প্রেরণ।

আল-কুরআনের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবুয়্যত দ্বারা মর্যাদাভিষিক্ত ও চির-সম্মানিত। রাসূল (সা)-কে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফের মাধ্যমে শিক্ষার সবক দেওয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম)

"ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। আল্লাযি আল্লামা বিল কালাম। আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম। (আলাক ১-৫)

"পড় তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে এক টুকরো জমাট রক্ত থেকে। পড় এবং তোমার রব অতি মেহেরবান, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। "

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর এটাই প্রথম হাতে খড়ি। 'পড়' অর্থাৎ হৃদয়ঙ্গম কর, প্রতিপালন কর এবং পরে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কর। মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে 'আল-কুরআন' উপহার স্বরূপ প্রদান করেন গোটা মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ "কুল, রাব্বী জ্বিদ্‌নী ইল্‌মা", বল, হে রব আমার, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।" কারণ জ্ঞান ব্যতীত মানুষ পৃথিবীতে সার্থক জীবন যাপনে অক্ষম। স্রষ্টা, সৃষ্টিঃ এ দুয়ের সাথে মানুষের সম্পর্ক কি তা যথাযথ জানার মধ্যেই মানব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত। এজন্যে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে বলেনঃ "বল, পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং তোমার পূর্ববর্তীদের পরিণতির প্রক্রিয়া লক্ষ্য কর [রোম/৩০] এবং আবিষ্কারের জন্যেও [রোম/৪২] এবং যারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি কৌশলের উপর চিন্তা–অনুধ্যান করে (তারা তখন বাধ্য হয় বলতে)---- হে আমাদের রব, তুমি ইহা (বিশ্বজগৎ) অযথা সৃষ্টি করনি।" [আল-ইমরান/১৯২] সুরা বিজ্ঞানের গুরুত্ব দিয়ে পাক কুরআনের অপর একস্থানে আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ "যাকে বিজ্ঞানের জ্ঞানদান করা হয়েছ, তাকে যথেষ্ট কল্যাণ দান করা হয়েছে।"

ইসলাম এমনিভাবে জীবনের জন্মলগ্ন থেকে শিক্ষাকে মানব জীবনের সাথে আষ্টেপৃষ্টে সংযুক্ত করে দিয়েছে। শিক্ষা ব্যতীত কোন মানুষই প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্যে উন্নীত হতে পারে না। "নিশ্চয়ই শিক্ষিত বান্দাগণ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, নিশ্চয়ই তিনি মহা পরাক্রমশালী ।"[ফাতির/২৮] আল-কুরআনের এ ঘোষণা থেকে ইহাই দেদীপ্যমান হয়ে উঠে যে "শিক্ষিত ব্যক্তিই" আল্লাহর একমাত্র প্রিয়জন। মানুষকে তিনি এই বিশ্বচরাচরে পাঠিয়েছেন খলীফা হিসেবে। তিনি নিজেই ঘোষণা করেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করেছেন, তিনি যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী বিচার কর এবং শাসন কার্য পরিচালনা কর। লোকদের খেয়ালখুশী অনুসরণ করো না।"

শিক্ষক হিসেবে নবী (সা) কিভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, সে সম্পর্কেও আল্লাহ্‌পাক রাসূল করীম (সা)-এর পরিচয় দেন নিম্নরূপে ঃ "তিনি (আল্লাহ্) যিনি নিরক্ষর লোকদের মধ্য হতে তাদেরই একজনকে নবী হিসেবে উন্নীত করেছেন. যিনি (নবী-(সা) তাদের কাছে আবৃত্তি বা পাঠ করেন তার (আল্লাহর) নিদর্শনসমূহ, তাদের পুত-পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও জ্ঞান; যদিও তারা পূর্বে মিথ্যা বিশ্বাসের অনুসারী ছিল।" [সূরা আল জমুয়া/৬২]

এ আয়াত শরীফে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) উম্মী ছিলেন। মানব রচিত কিতাব বা গ্রন্থজ্ঞান তিনি আহরণ করেন নি। মানব রচিত

www.pathagar.com

গ্রন্থের মতবাদ বা শিক্ষা অর্জনে বঞ্চিত থাকার ফলেই তিনি কোন লেখক বা গ্রন্থকারের মতবাদ দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া থেকে ছিলেন পাক ও পবিত্র। গোটা বিশ্বের তথা বিশ্বমানবজাতির শিক্ষক যিনি, তিনি কি করে কোন মানুষ বিশেষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বিশ্বকে সার্বজনীন শিক্ষা দেবেন? হয়ত এ কারণেই আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে হেফাজত করেছেন নিজে তাঁর শিক্ষার ভার গ্রহণ করে। আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে বলেনঃ "হে নবী। নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে সুসংবাদদাতা হিসেবে উন্নীত করেছি, একজন সাক্ষ্য হিসাবে; একজন সুসংবাদ দাতা হিসাবে, একজন সতর্ককারী হিসেবে, আল্লাহর প্রতি আহবানকারী হিসেবে এবং একটি উজ্জ্বল আলো হিসেবে।" [সূরা আল আহযাব ৪৫,৪৬]

উক্ত আলোচনা হতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ্পাক আল-কুরআনকে আবিশ্যক গ্রন্থ হিসেবে পাঠিয়েছেন গোটা মানবজাতির কল্যাণ ও পথ নির্দেশের জন্য: আর এ কল্যাণ ও পথ নির্দেশনায় হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এ মহাগ্রন্থের রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে শিক্ষক হিসেবে। অতএবঃ

১. পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে ক্রমানুসারে কুরআনের বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ
   (ক) বিশ্বনিচয়ের স্রষ্টা আল্লাহ
   (খ) মানুষঃ মোমেন, মুশরেক, মোনাফেক ও কাফের
   (গ) প্রকৃতি।
২. কুরআনের শিক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে নবীর (সা) সামগ্রিক কর্মময় জীবন পদ্ধতি যাকে বলা হয় আল-কুরআনের ব্যাখ্যাতা বাস্তব জীবন।
৩. আল-কুরআনের মূল শিক্ষা হচ্ছে ঃ
   (ক) আল্লাহ্ গোটা বিশ্বজাহানের স্রষ্টা
   (খ) আল্লাহ্ মানুষের স্রষ্টা।
   (গ) সুপরিকল্পিতভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত করার জন্য আল্লাহ মানুষকে এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করে পাঠিয়েছেন।
৪. কুরআনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ্ভীরু করে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সৌভাগ্যমন্ডিত করা দুনিয়া ও আখিরাতে।

অন্য কথায় গোটা মানব জাতির পাঠক্রম বা Curriculum হচ্ছে আল-কুরআন এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যসূচি বা Syllabus হচ্ছে রাসূলের জীবন ও কর্ম-পদ্ধতি।

সাধারণ অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায় গ্রন্থ, শিক্ষক ও ছাত্র। সতরাং, আল-কুরআন হচ্ছে আমাদের মূল শিক্ষা গ্রন্থ, নবী (সা) হচ্ছেন আমাদের শিক্ষক আর আমরা সবাই হচ্ছি তাঁর ছাত্র বা শিষ্য।

www.pathagar.com

পাক কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন ঃ "পরম করুণাময় আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে বর্ণনা রীতি শিক্ষা দিয়েছেন।" [সূরা রহমান/২, ৩, ৪]

পাক কুরআনের এ ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা) নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন এই বলেঃ 'বুয়েস্তু মোয়াল্লেমা' বা শিক্ষক হিসেবে আমাকে পাঠান হয়েছে। নিখুঁত সুন্দর নৈতিকতার পূর্ণতা দান করার জন্যই তিনি দুনিয়ায় তশরীফ এনেছিলেন।

আল্লাহ্ যে শুভক্ষণে হযরত আদম (আ)-কে শিক্ষা দিয়েছেন বিভিন্ন দ্রব্যাদির নাম ও এদের গুণাগুণ, সেশুভ মুহূর্ত থেকেই মানবজাতিঃ

১. শিক্ষকের ধারণা ২. ছাত্রের ধারণা ৩. শিক্ষার বিষয়বস্তু ৪. শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং ৫. শিক্ষার লক্ষ্য—

সম্পর্কে মূল জ্ঞান ও প্রত্যয় অর্জন করতে শিখেছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শিক্ষার জন্ম ও এর সার্বিক প্রসারে একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর কোন মতবাদ বা ধর্মে অনুরূপ কোন ধারণাই ছিল না। বরং শিক্ষা সংক্রান্ত সব মতবাদ প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শিক্ষা হতেই প্রণীত। তাই সন্দেহাতীতভাবে এটাও বলা যেতে পারে যে, শিক্ষার মূল পাঠক্রম বা Core-curriculum হচ্ছে 'আল-কুরআন'। এটা গোটা মানব জাতির জীবন ও জগতের পটভূমি হতে ব্যষ্টি ও সমষ্টি পর্যায়ের প্রত্যেকটি বিষয় সমাধানের রূপরেখা চির অক্ষয় করে রেখেছে সময়, কাল, জাতি, বর্ণ ও ভৌগোলিক পরিবেশ নির্বিশেষে। চিরন্তন বাস্তব স্বাক্ষর ও ইতিহাস হিসেবে তা অম্লান করে রেখেছে এর শিক্ষক, প্রচারক হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চিন্তা ও কর্মময় জীবনকীর্তির।

বিশ্বমানবের মূল পাঠ্যসূচি আল-হাদীস ঃ

ইসলামের শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন ও কর্মের সমষ্টিই হাদীস। তাঁর নবুয়্যতের সূচনা হয় পবিত্র 'ইকরা' বা 'পাঠ কর' ঐশীবাণী দিয়ে। তাঁর এ পাঠদানের দায়িত্বে নিজেকে তিনি আমৃত্যু নিয়োজিত রাখেন। তিনি নিজেই এ পরিচয় তুলে ধরেন এই বলে ঃ "বুয়েস্তু মোয়াল্লেমা"—শিক্ষক হিসেবে আমি প্রেরিত হয়েছি। পবিত্র মক্কা-মদীনার বিশ্ব প্রকৃতি এবং হেরাগুহা ছিল রাসূলে করীম (সা)-এর ক্লাসরুম বা শ্রেণীকক্ষ। হেরাগুহা ছিল তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক (Academic) এবং মক্কা-মদীনার বিশ্বপ্রকৃতি ছিল অপ্রাতিষ্ঠানিক (Informal) শিক্ষাগার। স্রষ্টা, মানুষ ও প্রকৃতির রাজ্য—এ তিনটি ছিল তাঁর শিক্ষার বিষয়বস্তু বা Curriculum। শবে-মিরাযের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতে এবং হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সহায়তায় তিনি শিক্ষিত

www.pathagar.com

হয়েছিলেন বিশ্বের শিক্ষকতার মহান গৌরব ও পদমর্যাদা লাভের নিমিত্তে। তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি (Method of Teaching) ছিল প্রধানত তিন প্রকার ঃ

১. কাওলী—কথা ও আলোচনা যাকে আধুনিক শিক্ষার পরিভাষায় Conversation -Method বলা হয়।
২. ফেলী -কর্ম প্রদর্শন - Demonstration Method.
৩. বক্তৃতা বা হিতোপদেশ বা Lecture ও Sermon Method.

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূল করীম (সা) যখন কোন কথা বলতেন, তিনি উহা তিনবার বলতেন যাতে শ্রোতা উত্তমরূপে বুঝতে পারে। (বুখারী)।

তিনি অপর এক বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ আল্লাহ্র অমিয় বাণী শ্রবণ করার পর তিনি ও অন্যান্য সাহাবী তা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করে তা হৃদয়ে মুদ্রিত করে রাখতেন। Law of exercise এবং Law of repetition বা পনুঃ .পুনঃ অনুশীলন ও চর্চা করার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন পদ্ধতি রাসূল করীম (সা)-এর সময় হতেই গৃহীত হয়। রাসূল করীম (সা)-এর বিবিগণও পাক কুরআন এবং হাদীস রাসূলের নিকট শিক্ষালাভ করেছেন। সাহাবাগণও মহিলাদের সাথে পর্দা বজায় রেখে পাক কুরআন এবং হাদীস শিক্ষা করেছেন। হযরতের (সা) বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ছিলেন এক্ষেত্রে সবার অগ্রবর্তিনী।

সাহাবীগণ পালা করেও রাসূলুল্লাহ্র বাণী শিক্ষা করেছেন। হযরত উমর (রা) এবং একজন আনসার পালা করে (by turn) রাসূলুল্লাহ্র দরবারে হাজির থাকতেন এবং একজন অপরজনের সাথে হাদীসের বিনিময় করে (give and take method) দুজনেরই জানা সমস্ত হাদীস একে অপরকে শিখিয়ে দিতেন। আধুনিক পরিভাষায় এ পদ্ধতিকেই Cross Age Teaching Method বা Monitorial System of Teaching হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ পদ্ধতির গুরুত্ব আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে নিম্ন হাদীসটির মাধ্যমে। রাসূলে করীম (সা) বলেনঃ প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তিই যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে তা (হাদীস) পৌঁছিয়ে দেয় (বুখারী)। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে আল্লাহ্র রাসূল বলেনঃ আল্লাহ সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করেন, যে ব্যক্তি আমার কোন কথা শুনে তা মুখস্থ করে নেয় এবং উত্তমরূপে অনুধাবন করে, তারপর তা অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয় (বুখারী)।

প্রাচীন ভারতের হিন্দু পুরোহিত বা মধ্যযুগীয় পাদ্রীগণ শিক্ষা-বিশেষ করে ধর্ম ও তন্ত্রমন্ত্রের শিক্ষাকে নিজেদের মধ্যে সীমিত রেখেছিলেন। তাদের শাসনমালে শিক্ষা ছিল গুটিকয়েক তথাকথিত অভিজাতের একচেটিয়া সম্পদ। আল্লাহর রাসূল (সা) উক্ত হাদীসের মাধ্যমে শিক্ষাকে শুধু সার্বজনীনই করেন নি,

www.pathagar.com

বরং প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছেন অল্প ও অশিক্ষিত লোকদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে। Education for all– সবার জন্য শিক্ষা অথবা UNO এর Every man has the right to education– প্রত্যেক মানুষেরই শিক্ষার অধিকার আছে—এ ধারণাটুকু আল্লাহর রাসূলেরই (সা) হাদীস থেকে গৃহীত হয়েছে।

আল্লাহর রাসূল (সা) জ্ঞানকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেনঃ

১. কুরআনের মীমাংসিত আয়াত।

২. হযরতের নিত্য কার্যাবলি এবং ন্যায়সঙ্গত বিধান।

৩. অন্যান্য অতিরিক্ত জ্ঞান।

প্রথম দুটি হচ্ছে ফরযে আইন বা Compulsory Subject এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ফরযে কিফায়া বা বর্তমান জগতের শিক্ষামূলক পরিভাষায় Optional Subject বা ঐচ্ছিক বিষয়। এ প্রসঙ্গে এও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, আল্লাহর নবী উক্ত দুটি বিষয়কে যেরূপ ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় করেছেন, ঠিক তেমনি তিনি এ দুটি বিষয়ের মূল ভাষা শিক্ষাকেও অপরিহার্য্য করেন নিম্নোক্ত হাদীস শরীফের মাধ্যমেঃ

তিনটি কারণে তোমরা আরবি (ভাষা) শিখঃ

১. আমার মাতৃভাষা আরবি ;

২. পবিত্র কুরআন আরবিতে ;

৩. বেহেশতবাসীদের ভাষা আরবি। (তিরমিযী)

আরবি ভাষা না জানা পর্যন্ত কোন মানুষই শিক্ষার মূল পাঠক্রম (Basic Curriculum) 'আল-কুরআন' এবং এর পাঠ্যসূচি (Syllabus) 'আল-হাদীস' ও এ দুয়ের শিক্ষক হযরত রাসূল (সা)-কে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। আধুনিক স্যাকুলার সভ্যতা ও বিজ্ঞান বস্তু এবং ভোগবাদের প্রসার ঘটিয়ে মানুষকে দীক্ষিত করেছে ধর্মবৈরী জীবন ও দর্শনে। ফলে বর্তমানে আল-কুরআন, আল-হাদীস এবং রাসূল (সা) সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা হচ্ছে ঐচ্ছিক বিষয়। এতদ্‌সঙ্গে আরবিকেও তথাকথিত একটি নিছক ধর্মানুষ্ঠানের ভাষার পদমর্যাদায় সীমিত ও সংকুচিত করে রাখা হয়েছে।

জ্ঞান বা বিদ্যার্জনের প্রধান ও চূড়ান্ত লক্ষ্য, ইংরেজীতে যাকে বলা যায়– The main and ultimate aim of education, জ্ঞানময় আল্লাহকে জানা। এ সম্পর্কে আল্লাহর রসূল (সা) বলেন ঃ প্রথম জ্ঞান আল্লাহকে জানা এবং শেষ জ্ঞান তাঁর প্রতি সর্বোতভাবে আত্মসমর্পণ করা। (সগীর) রাসূল করীম (সা)-এর এ হাদীসটি পাক কালামের নিম্ন আয়াতটিরই প্রতিধ্বনিঃ "নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জন্ম-মৃত্যু, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর

www.pathagar.com

জন্য।" মানুষ যা কিছুই শিখুক, যে জ্ঞানই চর্চা করুক না কেন, তার সর্বপ্রকার জ্ঞানের একটি মাত্রই লক্ষ্য থাকবে। এ লক্ষ্য হচ্ছে, আল্লাহকে জানা এবং তাঁর নিকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করা। এ সোপর্দকেই পারিভাষিক ভূষণে বলা হয় 'ইসলাম' বা আত্মসমর্পণ।

ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) শিক্ষার এ 'লক্ষ্য-অর্জন' শিখিয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্বে এসেছিলেন শিক্ষকরূপে। তিনি মানবকুলকে নির্দেশ দিয়েছেন "শৈশব হতে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর।" কারণ জ্ঞানই মানুষের যথার্থ শক্তি ও মুক্তির পথ-নির্দেশ দিতে পারে।

রাসূল (সা)-এর আমলে শিক্ষাগার ও শিক্ষার্থীঃ

প্রকৃতির বাস্তব কর্মশালা ছিল বিশ্বনবীর গ্রন্থ। বিশ্বপ্রকৃতি এবং এর অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় সৃষ্টিকুল, মানুষের সাথে স্রষ্টা ও অন্যান্য সৃষ্টিকুলের সম্পর্ক এবং আচরণের নীতিমালা পাঠ ছিল বিশ্বনবীর পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি ছিল তার পূর্ববতী নবী-রাসূলদের শিক্ষা-নীতির পরিশোধিত নিখুঁত সঞ্চয়ন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শিক্ষার বিষয়বস্তু শুধু বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবকুলের মধ্যেই সীমিত নয়, বরং ইহা নশ্বর এ দুনিয়ার লয় ও ধ্বংসপ্রাপ্তির পর 'আখিরাত' বা পারত্রিক জগৎ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। আখিরাত ও পারত্রিক জগৎ সম্পর্কে তিনি এ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন—পবিত্র শবেমেরাজ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তাঁর জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি ছিল প্রধানতঃ (১) ওহী বা স্বর্গীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আদেশ প্রাপ্তির ভিত্তিতে (Revelation), (২) রুইয়া বা স্বপ্নে প্রদত্ত জ্ঞান (Trance), (৩) দিব্যদৃষ্টি (Insight), (৪) আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য মেরাজ বা সশরীরে আসমানে উত্থান (Ascension) .

আল্লাহর রাসূল (সা) এ চারটি এবং বিশেষ করে ওহী ও মেরাজের অদ্বিতীয় ও অনুপম প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জন করেছেন সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি "আল্লাহ, মানুষ ও প্রকৃতির" পারস্পরিক সম্পর্ক ও নীতি শিক্ষাদান করেছেন গোটা মানব জাতিকে। এ শিক্ষা প্রদানের জন্য বর্তমান বিশ্বের মত তদানীন্তন সময়ে স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি ছিল না।

ইসলামে আদি শিক্ষার আগার হচ্ছে মসজিদ বা উপাসনাগৃহ। কোরআনের আয়াতে উল্লেখ রয়েছে হযরত আদম (আ) দুনিয়াতে প্রথম অবতীর্ণ হয়েই সর্ব প্রথম বায়তুল্লাহ শরীফ বা পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণ করেন। এটাই ছিল মানব জাতির প্রথম শিক্ষাগার। হযরত নূহ (আ) ঐতিহাসিক বন্যার পর এ গৃহটি পুনরায় নির্মাণ করেন ও পরে হযরত ইবরাহীম (আ) তদীয় পুত্র হযরত ইসমাঈলকে (আ) নিয়ে এ গৃহের সংস্কার সাধন করেন। তিনি স্বীয় সন্তানসহ হাত তুলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেনঃ

www.pathagar.com

"রাব্বনা হাবলানা মিন আজওয়াজেনা ওয়া জুয়াররিয়াতেনা কোর্‌তা আইয়ুনাও ওয়ায আল্‌না লিল মুত্তাকিননা ইমামা"—হে আমাদের রব, আমার স্ত্রী পরিবার-পরিজনকে চোখের শান্তিস্বরূপ (করে দাও), আমার বংশের মধ্য থেকে সরদার বানিয়ে দাও। এ দোয়ার ফলশ্রুতি হিসেবেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে মানবজাতির সর্দার বা গুরু হিসেবে পাঠিয়েছেন। জাহিলিয়াতের যুগে এ কাবা শরীফই ছিল শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। অধ্যাপক পি. কে. হিট্টির কথায়ঃ "The fair of Ukaz stood in pre-Islamic days for a kind of academic franchise of Arabia."

রাসূলে করীম (সা) নবুয়্যত লাভের পর কাবা শরীফকে প্রথম শিক্ষা প্রচারের কাজে ব্যবহারের প্রয়াস পান। অনেকের মতে রাসূল (সা) তাঁর নবুয়্যতের অতি শৈশব অবস্থায় মক্কা নগরীতে 'দারুল আরকাম' নামেও একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। এ স্থানে তিনি তাঁর নবদীক্ষিত শিষ্যদেরকে গোপনে নামায ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি শিক্ষা দিতেন। পরে তিনি মদীনা শরীফে হিজরত করে **'কুব্বা'** নামক স্থানে সর্বপ্রথম একটি ক্ষুদ্র মসজিদ স্বহস্তে স্থাপন করেন ও পরে তিনি মদীনায় মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন।

রাসূল (সা) আসরের নামাযের পরেই অধিকাংশ সময় এ মসজিদে শিক্ষাদানে ব্রত থাকতেন। লক্ষ্যণীয়, নারীদের মধ্যে শিক্ষা দান ও প্রচারের জন্য তিনি সপ্তাহের একটি দিনও ধার্য করে রেখেছিলেন। সে দিনটিতে মহিলাগণ নির্ধারিত কক্ষে জমায়েত হয়ে আল-কুরআনের অমিয় শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, ২রা হিজরীতে (৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে) মাকরামাহ ইবনে নাওফেল নামক জনৈক আনসারের গৃহে 'দারুল কাররাহ' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এ প্রতিষ্ঠানটি ছিল আবাসিক ধরনের। সাহাবীগণ তাঁর গৃহে থেকে জ্ঞানার্জন করতেন।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) মসজিদুন নববীতে অবস্থান করে সাহাবীদের নামায শিক্ষা দিতেন; পাঠ-শিক্ষা দিতেন পাক কুরআন ও হাদীস শরীফ। সাহাবীগণ কুরআন শরীফের আয়াত মুখস্থ করার জন্য তিনবার আবৃত্তি করতেন। আল-কুরআন শিক্ষা করা ছাড়াও সাহাবীগণ ধর্মীয় বিধান (rituals), ***কারুময় হস্তলিপি*** (calliography), **বংশ ইতিহাস** (geneology), ঘোড়দৌড়, বিদেশী ভাষা ও তীর নিক্ষেপ শিক্ষা করতেন। একযোগে দীন ও দুনিয়ার শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি ও প্রয়োগ আল্লাহর রাসূল (সা) এভাবে প্রচলিত করেন।

www.pathagar.com

মক্কা, মদীনা, সিরিয়া ও বিভিন্ন অঞ্চলের সাহাবীগণ আসতেন তাঁর নিকট কুরআন-হাদীসের উপর জ্ঞানার্জনের জন্য। রাসূল করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় ৯টি মসজিদ মদীনায় ছিল। এসব মসজিদে মদীনা ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য সমবেত হতো। আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতির মত তখন ভর্তি পরীক্ষা ও বেতনের দ্বারা শিক্ষার দ্বার সংকুচিত ছিল না। মসজিদ ছিল তখন একটি উন্মুক্ত বিদ্যালয়, যা হতে বর্তমান বিশ্ব Open University -এর ধারণা লাভ করেছে। শিক্ষাদানের বহু প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী সাহাবী তখন ছিলেন শিক্ষকতায় নিবেদিত। তাঁদেরকে ঘিরে রাখতেন ছাত্রগণ মৌচাকের মৌমাছির মত। যেমন, হযরত আলীর বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আমির আলী বলেন ঃ In the public mosque at Medina, Ali and his cousin Abdullah, the son of Abbas , delivered weekly lectures on philosophy and logic, the traditions, history, rhetoric, and law, whilst others dealt with other subjects. (History of the Saracens: p. 187).

ঐতিহাসিক খোদা বকশ 'Islamic Civilization' গ্রন্থে মসজিদের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য করেন নিম্নভাবেঃ "For the Muslims the mosque does not bear the same exclusive character as does a church for the Christians. It is not merely a place of worship. The Muslim indeed honours the mosque but he does not hesitate to use it for any laudable purpose". রাসূল (সা) কর্তৃক বিদ্যাপীঠ হিসেবে মসজিদের এই সার্বজনীন প্রশংসনীয় ব্যবহারই উত্তরকালে শিক্ষার গণমুখী প্রসার ও সম্প্রসারণে অতি ব্যাপক ও গভীর ভূমিকা পালন করেছে। ঐতিহাসিক ইয়াকুবের মতে বাগদাদে ৩০ হাজার মসজিদ শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত হতো; বড় বড় মসজিদগুলোতে পাঠ্য তালিকা ভাগ করা ছিল। শিক্ষকগণ সে পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী বিশেষ পাঠ্যসূচির উপর বক্তৃতা দিতেন। পরিব্রাজক নাসির খসরুর মতে (একাদশ শতাব্দীতে) মিসরের রাজধানী কায়রোর মসজিদে প্রত্যহ প্রায় ৫ হাজার লোক দীন ইলম হাসিল করার জন্য সমবেত হতো। সাম্প্রতিককালের মিসরের 'জামে আযহার', দিল্লীর 'জামেয়া মিল্লিয়া' এবং 'দেওবন্দ মাদ্রাসা' মসজিদভিত্তিক শিক্ষারই উত্তর ফসল।

www.pathagar.com

মসজিদের আরো বিবিধ ব্যবহার

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মুসলমানগণ যখনই কোন দেশ জয় করেছেন, তখনই তাঁরা সেদেশে তাঁদের বাসস্থান সংলগ্ন স্থাে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। উদ্দেশ্যঃ এ ঘরের মাধ্যমেই তাঁরা মুসলিম জাতির দীন ও দুনিয়ার শিক্ষাকে জাগ্রত ও প্রসারে সচেষ্ট থাকবেন। এ ঐতিহ্য হতেই শতাব্দীর পাদমূলে এসে ভাগ্যাহত ও বিভ্রান্ত মুসলিম মিল্লাত 'মসজিদকে' কেন্দ্র করে পুনরায় ইসলামী শিক্ষাকে উজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেতনা লাভ করছে। এ জাতি অধুনা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে যে, রাসূলুল্লাহ্র মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা ও আদর্শের ক্ষুরধার ব্যতীত মুসলমানদের ন্যায়পর 'মসী ও অসির' শৌর্যবীর্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

রাসূলে করীম (সা)-এর ছাত্রদের পরিচয় ঃ

সাইয়েদ সুলায়মান নদভী 'পয়গামে মুহাম্মদী'তে বলেন. ".....নবুয়াত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ শিক্ষায়তনটি দেখুন। সেখানে একই সময়ে এক লক্ষেরও বেশি ছাত্র দেখতে পাবেন। তাঁর [রাসূল (সা)] প্রত্যেকটি ছাত্রের নাম, পরিচয়, অবস্থা, জীবনচরিত, শিক্ষা ও অনুশীলনের ফলাফল, প্রত্যেকটি বিষয় ইসলামের ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।" আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা-বিজ্ঞানের পরিভাষায় "Follow up study" বা "Cumulative Record"-ও ছাত্রদের জীবন বৃত্তান্ত ততটুকু রাখতে সক্ষম হয়নি, যতটুকু আল্লাহর রাসূল (সা)-এর ছাত্রদের "ইতিহাস বৃত্তান্ত" বর্তমানে সংরক্ষিত হয়ে আছে। হযরত উমর (রা) হতে হযরত বিলাল (রা) পর্যন্ত খলীফা, ক্রীতদাস, আরব, অনারব, প্রতিপত্তিশালী, নিরীহ, সবাই এক কাতারে সমমর্যাদায় আল্লাহ্র রাসূলের (সা) নিকট বিদ্যাশিক্ষা লাভের সমান সুযোগ ও মর্যাদা পেয়েছিলেন। সুলায়মান নদভীর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষায়তনে সার্বজনীনতার এ দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এর মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য বর্ণ ও আকৃতি, দেশ ও রাষ্ট্র, জাতি ও বংশ এবং ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গিমার কোন প্রাচীরই ছিল না, বরং ঐ সময়ে দুনিয়ার সকল জাতি, সকল বংশ, সকল দেশ ও সকল ভাষাভাষীর জন্য শিক্ষার দ্বার ছিল উন্মুক্ত। এটিই হচ্ছে সত্যিকার Education for All-এর উত্তম নিদর্শন।

রাসূল করীম (সা)-এর শিষ্যগণের চরিত্র ও এর প্রভাব সম্পর্কে কিছুটা আলোচনাও এ প্রসঙ্গে অপরিহার্য। তাঁর শিক্ষাগার থেকে প্রথম সারিতে যাঁদের নাম উল্লেখ্য, তাঁরা হচ্ছেন ইসলামের চার খলীফা হযরত আবুবকর, উমর, উসমান ও আলী (রা)। তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সামনে

www.pathagar.com

তদানীন্তন বড় বড় শাহানশাহ ও শাসকগণের রাজনীতি, কুটনীতি, প্রশাসন নিষ্প্রভ ও মূল্যহীন হয়ে যায়। তাদের ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের ক্ষুরধারে ইরানী শাসনতন্ত্র ও রোমীয় আইন ভোঁতা ও অকেজো প্রমাণিত হয়। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের রণনৈপুণ্য ও সেনাপতিত্ব রোম ও পারস্যের দাপট ও প্রতিপত্তিকে ধরাশায়ী করে দেয় অচিরেই। তেমনিভাবে সাদ (রা) এর বাহুবল ইরাক ও ইরানের রাজমুকুটকে ইসলামের পদতলে স্থাপিত করে দেয়।

ওলামা ও ফকীহগণের মধ্যে হযরত উমর, আলী, আবদুল্লাহ, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, বিবি আয়েশা, উম্মে সালমা (রা) প্রমুখ সাহাবী বিশ্বের আইন ও ফিকাহ্ শাস্ত্রের সঠিক ভিত রচনা করে গেছেন।

আসহাবে সুফফার দলটি ছিল ৭০ জন সাহাবীর সমষ্টি। তাঁরা কৃচ্ছ্র সাধনায় জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তির জন্য যে ত্যাগ ও কুরবানীর নজীর রেখে গেছেন তা বিশ্বের প্রলয়দিন পর্যন্ত সমুজ্জ্বল আদর্শ হয়ে থাকবে। তাঁরা দিনের বেলায় জঙ্গলে কাঠ কাটতেন জীবিকা নির্বাহের জন্য, আর রাতভর ইবাদত করতেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে।

শিক্ষক-শিষ্যের সম্পর্ক কিরূপ ছিল তাও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। রাসূলে করীম (সা)-এর সম্পর্ক ও প্রভাব থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য হযরত বিলাল (রা), হযরত খাব্বাব (রা)-এর উপর যে নির্যাতন হয়েছিল, তা ইতিহাসে চির-নতুন হয়ে আছে। হযরত আম্মার, হযরত যুবায়র, হযরত সাঈদ ইবনে যায়দ, এমনকি হযরত উসমান (রা)-কেও অনুরূপ নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁদের একমাত্র অপরাধ ছিল তাঁরা রাসূলে করীম (সা)-এর শিক্ষা ও চরিত্রের অনুসরণ করতেন। হিজরতের সময় হযরত আলীর রাসূলুল্লাহর শয্যায় রাত যাপন, ইসলাম কবুল করার অপরাধে স্ত্রী অঙ্গে আবু জাহিল কর্তৃক আঘাতে বিবি সুমাইয়া (রা)-এর শাহাদত বরণ, সাফওয়া বিন উমাইয়া রাসূলকে অনুসরণ করার ফলে দু-উটের দ্বারা তার পদদ্বয় বন্ধনযুক্ত দেহটিকে আবু কোহাফা কর্তৃক দু-টুকুরাকরণ, হযরত দোহারের (রা) মক্কার 'বাড়িঘর সম্পত্তি' পরিত্যাগ করে মুস্তফা চরণের আশীর্বাদ লাভের আশায় মদীনায় হিজরতকরণ, জেরিনা নাম্মী মহিলার রাসূল প্রীতির জন্যে চক্ষুজ্যোতি কুরায়শদের হাতে বিনষ্ট হওয়া, রাসূলের (সা) দান্দান শহীদের খবরে ওয়ায়েশ করণী (রা) কর্তৃক স্বীয় মাড়ির সব তাজা দাঁত উৎপাটন, ওহোদ ও হুনায়েনের যুদ্ধে আবু দোজাহাহ-এর মত সাহাবীপ্রবরদের দেহ দ্বারা রাসূলের দেহ মুবারক রক্ষা করতে গিয়ে শাহাদত বরণ, খোবায়েব (রা)-এর কাফিরদের হাতে রাসূল প্রীতির জন্য মৃত্যু আলিঙ্গন, ইত্যাকার উজ্জ্বল ঘটনা কি অনুপম ও অনন্য গুরুভক্তির নিদর্শনই না বহন করছে

www.pathagar.com

আজকের সুধী সম্প্রদায়ের কাছে! জীবনের বিনিময়ে শিক্ষাগুরুর প্রতি এহেন একনিষ্ঠ গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধার এ ইতিহাস বিশ্বে অদ্বিতীয় ও অনতিক্রমণীয়। কারণ রাসূল করীম (সা)-এর চরিত্র ছিল 'উসওয়াতুন হাসানা' উৎকৃষ্টতম সৌন্দর্যমন্ডিত বা "রাহমাতুল্লিল আলামিন"-গোটা বিশ্বের রহমত স্বরূপ, আর প্রকৃতিগত ভাবেই এর সংরক্ষণের জন্যে শিষ্যবর্গের ছিল এহেন অনুপম ত্যাগের দৃষ্টান্ত।

বিশ্বমানবের মূল পাঠক্রম আল-কুরআনের শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে তাই আল-কুরআনেই আল্লাহ্ ইরশাদ করেন. "লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহে উস্ওয়াতুন হাসানাতুল লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহা ওয়াল ইয়াউমিল আখিরা ওয়া জাকারাল্লাহা কাসিরান"। (----------)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টিতে শিক্ষা ও শিক্ষকের মর্যাদা ঃ

জ্ঞান, তদনুযায়ী চরিত্র ও আমল যিনি অর্জন করেন প্রকৃতপক্ষে তিনিই শিক্ষিত বা আলিম। শিক্ষাগুণের প্রতিফলন ও বিকাশেই প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়। রাসূলে করীম (সা)-এর শিক্ষার মূল কথা এটা-ই। তিনি বলেনঃ 'লাম ইয়াকুনা মুসলিমান হাত্তা ইয়াকুনা আলিমান, ওয়ালাম ইয়াকুনা আলিমান হাত্তা ইয়াকুনা ফিল ইলমে আমিলান"-কোন ব্যক্তিই মুসলমান নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষিত না হয়, কোন লোকই শিক্ষিত নয় যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার শিক্ষানুযায়ী আমল না করে। এ হাদীসের দৃষ্টিতে আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে বিচার করলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা খুবই নগণ্য। কারণ ইসলামী জ্ঞানের চর্চাও প্রসার বর্তমান বিশ্বে যেটুকু হচ্ছে, সে অনুযায়ী চরিত্র ও কর্মতৎপরতা মুসলমানদের অধিকাংশের মধ্যে প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে অধিকাংশ মুসলমানের চারিত্রিক ও নৈতিক ভিত্তি ক্ষয়িষ্ণু।

আল্লাহর রাসূল ইলম ও আলিম সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞানার্জনের চিরন্তন উৎসাহ ও পথ-নির্দেশ দিয়ে থাকবে। নিম্নে এ ধরনের কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

"সমস্ত মানুষ স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনিসদাশ। যারা জ্ঞানী তারা অন্ধকার যুগেও উত্তম এবং ইসলামী যুগেও উত্তম।" (মিশ্কাত)

জ্ঞান যে মানুষকে জাহিলী যুগেও রক্ষাকবচ হিসেবে নিরাপত্তা দান করে এটাই এ হাদীস শরীফটির মূল বক্তব্য।

মিশকাত শরীফের অপর একটি হাদীসে রসূল (সা) বলেনঃ "আল্লাহ্র পরে, রাসূলের পরে ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা মহানুভব, যে জ্ঞানার্জন করে ও পরে তা প্রচার করে।"

www.pathagar.com

তিরমিযী ও মিশকাত শরীফে উল্লেখ আছে ঃ "ফিরিশতা, প্রকৃতি, মাছ, মানুষ এমন কি পিপীলিকা সবাই সদুপদেশকারীকে আশীর্বাদ করে।"

উত্তম জ্ঞানী করা ? এ প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (সা) বলেন, "যারা যা জানে তা পালন করে"। (মিশকাত) জ্ঞানানুযায়ী চরিত্র ও কর্মের সমন্বয় বা অন্বয় সাধনই হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের তাকিদ। শুধু তাই নয়, নিজে জ্ঞানার্জন করার পরক্ষণেই অপরকে সেজ্ঞানে শিক্ষিত ও চরিত্র গঠন করার দায়িত্বও জ্ঞানী ব্যক্তির।

"ইন্নামাল ওয়ালামা–উ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়াই" নিশ্চয়ই আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।

রাসূল (সা) বলেনঃ "শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ব্যতীত কেই আল্লাহ্র আপন নয়"।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "শিক্ষার্থী ইসলামের স্তম্ভ এবং জ্ঞানান্বেষণকারী আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়।" রাসূল (সা) আরো বলেনঃ "রাতের কিছুক্ষণ জ্ঞান চর্চা করা সারা রাত্রির নফল ইবাদতের চাইতেও উত্তম।"

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ "আল্লাহর শপথ, যদি তুমি একটি লোককে শিক্ষিত করতে পার তবে উহা তোমার পক্ষে একটি লাল উট লাভের চেয়ে উত্তম।" আরব দেশে লাল উট অত্যন্ত মূল্যবান এবং এটি একটি আভিজাত্যের প্রতীক। আল্লাহর রাসূল এ হাদীস শরীফের মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণের পুরস্কার কত মূল্যবান ও পদ মর্যাদামন্ডিত তা 'লাল উটের' উপমায় বুঝিয়েছেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেই জ্ঞানার্জনে শুধু ধন্য হন না, বরং অন্যের জন্যেও তিনি রহমত স্বরূপ। এ তাৎপর্যটুকু ফুটে উঠে নিম্নের কতিপয় হাদীসেঃ

বিশ্বে জ্ঞানীরা নক্ষত্র সদৃশ। "তারা জল-স্থলের অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন। অনন্তর যখন তাঁরা অদৃশ্য হন তখন সহজেই পথভ্রষ্টের আশঙ্কা হয়।"

অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ "জ্ঞানীদেরকে অনুসরণ কর। কারণ তাঁরা ইহকালের প্রদীপ ও পরকালের বর্তিকা।"

তৃষিত আলিম বা শিক্ষিত ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলেন ঃ "জ্ঞানান্বেষণকারীর জন্যে আল্লাহ্ বেহেশতের পথ সহজ করে দেন।"

"এক সহস্র আবিদ অপেক্ষা একজন তত্ত্বজ্ঞানী শয়তানের নিকট অধিক কঠোর।"

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ "তিন শ্রেণীর লোক কিয়ামতের দিন শাফা'আত করতে পারবেন। নবী, তৎপর আলিম, তৎপর শহীদগণ।" তিনি আরো বলেনঃ "আলিমের দিকে একবার দৃষ্টিপাত আমার কাছে রোযা নামাযসহ এক বছর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।" (সগীর)

www.pathagar.com

অপর এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেহেশতের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত লোক আলিম সম্প্রদায়। জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর রাসূল সৌভাগ্যবান বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এথেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদেরকে তিনি হতভাগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনেও উল্লেখ রয়েছে ঃ "তোমরা কি মনে কর যারা জানে এবং যারা জানে না তারা সমান? আঁধার ও আলো কি সমান? তোমরা কি চিন্তা কর না, মহান আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু ঐ ব্যক্তিগণ যারা মূক, বধির এবং নির্বোধ।" (৮ ঃ ২২)

"..... তারা পশুর মত। উপরন্তু পথভ্রান্তিতে তাঁরা আরও নিকৃষ্ট।" (৭ঃ৭৯) রাসূল (সা) বলেন ঃ "দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো পদগৌরব লোভনীয় নয়।"

১. ধনাঢ্য ব্যক্তি, যাকে মহান আল্লাহ্ ধনদান করেছেন এবং তা সত্যপথে দান করার ক্ষমতা দিয়েছেন; এবং

২. ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ জ্ঞানদান করেছেন এবং তদনুসারে সে কাজ করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" জ্ঞানান্বেষণকারী শুধু যে বেহেশতে প্রবেশ করবেন তাই নয় বরং তিনি রাসূলে পাকের কথায় বেহেশতের যে কোন পথে বিচরণ করার গৌরব লাভ করবেন। রাসূল (সা) অপর এক হাদীসে বলেন; "জ্ঞানান্বেষণকারী ও নবীর মধ্যে বেহেশতের মাত্র একধাপ পার্থক্য।" "জ্ঞানী ব্যক্তি" শহীদের চেয়ে অধিক মর্যাদাশীল। এ মর্যাদা বোঝাতে গিয়ে রাসূল (সা) বলেনঃ "জ্ঞানী ব্যক্তির কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও অধিক পবিত্র।" কারণ শাহাদাত বরণের অনুপ্রেরণা ও প্রত্যয় সৃষ্টিকারী তো জ্ঞানী ব্যক্তির কলমই।

বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান শিক্ষার উপর রাসূলুল্লাহ্ বলেনঃ "যাকে বিজ্ঞানের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে যথেষ্ট কল্যাণ দান করা হয়েছে।"

পরিশেষে আল্লাহর রাসূল (সা) লোক দেখানো বা পাণ্ডিত্য জাহির করার উদ্দেশ্যে যেসব ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে সেসব ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেছেন তা-ও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। রাসূলে পাক বলেন, যদি কোন ব্যক্তি

১. শিক্ষিত ব্যক্তিকে পরাভূত করার জন্য ২. নির্বোধদের সাথে তর্ক করার জন্য ৩. অথবা মানব মন আকর্ষণ করার জন্য বিদ্যান্বেষণ করে, আল্লাহ্ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করেন।

জ্ঞান মানুষকে সৌভাগ্যমন্ডিত করে। রাসূলের কথায় ঃ "আল্লাহ্ যার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে ধর্মের জ্ঞান দান করেন এবং সত্যপথ দেখিয়ে দেন।" (বুখারী, মুসলিম) আবুদারদা বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ আছে, "আসমান ও

www.pathagar.com

যমীনের ভেতর যা কিছু আছে সমস্তই আলিমের জন্য ক্ষমা চায়।" আবু নইম থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (সা) বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই হিকমত (বিজ্ঞান ও যুক্তি) সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি করে এবং গোলামকে এত উচ্চ করে যে তাকে বাদশাহ্র স্থানে বসিয়ে দেয়।" এজন্যই দেখা যায় যে বাদশাহ্ অপেক্ষা আলিমের পদমর্যাদা দুনিয়াতে বেশি প্রভাবশালী ও জনপ্রিয়।

আবুদারদা থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেনঃ "ঈমান পোশাকতুল্য। পোশাক আল্লাহ-ভীতি, এর সৌন্দর্য লজ্জা, এর কল্‌ব ইলিম্।" রাসূল (সা) বলেনঃ "কোন আলিমের মৃত্যুর চেয়ে কোন এক সম্প্রদায়ের মৃত্যু অধিক সহজ।" (তিবরানী) আলিমের গুরুত্ব ও প্রভাব সমাজ জীবনে কত গভীর ও ব্যাপক উক্ত হাদীসটি এটাই সম্যকভাবে উপলব্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে। জ্ঞান বা বিদ্যার্জন মানুষকে শুধু সম্মানিত ও প্রভাবশালী করে না; বরং এর ফলস্বরূপ আল্লাহ্ স্বয়ং জ্ঞানী বা আলিম ব্যক্তির যিম্মাদার হন। রাসূলের ঘোষণা ঃ "যে আল্লাহর দীন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করে, তার চিন্তা ভাবনা সম্বন্ধে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তাকে কল্পনাতীত স্থান হতে রিযিক দেওয়া হবে।" (খতিব) ইবনে বার কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন, মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট ওহী পাঠালেন ঃ "হে ইবরাহীম, আমি মহাজ্ঞানী, প্রত্যেক জ্ঞানীকে আমি ভালবাসি।" আলিমের দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসূল (সা) আরো বলেনঃ "আলিম পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার আমানতদার। (ইবনে বাব) আল্লাহর রাসূল (সা) আল্লাহ্র নিকট জ্ঞানশূন্য পরিবেশের সংস্পর্শ থেকে পানাহ চেয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ "যদি আমার উপর এমন দিন আগত হয় যার ভেতর আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য আমার জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না, সেদিন যেন সূর্যোদয়ের ভাগ্য আমার নসিবে না ঘটে।" (তিরবানী) অন্য কথায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য ও জ্ঞানবিবর্জিত আলিমগণ মানবজাতি এবং বিশেষ করে উম্মতে মুহাম্মদীর ঈমান, আমল ও আকীদার প্রতি কিরূপ মারাত্মক, তা এ হাদীসটি স্পষ্টরূপে তুলে ধরেছে স্বয়ং রসূল (সা)-এর উদ্বেগের উল্লেখ করে। রাসূল (সা) বলেন যে, যে ব্যক্তি যা শিখে ও তদনুযায়ী আমল করে; তাকে আসমানের রাজত্বে মহৎ বলে আহবান করা হয়। তিনি অপর এক হাদীসে উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের সময় আলিমদেরকে শাফা'আত করার সুযোগ দেবেন এবং তাদের শাফা'আত তিনি কবুল করবেন। (আবুল আব্বাস)

www.pathagar.com

অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে কুরআনের শিক্ষক রাসূল (সা.) ঃ

স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,"বুয়েস্তু লেউতিম্মা মাকারিমাল আখলাক," আমি প্রেরিত হয়েছি চারিত্রিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা দান করার জন্য। আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে নবী (সা)-এর যে সর্বজনীন ও শাশ্বত চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, এর সমর্থনে বিশ্বের প্রখ্যাত বহু অমুসলিম মনীষীও স্বীকৃতিদানে বাধ্য হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কতিপয় মনীষীর উদ্ধৃতি সন্নিবেশ করা হল ঃ

স্যার উইলিয়াম মূয়ীর ঃ আল্লাহ্‌র রাসূলের চারিত্রিক প্রভাব ও দীপ্তি তুলে ধরেন এই বলে ঃ "তিনি মধ্যমাকৃতি অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘকায় হলেও দেখতে রাজোপম ও তেজস্বী ছিলেন। তিনি মানবকুলের সর্বাপেক্ষা রূপবান, সর্বাপেক্ষা সাহসী, সর্বাপেক্ষা প্রদীপ্ত সুকান্তি বিশিষ্ট ও সর্বাপেক্ষা উদার ছিলেন। তাঁকে দেখলে অনুমিত হত যেন তাঁর মুখমন্ডল হতে স্বর্গীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।"

বাবু মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ঃ 'শেষ পয়গম্বর' গ্রন্থে নবী-চরিত্রের রূপ পরিস্ফুট করেন এভাবেঃ

"যতদিন আপামর সাধারণ সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব মনে করিয়া কৃতজ্ঞতা রসে নিমগ্ন থাকিবে, যতদিন এই জগতে মানুষের আধিপত্য অক্ষুণ্ন থাকিবে, ততদিন এই বিশাল সংসারে হযরতের নাম গগনস্থিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় অতি উজ্জ্বলভাবে বিরাজিত থাকিবে।"

রামপ্রাণ গুপ্ত ঃ রসূল করীম (সা)-এর চিন্তা ও কর্মের ঐক্য এবং সংহতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ "এই পবিত্র নবী মুখে যাহা বলিয়াছেন, কর্মজীবনেও উহা অবিকল প্রদর্শন করিয়াছেন।" তিনি আরো বলেন, "এই পবিত্র নবী বলিয়াছেন, জ্ঞান অর্জনের জন্য চীন পর্যন্ত গমন কর যখন ইউরোপ কুরুচি ও মূর্খতার গভীর গহ্বরে নিমগ্ন ছিল, যখন ইউরোপীয় রাজধানীতে ডাকিনীগণ জীবন্ত দগ্ধ হইতেছিল ও জ্ঞানার্জন হলাহল সদৃশ ঘৃণিত হইত, তখন মোসলেমগণ স্পেনের প্রত্যেক গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য শিক্ষা দিতেছিলেন।" (ইসলাম কাহিনী দ্রষ্টব্য)

লাহোরের প্রখ্যাত পন্ডিত **বাবু প্রকাশ** দে-এর কথায়ঃ "একেশ্বরবাদ শিক্ষা প্রদান ও সকলকে সরল পথে আনয়নের জন্য তাঁহার (নবী করীম সা) ন্যায় বিজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির আবশ্যক ছিল, অবশেষে তাঁহার দ্বারাই এই কঠোর কার্য সুসম্পন্ন হইল। যাহারা এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠিত তাহারা সম্পূর্ণ সংকীর্ণমনা ও সত্যদ্রোহী।"

www.pathagar.com

জার্মান পন্ডিত ডঃ গোস্টেভ উইল ঃ এ মন্তব্য করেন যে, হযরত মুহাম্মদ স্বীয় জনগণকে এক উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করেছেন। তাঁর চরিত্র পবিত্র ও সরল ছিল।

ঐতিহাসিক গীবন বলেনঃ "হযরত মোহাম্মদের ধর্মমত সন্দেহশূন্য, দ্ব্যর্থবোধহীন এবং কুরআন পরমেশ্বরের একত্ববাদের একটি সমুজ্জ্বল দলীল। আমার মনে হয়, এই ধর্মমত এতদূর উচ্চ যে, আমাদের বর্তমান জ্ঞান নিশ্চয়ই এটা সম্যক অভিনিবেশ করতে পারছে না।"

স্টেনলী লেনপুলও ঃ রাসূলে করীম (সা)-এর প্রশংসা করেছেন নিম্নরূপে ঃ "তিনি অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নবী ছিলেন, তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের স্বরূপ অথবা স্বীয় জীবনব্রত কখনও বিস্মৃত হননি। তিনি তাঁর উচ্চাসনের মর্যাদা মধুময় সৌজন্যের সাথে অক্ষুণ্ন রেখে স্বীয় অনুচরবর্গকে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছেন।"

বোসওয়ার্থ স্মিথ লিখেন ঃ "তিনি স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন, লিখতে পড়তে জানতেন না বললেই হয়, অথচ তিনি এমন একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন (যুক্তিধর্মী বলে একথা লিখেছেন) করেছেন, যা একাধারে কার্য, স্মৃতি, সংহিতা,স্তোত্রমালা এবং ধর্মগ্রন্থ। আমি বিশ্বাস করি, সুবিজ্ঞ দার্শনিক এবং প্রকৃত মনীষী, একদিন হযরত মুহাম্মদকে নবী, পরমেশ্বরের প্রকৃত নবী বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন।" (Mohammad and Mohammadism, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৩)

জন ডেভেনপোর্ট ঃ'Mohammad and the Koran' গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বাইবেলের অনুসরণে নিম্নভাবে উল্লেখ করেন, "The greatest and the last of God's prophets",

এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকাও ঃ অনুরূপ মন্তব্য করেছে ঃ "Of all the religious personalities of the world, Mohammad was the most successful".

ডঃ স্টোডডারড ঃ (Dr. Stoddard) রাসূলে করীম (সা) প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত ইসলামের মহান শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রভাব তুলে ধরেন এই বলে ঃ "জগতের অন্যান্য নামকরা নামগুলো ধীরে এবং দুঃখজনক সংগ্রামে ও সর্বশেষ নবধর্মে দীক্ষিত পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গের সহায়তায় বিজয় লাভ করে। খ্রিস্টধর্মের জন্য কন্সটেনটাইন, বৌদ্ধ ধর্মের জন্য অশোক, জরথুস্ত্রের জন্য সাইরাস ছিলেন; যাদের প্রত্যেকেই স্বীয় ধর্মমতের প্রসারকল্পে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির দোর্দণ্ড প্রতাপ ও শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ইসলামে এমনটি হয়নি।"

www.pathagar.com

উক্ত উদ্ধৃতাংশনিচয় থেকে অনায়াসেই এ উপসংহারে আসা যায় যে, বিশ্বমানবের চরিত্র গঠনে নৈতিক উন্নয়ন ও বৈষয়িক এবং পারত্রিক উন্নয়ন শিক্ষা প্রদানে একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত অন্য কোন মনীষী বা মহাপুরুষ বিশ্বমানবের শিক্ষকতার মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী হতে পারেন নি, পারবেনও না। এ জন্যই আল-কুরআন চিরন্তনভাবে নবী (সা)-কে 'রাহ্‌মাতুলিল আলামিন"- গোটা বিশ্বের কল্যাণ উপাধিতে চিরভূষিত করে রেখেছে।

ইসলামে শিক্ষিত জনের দায়িত্ব ঃ

বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের পর তা প্রচার করা আলিমদের উপর ফরয হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) বলেনঃ "যে বিদ্যা শিক্ষা করে তা গোপনীয় রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে আগুনের লাগাম দ্বারা টানবেন।" রাসূল (সা) আরও বলেন যে, "একমাত্র আলিম ব্যতীত (অর্থাৎ যিনি শিক্ষা দেন তিনি ব্যতীত) দুনিয়ার সকলেই লানত প্রাপ্ত।" ইবনে মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূল করীম (সা) একদিন বের হয়ে দুটি মজলিশ দেখতে পান। একটি মজলিশের লোকেরা মহান আল্লাহকে ডাকছে এবং ফরিয়াদ করছে, অপর মজলিসে জ্ঞান চর্চা হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল (সা) শেষোক্ত মজলিসেই উপবেশন করলেন।

কারা আপনার খলীফা? এ প্রশ্নের উত্তরে রসূল (সা) বলেনঃ "যারা আমার সুন্নাতকে ভালবাসেন এবং আল্লাহর বান্দাগণকে তা শিক্ষা দেন।" আল্লাহর রাসূল (সা) তাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় বলে উল্লেখ করেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে হযরত নবী করীম (সা) বলেছেনঃ আল্লাহ্ বান্দাদের বিদ্যা দিয়ে তা সম্পূর্ণভাবে তুলে নেবেন না; কিন্তু তিনি আলিমদের প্রাণ হরণ করে বিদ্যা তুলে নেবেন। যখনই একজন আলিম ওফাতপ্রাপ্ত হন, তাঁর সাথে যে-ইলম থাকবে তাও তিরোহিত হবে। এমনি ভাবে অবশেষে মূর্খ নেতাগণ ব্যতীত আর কেউ থাকবে না। তাদেরকে কোন কথা জিজ্ঞেস করা হলে ইলম ব্যতীত তারা ফতোয়া দেবে। এতে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে। 'শিক্ষা বা ইলম হাসিলের গুরুত্ব ও তাগিদ রাসূল (সা) কি পর্যন্ত দিয়েছেন তা উক্ত হাদীসশরীফসমূহ হতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর কোন মনীষী বা কোন ধর্ম 'শিক্ষার আবশ্যকতা ও সর্বজনীন শিক্ষার' প্রতি এ ধরনের গুরুত্ব দিয়েছেন বলে ইতিহাসে এ পর্যন্ত উল্লেখ নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। শিক্ষার প্রতি রাসূল (সা)-এর এই অনুরাগ কত প্রবল তা বদরের যুদ্ধে "শিক্ষিত যুদ্ধবন্দীদের প্রতিজনের দ্বারা" ১০ জন মুসলমানকে শিক্ষিত করার বিনিময়ে একজন 'যুদ্ধবন্দীর' মুক্তিদান বিশ্বমানবতার

www.pathagar.com

নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। রাসূলের দৃষ্টিতে ইলম এত সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ যে কট্টর কাফির-জানের দুশমন, বদরের প্রত্যেকটি শিক্ষিত বন্দী নাজাত লাভ করেছে একমাত্র বিদ্বান হওয়ার সৌভাগ্য ও কার্যক্রমে। রাসূল করীম (সা) এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাকের বদান্যতা সম্পর্কে আমাদেরকে যে সুসংবাদটি দিয়েছেন তাও এখানে লক্ষণীয়। হযরত (সা) বলেছেনঃ "পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদেরকে কিয়ামতের দিন উঠাবেন এবং তারপর আলিমদিগকে উঠাবেন এবং তারপর তিনি বলবেন-'হে সমবেত আলিমগণ, তোমাদের ভেতর আমি যে ইলম রেখেছি তা তোমাদের সম্বন্ধে জেনেই রেখেছি। আমি তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে তোমাদের ভেতর ইলম রাখিনি। যাও, তোমাদের আমি ক্ষমা করলাম।' (তিবরানী)

ইলম বা বিদ্যার্জন আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর নিকট কত প্রিয় ও মর্যাদাশীল তা উক্ত হাদীস শরীফ সমূহ থেকে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

সাহাবা-কিরাম ও মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও শিক্ষকের মর্যাদা ঃ

আল্লাহর রাসূল (সা)-এর 'শিক্ষা' বা 'বিদ্যার্জনের' প্রতি তাকিদ ও গুরুত্ব কি পরিমাণ ব্যাপক ও গভীর ছিল তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, গোটা বিশ্বে শিক্ষার প্রতি এহেন সর্বজনীন গুরুত্ব আরোপ ও প্রচারে অন্যকোন মহাপুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন না। এর প্রয়োজনও নেই। তাঁর শিক্ষার প্রতি অনুরাগ এবং এ শিক্ষা প্রচারে যেসব সাহাবা (রা) ও অন্যান্য মুসলমান প্রভাবান্বিত হয়েছেন জ্ঞানার্জনে, তদানুযায়ী কর্ম ও চরিত্র গঠনে, সেসব মনীষীর জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত কতিপয় সারগর্ভ উক্তি এখানে উল্লেখ্য। কারণ, এসব উক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার অপরিহার্যতা ও মূল্যবোধকে আরও স্বচ্ছ ও হৃদয়গ্রাহী করে রেখেছে। যেমন ঃ

হযরত উমর (রা) বলেছেনঃ যে একটি হাদীস শিক্ষা করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, সে ঐ ব্যক্তির পুরস্কার পাবে যে তা কার্যে পরিণত করল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে মানুষকে মঙ্গল শিক্ষা দেয়, তাঁর জন্য প্রত্যেক বস্তুই ক্ষমা চায়, এমনকি সমুদ্রের মৎস পর্যন্ত। হযরত হাসান বসরী (রঃ) মন্তব্য করেন এই বলেনঃ ওলামাগণ যদি না থাকতেন মানুষ পশুর ন্যায় হয়ে যেত। হযরত ইয়াহ্ ইয়ার দৃষ্টিতে আলিমগণ মাতা-পিতা অপেক্ষা উম্মতে মুহাম্মদির প্রতি বেশি দয়ালু; কারণ মাতা-পিতা সন্তানদের দুনিয়ার আপদ-বিপদ, বালা মুসিবত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু আলিমগণ তাদেরকে দোযখের অনন্তর আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালান।

www.pathagar.com

হযরত মুআয বিন জাবাল ইলমের গুরুত্ব ও উপকারিতার বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে হাদীসের উল্লেখ করে বলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেনঃ "ইলম অর্জন কর, কেননা এর অর্জন আল্লাহর ভয়ের সমান, এর অন্বেষণ ইবাদত, এর জন্য চেষ্টা এবং পর্যটন তসবীহ, এর জন্য চেষ্টা জিহাদ, ইহা যে জানেনা তাকে জানান দানস্বরূপ এবং ইহা উপযুক্ত লোকের নিকট ছড়ালে নৈকট্য লাভ হয়। ইলম সফরের বন্ধু, নির্জনতার সঙ্গী, ধর্মের পথ প্রদর্শক, দারিদ্র ও সচ্ছলতার নূর, বন্ধুর ইহা মন্ত্রী, অপরিচিতের নিকট বন্ধু, বেহেশত পথের আলোকবর্তিকা। ইহার বিষয় চিন্তা রোযার তুল্য। ইহার সাহায্যে আল্লাহকে মানা এবং আল্লাহর ইবাদত করা সম্ভব হয়, ইহাই আল্লাহর একত্ব শিক্ষা দেয়, ইহার সাহায্যেই আত্মীয়তা রক্ষা হয়, ইহাই মানুষকে হালাল-হারাম শিক্ষা দেয়।"

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, তার একটি বিশদ ব্যাখ্যা উক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ ব্যাখ্যার আলোকে আধুনিক শিক্ষা, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য বিচার করে উম্মতে মুহাম্মদীর শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপণ করা অপরিহার্য। উক্ত হাদীস শরীফটি মুসলমানদের জ্ঞানার্জনের সীমা-পরিসীমা নির্ধারক এবং নিয়ন্ত্রকও বটে। মহাত্মা ইবনুল মুবারক বলেনঃ "যে বিদ্যা অন্বেষণ করে না, তার প্রতি আমি আশ্চর্য বোধ করি। সে কিরূপে তার নিজেকে সম্মানের দিকে আহবান করবে?"

হযরত আবুদারদার জ্ঞানার্জনের গুরুত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিম্নভাবেঃ "শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই সওয়াবের অংশীদার, আর অন্যান্য লোক অপদার্থ। তাদের ভেতরে কোন মঙ্গল নেই।" হযরত আতা জ্ঞান চর্চার প্রাধান্য দেখিয়েছেন এই বলে যেঃ "উদ্দেশ্যেবিহীন ৭০টি মজলিসের কাফফারা আদায় হয় একটি মাত্র বিদ্যাশিক্ষা মজলিস দ্বারা।"

হযরত আলী (রা) কামিনকে এ উপদেশ দিয়েছেনঃ "হে কামিন, বিদ্যার্জন দৌলত অপেক্ষা উত্তম। বিদ্যা তোমার প্রহরী, তুমি যখন দৌলতের প্রহরী, বিদ্যা বিচারক এবং ধন-দৌলত বিচার প্রার্থী, ধনদৌলত হ্রাস হয় আর বিদ্যা ব্যয়ে বৃদ্ধি পায়।" হযরত আলী (রা) অন্যত্র বলেনঃ "আলিম ব্যক্তি রোযাদার, নামাযী, গাযী হতে উত্তম। যখন আলিমের মৃত্যু হয়, ইসলামে তখন এমন এক বিপদ আসে যা তাঁর (আলিমের) স্থলাভিষিক্ত ব্যতীত অন্য কেউ দূর করতে পারে না।"

হযরত আবু আসওয়াদ বিদ্যা ও বিদ্বানের তাৎপর্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিম্নভাবেঃ "বিদ্যার চেয়ে অধিক সম্মানিত জিনিস আর কিছুই নেই। রাজন্যবর্গ মানুষের বিচারক, কিন্তু আলিমগণ রাজন্যবর্গের বিচারক।"

www.pathagar.com

এক বর্ণনায় জানা যায় যে হযরত দাউদ (আ) স্বীয় সন্তান হযরত সুলায়মান (আ)-কে ১. ইলম, ২. ধন-দৌলত এবং ৩. রাজত্ব—এ তিনটির একটি পছন্দ করার আদেশ দিয়েছিলেন। হযরত সুলায়মান 'ইলমকে'ই পছন্দ করেছিলেন। কারণ, এ তিনটির মধ্যে ইলম চিরস্থায়ী ও চিরবর্ধিষ্ণু। তাছাড়া ইলমই হচ্ছে রাজত্ব লাভ, পরিচালনা এবং ধনসম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের সঠিক পথ প্রদর্শনের একমাত্র অদ্বিতীয় উপায়। এক প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা ইবনুল মুবারক বলেনঃ "একমাত্র আলিমগণই প্রকৃত মানুষ, অন্য কেউ নয়। যারা ধর্ম বিক্রয় করে, তাদেরকে তিনি কামিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।"

হযরত ফতলুল মোছলী ইলমকে দিল বা হৃদয়ের খোরাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ক্রমাগত তিন দিন পর্যন্ত হৃদয়কে হিকমত বা জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রাখলে সেই হৃদয়ের মৃত্যু হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) মৃত্যুর পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত বিদ্যার্জনের তাগিদ দিয়ে বলেন যে, শাহাদত প্রাপ্ত ব্যক্তি পুনরায় পৃথিবীতে আসতে চাবে শুধু আলিমের সম্মান উপভোগ করার জন্য। হযরত হাসান বসরী (র) ইলমকে দুনিয়ার কল্যাণ এবং আখিরাতের মঙ্গল অর্থাৎ জান্নাত বলে অভিহিত করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন বিদ্যা এমন জিনিস, যা নিকৃষ্টকে আনন্দ দান করে, আর যার নিকট হতে তা তুলে নেওয়া হয়, সে হয় দুঃখিত।

হযরত আসনাফের মতে, যার সম্মান ইলমের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে অপমানের দিকে ধাবিত হয়। হযরত আবু বকরের (রা) পুত্র হযরত যুবায়ের বলেন যে তাঁর পিতা তাঁকে বিদ্যা শিক্ষা অর্জনের জন্য তাকিদ দেন। কারণ এ বিদ্যাই নিঃস্ব অবস্থায় ধন এবং অনাবশ্যক সময়ের সৌন্দর্যবর্ধক।

হযরত লোকমান স্বীয় পুত্রকে আলিমদের সংসর্গে থাকার উপদেশ দিয়ে বলেন যে, জ্ঞানের নূর দ্বারা মহান আল্লাহ্ কালব্কে আলোকিত করেন, যেমনটি তিনি মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে সজীব করেন।

রাসূলে করীম (রা)- এর অনুসারিগণ ইলম ও আলিমদের প্রতি কিরূপ গুরুত্ব ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন, তা উক্ত কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে সহজেই আঁচ করা যায়।

মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তু, পশু-পাখির পার্থক্য একমাত্র ইলম বা জ্ঞানের জন্যেই। জ্ঞানের বলেই মানুষ নিজে সুন্দর ও সংযমী জীবন যাপনে সক্ষম এবং এ জ্ঞানের বলেই সে হিংস্র জীব-জানোয়ার, পশু-পাখি এবং বিশ্বের অন্যান্য সৃষ্ট জীবের উপর নিজের আধিপত্য ও শাসন পরিচালনায় কামিয়াবী অর্জন করছে। এ জন্যে পরম দয়ালু আল্লাহ মানুষকে যা কিছু নিয়ামত হিসাবে দান করেছেন এগুলোর মধ্যে জ্ঞানই হচ্ছে উত্তম অন্যতম নিয়ামত।

www.pathagar.com

খুলাফায়ে রাশেদার যুগে শিক্ষা ও শিক্ষাকেন্দ্রঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হতে হযরত আলী (রা) পর্যন্ত শাসনামলের সমষ্টিকে খুলাফায়ে রাশেদা বা ইসলামের চতুষ্টয় খলীফার যুগ বলা হয়।

এ যুগের প্রথম দিকে কোন সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না। মসজিদকে কেন্দ্র করেই তখন শিক্ষার প্রসার প্রাথমিকভাবে শুরু হয়। হযরত উমর (রা) ইসলামী শিক্ষার উপর বক্তৃতা দেবার জন্য কুফা, দামেস্ক ও বসরায় বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে নিয়োজিত করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে তিনি কুরআন বিশেষজ্ঞ আলিমদেরকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তাঁরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন মসজিদে পাক কুরআন ও হাদীস শরীফের উপর বক্তৃতা দিতেন। এসব বক্তৃতাকে 'মাওএজা' বলা হয়। খলীফা উমর (রা) এসব বক্তৃতা শ্রবণের জন্য জনগণকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাসূল করীম (সা)-এর ওফাতের পর ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য

১. পবিত্র মদীনায় হযরত আয়েশা, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর, আবু হুরায়রা, যায়দ বিন সাবিত; ২. পবিত্র মক্কায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস; ৩. কুফায় হযরত আলী, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আনাস ইবনে মালিক; ৪. বসরায় হযরত আবু মুসা আল আশআরী; ৫. সিরিয়ায় হযরত আবু সাঈদ খুদরী; ৬. মিসরে হযরত আমর ইবনুল আস; ৭. দামেস্কে হযরত আবুদারদা প্রমুখ সাহাবীকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ইবনে মাসউদের (রা) মসজিদ ভিত্তিক মাদ্রাসায় ৪০০০ ছাত্র এবং দামেস্কের মসজিদভিত্তিক মাদ্রাসায় ১৬০০ ছাত্র শিক্ষালাভের জন্যে জমায়েত হতেন। দামেস্কে প্রতি ৪০ জন ছাত্র নিয়ে একজন শিক্ষক নিয়োজিত থাকতেন এবং তাদের দেখাশুনার জন্য একজন সাহাবী সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। উল্লেখ্য, প্রতি ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক এর অনুপাত বর্তমানে যে আমরা দেখতে পাই তা খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ছিল।

হযরত আলী (রা) জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার জন্যে রাসূল করীম (সা)-এর নিকট থেকে 'জ্ঞানের দ্বার' উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি মদীনার মসজিদে দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, হাদীস, ইতিহাস, আরবি ব্যাকরণ, কাব্য এবং ইতিহাসের উপর সাপ্তাহিক বক্তৃতা প্রদান করতেন। ঐতিহাসিক মাসুদ হযরত আলীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, "শিক্ষকতায় তাঁর (হযরত আলী) অগাধ জ্ঞান ও উৎসাহ ছিল, এবং ব্যুৎপত্তি ছিল আল্ কুরআনের উপর।" রাসূল (সা) তনয়া বিবি ফাতিমা (রা)-ও ধর্মোপদেশ দানে সাধারণ লোকের মধ্যে ইসলাম শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটান। প্রবাদ বাক্য বা Aphorism- এ তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম।

www.pathagar.com

এ আলোচনা থেকে জানা যায় যে, খুলাফায়ে রাশেদার আমলে শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল ১. আল-কুরআন ২. আল হাদীস ৩. বাক্যালংকার (Rhetoric), ৪. নীতিশাস্ত্র ৫. দর্শন ৬. ইতিহাস ৭. অঙ্ক ৮. ব্যাকরণ। তাছাড়া এসব বিষয়ের সাথে শারীরিক ও সামরিক শিক্ষার জন্যে Co-curricula হিসেবে হযরত উমর (রা) নিম্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের নির্দেশও দেনঃ

১. সাঁতার ২. তীর-বর্শা নিক্ষেপ ৩. ঘোড়-দৌড়।

প্রত্যেক অভিভাবকই এ নির্দেশানুযায়ী ছেলেদেরকে উক্ত শিক্ষা দিতে বাধ্য ছিলেন। অভিভাবকদেরকে হযরত উমর (রা) এ তাকিদও দিয়েছিলেন যে ঐতিহাসিক আমীর আলির কথায়ঃ You should make them learn wellknown proverbs, wise sayings and good poetry.

ইবনুল কিয়ামের মতে প্রত্যেক পিতা-ই এ নির্দেশানুযায়ী সন্তানদেরকে শিক্ষাদানে রত ছিলেন।

ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্ররূপে কুফা ও বসরা ঃ

হযরত উমর (রা) কুফা শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তিনি এ নগরীকে আল্লাহর রহমত ও ঈমানের ভান্ডার বলে অভিহিত করেন। চিঠিপত্রে তিনি একে আরবের মুকুটমণি বলেও উল্লেখ করতেন। হযরত আলী (রা) কুফাকেই খিলাফতের কেন্দ্রস্থল হিসেবে সাব্যস্ত করেছিলেন। কারণ এক হাজারের অধিক সাহাবী এ নগরীতে বসবাস করতেন। তাঁদের মধ্যে এমন চব্বিশজন সাহাবাও ছিলেন যাঁরা বদরের যুদ্ধে বিশ্বনবীর সাথে শরীক হন। এসব সম্মানিত সাহাবীর বসবাসের ফলে গোটা কুফা নগরী তখন হাদীস ও রিওয়ায়েতের শিক্ষা কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়েছিল।

(চারি ইমামের জীবনী, মৌলভী মুজাফফর হোসাইন, পৃষ্ঠা ১২-১৬ দ্রঃ, প্রকাশকাল ১৯৭৬ ইং)

হযরত উমর (রা) বসরা নগরীরও ভিত্তি স্থাপন করেন। এ নগরী কুফার মত ইসলামী শিক্ষা ও প্রচারের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। মক্কা ও মদীনার ন্যায় কুফা ও বসরা ইসলামের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে মর্যাদা লাভের অম্লান গৌরব অর্জন করে।

মসরূফ বিন আজদার, উমাইদ বিন উমর, আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ, জার বিন হাবশ, আবদুর রহমান আবী লাইলী, আবু আবদুর রহমান আসলামী, শাবীহ বিন হারস, শারীহ বিন হাফিজ ইবনে সানান, কাহিজ বিন হাজম, হাসান বসরী, শুয়রা বিন হিজাজ, প্রমুখ মহাত্মা কুফা ও বসরা শহরে বসবাস করেন। আল্লামা জেহনী তাঁদেরকে হাদীস বহনকারী উপাধি দান করেন।

www.pathagar.com

ইমাম সাফাইয়ান প্রায়ই বলতেন, শিক্ষাদানে বিশ্ব-কেন্দ্ররূপে মক্কা শরীফ, কিরাতের জন্য মদীনা শরীফ এবং হালাল ও হারামের শিক্ষাদানের নিমিত্তে কুফা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ধর্মীয় বিবরণ ও মাসআলা মাসায়েল কুফাকে এরূপ প্রভাবিত করেছিল যে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে আলিমের দরবারে উঠা-বসা ও যাতায়াত করে করেই তা লাভ করা সম্ভব হতো। (চারি ইমাম, পৃষ্ঠা ১২)

উমাইয়া যুগে শিক্ষা ঃ

উমাইয়া যুগে প্রথম খলীফা হযরত মু'আবিয়া (রা) সন্তানকে ১. খাঁটি আরবি.২. কাব্য এবং ৩. সাঁতার শিক্ষার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত উমর ইবনে উতবা স্বীয় সন্তানদের গৃহশিক্ষককে বলেছিলেনঃ "আপনার ইচ্ছানুসারে আমার সন্তানদের প্রাথমিক উৎকর্ষ সাধন হোক। কারণ আপনি যা করবেন তাই তাদের দৃষ্টিতে সুন্দর ও কল্যাণকর হবে এবং যা করবেন না তাই হবে তাদের নিকট মন্দ বা অকল্যাণকর। তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দিন। সতর্কতা অবলম্বন করবেন যাতে আপনি যা শিক্ষা দিচ্ছেন তা যেন তাদের উপর গুরুভার না হয়ে উঠে। কারণ এরূপ অবস্থায় তাদের মধ্যে বিরূপ ভাব সৃষ্টি হবে। কুরআন শিক্ষাদানের ব্যাপারে এমন দীর্ঘ বিরতি দেবেন না যার ফলে এরা (ছেলেমেয়েরা) এ শিক্ষাটুকু ভুলে যেতে পারে। তাদেরকে উত্তম গদ্য সাহিত্য (The most noble prose) এবং অতীব শালীন কবিতা (Poetry the chastest) শিখতে দিন। ...জ্ঞানী ব্যক্তিদের জীবন পদ্ধতি শিক্ষা দিন এবং মহিলাদের সাথে গল্প গুজব করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখুন। আমার কোন দুর্বলতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবেন না, বরং আমি তাদেরকে আপনার কাছে সোপর্দ করেছি আপনার চারিত্রিক পরিপূর্ণতা অর্জন করার জন্যে—আমার দুর্বলতাগুলো নয়।"

কথিত আছে আরবি ব্যাকরণের রীতি ভঙ্গ করার জন্যে হযরত উমর (রা) স্বীয় সন্তানকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেছিলেন। এমনকি এ অপরাধের জন্যে তিনি বেত্রাঘাত করারও পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সন্তানদেরকে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষককে বলেছিলেন, যেন তিনি ছেলেদের আমোদ-প্রমোদের প্রতি তীব্র ঘৃণাভাব সৃষ্টি করেন। কেননা এ আমোদ-প্রমোদই শয়তানের কাজ, যার পরিণাম সৃষ্টি করে আল্লহার ক্রোধাগ্নি।

উমাইয়া যুগে শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষক এবং অভিভাবকের সম্পর্ক কিরূপ ছিল তা উক্ত দুটি উদ্ধৃতি থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। খুলাফায়ে রাশেদার আমলে 'শিক্ষা' ও 'শিক্ষাব্যবস্থা' ছিল সবিশেষভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক। উমাইয়া যুগে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাদান পদ্ধতির ধীর সূচনা লাভ করে। খলীফা আবদুল মালিকের সময়ও দেখা যায় যে তিনি তাঁর গৃহশিক্ষক আল জালাবিকে নির্দেশ

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন সন্তানকে 'সাঁতার' এবং 'স্বল্পকালীন ঘুম' শিক্ষা দানের জন্যে। তিনি গৃহশিক্ষককে বলেন, "আল্লাহর ভয়ে ভীত হোন এবং নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করুন। আপনাকে আমি প্রথম দায়িত্ব দিচ্ছি তাকে আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে শিক্ষা দিন, এরপর তাকে উত্তম কবিতা শিক্ষা দিন ও পরে তাকে আরবের গোত্রাঞ্চলগুলোতে শিক্ষাসফর করতে দিন, যাতে এদের (গোত্রসমূহের) উত্তম কবিতাগুলো বাছাই করে সে মুখস্থ করতে পারে। তাকে হালাল-হারামের সীমা সম্পর্কে জ্ঞানদান করুন। বক্তৃতা ও ইসলামের ধারাবাহিক বিজয় ইতিহাসও তাকে শিক্ষাদান করুন।" খলীফা ও আমীর উমারাদের নিযুক্ত এরূপ শিক্ষকদিগকে 'মুহাদ্দিস' বলা হতো। মুহাদ্দিসগণ অতি মর্যাদাসম্পন্ন ও মেধাসম্পন্ন শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন।

উমাইয়া আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার দুটো রূপ পাওয়া যায়—১. খলীফা ও অভিজাত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা; ২. সাধারণ লোকদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষা ব্যবস্থা। খলীফা ও অভিজাত পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা মূলত গৃহভিত্তিক ছিল। পিতা ও গৃহশিক্ষক পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সন্তানের লেখাপড়ার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করতেন। এ পাঠক্রমের বিশেষ দৃষ্টি ছিল উচ্চ মর্যাদাবান, সাহসিকতা পূর্ণ ও রণকৌশলে নিপুণ শাসক তৈরি করা। জনসাধারণের ছেলেমেয়েরা মসজিদে এবং মসজিদ সংলগ্ন মকতবে লেখাপড়া করত। যেমন হাজাজবিন ইউসুফের শিক্ষকতার জীবন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রথম জীবনে শিক্ষক ছিলেন। আল-কাউইনি (Al-Qawini) লিখেন,'Hajjaj began life as a mere teacher of the young'. এখানে young বলতে বালক এবং বালক ভৃত্যকে বোঝান হয়েছে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ অবশ্য আমীর ও উমারাদের সন্তানদেরকেও পড়াতেন। তাঁর শিক্ষকতা জীবনে মকতবের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব মকতবে শিশু হতে কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা লাভ করত। কচি বয়সের ছেলেমেয়েরা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করে ফেলবে অথবা মসজিদের পবিত্রতা সংরক্ষণে অসমর্থ—এ কারণে তাদের লেখাপড়ার জন্যে মসজিদ সংলগ্নস্থানে এবং লোকালয়ে আলাদা প্রতিষ্ঠান করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো কুত্তাব বা আধুনিক পরিভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় (Elementary School) হিসেবে পরিচিত। মকতবের শিক্ষকদের মুয়াল্লিমুল সিবইয়ান বা শিশু-শিক্ষক বলা হতো।

উমাইয়া যুগে শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল ঃ

১. আল-কুরআন, ২. আল-হাদীস, ৩. হালাল-হারামের বিষয়াদি, ৪. বক্তৃতা, ৫. কবিতা– কাসীদা, গযল ৬. আরবি ব্যাকরণ, ৭. ইসলামের বিজয় ইতিহাস বা 'মাগকাজ'।

www.pathagar.com

তাছাড়া জুম্মার দিনে খুতবা প্রদানের সময় মসজিদের ইমামগণ মুসল্লীদের নিয়মিতভাবে ১. দেশপ্রেম, ২. সামরিক শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দান করতেন। Co-Curriccula বা আনুষঙ্গিক বিষয়ের মধ্যে ১. সাঁতার, ২. তীর নিক্ষেপ, ৩. শিক্ষা সফর, ৪. ঘৌড়দৌড় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ধরনের শিক্ষা বিশেষভাবে সীমিত ছিল খলীফা ও আমীর- উমারার সন্তানদের জন্যে। ইবনে সা'দের মতে উমাইয়া যুগে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হতো দুভাবে ঃ

১. ধর্মবিষয়ক এবং ২. দেহ বা প্রকৃতি বিষয়ক। পি.কে. হিট্টি উমাইয়া যুগের শিক্ষার মূল লক্ষ্য নিম্নভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ The ethical ideals of education were sabre, jeor (obligation to the neighbours), muruah (manliness), generousity, hospitality, regard for women and upkeeping of promises."–'শিক্ষার নৈতিক আদর্শ ছিল সবর, জেওর (পড়শীর প্রতি দায়িত্ববোধ) মুরুয়াহ (গৌরব), সদাশয়তা, আতিথেয়তা, নারী সমাজের প্রতি সম্ভ্রম এবং ওয়াদা প্রতিপালন।"

উমাইয়া আমলের শিক্ষার সামগ্রিক রূপ হৃদয়ঙ্গমের জন্যে উক্ত উক্তিটি যথেষ্ট।

আব্বাসীয় যুগে শিক্ষাব্যবস্থা ঃ

আব্বাসীয় যুগের শিক্ষাব্যবস্থা উমাইয়া যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার উপরই ভিত্তি করে রচিত। আব্বাসীয় খলীফাগণ রাজ্যশাসন ও রাজ্যজয় অপেক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে ইতিহাসে অধিক খ্যাতি এবং প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। এ যুগ ইসলামের ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে পরিচিত।

আব্বাসীয় যুগেও বিশেষ কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি ছিল না; যদিও সে সময়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং অনেক মক্তব-মাদ্রাসাও গড়ে উঠেছিল। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দু'টি রূপ ছিলঃ

১. প্রাথমিক ও ২. উচ্চ পর্যায়ের।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো স্বাভাবিকভাবে জন্মেছিল মসজিদ ও গৃহাঙ্গনে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইয়াকুত বলেন যে, তিনি একজন শেখের গৃহকে বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখেছেন। ফলে উমাইয়া যুগের মতো অধিকাংশ শিশু ও কিশোরদের শিক্ষাঙ্গন ছিল গৃহাঙ্গন ও মসজিদ। গৃহে সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে পিতার ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান শিক্ষার হাতেখড়ি নিত সর্বপ্রথম 'কালেমা তৈয়্যবা' পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

আব্বাসীয় যুগে মহিলাদের শিক্ষার্জনের প্রসার ও ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ পরিবারের মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ দেখা যায়। বড় অভিজাত ঘরের মেয়েরা **'মুয়াদেদিব'** বা Private tutor রেখে ধর্ম ও শালীনতামন্ডিত সাহিত্য, ছন্দ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন (পি.কে. হিট্টি)। উচ্চশিক্ষার আগার ছিল 'বায়তুল হিকমাহ'। খলীফা আল্ মামুন ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানে সৌরবিজ্ঞান, অনুবাদ, বিশেষ করে প্রাচীন গ্রিক, সিরীয় ও পার্সি সাহিত্যের অনুবাদ, সাহিত্যের ভিত্তিতে **'আওয়াল বিজ্ঞান'** শিক্ষাদানের মাধ্যমে ধর্ম, দর্শন, ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হতো। ইসলামের ইতিহাসে প্রকৃত অর্থে প্রথম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে দারসে নিজামিয়া। সেলজুক সুলতান আল্প আর-সালান ও মালিক শাহের আমলে তাদের পার্সি মন্ত্রী নিজামুলমুলক এ প্রতিষ্ঠানটির স্থাপিয়তা। ১০৬৫-৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করা হয়। আল কুরআন, শরীয়ত, প্রাচীন কবিতা ইত্যাদি বিষয় এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হতো মানবিক বিষয়ের (Humanities) ভিত্তি হিসেবে। আবাসিক ব্যবস্থা ও বৃত্তিসহ ছাত্রদের লেখাপড়ার সুযোগ এখানে ছিল। প্রখ্যাত ইসলামিক দার্শনিক ইমাম গাযযালী (র) এ প্রতিষ্ঠানে (১০১১-১৫) সুদীর্ঘ চার বছর অধ্যাপনা করেছেন। সুলতান সালাহউদ্দীনের জীবনী লেখক বাহ-আল-দিনও নিজামিয়ার একজন মশহুর শিক্ষক ছিলেন।

নিজামিয়া তদানীন্তন খলীফা কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপকগণ খলীফার অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োজিত হতেন। (Hitti : p.411) উমাইয়া খলীফাদের মত আব্বাসীয় খলীফাগণ গৃহশিক্ষক কর্তৃক স্বীয় সন্তানদেরকে শিক্ষা প্রদানের রীতি চালু রেখেছিলেন। ইবনে খালদুনের বিবরণ হতে জানা যায়, খলীফা হারুন-অর-রশীদ তাঁর সন্তান আল আমীনকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য গৃহশিক্ষকের প্রতি নিম্ন উপদেশ প্রদান করেন ঃ 'আপনি এত কঠোর হবেন না যা তার (আমিন) মানসিক বিকাশের (Faculties) পথ রুদ্ধ করে দিতে পারে, অথবা এত কোমলও হবেন না যা তাকে আলস্য-আনন্দ উপভোগে আসক্ত করে তোলে। তাকে গড়ে তুলুন যতটুকু আপনার মহানুভবতা ও ভদ্রতা দ্বারা সম্ভব; কিন্তু এতে ফলোদয় না হলে শক্তি ও কঠোরতা প্রয়োগে পিছপা হবেন না"। (মুকাদ্দমা, পৃষ্ঠা ৪৭৫-৭৬) এই গৃহশিক্ষকের নাম ছিল আল্ আহমাস। খলীফা হারুন-অর-রশিদ তাঁকে সম্বোধন করে আরো বলেন, "হে আল আহমাস, আমিরুল মুমিনীন তাঁর কলিজার টুকরাকে (আমিনকে) আপনার হাতে সোপর্দ করেছে। আপনার কথা মান্য করা তার উপর ফরয। কুরআন, ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস, কবিতা, সুন্নাহ, বক্তৃতা তাকে শিক্ষা দিন। আনন্দের সময় তাকে অট্টহাস্য হতে সংযত রাখুন। বনি হাশিম এবং সামরিক প্রধান ও

www.pathagar.com

নেতাদেরকে সম্মান করতে শিক্ষা দিন। বিনম্রভাবে তাকে সংশোধন করুন। কিন্তু এতে ফল না হলে কঠোর শাস্তি দিন" (P.K. Hitti: P. 411) । শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব ও চরিত্রের উপর আববাসীয় খলীফাদের কীরূপ অগাধ প্রত্যয় ও শ্রদ্ধা ছিল, উক্ত উক্তিটি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

আব্বাসীয় যুগে শিক্ষার বিষয়বস্তু উমাইয়া যুগের বিষয়বস্তুর অনুরূপ ছিল, তৎসঙ্গে ১. নবীদের জীবনী. ২. বিশেষভাবে হাদীস অধ্যয়ন, ৩. প্রাথমিক গণিত, ৪. দর্শন ৫. প্রাচীন সাহিত্য পাঠ, ৬. চিকিৎসাবিজ্ঞান, ৭. জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি পাঠক্রমে সন্নিবেশিত হয়েছিল।

আব্বাসীয় যুগ কলঙ্কের যুগও

আব্বাসীয় যুগ একদিকে যেরূপ 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে, অপরদিকে এ যুগই মুসলিম তথা ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিকৃতির এক কলংকজনক অধ্যায়ও। এ অধ্যায়ের সূচনাকারী হচ্ছেন খলীফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট মুতাযিলা সম্প্রদায়। 'মুতাযিলা' শব্দের অর্থ হচ্ছে পথচ্যুত। এ সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রবর্তক ইরাক নিবাসী ওয়াসিল ইবনে আতা (৬৯৯-৭৪৯)। তিনি তাঁর উস্তাদ ইমাম হাসান-আল-বসরীর সাথে 'গুরুতর অপরাধকৃত কোন মুসলমান ইসলামের দৃষ্টিতে কি হবে এ প্রশ্নে মতানৈক্য করেন। তাঁর শিক্ষক বলেন যে, এ ধরনের মুসলমান 'মুনাফিক' হবে, আর তিনি বলেন যে সে হবে 'মুসলমান' এবং 'অমুসলমানের' মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানরত একজন। ইমাম হাসান আল-বসরীর সাথে এ পার্থক্য হওয়ায় তিনি তাঁর সম্পর্কে' 'ইতাজালা মিন্‌না' বা সে আমার পথ হতে সরে গেছে বলে মন্তব্য করেন। মুতাযিলার প্রবর্তক এই ওয়াসিল ইবনে আতা খলীফা মামুন কর্তৃক গ্রিক, পারসি ও সিরীয় গ্রন্থের অনুবাদকৃত সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পথভ্রষ্ট হন। তিনি ইসলাম, বিশেষ করে আল-কুরআনকে এরিস্টটলের দর্শনের সাথে এককার করে দেখার অপপ্রয়াস চালান। এইচ. এ. আর. গীবের কথায়ঃ The Mutazilite extremists began to force Muslim Doctrines into the mould of Greek concepts and to derive their theology speculatively from Greek Metaphysics instead of the Koran (Mohammedanism, Oxford, Oct, 1952, P: 114-15). তারা আল-কুরআনকে **created** বা 'সৃষ্ট গ্রন্থ' হিসেবে যুক্তির ভিত্তিতে বিচার করার অপপ্রয়াস চালিয়ে এর বিষয়বস্তু ও ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট এবং মর্যাদাকে সন্দেহপ্রযুক্ত করে তোলেন, বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করেন গোটা ইসলামী বিশ্বে। ফলে তদানীন্তন কালের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও আলিম : আবদুল

www.pathagar.com

হুজাইন, আমর ইবনে উবাইদ, মুহাম্মদ আল জাবকীর প্রমুখ, এমন কি খলীফা মামুন পর্যন্ত সবাই 'আল-কুরআনকে' নিছক যুক্তি ও বিবেচনার ভিত্তিতে মানবসৃষ্ট দর্শন ও সাহিত্যের কাতারে বিচার-বিশ্লেষণের হীনতম পর্যায়ে নিয়ে আসেন। W. D. Lester রেনেসাঁর কুফল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন ঠিক হুবহু সে মন্তব্যটি দিয়েই মুতাযিলা মতবাদের স্বরূপটি সুন্দরভাবে এখানে ফুটিয়ে তোলা যায়। রেনেসাঁর দার্শনিকের মত মুতাযিলা সম্প্রদায়ও turned to examine the qualities of Religion to find reason and reality of it in life'. অর্থাৎ জীবনের আঙ্গিনায় ইসলামকে যুক্তি ও বাস্তবতার পূর্ণরূপ দেওয়ার অপচেষ্টা চালায়। ইউরোপীয় গির্জা যুগের (মধ্যযুগ) যাজক সম্প্রদায় তাদের মতবাদের প্রতিবাদকারীদেরকে যেরূপ নির্যাতন করেছিল, আব্বাসীয় আমলে অনুরূপ নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছিল বহু আল্লাহ্ভীরু আলিম ও পন্ডিত প্রবর মুতাযিলা মতবাদের প্রতিবাদের কারণে। প্রখ্যাত চারি ইমাম বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা (র)-কে কারা-প্রাচীরে শাহাদত বরণ করতে হয়েছিল এ মতবাদের বিরুদ্ধে সঠিক সংশোধনী প্রতিবাদের অপরাধে। এ প্রসঙ্গে মোগল আমলের সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-ইলাহী' মুতাযিলা মতবাদেরই একটি নতুন পোশাকী সংস্কার ছিল বলে অনেক আলিমের প্রত্যয়। সাম্প্রতিকালের বাহাই ধর্মও এ মতবাদেরই একটি নব্য সংস্করণ।

গ্রিক তথা হেলেনীয় (Hellenistic) প্রভাবমণ্ডিত 'মুতাযিলা সম্প্রদায়' গোটা মুসলিম তথা ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি 'আল-কুরআন ও এর আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর উপর' নিছক যুক্তি চিন্তার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে দিয়ে গোটা মুসলিম মিল্লাতকে আজ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও দর্শনের মায়া জালে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। তাদেরকে আল্লাহর গোলামী ও রাসূলের আনুগত্য থেকে সরিয়ে নিকৃষ্টতম দাস বানিয়ে দিয়েছে অমুসলিম শিক্ষা ও দর্শনের প্রবক্তাদের । ধারক ও বাহক হিসেবে এটাই হচ্ছে আব্বাসীয় যুগের শিক্ষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সর্বশেষ কলংকতিলক।

মুসলিম শাসনামলে স্পেনের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

আব্বাসীয়দের খিলাফত লাভের পর উমাইয়া বংশের আবদুর রহমান আরব উপমহাদেশ হতে পালিয়ে কালক্রমে স্পেনে খিলাফত কায়েম করেন। তাঁর বংশধররাই ইতিহাসে মুরীস্ স্পেন নামে খ্যাত। উমাইয়াদের খিলাফত স্পেনে কায়েম হওয়ার ফলে কালক্রমে গোটা ইউরোপ ও আফ্রিকায় ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে পড়ে। মুরদের আমলে স্পেন গোটা ইউরোপ এবং আফ্রিকার seat of learning বা শিক্ষার বেদীমূল হিসেবে গৌরবময় মর্যাদা লাভ করেছিল তদানীন্তন বিশ্বের দরবারে। তখন স্পেনে প্রধানত দুই প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ঃ

www.pathagar.com

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়—যেখানে সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করত, ২. উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে উচ্চ পর্যায়ের বিষয়াদি 'শিক্ষা' দেওয়া হত। অর্থাৎ The academies of the Saracens were the shrines at which the barbarised nations of the west rekindled the torch of science and philosophy."

কর্ডোভা, সেভিল, টলেডো, জেইন এবং মালাগার এর কলেজগুলোতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্যে ইতালি, ফ্রান্স, ও ইংল্যান্ড হতে শিক্ষার্থীরা ভিড়জমাত। বাতের (Bath) প্রখ্যাত ধর্মযাজক আবেলাদ, মলি, এমনকি প্রথিতযশা দার্শনিক মাইকেল স্কটও উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য স্পেনে আগমন করেছিলেন। শুধু কর্ডোভাতেই ৭০টি পাবলিক লাইব্রেরি, ৭০টি কলেজ এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্যে ২০০টি স্কুল ছিল। ঐতিহাসিক কাছিরীর হিসাবে ১৭০ জন পণ্ডিত ও দরবেশের জন্ম হয় কর্ডোভাতে।

খলীফা হাকাম আল-মুনতাসীর নিম্ন পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে শুধু রাজধানীতেই ২৭টি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিঃস্ব অভিভাবকদেরকে তিনি শিক্ষাব্যয়ের জন্যে দান করতেন অকাতরে এবং রাষ্ট্রের তরফ হতে বিনা পয়সায় বই-পত্র প্রদানেরও তিনি ব্যবস্থা করেন। তাঁর আমেলই কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহা কায়রোর 'আল-আজহার' এবং বাগদাদের 'নিজামিয়া' বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও উন্নত ছিল।

উন্নত ও উৎকৃষ্টমানের শিক্ষা প্রদানের জন্য খলীফা হাকাম প্রাচ্যের অনেক শিক্ষাবিদ ও পন্ডিতকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত করেন। ঐতিহাসিক ইবনে আল-কুতিয়াহ 'ব্যাকরণ' ও আবু আলা আলকালি 'ভাষাতত্ত্বের' (Philology) অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপকদের বেতন এবং ভাতার সচ্ছলতা ও নিরাপত্তার জন্যে 'আল-হাকাম' আগে ভাগেই বিপুল পরিমাণ অর্থ আলাদাভাবে সঞ্চিত রাখতেন।

শিক্ষার বিষয়াবলি

১. আল-কুরআন. ২. আরবি গ্রামার. ৩. কবিতা, ৪. ইতিহাস ৫. ভূগোল. ৬. অভিধান কোর্স (Lexicography). ৭. আইন. ৮. রসায়ন ৯. দর্শন. ১০. চিকিৎসা ১১. সৌরমণ্ডল বা জ্যোতিষশাস্ত্র।

ঐতিহাসিক ডজি তখনকার মুরীয় স্পেন ও ইউরোপের চিত্রটি তুলে ধরেন এই ভাবে — In Spain almost every body knew how to read and write, whilst in Christian Europe, save and except the clergy, even parsons belonging to highest ranks were wholely ignorant. (History of the Saracens —A. Ali.)

www.pathagar.com

স্পেনে প্রায় প্রত্যেকেই পড়া ও লেখা জানত, তখন খ্রিস্টান ইউরোপে পুরোহিত সম্প্রদায় ব্যতীত সবাই ছিল নিরেট অজ্ঞ ও মূর্খ, এমনকি উচ্চ পদের ব্যক্তিবর্গও। অন্যকথায় মুরদের আগমন, রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা সাংস্কৃতিক বিকাশ তখনকার দিনে স্পেনে না ঘটলে আজও বোধ হয় স্পেন শিক্ষা ও সভ্যতার আলো হতে বঞ্চিত থাকত। আর এরই পরিণামে গোটা ইউরোপও থাকত অন্ধকারের তিমিরে নিমজ্জিত।

এই প্রসংগে মুসলিম সাহিত্য রত্ন ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'স্পেনে মুসলমান সভ্যতা' শীর্ষক প্রবন্ধের কিয়দংশের উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়াটা অপরিহার্য বোধ হল। কারণ তাঁর সাহিত্য-শ্রী মন্ডিত কার্ডোভার বর্ণনা থেকে এটা সম্যক উপলব্ধি হবে যে সেসময় মুসলমানদের অসির চেয়ে মসী কতই না সমৃদ্ধ ছিল মুসলমানদের জ্ঞান বিকাশে। "প্রাচীন কালে সভ্যতা, সৌন্দর্য ও শিক্ষার বিচিত্র লীলাভূমি ও কীর্তি মন্দির বলিয়া যে সমস্ত মহানগরী খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে গৌরবোন্নত, সৌন্দর্য-সমালঙ্কৃত, সমৃদ্ধি সম্পন্ন স্পেনের কর্ডোভা মহানগরী অন্যতম। বোগদাদ ব্যতীত কর্ডোভা মহানগরীর সহিত অপর কোনও নগরীর নামও উল্লেখিত হইবার যোগ্য নহে। স্পেনকে পরী বলিয়া কল্পনা করিলে কর্ডোভাকে তাহার চক্ষু বলিয়া স্থান দিতে হয়। প্রাচীন আরব ঐতিহাসিকগণ কর্ডোভাকে স্পেনের পাত্রী বা কনে (Bride) বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।"

"মুসলমান-স্পেনের কর্ডোভা নগরী হইতে যখন সভ্যতার স্বর্গীয় প্লাবন, জ্ঞান-বিদ্যাশিক্ষার উত্তাল তরঙ্গমালা বক্ষে ধারণ করিয়া কুসংস্কার-জঞ্জাল পরিপূর্ণ ইউরোপকে বিপ্লাবিত এবং বিধৌত করিবার জন্য চতুর্দিকে তীব্রবেগে ছুটিয়া পড়িতেছিল, তখন বর্তমান জ্ঞানগর্বিত সভ্যতা-প্রদীপ্ত ইংরেজি, ফরাসী এবং জার্মান জাতির পূর্বপুরুষগণ পর্বতগহবর এবং গভীর কাননাবাসে বন্য ফল-মূল এবং আম-মাংসে উদরপূর্তি করিয়া আপনাদের বন্যজীবন অতিবাহিত করিত।

অধ্যাপক ও পণ্ডিতবর্গের জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা, কলেজ ও পাঠশালার অসংখ্য ছাত্রের সহস্র কোলাহল, খরস্রোতা ওয়াদীঅল-কবীদের (গোয়াডেলকুইভার) মর্মরমন্ডিত তীরে অধিবাসীদের সান্ধ্য ভ্রমণ, ময়দানে অশ্ব-ধাবন ও চৌগন-ক্রীড়া (পলো), অপরাহ্নে এবং জ্যোৎস্না-স্নাত-প্রফুল্লা-যামিনীতে নদীবক্ষে নানা বর্ণের নানা আকারের তরণীমালার অভিযান, পথিক ও ভ্রমণকারীদের আশ্রয় গৃহ, নানা দেশীয় বিলাস-সামগ্রী সম্ভারপূর্ণ বাজার ও বিপণিসমূহ, বিবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থপূর্ণ লাইব্রেরি, অসংখ্য স্নানাগার, নদী-তীরের হাওয়াখানা এবং বুরুজ, স্বর্ণচূড়া রমনীয় মসজিদসমূহ, অভ্রভেদী সুদৃঢ় দুর্গ, বিস্তৃত পরিখা এবং মনোহর রাজপ্রাসাদনিচয় ইত্যাদির মনোরম দৃশ্যে ইহা ভূবনমোহিনী নগরীকূল-নারী

www.pathagar.com

বলিয়া বিশ্ব-বিশ্রুত খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ফলত তৎকালের সুসভ্য ও সমুন্নত জাতির নাগিরক জীবনের যাবতীয় আবশ্যকীয় উপকরণ এবং দ্রব্য একত্রে সম্মিলিত ও শৃঙ্খলিত হইয়া কর্ডোভাকে ভূস্বর্গে পরিণত করিয়াছিল। কর্ডোভার নাগরিকগণ সুশিক্ষিত এবং সুমার্জিত রুচিসম্পন্ন ছিলেন। কাব্য ও সঙ্গীতালোচনা, ললিতাকলা ও সুকুমার বিদ্যাচর্চা সম্ভ্রান্তবর্গের আদরণীয় ছিল।

কর্ডোভা নগরী স্বীয় গৌরবের দিনে জ্ঞানালোচনা এবং শিক্ষার কোলাহলে যেমন মুখরিত তেমিনি আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনার মহিমায় শীর্ষস্থানীয় ছিল। নগরীর সৌন্দর্য, পারিপাট্য, ঐশ্বর্য এবং বৈচিত্র্য আশ্চর্যজনক ছিল, এর শিক্ষানুরাগ এবং জ্ঞানচর্চার বিপুল আয়োজন ও উপকরণ ততপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না।"

ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রবন্ধ পাঠে মনে হয় গোটা কর্ডোভা-ই ছিল "জ্ঞান-ভুবন", এর অধিবাসীরা ছিল এ ভুবনের আরাধ্য। তাঁর বর্ণনায় ঃ "কর্ডোভা সমগ্র ইউরোপের জ্ঞান, বিদ্যা ও সভ্যতার কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। ইউরোপের সমস্ত রাজ্য হইতে জ্ঞানপিপাসু সহস্র সহস্র ছাত্র, ধীসমৃদ্ধ বিজ্ঞানবিশারদ অধ্যাপকমন্ডলীর নিকট জ্ঞানাহরণার্থ সমবেত হইত। কর্ডোভার বিরাট বিজ্ঞানাগারে ছাত্রমন্ডলীকে যন্ত্রসংযোগে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণ শিক্ষা দেওয়া হইত। সাধারণের পাঠের জন্য সপ্তদশটি বিরাট লাইব্রেরি এবং বহুসংখ্যক পাঠসম্মিলনী (ক্লাব) ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক স্কুল-কলেজ এবং মস্‌জিদে ছাত্রমণ্ডলীর এবং উপাসকদিগের পাঠের জন্য বিবিধ প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি রক্ষিত হইত। গৌরবের মধ্যাহ্নিক কালে বত্রিশটি কলেজ এবং ৫০০ উচ্চ শ্রেণীর সুপরিচালিত বিদ্যালয় কর্ডোভাতে বিদ্যমান ছিল। পাঠক মনে রাখিবেন, স্পেনে প্রত্যেক নগরেই স্ব-স্ব বিদ্যালয় এবং কলেজ ও পাঠশালাসমূহ বিদ্যমান ছিল। স্পেনের অন্যতম মহানগরী গ্রানাডাতেও ২০টি সুপরিচালিত কলেজ এবং বহুসংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্পেনের প্রত্যেক সোলতান এবং আমীর অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যোৎসাহী ও জ্ঞানচর্চালিপ্সু ছিলেন বলিয়া স্পেন সাম্রাজ্য তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যাহ্ন মিহির-করে উদ্ভাসিত এবং বিশ্বজগতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক সোলতানই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেন। রাজ্যের সম্ভ্রান্তবর্গ এবং আমীরগণ সোলতানদিগের অনুসরণে বিরত ছিলেন না। শিক্ষার জন্য ধনাঢ্য ব্যক্তি হইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ পর্যন্ত স্ব-স্ব সম্পত্তির অধিকাংশ 'ওয়াকফ' করিয়া যাইতেন। তৎকালে যে ব্যক্তি বাটিতে ছাত্র-'জায়গীর' এবং লাইব্রেরি না রাখিতেন, তিনি নিতান্ত অভদ্র এবং অশিক্ষিত বলিয়া সমাজে লাঞ্ছিত হইতেন। খলিফা হাকামের সময় প্রায় লক্ষ ছাত্র এবং ছাত্রী কর্ডোভাতে অধ্যয়ন করিত। ভূগোল শিক্ষার জন্য গোলক (Globe) এবং মনাচিত্র ব্যবহৃত হইত। কর্ডোভার রসদখানায় (মানমন্দিরে) বহুসংখ্যক নতুন যন্ত্র

www.pathagar.com

সংগৃহীত এবং নির্মিত হওয়ায় নানা দিগ্‌দেশ হইতে পন্ডিতমন্ডলী আগমন করিয়া জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা এবং নক্ষত্রাদির গতি নির্ধারণ করিতেন। বিদ্যোৎসাহী খলিফা হাকাম প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া পৃথিবীর নানা রাজ্য এবং নানা রাজধানী হইতে বহু যত্নে শত শত লোক নিযুক্তিপূর্বক প্রায় ছয় লক্ষ মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইতোপূর্বে পৃথিবীতে এরূপ বিরাট এবং মূল্যবান লাইব্রেরি আর কখনও স্থাপিত হইয়াছিল না।"

জ্ঞানাহরণ ও জ্ঞান-চর্চার সাথে সাথে ইতিহাস বিরচনে স্পেনের মুসলমানদের কী অনুপম অবদানই না ছিল তখন। যেমন অতি সামান্য ঘটনা পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচিত এবং লিখিত হইত। স্পেনের একখানি ইতিহাস সুবৃহৎ ৭০ খন্ডে রচিত হইয়াছিল। ভূখন্ডের একাল পর্যন্ত কোনও দেশে এমন বিরাট ইতিহাস বিরচিত হয় নি। আরবি সাহিত্য এবং ইতিহাস এখানে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। শত শত পন্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া অমৃতনিত্যস্যন্দিনী আরবী ভাষায় সাহিত্য এবং ইতিহাস রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বাহুল্যভয়ে ঐতিহাসিক এবং 'সাহিত্যবিদ পন্ডিতদিগের আলোচনায় বিরত রহিলাম। মুসলমানগণ সর্বত্রই ইতিহাসের চর্চা এবং সেবা চিরকালই করিয়া আসিয়াছেন"।

মুসলিম শাসিত স্পেন ছিল তদনীন্তন ইউরোপের শিক্ষা সভ্যতার এমনি কল্যাণকর অভিভাবক।

আইয়ুবী ও ফাতিমী যুগে মিসরের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

হযরত উমর (রা)-এর সময় মিসর মুসলমানদের অধীনে আসে। সেই থেকে মুসলিম শাসন ও শিক্ষার প্রভাবে এদেশটি বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। মিসরের আইয়ুবীয় বংশের সুলতান সালাহউদ্দীন শুধু প্রখ্যাত যোদ্ধা ও মহানুভব সুলতান হিসেবেই খ্যাত নন, তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও যে অবদান রেখে গেছেন, তা বিশ্বমানবতার নয়নমনিতে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্যে তিনি জেরুজালেম ও মিসরে মাদ্রাসার অনুরূপ অনেক স্কুল স্থাপন করেন। (ইবনে খাল্লিকান, Vol. 111. পৃষ্ঠা ২৫১) মিসরের রাজধানী কায়রোতে 'আল সালাহিয়া' একাডেমিটি তাঁরই নামানুসারে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আলেকজান্দ্রিয়াতেও অনেক মাদ্রাসা তাঁর আমলে স্থাপিত হয় বলে ইবনে জোবায়ের উল্লেখ করেন।

ফাতিমী বংশের আমলেও মিসরের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তুদেলার পরিব্রাজক বেনজামিন তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে (Itinerary) লিখেন যে, তিনি ফাতিমীর আমলে ২০টিরও অধিক দর্শন চর্চার প্রতিষ্ঠান দেখতে পান। কায়রোতে সে আমলে অসংখ্য কলেজ ছিল। রাজকীয় বা Imperial

www.pathagar.com

Library-তে এক লাখের মত শোভন বাঁধাই গ্রন্থ ছিল। ছাত্রদিগকে অধ্যয়ন করার জন্যে বিনাচার্জে এসব গ্রন্থ ধার দেওয়া হতো। ফাতিমীগণ তাঁদের পূর্বপুরুষদের মতই বিদ্যুৎসাহী ও জ্ঞানানুশীলনে মশগুল ছিলেন। এদের আমলে 'দারুল হিকমা' বা বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল বিজ্ঞান চর্চার জন্যে। জ্ঞানগর্ভ আলোচনার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'দহিউত দাওয়াত' নামে বিরাট হল কক্ষ ও 'মজলিসুল-হিকমত' নামে দর্শনতত্ত্বের আলোচনারীতি।

কায়রোতে মহিলাদের শিক্ষার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার জন্যে মকতবে যেত।.উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্যে একটি মাদ্রসাা ও স্থাপন করা হয়েছিল। এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মামলুক সুলতান তাহিরের কন্যা। ইহা ১২৩৭ খিস্টাব্দে স্থাপিত হয়।

ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি ঃ

হযরত আদম (আঃ) থেকে রাসূলে করীম (সা) এবং এমন কি আব্বাসীয় যুগের ধ্বংসলগ্ন পর্যন্ত ১. আল-কুরআন, ২. আল-হাদীস, ৩. ফিকহ্ শাস্ত্র, ৪. ইসলামের বিজয় ইতিহাস বা মাগজী সবার জন্যে আবশ্যকীয় পাঠ্যসূচি ছিল। ইসলামের বিশিষ্ট ইমাম, আলিম ও মুহাদ্দিসগণের শিক্ষাজীবনেও দেখা যায় যে, তারা প্রত্যেকেই প্রথমে 'কিতাবুল্লাহ' এবং 'সুন্নতে রাসূলুল্লাহ' অধ্যয়ন করেছেন এবং পরে আইন, দর্শন, সাহিত্য, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জনে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। ফলে তাদের এসব বিষয়ের শিক্ষা ও দৃষ্টিকোণ ছিল পাক-কুরআন ও হাদীস শরীফের জ্ঞান প্রভাব দ্বারা বিপুলভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বিশুদ্ধকৃত। ইমাম আবু হানীফা নুমান বিন সাবিত কুরআনে হাফিজ ছিলেন। হাদীস শরীফেও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। তাঁর মশহুর ফিক্হ কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে প্রণীত। ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরিস আশ-শাফিঈ, ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল-তারা সবাই প্রাথমিক স্তরে আল-কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করেন।

বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, সম্মানিত এ চারজন ইমামের কেউই Linear system of progression বা তথাকথিত শ্রেণীকক্ষ পাশের সার্টিফিকেটে প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি। আধুনিক বিশ্বের মত স্কুল কলেজ দ্বারা তখন জনশিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করার অর্বাচীন পদ্ধতি ছিল না। নয়শত শিক্ষকের সাহচর্যে থেকে ইমাম শাফিঈর জ্ঞানার্জন ইহাই প্রমাণ করে যে জ্ঞানার্জনের জন্য তথাকথিত Academic Control অত্যাবশ্যকীয় নয়। বিশ্বের অধিকাংশ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকই Non এবং Un-academic ভাবে শিক্ষালাভ করেছিলেন। আর তাঁদের মতো মনীষীরাই বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার বা শিক্ষার জগতে মৌলিক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইহাও

www.pathagar.com

লক্ষণীয় যে ইহুদী, খ্রিস্টান বা মুসলমান, এমন কি হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মহাপুরুষদের কেহই মানবরচিত পুস্তক বা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না। অথচ তাঁরাই বিশ্বের মতবাদের রাজ্যে বিপুল বৈশিষ্ট্যমূলক 'দর্শন' সৃষ্টি করে গেছেন যা থেকে যুগে যুগে মানুষ-চিন্তার খোরাক পাচ্ছে অন্তহীনভাবে। এসব মনীষীর শিক্ষাজীবন ও দর্শন প্রমাণ করে যে, মানুষের শিক্ষা ও প্রগতির পথ নির্দেশে মানব রচিত পুস্তক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কত দুর্বল ও অপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি William Wordsworth-এর কথাটি স্মরণীয়। তিনি বলেন, "World is the garment of God." এ জন্যই গোটা প্রকৃতিকে পাঠ হিসেবে যারা অধ্যয়ন করেন বা বিশ্বজাহানকে একটি Unit বা একক হিসেবে পাঠ করে যে অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিকোণ অর্জন করেন, তা তথাকথিত বিভক্ত বা Grouped বিষয়ের উপর শিক্ষা গ্রহণকারীর জ্ঞান হতে অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ। লক্ষণীয়ঃ পাক-কুরআনে আল্লাহ্ স্বীয় পরিচয় দিয়েছেন এই বলে, "আল্লাহু -নুরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে" বা আসমান ও যমীনের 'নূর' বা আলোর মহিমাই হচ্ছেন আল্লাহ। তাই ইমাম গাযযালী (র) বলেনঃ আমাদের পয়লা কাজ হল সত্যিকারের প্রভু সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন।' সত্যিকারের প্রভু বলতে তাওহীদ বা Unity of God,-সৃষ্টি, স্রষ্টা ও জীবনের মাধ্যমে আল্লাহর ঐক্য জ্ঞানলাভ করাই এখানে বোঝান হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম সাহেব আরো বলেন, আল্লাহ ইলমকে 'নূরই হিকমত' বা বিজ্ঞানের আলো এবং 'হিদায়াত'কে 'পথের দিশারী' বলে উল্লেখ করেছেন। এ আলোচনা হতে এটিই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আল্লাহর পরিচয় লাভই হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার মূল ভিত্তি। হযরত দাউদ (আ)-কে আল্লাহ ওহী পাঠালেন ঃ 'হে দাউদ কল্যাণকর বিদ্যা অর্জন কর।' হযরত দাউদ (আ) প্রশ্ন করলেন ঃ 'পরওয়ারদিগার, কল্যাণকর শিক্ষা কোনটি?' জবাবে আল্লাহ বললেন, "আমার শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতার বড়াই ও সব কিছুর উপর একচ্ছত্র আধিপত্য সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন কর।"

হযরত আলী (রা) বলেন যে, তিনি শৈশবে মৃত্যুবরণ করে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করা অপেক্ষা জীবনভর আল্লাহর ইবাদত করে মৃত্যুবরণ করার কামনা অধিক পোষণ করেন। কারণ শিক্ষার প্রকৃত সৌন্দর্য, রূপ, প্রকৃতি ও ব্যবহারিক উপকার এবং তৃপ্তি 'তাওহীদ' শিক্ষা ব্যতীত সম্ভব নয়। আর এ জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষাদানে যে বাধ সাধে সে-ই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব মানবের এক নম্বর দুশমন।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় প্রত্যেক খলীফাই তাঁর গৃহ শিক্ষককে প্রথম নির্দেশ দিতেনঃ "Teach my children first the Book of Allah, then Hadith and then swimming", etc.

www.pathagar.com

অতএব ইসলামী মনীষীদের দৃষ্টিতে শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। এতে কিঞ্চিৎ সংশয়ের অবকাশ নেই। কবি ইকবাল "Islam as a moral and political ideal" প্রবন্ধে এরই প্রতিফলন করেছেন এই বলে—"Man is a free responsible being, he is the maker of his own destiny, salvation is his own business. There is no mediator between God and man. God is the birth right of every man." – অর্থাৎ মানুষ একটি স্বাধীন দায়িত্বশীল প্রাণী। সে নিজেই তার ভাগ্য নির্মাতা। স্বীয় মুক্তি বা পরিত্রাণ তার নিজেরই দায়িত্ব। আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যে কোন সালিশীর স্থান নেই। আল্লাহ্ সম্বন্ধে জানা মানুষের জন্মগত অধিকার।

'তাওহীদ' বা আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ও এজ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করার উদ্দেশ্যেই গোটা বিশ্বে এক লক্ষ, মতান্তরে ২ লাখ ২৪ হাজার নবী ও পয়গম্বর সংগ্রাম করে গেছেন। শিক্ষার এ চিরন্তন মূল ভিত্তিটিই পুনরায় মুসলিম তথা ইসলামী বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করার নৈতিক দায়িত্ব আজকের উম্মতে মুহাম্মদীর উপর অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। কেননা 'তাওহীদ' হচ্ছে মুসলমানদের ঐক্য, শক্তি, স্বাতন্ত্র্য বিজয় প্রতিষ্ঠার একমাত্র আদ্যান্ত বিষয়বস্তু। পুনরায় কবি ইকবালের কথায়ঃ "ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে মুসলমানগণ ইসলামকে রক্ষা করেনি বরং ইসলামই মুসলমানদেরকে রক্ষা করছে।" অতএব একমাত্র তাওহীদ ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষার পুনর্জাগরণ ও প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ইসলামী বিশ্বের মুক্তি, প্রগতি ও প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। এ দৃষ্টিতে কতিপয় মুসলিম মনীষীর শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবন সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো যাহা ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধির সহায়ক হবে অবশ্যই।

কতিপয় মুসলিম মনীষীর সংক্ষিপ্ত শিক্ষাজীবন পরিচিতি ঃ

ইমাম উস্তাদ হাম্মাদ (র)

ইমাম উস্তাদ (র) হাম্মাদ কুফা নগরের বিখ্যাত ইমাম ও শিক্ষাগুরু ছিলেন। রাসূল (সা)-এর খাদেম হযরত আনাস (রা) হতে তিনি হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করেন। তাছাড়া বহু বিখ্যাত তাবেয়ীর ফয়েজ ও সাহচর্য লাভে তিনি বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হন। কুফা নগরে তিনি একটি মাদ্রাসাও স্থাপন করেন, যা তখনকার দিনের জনসাধারণের শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে মর্যাদাভিসিক্ত ছিল।

এ সময়ে শিক্ষার ধারা ছিল Lecture method বা বক্তৃতাভিত্তিক এবং Conversational method বা কথোকথন ভিত্তিক। ছাত্র বা শাগরিদগণ উস্তাদের পাক মুখ-নিঃসৃত বাণীসমূহ স্মরণ রাখতেন, আবার কেউ কেউ তা লিখেও রাখতেন।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানীফা (র)

হযরত ইমাম আবু হানীফা (র)- এর শিক্ষাক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত মেলে। নবাগত হিসেবে প্রথম তিনি উস্তাদের বাম কাতারে বসেন ও পরে স্মৃতিশক্তি ও মেধার অপূর্ব ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তাঁকে তাঁর ওস্তাদ সকলের সম্মুখে আসন গ্রহণ করার আদেশ দেন। ইমাম আবু হানীফাও উস্তাদের শিক্ষাদানে এত মুগ্ধ ও উপকৃত হয়েছিলেন যে, পরে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতদিন উস্তাদ সাহেবকে আল্লাহ জীবিত রাখেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি উস্তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখবেন। অবশ্য ইমাম সাহেব অন্যান্য বুজর্গদের নিকট থেকেও ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যায়ন করে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

তিনি ইলম, ফিক্‌হ ও সুন্নতের উপর এরূপ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন যে, তাঁর তফসীল বর্ণনা করার মত শক্তিও অর্জিত হয়েছিল। স্বপ্ন যোগে রাসূল করীম (সা) কর্তৃক তাকে বলা হয়েছিল, "হে আবু হানীফা, আল্লাহ তোমাকে এ জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তুমি আমার সুন্নতকে জীবিত করবে। তোমাকে লোকসমাজে বসবাস করতে হবে।" রাসূল (সা)-এর উক্তি থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানীফা (র) কিরূপ জ্ঞান ও প্রত্যয়ের অধিকারী ছিলেন। তাঁর শিক্ষকতার রাজ্য ও সীমানা এত বিস্তৃত, উন্নতও ব্যাপক ছিল যে মক্কা, মদীনা, দামেস্ক, বসরা, মিসর, বাগদাদ, কিরমান ইত্যাদি স্থানসহ তদানীন্তন খলীফার সাম্রাজ্যের মতই ছিল এর বিস্তার ও প্রভাব।

ওয়াজ ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে তাঁর শিষ্যত্বে দীক্ষিত করেছিলেন। খলীফা মামুন ইমাম সাহেবের প্রভাবে এত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁকে পদলোভে বশবর্তী করতে না পেরে অবশেষে কারাগারে নিক্ষেপ করে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে ক্ষান্ত হন।

ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তিনি ইলম হাসিল করতেন। হাদীস বর্ণনার সময় তিনি অযু করে সুগন্ধি মেখে দাড়ি বিন্যাস করে, গম্ভীর ও ভীত হয়ে হাদীস বর্ণনা করতেন, যাতে হাদীসের প্রতি তাঁর সম্মান প্রদর্শন ক্ষুণ্ন না হয়। (ইমাম গাযযালীর ইহ্‌ইয়ায়ে উলুমুদ্দিন দ্রষ্টব্য)

আত্তার বিন আবি বরাহ (র)

হযরত আত্তারের শিক্ষা মজলিস তদানীন্তন কালে সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ ছিল। ইমাম আবু হানীফা তাঁর মজলিসে স্থান লাভের খোস নসীব লাভ করেছিলেন। হযরত ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেন বলে ইমাম গাযযালী লিখেন। (ইহ্‌ইয়ায়ে উলুমদ্দিন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২)

www.pathagar.com

তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত তাবেয়ী। প্রখ্যাত সাহাবা হযরত আবদুল্লাহ বিন আবদ ইবনে উমর, ইবনে যায়দ, আবু হুরায়রা (রা) প্রমুখের সাহচর্যে বিপুল জ্ঞান ও ইজতিহাদের ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূল (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এমন ২০০ সাহাবার সংসর্গ লাভে তিনি শিক্ষিত হওয়ার গৌরব ও সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হযরত আত্তারের বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভার স্বীকৃত দিয়েছিলেন এই বলে যে 'আত্তার ব্যতীত আর কাহারো ফতোয়া দেওয়ার অধিকার নেই।'

হযরত ইমাম মালিক (র)

খলীফা মনসুর এক সময় হযরত ইমাম মালিক (র)-এর মজলিসে জোরে তর্ক-বিতর্ক করায় ইমাম সাহেব তখন খলীফাকে শাসিয়ে ছিলেন এই বলে যে, পয়গম্বরের আওয়াজের চেয়ে তোমাদের আওয়াজ উচ্চ করো না। এ নির্দেশটি থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষার পরিবেশে আদব ও মেজাজের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ কত কঠিন ও নিয়ন্ত্রিত ছিল। এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয়, প্রকৃত আলিম বা শিক্ষক রাষ্ট্রনায়কের চেয়ে ক্ষমতাশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। হযরত ইমাম মালিক (র) বাদ ফজর সূর্যোদয়ের পর পরই শিক্ষাদানে ব্রতী হতেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের দু-একজনের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে তিনি ধীরে গুরুগম্ভীরভাবে বক্তৃতা দিতেন। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা মজলিসের বিভিন্ন নির্দিষ্ট স্থানে বসা বা দন্ডায়মান অবস্থায় থাকতেন। শিক্ষার্থীরা দোয়াত কলমের সাহায্যে বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করতেন। শেখগণ মাঝে মাঝে বক্তৃতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ছাত্রদের নিকট প্রদান করতেন। নকলকারীদের ভুল হলে তা সংশোধনের দায়িত্বও ছিল তাদের উপর ন্যস্ত। ছাত্রসংখ্যা যখন বিপুল হত, তখন নকীব নিযুক্ত করা হতো মজলিসে। নকীবগণ ইমাম সাহেবের বক্তৃতা হুবহু নকল করে দ্বারে উপবেশনকারী ছাত্রদেরকে তা' শুনিয়ে দিতেন। ইবনে আত্তিয়া ইমাম সাহেবের একজন প্রখ্যাত নকীব ছিলেন। অধিকাংশের মতে তেরশত ছাত্র ইমাম সাহেবের মজলিসে ছিল।

হযরত ইমাম শাফিঈ (র)

ইমাম শাফিঈ (র) স্বল্পভাষী ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। তিনি নীরবতা অবলম্বনের মাধ্যমে জ্ঞান-চেতনা লাভ করে উত্তর দিতেন। ইলমের সাহায্যে আল্লাহর আনুগত্য লাভই ছিল তাঁর জ্ঞানার্জনের প্রধান লক্ষ্য। ইমাম শাফিঈ (র)-এর শিক্ষা প্রদানকাল ছিল বাদ ফজর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। ফিক্‌হ শিক্ষা দানের

www.pathagar.com

পর হাদীসের ক্লাস শুরু হতো। এরপর তাঁর ওয়াজ বা বক্তৃতা শিক্ষার বিষয়-বস্তুর উপর শিক্ষামূলক যুক্তি-বিতর্ক চলত। জোহরের পর তাঁর শিক্ষা মজলিসে সাহিত্য, কবিতা, লুহুগ্যাতের ক্লাস শুরু হয়ে আছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকত।

ইমাম শাফিঈ প্রাণস্পর্শী কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাঁর লাহান এত সুমধুর ও প্রভাবশালী ছিল যে, শ্রোতৃবর্গ এ সুরের স্পর্শে রোদনে অভিভূত হয়ে যেতেন। উমর বিন তাহেরের অভিমত হচ্ছে 'আমার বিবেচনায় ইমাম শাফিঈ সবচেয়ে জাহিদ, আবিদ ও মুত্তাকী।' রবীয় বিন সুলায়মান বলেন, "আমি তাঁর দরজায় ৭ শত গাড়ি দেখেছি। লোকেরা গাড়িতে চড়ে বহু দুর হতে হাদীস ও ফিক্‌হ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর দরবারে আসত।" ইমাম শাফিঈ (র) প্রকৃত ইলম বা জ্ঞান সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'গুণাহর অন্ধকার দ্বারা ইলমকে অপবিত্র করো না। কারণ গুনাহযুক্ত ইলম মানুষকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখে।' [ইমাম গাযযালীঃ উহুইয়ায়ে উল্‌মুদ্দিন. ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪]

মুসলিম রাষ্ট্রে আলিম সমাজের পদমর্যাদা ও প্রভাব ঃ

এ প্রসঙ্গে খলীফাদের আমলে আলিম সমাজের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে রাসূল করীম (সা)-এর সময়টুকুর প্রাসঙ্গিক উল্লেখ প্রয়োজন। রাসূল (স)-এর সময় আলিম বলে কোন সম্প্রদায় ছিল না। অন্য কথায় সব সাহাবাই আলিম ছিলেন। তাঁদের সবারই প্রভূত মর্যাদা ও ভূমিকা ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রে। রাসূল (সা) বিভিন্ন সাহাবাকে উপদেশ সহকারে বিভিন্ন স্থান ও গোত্রে পাঠাতেন ইসলামী আহকাম ও আরকান শিক্ষাদানের জন্য। তিনি ইসলামী শিক্ষা দানকারিদেরকে সম্মানিত করেছেন এই বলে যে, "আলিমগণ হচ্ছেন নবী-রাসূলদের উত্তরাধিকারী।"

খুলাফায়ে রাশেদার যুগেও ইসলামী আহকাম ও আকীদা শিক্ষাদানকারি সামাজিক মর্যাদা ও পদবীতে ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও বরেণ্য। আব্বাসীয় যুগে বিশেষ করে আল মামুন ও আল মনসুরের কাল হতেই প্রকৃত অর্থে আলিম সমাজের মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। মুতাযিলা সম্প্রদায় হচ্ছে এর প্রধান কারণ। এ সম্প্রদায় আব্বাসীয় যুগের ইসলাম বিরোধী ও ইসলাম বৈরী অনুবাদ সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ইসলামের প্রকৃত আলিম সম্প্রদায়কে নির্যাতন ও অত্যাচার আরম্ভ করে। খলীফার সাহায্য ও সহায়তার মাধ্যমে প্রখ্যাত চার ইমামের জীবন, বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর কারাপ্রাচীরে শাহাদত বরণ এ নির্যাতনেরই কলংক স্বাক্ষর। খলীফা মামুন নিজে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলেই এহেন লোমহর্ষক নির্যাতন তখন ছিল একটি

www.pathagar.com

নৈমিত্তিক ব্যাপার। ঐতিহাসিক খোদাবখ্‌শের মতে এ গর্হিত জুলুমের অবসান ঘটে খলীফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে। এই খলীফাই পুনরায় ইসলামের প্রকৃত আলিমগণকে সমাজে মর্যাদাশীল করেন।

ইসলামে রাজনীতি ও ধর্ম অবিভাজ্য। যতদিন পর্যন্ত এ ধারণা ও তদানুযায়ী খিলাফত বর্তমান ছিল, ততদিন পর্যন্ত আলিম সমাজের প্রভাব ও মর্যাদা বিদ্যমান ছিল যুগপৎ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায়। কালের চক্রে এ অবস্থার অবসান ঘটে যখন খিলাফতকে প্রজাতান্ত্রিক রূপ থেকে বিচ্যুত করে রাজতন্ত্রে বিকৃত করা হয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর সময় হতেই ইসলামে রাজনীতি বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা শিকড় গাড়তে থাকে।

হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর দ্বারা এ পরিবর্তন আলেম সমাজকে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে এবং রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ থেকে ক্রমান্বয়ে বঞ্চিত করে। ফলে আলিম সমাজের কাজ ও চিন্তাধারা একমাত্র তথাকথিত ধর্মীয় গণ্ডিতে হয়ে পড়ে শৃংখলিত ও সংকুচিত। এতদসঙ্গে ১. ইসলামের সর্বজনীন শিক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষতা এমনকি ইসলাম বিরোধী শিক্ষার প্রভাবে বিকৃত ও পঙ্গু হয়ে উঠে; ২. কালক্রমে আলিম সমাজের প্রভাব রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অনুপস্থিত থাকাতে ইসলামী রাজনীতিও হয়ে উঠে ধর্মনিরপেক্ষ প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে পরিপুষ্ট ও মারাত্মভাবে বিকৃত। উক্ত দুটি মারাত্মক ত্রুটি ও পরিণামের ভয়াবহ পরিণতি থেকে মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষা করার জন্য ইসলামের প্রকৃত আলিমগণ অধীর হয়ে উঠেন। অষ্টাদশ শতকের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবের ওহাবী (?) আন্দোলন, ঊনবিংশ শতাব্দীর মিসরের মুফতী মুহাম্মদ আবদুহুর আন্দোলন ও আফগানিস্থানের মওলানা জামালুদ্দীন আফগানীর প্যান-ইসলামিক আন্দোলন, ভারতের মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও তদীয় শিষ্যদ্বয় মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ ও মাওলানা কারামত আলীর শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ, ইত্যাদির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল গোটা মুসলিম বিশ্বে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে ইসলামকে একক ও অবিভাজ্য সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে হাজী শরীয়তুল্লাহও অনুরূপ আন্দোলন পরিচালনা করেন 'ফারায়েজী আন্দোলন' নামে। তাঁর ওফাতের পর তদীয় পুত্র দুদু মিয়া এ আন্দোলন পরিচালনা করেন। গোটা মুসলিম ভারতকে শিক্ষা ও রাজনীতির মাধ্যমে 'দারুল হারব' হিসেবে রূপান্তরিত করার বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে এ আন্দোলনের সূত্র ও রেশ ধরে তদানীন্তন ভারতের মুসলমানগণ নিজদেরকে ইসলামী অনুশাসন ও সংস্কৃতিতে পরিচালিত করার নব চেতনা ও উদ্দীপনা লাভ করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ

www.pathagar.com

খানের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ করে দিল্লীর হজরত মাওলানা আবুল কাসেম নানুতভী সাহেবের দেওবন্দ মাদ্রাসা উক্ত চেতনা ও উদ্দীপনার মূর্ত প্রতীক বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীর অধীনে শিক্ষিত মুসলিম ছাত্র সম্প্রদায়ই ভারতবর্ষের ইংরেজি শাসন ও খৃষ্টানি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্টে সৃষ্ট অনন্য আবাসিক মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের পত্তন এ আন্দোলনেরই স্বর্ণ ফসল।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর তদানীন্তন ভারতের ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও সংস্কারক মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী এ নতুন রাষ্ট্রটিকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার আমরণ প্রয়াস চালান। সাধারণভাবে গোটা মুসলিম তথা ইসলামীবিশ্ব এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের মুসলমানদের নৈতিক ও আদর্শিক চরিত্র ইসলামী শিক্ষা এবং মূল্যবোধে সংশোধন ও গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি শতাধিক গবেষণাধর্মীও পর্যালোচনামূলক ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করেন এবং এ-সাহিত্যের ভিত্তিতে সুধী সমাজের চিন্তা ও কর্মজগতে ইসলামী রেনেসাঁর এক বিস্ময়কর প্রসার ঘটান। অধিকন্তু তিনি ইসলামী শিক্ষা ও চরিত্র প্রভাবান্বিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে সর্বমুখী একটি নিবেদিত ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য 'জামায়াতী ইসলামী' নামে একটি আদর্শ সংগঠন কায়েম করেন। রাসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশিত পথে আল্লাহর যমীনে আল্লহ্র সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম এবং গোটা মানবজাতির শান্তি ও প্রগতি স্থাপনই হচ্ছে এ আন্দোলনের মূল এবং চরম লক্ষ্য। মাওলানা মওদুদী প্রায় একশ-এর কাছাকাছি গ্রন্থ লিখেছেন। তন্মধ্যে তাঁর পর্দা, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, তাফহীমুল কোরআন, সুদ, প্রভৃতি গ্রন্থ বর্তমানে গোটা মুসলিম বিশ্বে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে; ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জাগ্রত করেছে বিংশ শতাব্দীর বিমূঢ় মুসলিম মিল্লাতকে। বর্তমানের ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক, আফগানিস্তান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ মাওলানা মওদুদীর চিন্তাধারায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে ইসলামী বিপ্লব সাধনের জোশ ও উদ্দীপনায়।

লক্ষণীয়, আলিম, বিশেষ করে আল-কুরআন ও হাদীসের যথার্থ শিক্ষা এবং দীক্ষা-প্রাপ্ত আলিম শুধু স্বীয় দেশে নয় বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনীতি করার কিরূপ যোগ্যতা, নির্ভীকচিত্ততা ও আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী হতে পারেন তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনী। আল্লাহ-ভক্ত আলিমের মান, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা কতটুকু তা আজকের ইরানই গোটা বিশ্বের নিকট অন্যতম উপমা হিসাবে বিদ্যমান।

www.pathagar.com

পরিশেষে খলীফাদের আমলে আলিমদের মর্যাদা কিরূপ ছিল এর সারসংক্ষেপ বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে যে, আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী অধুনা যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আছেন তা ঐ আমলেরই প্রতিফলন বৈ নতুন কিছু নয়। এস, খোদাবখস তাঁর 'Politics in Islam' গ্রন্থে খিলাফতের আমলে আলিমদের মর্যাদা সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে তুলে ধরেন অনেকটা নিম্নরূপে ঃ

১. নির্মল চরিত্রের এবং ব্যক্তিত্বের জন্যে আলিমদের মর্যাদা সমাজে ছিল ব্যাপক ও গভীর।
২. ফকীহ্দের সাহায্য ব্যতিরেকে খলীফাদের পক্ষে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কাজ চালানো ছিল একটি অবাস্তব ব্যাপার।
৩. অধিকাংশ খলীফাই (আব্বাসীয়, ফাতিমী ও মুরীয়) তাঁদেরকে মর্যাদা সহকারে সমাদর করতেন।
৪. আলিম সমাজের ফতোয়ার উপর খলীফাদের খিলাফত ও শাসন ছিল গভীরভাবে নির্ভরশীল ও সুনিয়ন্ত্রিত।
৫. খলীফাগণ শিক্ষা বিস্তারের জন্যে নিয়মিত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতিপালন ও ভাতার জন্যে তাঁরা প্রচুর পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরী করতেন বৃত্তি ও ওয়াকফ সম্পত্তি প্রদানের মাধ্যমে।
৬. অনেক আলিম ও ফকীহ্ শিক্ষকতার জন্যে এতো পারিতোষিক পেতেন যে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই বেশ সচ্ছল ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। আলেপ্পোর এক কাযীর সঞ্চয় ছিল ১০ লক্ষ দিরহাম। [Hambaug : Schul and Lehriusen der Araber, পৃষ্ঠা ২৭]

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সববিষয়ের উন্মেষ, সংস্কার, প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও প্রতিপত্তিতে একমাত্র আলিম সমাজেরই মূল ও মৌলিক অবদান সক্রিয়। তাঁদেরই জীবন ও তিতীক্ষার বিনিময়ে ইসলামের সোনালী অধ্যায় রচিত হয়েছিল বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে, এবং অনুরূপভাবে তাদেরই মর্যাদাও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের উপর ইসলামী বিশ্বের হৃত গৌরব ও প্রতিপত্তি পুনরায় অর্জন যে সম্ভব তা প্রতিদিনের সূর্যোদয়ের মতই অবশ্যম্ভাবী।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

১. পাক কুরআন

২. হাদীস শরীফ ঃ বুখারী/তিরমিযী।

৩. পয়গামে মোহাম্মদী ঃ সুলায়মান নদভী, অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব।

৪. ইয়াহইয়া-ই উলুমুদ্দীন (ভল্যুম) ঃ ইমাম গাযযালী (র)।

৫. চারি ইমামের জীবনী ঃ মোজাফফর হোসেইন।

৬. স্পেনে মুসলমান সভ্যতা ঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ।

৭. Islamic Civilization : Khoda Baux.

৮. Politics in Islam: Khoda Baux.

৯. History of the Saracens : S. Ameer Ali.

১০. Mohammed and the Quran: John Devenport.

১১. Mohammedanism: H.R. Gibb.

১২. Islam as a Moral and Political Ideal: Iqbal.

----

www.pathagar.com

২য় অধ্যায়

আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা সঙ্কট ঃ কারণ ও প্রতিকার

আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা সঙ্কট ঃ

Education is as old as man. মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই শিক্ষার জন্ম। শিক্ষা মানুষের জন্যে। মানুষ শিক্ষার জন্যে সৃষ্ট। 'অমূল্য সম্পদ' হিসাবে স্বীকৃত 'শিক্ষা' বর্তমানে অভিসম্পাতের রূপ নিয়েছে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও প্রগতি সাধনের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা এক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এর মূল কারণ প্রধানত তিনটি ঃ

১. তথাকথিত শিক্ষাবিদগণ 'মানুষের' পরিচয় ও 'প্রকৃতি' ২. প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক ও ব্যবহার-উপভোগ বিধি নিরূপণে ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছেন, এবং ৩. সবশেষে এরা বিশ্ব ও মানব সৃষ্টির মূল উৎস 'স্রষ্টা' বা 'আল্লাহ'কে শিক্ষার অঙ্গন থেকে দিয়েছেন অব্যাহতি! ফলে আধুনিক শিক্ষার বিষময়ফল আজ বিশ্বের ক্ষুদ্র-বৃহৎ, উন্নত-অনুন্নত সব রাষ্ট্রেই প্রকটিত। 'শিক্ষা' আজ মানুষের স্বস্তি ও মুক্তির দিশারী হওয়ার পরিবর্তে অশান্তি ও অপমৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই শান্তি ও শ্রদ্ধার আগার অপেক্ষা হতাশা ও আতংকের আখড়ায় হয়েছে পরিণত। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানুষের আশা-আকাঙ্খা ও মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে, হয়ে উঠছে মনুষত্ব ও নৈতিকতাকে সমাধিস্থ করার অপপ্রয়াসী। এর কারণ বহুবিধ। নিচে কতিপয় প্রধান কারণ উল্লেখ করা হলোঃ

আধুনিকশিক্ষা জীবন ও সমাজের অন্তরায়

ইউনেস্কোর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জীন টমাস 'World Problems in Education' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বর্তমান শিক্ষা ও শিক্ষাপদ্ধতি মানুষ ও সমাজের মধ্যে ঐক্য ও যোগসূত্র সৃষ্টি অপেক্ষা বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করছে মারাত্মকভাবে। তাঁর কথায় আধুনিক শিক্ষা হচ্ছে একটি "artificial barrier between education and society, between educational institutions and life." (UNESCO Press, Paris 1975, P. 108) জীন টমাস বিশ্বের বিশেষ করে এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও

www.pathagar.com

আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিক্ষার উপর জরীপ চালিয়ে উক্ত মন্তব্য করেন। বিশেষ করে সেসময়ে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আফ্রিকার কতিপয় রাষ্ট্রের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ঐসব রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসন হতে মুক্তি লাভ করার পর উত্তরাধিকারী হিসাবে যে শিক্ষা ব্যবস্থা পেয়েছে, তা শাসক-রাষ্ট্রের ভাব-ভাষা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ। তাছাড়া অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তক বিদেশী ভাষায় লিখিত এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও প্রচলিত ছিল বিদেশী ভাষা। ফলে এসব দেশ স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের আলোকে নিজেদেরকে আবিষ্কার করল বিদেশী মন-মানসিকতা ও আচার -আচরণে স্বদেশে বিদেশীরূপে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ ইসমাইল ফারুকী উক্ত দুরবস্থাটি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'Crisis in Muslim Education because of Dicotomy of Traditional and Modern Systems and Means of Solving It' শীর্ষক প্রবন্ধের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে। তিনি বলেন ঃ তথাকথিত Humanities বা মানবিক বিষয় হিসেবে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদরা বিভিন্ন দেশে যা শিক্ষা দিচ্ছেন, তা মানবিক বিষয় নয়; বরং পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষয়বস্তু ও উপকরণ যেগুলোর সাথে মুসলমানদের (এমন কি অখ্রিস্টানদেরও) চিন্তা, কর্ম ও পরিবেশের সঙ্গতি ও সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন ঃ "We are befooled by the westerners who use to say that Modern Subjects are universal, but infact these subjects are designed to teach us their society and culture in the guise of universality. They teach us their culture depriving us doing our 'homework' by ourselves".

(দৈনিক সংগ্রাম ৩০। ৩ ।৮০)

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসকরা তদানীন্তন ভারতবর্ষকে 'ইউরোপীয়' করার জন্যে ইংরেজী সভ্যতার আলোকে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছিল। তারা ভারতের প্রচলিত নৈতিকতা ও মানবতা সমৃদ্ধ উর্দু ও ফারসি ভাষাকে তুলে দিয়ে তদস্থলে ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় অভিষিক্ত করে। এতদ্‌সঙ্গে শিক্ষার বিষয়বস্তুকেও ইংরেজি সভ্যতা ও আদর্শের উপকরণে ঢালাই করে। শিক্ষার মাধ্যম বা Medium of Instruction হিসেবে ইংরেজি চালু করে সর্বত্র। ফলে সার্পের কথায় "তারা (ভারতীয়রা) হবে এমন এক শ্রেণীর যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়; কিন্তু রুচি, ভাবধারা, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ।" (Selection from Educational Research Part 1, P. 23). 'ব্লাক' আফ্রিকা হিসেবে

www.pathagar.com

আখ্যায়িত মহাদেশেরও অনুরূপ অবস্থা ছিল। স্বাধীনতা পাওয়ার পরক্ষণেই এ মহাদেশের রাষ্ট্রগুলো দেখতে পেল যে, তাদের প্রভুরাষ্ট্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আফ্রিকার সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি তথা জাতীয় আকাঙ্খার কোন প্রতিফলন ঘটেনি। এতদ্দর্শনে নাইজেরিয়া ও ঘানার প্রতিনিধিগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, "The System of Education in Africa must be re-invented,"– আফ্রিকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনরায় উদ্ভাবন করতে হবে।

শুধু আফ্রিকা নয়, বরং প্রতিটি শাসিত রাষ্ট্রই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে re-invention-এর চিন্তায় ক্লিষ্ট। বৈদেশিক শাসকগণ এসব দেশের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তাকে শিক্ষার মাধ্যমে এমন বিকৃত ও বিনষ্ট করার অপপ্রয়াস পেয়েছে যে এর কুফল স্বরূপ এসব দেশের আপামর জনসাধারণ নিজের দেশ ও ভূমিতে ময়ূরপুচ্ছ বিশিষ্ট কাকের মত বিরাজ করছে বৈদেশিক চিন্তা কর্মের প্রভাবে, আর স্বদেশী চাহিদা মিটানোর অন্তর্দ্বন্দ্বে।

বিংশ শতাব্দীর মানুষ 'নতুন মানুষ' হিসেবে সমস্যা পীড়িত। সভ্যতার শৈশবাবস্থায় মানুষের জীবন ছিল সরল ও সাধারণ কায়িক-মানসিক শ্রমভিত্তিক। ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের গুরুভার ছিল সমাজের আপামর জনসাধারণের উপর। সেকালে আজকের মত এ ধরনের স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু রেনেসাঁ ও শিল্প বিপ্লবের পর (১৪০০-১৬০০ খ্রিস্টাব্দ) মানুষের জীবন, ধ্যান-ধারণা ও কর্মকাণ্ড হয়ে পড়ল যন্ত্র, কলকব্জা, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল-নির্ভর। মানুষের কায়িক ও দৈহিক শ্রমের পরিধি হয়ে গেল সংকুচিত। মানুষের হাত-পা, মন-মগজের স্থান দখল করে নিল বিজ্ঞান ও শিল্প-কল-কারখানা। সে তার স্বীয় সত্তা হারিয়ে ফেলল আপন সৃষ্ট বিজ্ঞান নামক দেবতার কাছে। '.........The scientific and technological revolution, both by virtue of the instantaneous transmission of news over any distance and the invention of the computer, has gained supremacy over the minds of mankind as a whole. The new man, the man of the technological era, mass media and cybernetics, needs a new education.'– এ ছিল International Commission on the Development of Education, UNESCO এর মন্তব্য। (Published Autumn, 1972)

কমিশন বিজ্ঞানের এ বিপুল প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত রেখে বিজ্ঞানের পরিচর্যা করার কথা বলেছে এই বলে– "a scientific frame of mind in order to promote the sciences without becoming enslaved by them."

www.pathagar.com

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের জীবনে বৈষয়িক সমৃদ্ধি এনেছে বিপুল; কিন্তু এর বিনিময়ে কেড়ে নিয়েছে মানুষের মন-মগজের শান্তি ও পবিত্রতা, মানসিক পরিতৃপ্তি ও স্বাধীনতা। রক্তমাংস ও আত্মা বিশিষ্ট মানুষ বিজ্ঞানের চাপ ও প্রভাবে নিরেট Machine তথা Robot বা যন্ত্রসত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও কবি Thomas Carlyle-এর কথায় "Men are grown mechanical in head, in heart as well as hand."

শিক্ষার বিচার্য বিষয় নিরূপণ সমস্যা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পৌঁছেও আজ মানুষের মনে সেই জিজ্ঞাসাই জেগেছে What are the criteria of Education? শিক্ষার বিচার্য বিষয়গুলো কি? Who is that one to determine the criteria? এবং এর সুরাহা যিনি করবেন তিনি কে? ঘানা, নাইজেরিয়া এবং জর্দানের পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন উঠেছে এবং এদের সবাই দেখছে যে আধুনিক শিক্ষা ও এর বিষয়বস্তু কোনটিই সার্বজনীনতা লাভের যোগ্যতা দেখাতে পারেনি। জীন টমাসের কথায় বলা যেতে পারে, "The trouble with education is that it is always torn between conflicting requirements, health, labour, unemployment, agriculture, trade or industry", দেশ, ভৌগোলিক পরিবেশ ও জাতিগত (ethnical) বৈষম্যের ভিত্তিতে শিক্ষার যে একই সাধারণ ভিত্তি ও লক্ষ্য হওয়া দরকার ছিল তা আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। ফলে 'শিক্ষা' নামক এই অদ্ভুত (!) বিজ্ঞানটিকে নিয়ে প্রতিটি দেশ যেভাবে খুশী সেভাবে টানা হেঁচড়া করে শিল-পাটায় পেশা মরিচের দশায় পৌঁছিয়েছে। এর পরিণামে শিক্ষার ভূমিকা, ঐক্য, আদর্শ, প্রীতি ও প্রত্যয় সৃষ্টির পরিবর্তে পরস্পর সংঘর্ষমুখী ভাবমন্ডল ও পরিবেশ রচনা করে যাচ্ছে ভয়ংকরভাবে। শিক্ষা এখন শান্তি ও সমৃদ্ধির উপায় হিসেবে অস্তিত্ব হারিয়ে রূপপরিগ্রহ করছে স্বৈরাচারী এবং অনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্য হিসেবে। অর্থাৎ Education is no longer a means to an end to attain mental and material accomplishment.

পর্যায়ক্রমিক প্রমোশনদান পদ্ধতি সমস্যা

মানব সভ্যতার উন্মেষকালে স্কুল-কলেজ ছিল না। তখন ছাত্ররা শিক্ষকের গৃহে, আশ্রমে, মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় শিক্ষা লাভ করত। এক বা একাধিক কিতাব বা গ্রন্থ পাঠ শেষে অপর শিক্ষকের নিকট গিয়ে শিক্ষার্থীগণ নতুন সবক নিত। সেদিন সার্টিফিকেট প্রদান বা প্রমোশনের পদ্ধতি ছিল না। ফলে যে কোন শিক্ষার্থী যে কোন বয়সে যে কোন পুস্তকের পাঠ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের শরণাপন্ন হতো। এতে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছিল না। অবশ্যি এ প্রসঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পোপ বা বিশপগণ মাঝে মাঝে বাধ

www.pathagar.com

সাধ্ত স্বার্থ, জাত (Caste) বা রক্তের ভিত্তিতে। কিন্তু তবুও তখন সাধারণ মানুষের শিক্ষালাভের পথ এত নিয়ন্ত্রিত ও কঠোর ছিল না, যা বর্তমান সভ্য জগতের মানুষ একনিষ্ঠভাবে পালন করছে। বর্তমান সভ্যজগত(?) শিক্ষার দ্বারকে সংকীর্ণ ও অপ্রশস্ত করে দিয়েছে তথকথিত The System of Linear Progression বা পর্যায়ক্রমিক পাঠোন্নতির পদ্ধতি আরোপ করে। এক শ্রেণীতে পাস দিয়ে অন্য শ্রেণীতে প্রবেশানুমতি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠপর্ব শেষ করে মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠপর্ব শেষ করে মহাবিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের পাঠোন্নাতির পর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার ছক বাঁধা নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ মানবজাতির বিপুলাংশকে শিক্ষালাভের সার্বজনীন আলো ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে। অথচ জন্মগত এমন কি সাধারণ মানবিক দৃষ্টিতেও প্রতিটি মানব শিশুই শিক্ষা লাভের অধিকারী। UNESCO কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা বৈঠকে অনেক সদস্য রাষ্ট্র Linear Progression -এর উপর সমালোচনা করে এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, "There are many people who are fairly educated through living and doing but do not get lift for certificates." অর্থাৎ অনেক লোকই আছেন যারা জীবন যাপন প্রণালীর মাধ্যমে সুশিক্ষিত হয়েছেন, কিন্তু তারা সনদ বা সার্টিফিকেটের অভাবে উন্নতি লাভ হতে বঞ্চিত রয়েছেন।

পরীক্ষার মূল্যায়ন ও মানদণ্ডের সমস্যা

Evalutionary Stick সম্বন্ধে অনেক শিক্ষাবিদ সংশয়াবিষ্ট। প্রচলিত মানদণ্ডের মাধ্যমে কোন শিক্ষার্থীরই যুগপৎ সুপ্ত ও প্রকাশিত প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর পটভূমি ঃ বৈষয়িক ও পারিপার্শ্বিক মণ্ডল, দৈহিক ও মানসিক অবস্থা, আত্মিক ও আধাত্মিক সম্ভাবনা মূল্যায়ন বা বিচার করার ক্ষমতা বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির আছে কি? ১৯৭২ সালে 'ডাকারে' এ ব্যাপারে একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের সদস্যগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি অপর্যাপ্ত এবং অসামঞ্জস্যশীল, যার ফলে ভাবী পরীক্ষার্থীদের জন্যে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার ও নবায়ন প্রয়োজন। এ বৈঠকের কতিপয় বিশেষজ্ঞ এ অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি 'rests on mere axioms' বা একটি স্বতঃসিদ্ধের নাম মাত্র যা সম্পর্কে গবেষণায় মনোনিবেশ করার অর্থ হচ্ছে "The only point of entry into this system is at zero"– শূন্যে অনুপ্রবেশ মাত্র। শিক্ষা জগতের linear progression পদ্ধতি একটি অভিশম্পাত বা scourge বলে অনেকে মনে করেন। এর ব্যাপকতা এত গভীর যে, তা থেকে তথাকথিত উন্নত দেশগুলোও নিষ্কৃতি পায়নি। উদাহরণস্বরূপ ১৯৭১-৭২ সালের পরিসংখ্যানে

www.pathagar.com

দেখা যায় ফ্রান্সে শতকরা ৫০ জন, বেলজিয়ামে শতকরা ২৮ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'পাস সার্টিফিকেট' না পাওয়াতে লেখাপড়ায় আর অগ্রসর হতে পারেনি। অনুন্নত রাষ্ট্র যেমন জহোমী ও জায়েরীতে ৮০% ছাত্রই উক্ত কারণে লেখাপড়া লাভ হতে বঞ্চিত হয়। আর্জেণ্টিনা, নাইজেরিয়া, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় dropouts বা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিত্যাগকারী ছাত্রের সংখ্যা এর চেয়েও বেশি। ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এ ধরনের ছাত্র সংখ্যা গড়ে আজ-ও ৬০% জন হবে অনেকে মনে করেন। ২০০৫-এ এক্ষেত্রে গড়ে ৫% ভাগ উন্নয়ন ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন এবং এটা স্বার্থ ও ভোগ-কেন্দ্রিক শিক্ষায় উন্নয়ন মাত্র হয়েছে।

রাজনৈকি খটে তবে মতাদর্শের দ্বন্দ্ব ও জাতীয়তাবাদ সমস্যা

একমাত্র কম্যুনিষ্ট দেশ ছাড়া বিশ্বের সব রাষ্ট্রেই একাধিক রাজনৈতিক দল রয়েছে। এবং দলের লক্ষ্য ও আদর্শ ভিন্ন হওয়ায় যে রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতায় আসে, সে দলটিই স্বীয় আদর্শ ও মতবাদ প্রচারের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা চালায়। ফলে কোন রাষ্ট্রই আজ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে তার গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। উপরন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, যদিও কম্যুনিষ্ট দেশগুলোতে "one party, one government এবং one slogan" ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা বা মতাদর্শ বরদাস্ত করা হয় না, তথাপি অকম্যুনিষ্ট দেশগুলোতে কম্যুনিষ্ট পার্টি বা এর দোসর ও সমজাত সোশ্যালিস্ট দলের রাজনীতি করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ফলে এসব গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এত প্রকট হয়ে উঠে যে, অনেক সময় কম্যুনিষ্ট পার্টির বিজয় সেসব দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে একমাত্র রাশিয়া ও এর আওতাভুক্ত রাষ্ট্রগুলো ব্যতীত কোন রাষ্ট্রেরই "জাতীয় শিক্ষার সুনির্দিষ্ট" রূপরেখা ও লক্ষ্য" স্থির নেই। বর্তমানে পরাশক্তির দ্বারা সৃষ্ট বিশ্বায়নের প্রভাবেও পরাশক্তির দ্বারা সৃষ্ট এই লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই তথাকথিত জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ভাষা, বর্ণ, ভৌগোলিক পরিবেশের বৈষম্য ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকটি সরকারই সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জাতীয়তাবাদের প্রকট রূপ দৃষ্টিগোচর হয় সর্বপ্রথম ফ্রান্সে। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স তার শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসে। W.O. Lester Smith এর কথায়, নেপোলিয়ান 'belived in nations, especially in his beloved France. In shaping her reconstruction he soon realized the political significnce of education." (Government of education, ed, 1968. p. 196.)

www.pathagar.com

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের সূচনায় জার্মানীও জাতীয়তাবাদকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে। এ উদ্দেশ্যে জার্মানি স্কুলসমূহের সংস্কার ও সংশোধনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জার্মান শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'স্বদেশপ্রেম' ও সামরিক শৌর্যবীর্য স্ফূরণের জন্য সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদগন বইপত্র লিখতে শুরু করেন। এসব লেখক ও পণ্ডিতদের মধ্যে জেকব উইলহেম গ্রীন, ফিসতে সবিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। তাঁরা 'জার্মান' জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জার্মান লোক-সাহিত্য, (German Folklore) তাদের বীরপুরুষদের কাহিনী, ইত্যাদি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেন। ফিসতে বিশ্বাস করতেন যে, Nationlistic education was a must for the rise of Germany as a supreme power on the globe, (World Book Encyclopaedia,Vol-E. Education দ্র.) উল্লেখ্য ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি এই উগ্র জাতীয়তাবাদের (Jingoism) দৃষ্টিতে জার্মানিকে স্বৈরশক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল।

ফ্রান্স ও জার্মানির এ মতবাদে দীক্ষিত হয়ে বর্তমানের অধিকাংশ রাষ্ট্রই শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়তাবাদের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়াস পাচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের এ প্রভাবকে লক্ষ্য কর E. Kedourie "Nationalism" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন","Schools are rather instruments of State policy, like the army, the police and the exchequer." (Hutchinson, 1961, p. 84.)

নৈতিকতার অবক্ষয় ও যৌন শিক্ষার পরিণাম

শিক্ষার বলয়ে ধর্ম তথা নৈতিকতার অবক্ষয় আর একটি ব্যধি হিসেবে মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করেছে আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্ষেত্রে। নৈতিকতার এ অবক্ষয়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে Freud-এর lieben and arbeitan বা ভালবাসা ও কর্মের শিক্ষাদর্শন। ভালবাসা বলতে তিনি Intimacy বা হৃদ্যতা এবং Genital love বা যৌন প্রিয়তাকে বুঝিয়েছেন। Work বলতে বুঝিয়েছেন তিনি প্রজনন কাজকে। ধর্মের ভিত্তিতে বৈবাহিক বন্ধনের নীতি ও নৈতিকতা এ দর্শনের ফলে লোপ পায়। নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক শুধু Sex নয় বরং প্রেম, প্রীতি, সৌহার্দ ও ত্যাগের ভিত্তিতে একটি নির্মল পরিবার তথা মানব সমাজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যও; এ লক্ষ্যকে ফ্রয়েড ব্যর্থ করে দেন তাঁর উক্ত দর্শনের মাধ্যমে। Barnes তাঁর The Denis experiment in pornography' গ্রন্থে এর পরিণামটি তুলে ধরেন নিম্নভাবে ঃ The realties of sexual life widely exposed and admitted and full and frequent sexual

www.pathagar.com

experiences among the younger groups are now commoner than it was in some social groups. (edition, 1970). ইংল্যান্ডের শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক বেন মরিস জনৈক শিক্ষককে যৌন বিষয়ক সম্পর্কে এক প্রশ্ন করে যে উত্তরটি পান তা-ও এখানে প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষক মহোদয় বলেন যে, তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীর যৌন সমস্যা নিবৃত্তের জন্য পরামর্শ দেন ঃ Once trouble starts with your girl (boy) friend who bother? Why not just move on to some one else? (Objectives and Prespectives in Education; Ben Morris, Edn, 1972, p. 193)

ফ্রায়েডের যৌন দর্শনকে কেন্দ্র করে বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাসূচিতে যৌন শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে চালু করা হয়েছে। আমেরিকা-ই প্রথম 'যৌন শিক্ষা'কে স্কুল কলেজে চালু করার উদ্যোগ নেয়। এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব ডঃ ইসমাইল ফারুকী যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আমেরিকায় যৌন শিক্ষার কুফলস্বরূপ নগ্নতা ও অশ্লীলতাপূর্ণ ছায়াছবি প্রচারের সয়লাব বইছে। কিশোরীদের থেকে শুরু করে বয়স্ক নরনারী বর্তমানে যৌন রোগে ব্যাপকভাবে ভুগছে। যৌন শিক্ষা এ দেশে Animality বা পশুত্বের জন্ম দিয়েছে সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। যার ফলে এক সময় আমেরিকায় যে 'গর্ভপাত' বেআইনী ছিল তা বর্তমানে আইনসঙ্গত করার চিন্তায় আমেরিকানরা চিন্তাক্লিষ্ট। একবিংশ শদাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়েছে মিউচ্যুয়েলে কনসেন্টে ব্যভিচারের অনুমোদন দানে। (দৈনিক সংগ্রাম, ৩১।৩।৮০) সমাজতত্ত্ববিদ Murry A. Straus বর্তমান আমেরিকার পারিবারিক চিত্র তুলে ধরেন এভাবে ঃ For any typical American citizen, rich or poor, the most dangerous place is home from slaps to murder" (Time, July, 1979, p. 43)

যৌন শিক্ষা ও নৈতিকতাবিহীন শিক্ষা পরিবেশের বিষময় ফলই হচ্ছে উক্ত পারিবারিক জীবন তথা জাতীয় জীবনে দুর্গতির কারণ।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিবিধ বৈষম্য

(ক) শহর, নগর ও গ্রামগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার উপকরণ, মান ও পদ্ধতি একই রকম নয়। ১৯৭২-এর ইউনেস্কোর এক রিপোর্টে দেখা যায় কিউবা, ইথিওপিয়া, ইরাক, জাপান, লাইবেরিয়া, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনে ৩০% নগরীতে, ৬৮% রাজধানীতে এবং ১২% গ্রাম পল্লীতে লেখাপড়ার জন্যে স্কুলে ভর্তি হয়ে থাকে। জর্দানে দেখা যায় ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা অতি নগণ্য। ২০০৫-এ গড়ে ২০% ভাগ ভর্তির হার বেড়েছে এসব দেশে।

www.pathagar.com

(খ) ধনী-দরিদ্র শ্রেণীভিত্তিতে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশ ধনী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়ার যে ধরনের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, দরিদ্র শ্রেণী সেইসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এমন কি ভগ্নদশা প্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার মত এককেন্দ্রিক শাসনতান্ত্রিক দেশও আজ পর্যন্ত এ বৈষম্য দূরীকরণে সমর্থ হয়নি।

(গ) অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ এ অবস্থার ভিত্তিতেও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বজুড়ে। জরীপ করে দেখা গেছে ইটালি, ভারত, বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবার তাদের ছেলেমেয়েদেরকে অল্প বয়সেই রোজগারের জন্য স্কুল ত্যাগ করাতে বাধ্য হচ্ছেন।

(ঘ) বর্ণ বৈষম্য ঃ বিংশ শতাব্দীর প্রস্থান হয়ে একবিংশ শতাব্দীর যাত্রা শুরু হলেও তথাকথিত সভ্য জগত আজও বর্ণ বৈষম্যবাদ বা Apartheid Policy-কে পরিহার করতে পারেনি। বরং সাদা চামড়া এবং কালো চামড়ার ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করে দু'রকমের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে কতিপয় রাষ্ট্র। এর ফলে শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে কতিপয় দেশে। ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুক্তরাষ্ট্র এ বর্ণ বৈষম্যবাদ থেকে আজও নিষ্কৃতি পায়নি। মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের সেই করুণ উক্তিটি এখানে লক্ষণীয় ঃ "I never realized I was black untill come to U.M.C." ১৭ বছরের অপর একজন কৃষ্ণ ছাত্র বর্ণবাদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করে বলেন ঃ 'I suppose the black man's struggle is eventually to gain equal standing in this predominantly white country without at the same time becoming a carbon copy of the white man."

—— Time : April 16, 1979, p. 104.

জীন টমাসের মত সার্বজনীন শিক্ষার পূজারীও তার World Problems in Education গ্রন্থে আফ্রিকাকে 'Black Africa' লেখা হতে নিবৃত্ত হতে পারেন নি। উল্লেখ্য, সাম্প্রদায়িকতার ফোড়ন ও বর্ণ বৈষম্যের আর একটি সূক্ষ্ম হাতিয়ার।

(ঙ) শিল্পায়নজনিত সমস্যা ঃ শিল্পায়িত দেশগুলোর মধ্যে বিশেষ করে জার্মানি, যুক্তরাজ্য শিক্ষার উপযোগিতা নির্ধারণে হিমশিত খাচ্ছে। এসব দেশের অধিকাংশ গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী কোন কাজ বা চাকরিতে সঠিকভাবে নিয়োজিত হতে পারছে না। কারণ তাদের শিক্ষা বা ডিগ্রী, জীবন ও

www.pathagar.com

পেশার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ধারণা ও সঠিক কর্মকুশলতা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। এ জন্য সম্প্রতি অনেক শিল্পোন্নত দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষা ব্যয় সংকট

১৯৬৮ সালে ফিলিপ এইচ. কোম্বস শিক্ষাখাতে উত্তরোত্তর ব্যয়-বৃদ্ধিতে যে আশংকা প্রকাশ করেছেন তা এখনো বিদ্যমান। তিনি বলেন "The rapid rise in the cost of education is the precursor of an impending crisis". যুক্তরাষ্ট্র অনুরূপ আশংকায় আক্রান্ত হয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছে যে ১ লক্ষ অভিজ্ঞ শিক্ষক এদেশে বেকার হয়ে পড়বে। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতেও এই সংকট আরো বৃদ্ধি পেয়েছে ভোগবাদী জীবন যাত্রার জন্যে।

কিউবা অনুরূপ আশংকা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে "Corss age tecahing" (বয়স্ক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্বল্প ও অশিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে শিক্ষাদান) পদ্ধতি চালু করেছে। কিউবা মন্দির, মসজিদ, গির্জাগুলোকেও বর্তমানে বিদ্যাপীঠ হিসেবে ব্যবহার করার নির্দেশ জারী করেছে। ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি এমনকি রাশিয়া বন্ধের দিনে বৈকালিক ক্লাস নেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে এবং শিক্ষকদেরকে part time ভাতা বা part time শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে ব্যয় সংকোচের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। সম্প্রতি ইংল্যান্ডে 'Open University" নামে এক বিশ্ববিদ্যালয় চালু করেছে স্নতকোত্তর ৭৫,০০০ অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দান হিসেবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার খরচ যুক্তরাজ্যের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা অনেক কম। সম্প্রতি বাংলাদেশেও দু'শিফটে শিক্ষা দান ও Open University-এর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, মুক, বধির, অন্ধ এবং প্রতিভাশালী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিশেষ শিক্ষা (specialized education) প্রদানের ক্ষেত্রেও যে অর্থনেতিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে তা সংকুচিত করার জন্যে আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং জার্মানি বর্তমানে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে চরমভাবে।

আধুনিক শিক্ষা দর্শনের পটভূমি (খ্রিঃ পূর্ব-৫০-৫০০ খ্রিষ্টাব্দ) ঃ

এবার শিক্ষা দর্শন প্রসঙ্গ

আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা দর্শন প্রাচীন গ্রিক ও রোম সভ্যতার জীবনবোধ ও শিল্পকলার দর্শনের ভিত্তিতে সৃষ্ট। প্রখ্যাত ইউরোপীয় শিক্ষাবিদ বেন মরিস ইতিহাসকে 'অভিজ্ঞতা' এবং শিক্ষাকে প্রখ্যাত মনীষীদের ধারাবাহিক 'অভিজ্ঞতা' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এ ব্যাখার অনুসরণেই গ্রিক ও রোম সভ্যতাকে বর্তমান বিশ্ব শিক্ষাদর্শনের মূল ও আদি ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

www.pathagar.com

গ্রিক শিক্ষা দর্শন

প্লেটোর 'রিপাবলিক', এরিষ্টটলের 'পলিটক্স' গ্রন্থদ্বয় গ্রিক শিক্ষা দর্শনের মূল উৎস। এ দুটি গ্রন্থেই 'রাজনীতি' ও 'শিক্ষার' উপর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গিসহ সামরিক শক্তিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক সৃষ্টিই হচ্ছে এ দুটি গ্রন্থের মূল লক্ষ্য। উভয় লেখকই ১. নাগরিকদেরকে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধকরণ. ২. শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে দৈহিক শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্পার্টারে ছেলেমেয়েদের সামরিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য কঠোর ট্রেনিং দেওয়া হত। এ কঠোরতা এমন নির্মম ও পাশবিক ছিল যে, সবল ও স্বাস্থ্যবান প্রমাণ করার জন্যে বলিষ্ঠ যুবকরা দুর্বল যুবকদেরকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারত। এথেন্সের দৃষ্টিভঙ্গিতেও শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যে ছিল প্রায় অনুরূপই। They treated education as a means to teach the art of defence and peace—শিক্ষাকে তারা দেশরক্ষা ও শান্তির উপায় হিসাবে গণ্য করত। (Lester Smith, Government of Education, U.S.A. 1968 দ্রঃ)

শুধু ধনী অভিজাত বংশের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পেত, আর দরিদ্র ও দাস সম্প্রদায়ের সন্তানদের জন্যে ছিল 'ব্যবসা ও কায়িক শ্রম' নির্দিষ্ট। ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ অর্থাৎ আলেকজান্ডারের জীবদ্দশা পর্যন্ত ছিল এথেন্সের এ চিত্র।

প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রিসকে সুন্দর, সুস্থ ও বলিষ্ঠ নাগরিক উপহার দেওয়ার জন্যে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদনের প্রথা রহিত করে দিয়ে নরনারীর অবাধ মেলামেশার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। যুক্তি হিসেবে দেখানো হয় যে, ভাল ও স্বাস্থ্যবান সন্তান উৎপাদনের জন্যে স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী নরনারীর যৌন মিলন অত্যাবশ্যক। "The best men must mingle most often with the best women and only the children of the best must be brought up .... if the flock is to be tip top." ফলে নিম্নমানের স্বাস্থ্য ও বিকলাঙ্গ সন্তানদের বেঁচে থাকার নৈতিক ও মানবিক অধিকার গ্রিসে আর থাকল না।

এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল ঃ

১. সুস্থ ও সবল নাগরিক প্রতিপালন এবং সংরক্ষণ;
২. উর্বর মস্তিষ্ক ও দেহবিশিষ্ট প্রশাসক শ্রেণী গঠন;
৩. শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গঠন।

প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল গুরুর মত-পথেরই সমর্থক ছিলেন। শুধু তফাৎ ছিল এটুকু যে, তিনি তার গুরুর মত শিক্ষাক্ষেত্রে Collectivism বা সামষ্টিক অপেক্ষা Individualism বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ওপর গুরুত্ব দিতেন অধিক।

www.pathagar.com

রোমীয় প্রভাব

গ্রিস বিজয়ের পর রোমানরা গ্রিক সভ্যতাকে নিজেদের সভ্যতায় আত্মস্থ করে নেয়। তারা গ্রিক দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে শরীর চর্চা, পৌরবিজ্ঞান, কাব্যালংকার ও দর্শনকে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সন্নিবেশ করে। গ্রিকদের মতো তারাও দৈহিক সৌন্দর্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে খেলাধুলা ও শরীর চর্চার বিশেষ প্রাধান্য দেয় শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে।

ফলাফল

গ্রিক-রোমীয় শিক্ষা দর্শন থেকে আমরা উত্তরসূরি হিসেবে যা পেয়েছি তা হলো ঃ

১. ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থা;
২. বৈবাহিক জীবনের সমাপ্তি ও নরনারীর অবাধ যৌন সম্ভোগের পথ নির্দেশনা;
৩. শরীর চর্চা নামক শিল্পের উলঙ্গ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা;
৪. দুর্বল, বিকলাঙ্গ মানুষের প্রতি নিষ্ঠুরতার দীক্ষা।

"Games, sports and physical exercise were encouraged to such an extent that stark naked athlets– male and female, exhibited their persons to the audience sitting in the stadiums." [Islam and Modernism– Mariam Jamila দ্রষ্টব্য]

প্লেটো ও এরিস্টটলের দর্শন এমনিভাবে সামাজিক ও জাতীয় জীবনের শালীনতা ও নীতিবোধের যবনিকাপাত ঘটাল মানব জীবনের শিক্ষাঙ্গনে। এ দু'দার্শনিকের পথ মাড়িয়ে আরও এক ধাপ অগ্রসর হলেন টায়ারের রোমন দার্শনিক Maximus । তিনি জন্ম দিলেন নাস্তিক্যবাদের এই বলে যে, 'গড' যদি সত্যিই সর্বশক্তিমান ও অদ্বিতীয় ইচ্ছাসম্পন্ন সত্তা হবেন তবে তার উপাসনা নিছক বাতুলতা। আসলে "We pray to God only because we have made Him in our own image."— আমরা গডের আরাধনা করি কারণ তিনি আমাদের কল্পনাপ্রসূত সত্তা মাত্র।

[–The Portable Voltuire, Viking Press N. Y. 1947 দ্রষ্টব্য]].

মধ্যযুগ (৫০০–১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)

এ যুগটিকে গির্জার শাসনামল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পথ বেয়ে গীর্জার প্রাধান্য প্রতিমূর্ত হয়ে ওঠে তদানীন্তন ইউরোপে। গীর্জা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন, "The blood of the maryrs is the seed of the Church"— শহীদানের খুন থেকেই গির্জার জন্ম। রাষ্ট্র থেকে

www.pathagar.com

শিক্ষার দায়িত্বভার গির্জা তখন থেকে কেড়ে নিল নিজ দায়িত্বে। গ্রিক-রোম সভ্যতার ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাকে গির্জা কর্তৃপক্ষ "Pagan culture and education": বর্বর শিক্ষা-সংস্কৃতি হিসেবে বিরচিত দেখল। তাই তারা এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূর্ণভাবে ঢালাই করার জন্যে 'বাইবেল ও গসপেলকে' সন্নিবেশ করে শিক্ষাকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করল; ধর্মীয় শিক্ষা ও পার্থিব শিক্ষা আখ্যানে। মহামতি কন্‌সটেইনটাইন ঈমান, ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষার দায়িত্বভার অর্পণ করলেন গীর্জার হাতে, আর রাষ্ট্রের কাছে রাখলেন, পেশাগতও পার্থিব শিক্ষার বিষয়বস্তু। এ ছিল ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কথা যা মধ্যযুগে গির্জার আধিপত্যে নবোদ্যম ও নব আংগিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রেনেসাঁর যুগ (১৪৮৫-১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ)

রেনেসাঁর মাতৃভূমি ইটালি। এখান থেকেই গোটা ইউরোপ মহাদেশেও জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে দেশ আবিষ্কার, কলকব্জা, বিজ্ঞান ও শিল্প-কারখানার উপায় উদ্ভাবনে। এসব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে মানুষ যুক্তি, মুক্ত বুদ্ধি ও গবেষণার উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে, আর অপরদিকে মানুষের কর্মজীবন নিয়ন্ত্রণে গির্জার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্ষয়িষ্ণু রূপ ধারণ করে। এক্ষেত্রে প্রধান ও সক্রিয় ভূমিকা নেন জার্মানির প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারক মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬)। তিনি সংস্কার আন্দোলন বা Reformation Movement - এর নেতৃত্ব দিয়ে গির্জার আধিপত্যকে সমাজ থেকে খর্ব করেন এবং গির্জাকে রাষ্ট্রের অধীনস্থ করে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের জন্ম দেন। W.O. Leister Smith এ পরিবর্তনের কথাটির বর্ণনা দেন এই বলে যে, "Writers turned to exmine the qualities of Religion to find reason and reality of it in life." ধর্ম তথা ধর্মীয় শিক্ষা মানব জীবনের প্রয়োজন কতটুকু মেটাতে পারে—এটি তখন তর্কবির্তকের বিষয় হয়ে দাঁড়াল শিক্ষাবিদ ও বৈজ্ঞানিকদের কাছে। ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১–১৬২৫) এক গ্রন্থ লিখলেন "The New Atlanties নামে, যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বিজ্ঞানকে গির্জার বিরুদ্ধে অস্ত্রাগার (Arsenal) হিসেবে ব্যবহার করার শিক্ষা প্রদান। বৈজ্ঞানিক ডিকার্টে আর একটু অগ্রসর হয়ে মানুষকে "a mere matter of automatic chemical reaction" প্রমাণিত করার প্রয়াস পেয়েছেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। এরপর নিউটন এলেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করতে চাইলেন যে 'ধর্মীয় বিশ্বাস' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংঘর্ষমুখী ও শত্রুভাবাপন্ন। সুতরাং ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠানের কুসংস্কার থেকে শিক্ষাঙ্গনকে পবিত্র রাখা উচিত।

www.pathagar.com

রেনেসাঁ যুগের অন্যান্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক—হিউম, ডিজোরিয়েট, রুশো, প্রমুখ তাঁদের পূর্বসুরির মত-পথের অনুসরণ করে এ শিক্ষাই দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, মানুষ 'বস্তুসর্বস্ব জীবসত্তা মাত্র'। আত্মা ও নৈতিকতাকে তারা নির্বাসিত করার চেষ্টা চালালেন মানব অস্তিত্ব থেকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) এক নতুন মতবাদের জন্ম দেন। তিনি বিবর্তনবাদের মাধ্যমে মানুষকে নিকৃষ্ট জীবের উন্নত সংস্করণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। তাঁর এ মতবাদ সততা-সাধুতা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলির চিরন্তন দৃষ্টিভঙ্গিতে আনে এক অদ্ভুত বিচার বিশ্লেষণের ধারা। কারণ ডারউইনের মতে মানুষ হচ্ছে একটি প্রকৃতিজাত প্রাণী (Product of Nature), যাকে অস্তিত্বের তাগিদে সংগ্রাম করে বিশ্বে টিকে থাকতে হচ্ছে। অন্য কথায় "Might is Right"- (not justice is right) অথবা Survival of the fittest is the law of nature" : এটিই হচ্ছে মানব জীবনের রক্ষাকবচ।

এরপর আবির্ভূত হলেন ফ্রয়েড। ডারউইন মানুষকে জানোয়ারের অধস্তন হিসেবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস পেয়েছেন, আর ফ্রয়েড তাকে জানোয়ারের অধস্তন হিসেবেই আর এক ধাপ এগিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন যে, মানুষ 'compulsive drives' বা যৌন আবেগসর্বস্ব প্রাণী বিশেষ। ফ্রয়েডের এ ব্যাখ্যা তাঁর Liben and Arbeitan"-Love and Work দর্শনে বিবৃত হয়েছে।

ফ্রয়েডের এ দর্শনকে কেন্দ্র করে আধুনিক শিক্ষিত সমাজ যৌনাঙ্গকে নিয়ে এক বিপাকে পড়েছেন ব্যক্তি হতে সামষ্টিকজীবন পর্যন্ত। আর এ বিপাক থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আরও বিপদ টেনে এনেছেন যৌনশিক্ষা নামীয় একটি বিষয় শিক্ষাঙ্গনে অর্বাচীন ভাবে প্রবেশ করিয়ে। সুফল বর্তমানে এই দাঁড়িয়েছে যে গণজীবনে যৌনাঙ্গ ও যৌন বিজ্ঞান চর্চা আজ প্রাইভেসি বা অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়ে যৌন-চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছে। ফলে অবাধ যৌনাচার সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠাপোষকতায় (!) জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ব্যাপকভাবে। ফলে মরণ-ব্যধি AIDS বিশ্বের ৬৫০ কোটি মানুষের মাঝে অন্যূন ১৫০ কোটির সহচর হওয়া সত্ত্বেও যৌনাচার প্রশমিত ও নিয়ন্ত্রিত ত হয়নি বরং এর ব্যর্থতা বৃদ্ধি পেয়েছে কার্যকরী ভাবে।

সবশেষে কার্ল মার্কস সম্পর্কে দুটো কথা বলা প্রয়োজন। কারণ তিনি বর্তমান বিশ্বের মৃত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সবচাইতে অপসৃয়মান অথচ প্রভাবশালী সত্তা। বর্তমান সভ্যতার অদ্যাবধি শেষ প্রলেপটি তাঁরই হাতের; অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতার অন্যতম জনক হিসেবে তিনিই সর্বাধিক বরেণ্য। তিনি 'দাস

www.pathagar.com

ক্যাপিটাল'-এ মানব সমাজকে ইতিহাস ও সংস্কৃতির অর্থনৈতিক কার্যকরণের 'ফল' হিসেবে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ মানুষ হচ্ছে প্রধানত 'অর্থনৈতিক জীব'। তাঁর এই দর্শনের ফলেই বর্তমান শিক্ষাবিদদের অনেকেই শিক্ষাকে "economic investment" ও "Job oriented" পদ্ধতি হিসেবে চালু করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। সবশেষে Sir Cyril Nor Wood-এর একটি উদ্ধৃতি। তিনি ইংল্যান্ডে রেনেসাঁ ও সংস্কারের সামগ্রিক পরিণাম সম্পর্কে বলেন ঃ The Renaissance and Reformation were both disintegrating influences......... It was the reformation which in this country dealt the hardest blow to education. It broke up the unity of the nation. (The English Tradition of Education. Murry, 1929, p. 13.) স্যার সাইরেল এ মন্তব্য যদিও শুধু লন্ডনের জন্য করেছেন, এ মন্তব্যের প্রতিধ্বনি আজ গোটা বিশ্বজুড়েই অনুরণিত হচ্ছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

দুটি মহাযুদ্ধের প্রভাব ঃ

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসক্রিয়া শিক্ষার উপর এক নব চেতনার সঞ্চার করে। এ যুদ্ধ দুটো মহাশক্তি হিসেবে শিক্ষার উপকরণ ও দর্শনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। স্যার উইনস্টন চার্চিলের কথায়, "The future of the world is to the highly educated races."- বিশ্বের ভবিষ্যৎ উচ্চ শিক্ষিত মানব গোষ্ঠীর উপর ন্যাস্ত।

মিত্র শক্তি—ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, তাদের পরাভূত শক্তির বিশেষ করে জার্মানীর সামরিক শক্তি ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানির দোর্দণ্ড প্রতাপের অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে পেল, G.M. Travelyan-এর কথায়, 'She (Germany) attributed her success to the school master as well as to the drill sergeant."

ফলে এ দুটো মহাযুদ্ধের পর শিক্ষাকে সামরিক সজ্জায় সুসজ্জিত করার নবতর প্রবণতা দেখা গেল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায়। জার্মানি ও ইটালির স্কুলভিত্তিক সামরিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের পদ্ধতি পাশ্চাত্য ইউরোপ গ্রহণ করতে শিখল। দ্বিতীয়ত, এ যুদ্ধ দুটোর আর একটি অবদান হচ্ছে এই যে শিক্ষার রূপরেখা ও উদ্দেশ্যকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রণয়ন করার বিশ্বব্যাপী তীব্র আকাঙ্খা। ফলে শিক্ষা সবার জন্যেঃ Education for all— অথবা Every man has right to take education -এর ভিত্তিতে গোটা বিশ্বে একটি অখন্ড মানব সমাজ সৃষ্টি করে প্রত্যেক রাষ্ট্রের পারস্পরিক দেয়া-নেয়ার (Give and Take) ভিত্তিতে চলার স্বপ্নটি ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

সামরিকদর্শন পুষ্ট জাতীয়তাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই সম্প্রতি একটি যুদ্ধংদেহী ক্ষুদ্র শিবিরে পরিণত হয়েছে। পারস্পরিক অনাস্থা ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে বর্তমান আন্তর্জাতিক বিশ্ব ওৎ পেতে রয়েছে একটি বিরাট বিপর্যয়কে স্বাগতম জানাতে। এই অত্যাসন্ন বিপর্যয় বিলম্বিত হচ্ছে পরাশক্তি গুলোর পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক অস্ত্রসজ্জার বিরচিত অবিশ্বাস ও এর ভিত্তিতে Balance of Peace নয় বরং Balance of Terrorএর মহিমায়।

সহ-শিক্ষা প্রসংগ ঃ

আধুনিক শিক্ষার মান বিনষ্ট ও বিকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে সহ-শিক্ষার মারাত্মক ভূমিকাটিও এক্ষেত্রে বিচার্য। তাই 'সহ-শিক্ষা' সম্পর্কে অন্ততপক্ষে সামান্যটুকু হলেও আলোচনা অপরিহার্য।

শিল্প বিপ্লব ও প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানব সভ্যতার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের নৈতিকতা ও মূল্যবোধে অবক্ষয় ও বিকৃতি ঘটতে থাকে। শিল্প বিপ্লবে হয়েছে 'বস্তুতান্ত্রিকতার' প্রকট বিকাশ এবং দুটো মহাযুদ্ধোত্তরকালে ঘটেছে নারী সম্ভ্রম ও শালীনতার' চরম বিপর্যয়। যুদ্ধে অনেক পুরুষ 'যোদ্ধা' হিসেবে মৃত্যুবরণ করায় নারী সমাজের বিরট অংশ অসহায় হয়ে পড়ে। চরিত্র হননের শিকার হয়ে পড়ে তারা অনেকেই। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বীভৎস বেশ্যাবৃত্তির জন্ম হয় সেই সময়েই। জীবিকা ও সতীত্বের প্রশ্নে নারীকুলের মাঝে সংশয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এ অবস্থা হতে পরিত্রাণের জন্যে নারীর 'শিক্ষা' ও 'চাকরি' হয়ে ওঠে তীব্রভাবে অত্যাবশ্যক। এই দৃষ্টিতে নারী শিক্ষার বিকাশ ঘটতে থাকে প্রথমত শম্বুক গতিতে। কালে নারী শিক্ষার অধিকতর প্রসারণে জন্ম হয় সহশিক্ষার যা অনেক ক্ষেত্রে জন্ম দিয়েছে Aristocratic Prostitution শিল্পের।

বিশ্বকোষের আলোকে দেখা যায় ১৮০০ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত নারী শিক্ষার প্রতি জনগণের বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল। পরে 'লাঞ্চ' বা মধ্যাহ্ন ভোজন এবং স্কুল ছুটির পর মেয়েদেরকে শিক্ষাদানের সামাজিক প্রথা অনুসরণের মাধ্যমে সহ-শিক্ষার প্রচলন কায়েম হতে থাকে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে যুবকদের সাথে যুবতীদের কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান সর্বপ্রথম ওবারলিন কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান ছেলেদেরকে তিনজন মহিলাসহ সহ-শিক্ষার মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করে। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে এর প্রতিটি বিভাগে সহ-শিক্ষার রীতি প্রবর্তন করে। সেই থেকে সহ-শিক্ষা গোটা যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক স্তর হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত 'মড়কের' মত ছড়িয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

গির্জা নিয়ন্ত্রিত এবং কতিপয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সহ-শিক্ষাগার। এবার ইউরোপের চিত্রটি।

অতীতে ইউরোপে সহ-শিক্ষাকে ঐতিহ্য বিরোধী বলে মনে করা হতো। মার্টিন লুথারের (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রিঃ) আবির্ভাবের পূর্বপর্যন্ত কতিপয় প্রটেস্টান্ট ছাড়া সবাই নারী শিক্ষা বিরোধী ছিলেন। মার্টিন লুথার ও তাঁর সমর্থকগণ 'বাইবেল' শিক্ষাকে ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্যে উন্মুক্ত রাখার আহ্বান জানালে ইউরোপে সহ-শিক্ষার উন্মেষ ঘটতে থাকে। প্রথম স্কটল্যান্ড ও পরে ইংল্যান্ডে এর প্রসার ঘটে। ইংল্যান্ডের উপনিবেশে প্রতিষ্ঠিত Dame School ও পরে ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "The Society of Friends" বিশ্বব্যাপী সহ-শিক্ষা প্রচলনের অগ্রদূত হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাবধি সহ-শিক্ষা বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে অতীব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্তমানে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দী শেষ দশকেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৭০% কলেজ সহ-শিক্ষাগার হিসেবে খ্যাতি (?) অর্জন করে। বর্তমানে অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৮০% কলেজ সহ-শিক্ষাগার হিসেবে সমাদৃত! এর প্রভাব ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে পশ্চিম ইউরোপে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত সহ-শিক্ষা মোটামুটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সীমিত ছিল। সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক অবস্থার মত গুটি কয়েক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে সহ-শিক্ষা চালু ছিল। লক্ষণীয়, জার্মানিতেও সে সময় সহশিক্ষা ছিল না; বরং সেখানে মেয়েদের জন্যে পৃথক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

[Encyclopaedia Britannica, Micropaedia, Vol.II, Ed. 1982 P. 1033]

অক্সফোর্ড জুনিয়ার এনসাইক্লোপেডিয়ায় 'সহ-শিক্ষা' সম্পর্কে আরও কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যায়। এতে Co-education-কে "relatively modern" বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই গ্রন্থে বলা হয় যে, যদিও অধিকাংশের মতে সহ-শিক্ষা সমর্থনযোগ্য, তবু এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা "suitable for children until they are about 10". ১০ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষার জন্য উপযোগী বলে এতে মন্তব্য করা হয়। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে ১৯২০ ও ১৯৪৭ সালের মধ্যে সহ-শিক্ষাকে অনুমোদন করা হয়। বর্তমানে এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুমানিক ৬৫% ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রয়টার পরিবেশিত এক সংবাদে বলা হয় যে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রী Sex-harassment-এর বিনিময়ে ডিগ্রী পাচ্ছে।

www.pathagar.com

লক্ষণীয়, সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে জীবন যাত্রাও জটিল রূপ নিতে থাকে। এই জটিলতা মানুষের আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক জগতেও বিপুল পরিবর্তন আনয়ন করে। মহিলা সম্প্রদায় আধুনিক জীবন যাপনের প্রেক্ষাপটে 'শিক্ষা'কে জীবন যাপনের অপরিহার্য সম্পদ হিসাবে অর্জন করতে বাধ্য হতে থাকে।

যাহোক, কালক্রমে সহ-শিক্ষা সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অনেকের মতে যৌবন বয়সে সহ-শিক্ষা বিপজ্জনক। একই শ্রেণীতে পাঠদানের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মানসিকতায় যৌন সংক্রান্ত চেতনা-যাতনা, ব্যর্থতা-বিস্বাদ ও অবাঞ্ছিত যৌনাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে বলে তাঁরা মন্তব্য করেন।

বিপরীত পক্ষের সুধীবর্গের (!) মন্তব্য হচ্ছে এই যে, সহ-শিক্ষা প্রবর্তনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্দীপনা (stimulus) ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ৯৭% ভাগ সহ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী বলে জানা যায়। রাশিয়ায় সহশিক্ষার প্রসার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তর ইউরোপের প্রটেস্ট্যান্ট দেশগুলো 'সহ-শিক্ষা'র পক্ষে অভিমত দিয়েছে ও দক্ষিণ ইউরোপের ক্যাথলিক প্রভাবিত দেশগুলো পৃথক শিক্ষা চালু রাখার প্রয়াস পাচ্ছে।

সহ-শিক্ষার পরিণতি

সম্প্রতি সহ-শিক্ষা যৌন অনাচার ও নারী নির্যাতনের একটি অদম্য ও মোক্ষম উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের অমুসলিম সমাজ, বিশেষ করে খ্রিস্টান সমাজে এর করুণ পরিণতি গোটা মানব সভ্যতার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। অতীতের কিছু সংশ্লিষ্ট তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো।

প্রথমত যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরা যাক। যে যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৯৭ জন ছাত্র-ছাত্রী সহ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ে, সেই যুক্তরাষ্ট্র সহ-শিক্ষার ভালমন্দ যাচাইয়ের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত বৈ কি!

'Sex in America' Statistical গ্রন্থের রিপোর্টটি এখানে লক্ষণীয়। এই রিপোর্টে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যভিচারের যে চিত্রটি দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

প্রতিষ্ঠান	বিয়ের পূর্বে কুমারীত্ব-হারা ছাত্রীর শতকরা হার	ছাত্রদের ব্যভিচারের হার	সাল
কলেজ	৩৫	৫০	১৯২৯
	৩৭	৬১	১৯৩৭
	৫০	৬৭	১৯৫৩

[উৎস ঃ Sex in America, Corgi Books, London, 1984, PP 18-19]

এই গ্রন্থে আরও উল্লেখ করা হয় যে, আমেরিকায় কোন কোন কলেজে ছাত্রীদেরকে শ্রেণীকক্ষেই ছাত্রদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে দেখা যায়। [P.23]

www.pathagar.com

Sex in America গ্রন্থের আর একটি দৃষ্টান্ত। আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নিয়ম করা হয়েছে যে বিকেলে ৪টা হতে ৭টা এবং শুক্র ও শনিবার রাত ১টা পর্যন্ত ছাত্ররা মেয়েদেরকে ভোগ করার জন্যে হোস্টেলে নিয়ে যেতে পারবে।

১৯২৬ সালে প্রকাশিত নিউইয়র্কের এক রিপোর্টে কর্নেল মার্গারেট যে তথ্য প্রকাশ করেন তাতেও দেখা যায় ১৬ বছর গড়-বয়স সম্পন্ন স্কুল ছাত্রীদের ৪২% ভাগ ক্লিনিকে গর্ভপাত করার জন্য আসছে। ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে এদের অনেককে গর্ভবতী হতে দেখা যায়। তিনি আরও প্রকাশ করেন যে, স্কুলে অধ্যয়নরত অবস্থায় ৩০ জন ছাত্রী যৌন অনাচার এবং ৪৫% স্কুল ত্যাগের পর কুমারীত্ব হারায়। এদের মধ্যে মাত্র ৫% জন গর্ভধারণ করে; আর বাদ-বাকি গর্ভরোধক সরঞ্জামাদি ব্যবহারে গর্ভ নিরোধ করে থাকে।

২২-৭-১৯৬৮ তারিখের দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ডঃ আব্দুল কাদের উল্লেখ করেন ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫৯% ছাত্র ও ৪০ % ছাত্রী বিয়ের পূর্বেই যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হয়।

এ তো গেল যুক্তরাষ্ট্রের কথা। এবার ব্রিটেনের অবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। উক্ত জনাব আবদুল কাদের সাহেবের পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী ব্রিটেনে ৭৫% ছাত্র ও ৬৩ % ছাত্রী চরিত্র হনন করে থাকে।

[Dainik Pakistan: 22-7-1964]

অনুরূপভাবে Pakistan Observer-এর পরিবেশিত তথ্যে দেখা যায় বৃটেনের ৮০% হাই স্কুলের ছাত্রী গর্ভনিরোধক ওষুধ সাথে রাখে।

[Pakistan Observer: 1. 10.71]

নরওয়ে ও জার্মানির অবস্থা তথৈবচ। নরওয়েতে ৫৪% জন ছাত্রী; জার্মানিতে ৫৫% জন ছাত্র ও শতকরা ৯৯% জন ছাত্রী বিয়ের পূর্বেই যৌন স্বাদ ভোগ করে থাকে। [দৈনিক পাকিস্তান ঃ ২২-৭-৬৪]

এশিয়ার ফিলিপাইনেও এর মহড়া হচ্ছে। ম্যানিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হোস্টেল পরিদর্শন করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কোন এক কক্ষে জনৈক ছাত্রকে যৌনাচারে লিপ্ত দেখতে পান। [দৈনিক সংগ্রাম ৬-৫-৭৭]

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী নির্যাতনের ইদানিংকালের একটি বীভৎস রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসংগের ইতি টানা হলো। তা' হচ্ছে লন্ডন ভিত্তিক প্যানাস ইনস্টিটিউটের সর্বশেষ রিপোর্ট যা সংক্ষেপে এইঃ

যৌন সহিংসা ১৫ থেকে ৪৪ বছর বয়েসী মহিলাদের অসুস্থতা ও মৃত্যুর দিক দিয়ে ক্যান্সারের সমান ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। ম্যালেরিয়া ও সড়ক দুর্ঘটনা মিলে যতজন অসুস্থ ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যৌন সহিংসতায় ঐ বয়েসী মহিলা

www.pathagar.com

অসুস্থতা ও মৃত্যুর শিকার হচ্ছে তার চেয়েও বেশি। স্কুল থেকে শুরু করে ভার্সিটি পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও মেয়েরা এজাতীয় সহিংসতার সম্মুখীন। অথচ সেখানে তাদের নিরাপদ থাকার কথা। প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের যৌন সহিংসতা অবশ্যই দূর করতে হবে। কারণ প্রথমতঃ এটা মানবাধিকারের লংঘন। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং রাষ্ট্রীয় আইনে এই সহিংসতার নিন্দা জানানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যৌন সহিংসতা মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। তারা অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ এবং এইচ আই ভিসহ যৌন বাহিত রোগের শিকার হয়। তৃতীয়তঃ যৌন সহিংসতা বা হয়রানি মেয়েদের শিক্ষার অধিকারকে ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন করে। কারণ, এহেন অবস্থায় তারা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে। রিপোর্টে এই সংকট মোকাবেলার বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে জানানো হয়; যেমন: ব্রিটেনে নতুন আইন প্রণীত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ চলছে, তানজানিয়ায় স্কুল ছাত্রীদের অভিভাবকদের জন্য কর্মসূচি নেয়া হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে মাস্তানি বিরোধী কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। নাইজেরিয়ায় যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার নাম 'নারীর ক্ষমতা'। বলিভিয়া, ভেনিজুয়েলা ও শ্রীলঙ্কায় সন্ত্রাস ও নারী-পুরুষ বৈষম্যের বিষয়ে ওয়ার্কসপ হচ্ছে। জিম্বাবুইয়ে ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে। উগান্ডায় জোর দেয়া হচ্ছে কম্যুনিটি পর্যায়ে আলোচনার ওপর।

বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যায়, মহিলাদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা উন্নত ও অনুন্নত নির্বিশেষে বহু দেশেই ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।

ব্রিটেনে সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, ছেলেদের ৫০ শতাংশ এবং মেয়েদের ৩৩ শতাংশ মনে করে যে, বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে কোন মহিলাকে আঘাত করা কিংবা তাকে যৌনকর্মে বাধ্য করা ন্যায়সঙ্গত।

এদিকে ফ্রান্সে তরুণ কর্তৃক তরুণীদের গণধর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকায় সে দেশের মন্ত্রীরা শপথ নিয়েছেন, "আমরা স্কুলগুলোতে যৌন সহিংসতার অবসান ঘটাবোই।"

নিউজিল্যান্ডে ২১/২২ বছর বয়সী ৪৫৮ জন মহিলার ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা যায়, ১৩ বছর না হতেই যারা পুরুষের সাথে যৌন কর্ম করেছে, তাদের এক-চতুর্থাংশ বলেছে, এটা করতে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে।

ক্যারিবিয়ানে ৯টি দেশের পরিচালিত জরিপে জানা যায়, ১০-১৮ বছর বয়সী মেয়েদের ৪৭ দশমিক ৬ শতাংশকে যৌন মিলনে বাধ্য করা হয়েছে। ২০টি দেশের জরিপে দেখা যায় ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশুরা তিনগুণ পর্যন্ত বেশি যৌন সহিংসতার শিকার। রিপোর্টটির অপর একটি দিক হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

"দারিদ্র্যের কারণেই স্বামী স্ত্রীর ওপর নির্যাতন চালায়"- এই ধারণা সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার জরিপ থেকে দেখা যায় সে দেশের সর্বাপেক্ষা দরিদ্র পরিবারগুলোতে স্ত্রী কোন উপার্জন না করলেও সহিংসতার শিকার হয় খুব কম। এসব পরিবারের আয়-রোজগার নিয়ে ঝগড়া-ঝাটিও তেমন হয় না। নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণার ফলাফলের উদ্ধৃতি দিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে কিছু সমাজে নারীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস-সহিংসতার ঘটনা খুবই বিরল। আর এ ধরনের আচরণকে সামাজিকভাবে অত্যন্ত গর্হিত বলে বিবেচনা করা হয়। গবেষকরা দেখেছেন, যেসব সমাজ এখনো শিকারের ওপর জীবিকা নির্ভরশীল, তাদেরকে পশ্চাদপদ মনে করা হলেও বউ পেটানো ওদের মাঝে নিষিদ্ধ। এসব সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ক মহৎ ও উদার এবং সমাজে নারীর অবদানকে স্বীকার করা হয়।

পাপুয়া নিউগিনিতে নারীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস-সহিংসতা খুব বেশী। কিন্তু সেখানকার 'আদিম জনগোষ্ঠী নারী-পুরুষ, কারো প্রতিই আক্রমণাত্মক আচরণকে সহ্য করে না।' একই মনোভাব দেখা যায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে এবং আফ্রিকার আদিম মানুষের সমাজেও।

[সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম, মে ২৯, ২০০৩]

এসব অশ্লীল চিত্রের কলেবর বৃদ্ধির বোধ করি আর প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা দর্শন মানুষকে rational animal হিসেবে চিহ্নিত করে মানুষের Moralityt-কে নিখোঁজ করে দিয়েছে। আর এরই ফলে আজ কিশোর ও তরুণসমাজের এ অধোগতি। সহ-শিক্ষার জোয়ার মানুষের নৈতিক চরিত্র ও শালীনতাকে এমনভাবে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে যে, মানুষ এখন পশুত্বকে শিক্ষাঙ্গনে চরিতার্থ করার জন্যে কোনরূপ নৈতিক বা বিবেকের তাড়নাটুকু পর্যন্ত অনুভব করছে না। ধীরে ধীরে Sex এখন সর্বস্তরে পাঠক্রমের আওতাভুক্ত হয়ে বল্গাহীন যৌনাচারকে পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গনের পূতপবিত্রতা বিনষ্টকারক হিসেবে চিহ্নিত করতে অপরাগ হয়ে পড়েছে। অন্যকথায় তথাকথিত আধুনিক সহ-শিক্ষা পরিবেশের মাধ্যমে প্রতিটি তরুণ-তরুণী সম্প্রতি আচরণে চতুষ্পদ জানোয়ারে পরিণত হচ্ছে। এটাই সহ-শিক্ষার ক্রেডিট!

ইসলামের দৃষ্টিতে সহ-শিক্ষা ঃ

ইসলামে জ্ঞানার্জন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ফরয। এই ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে আল-কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানার্জনকে বোঝান হয়েছে। কারণ এ জ্ঞানই মানুষকে মনুষত্ব পদবাচ্যে উন্নীত ও সংরক্ষণ করতে পারে। এই জ্ঞানের ভিত্তিতে বয়স ও প্রবণতার তারতম্য অনুযায়ী পেশাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা প্রত্যেক নর-নারীর শিক্ষা করার তাগিদও রয়েছে। আর 'ফরয' শিক্ষাসহ যাবতীয় জাগতিক জ্ঞান অর্জনে পর্দা সংরক্ষণ ইসলাম

www.pathagar.com

অত্যাবশ্যক করে দিয়েছে। কারণ মানব সভ্যতার সুস্থ ও পবিত্র বিকাশ এবং সমৃদ্ধি নরনারীর সঠিক নৈতিক সম্পর্ক ও চারিত্রিক শালীনতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

ইসলাম নর-নারীকে অবাধে চলাফেরার অনুমতি দেয় নি। পুরুষকে কঠোর পরিশ্রম করার এবং নারীকে কোমল কাজকর্ম করার নির্দেশ দিয়েছে। প্রকৃতির চন্দ্র-সূর্যের মত নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র ও শোভা-সৌন্দর্য পৃথক। পুরুষ জনক, পিতা। নারী জননী, মাতা। প্রকৃতির এ শাশ্বত বিধান অমান্য করা মানব সভ্যতার ধ্বংসের নামান্তর। তাই পাক কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

১. নারী-পুরুষকে দৃষ্টি সংযত রাখতে ও দৃষ্টি বিনিময় বন্ধ রাখতে।
(কুরআন ৩০ঃ৩১)।
২. নারী যেন তার সৌন্দর্য পরপুরুষকে না দেখায়। (সূরা নূর ঃ ১)।
৩. নারীদেরকে শালীনতা রক্ষাকারী পোশাক ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
(সূরা নূর ঃ ৩১)
৪. নারী-পুরুষকে ব্যভিচারের কাছে না যেতে সাবধান করা হয়েছে।
(বনী ইসরাইল ঃ ৩২)

রাসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ (স) পুরুষদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ তোমরা (অবৈধভাবে) নারীদের নিকট যেও না। (বুখারী, মুসলিম)। তিনি নারীকে 'আওরাত' বা আবরণীয় বস্তু বলে আখ্যায়িত করেছেন।

[১. সূত্র ঃ ইসলামের ডাক ঃ প্রকাশনায় ঢাকাস্থ লিবিয়া আরব জমাহিরিয়া ১ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, গণ-বুরো, গুলশান, ঢাকা। জুন, ১৯৮৪, পৃঃ ১৯-২১।]

বিবি আয়েশা (রা) নারী-পুরুষ উভয়কে হাদীস শিক্ষা দিতেন। পর্দার আড়ালে থেকে তিনি পুরুষদেরকে হাদীস ও এর ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। এ থেকে বোঝা যায় নারী 'ছাত্রী' ও 'শিক্ষিকা' উভয়ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অংশ নিতে পারে। তবে পুরুষদের সাথে তাদের শিক্ষাক্রমে পর্দা অপরিহার্য। পর্দাবিহীন 'সহ-শিক্ষার' পরিণাম আজ এ সত্যটি স্বচ্ছ করে তুলেছে যে, 'বেপর্দা-ই' প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার ধ্বংসাত্মক সোপান, আর পর্দা এর প্রগতি। পর্দা প্রথা হচ্ছে প্রকৃত সভ্যতার ধারক-বাহক ও পরিপোষক। লক্ষণীয়, শিক্ষাঙ্গনের মত পবিত্র স্থানে যখন সহ-শিক্ষা তথা ছাত্র-ছাত্রীদের পবিত্র জ্ঞান অর্জনের পরিবেশে যৌন ব্যভিচারের এই বীভৎস রূপ, তখন সমাজে অন্যত্র নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাসহ গোপনে কি পরিমাণ বীভৎস পরিবেশই না সৃষ্টি করে যাচ্ছে, তা সহজেই অনুমেয়।

www.pathagar.com

এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নৈতিক পরিবেশ, বিশেষ করে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী ধর্ষণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ সুস্থ ও শালীন রাখার জন্যে সহ-শিক্ষা সম্পর্কে কি ধরনের পদক্ষেপ অপরিহার্য, তা আর ব্যাখ্যা করে দেখানোর অপেক্ষা রাখে বলে মনে হয় না।

আধুনিক শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিতে শিক্ষা ঃ

সহ-শিক্ষা স্বরূপ উদ্ঘাটনের পর এখন বিশ্বজোড়া প্রচলিত শিক্ষা এবং এর ওপর বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও চিন্তাশীল মনীষীগণের অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। প্লেটো হতে আরম্ভ করে কার্ল মার্কস পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষীর চিন্তা ও দর্শনের সমষ্টি হচ্ছে 'আধুনিক শিক্ষার জন্ম ও প্রসার' এবং এ বিষয়ে যাদের অভিমত ও মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে, তাঁরাও এ বিংশ শতাব্দীরই সন্তান। অতএব তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিকতার যথেষ্ট মূল্য ও প্রভাব রয়েছে আজকের বিশ্বের শিক্ষার স্বরূপটি বুঝবার ও হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে।

১. অধ্যাপক জন ভেজারী 'Education in the Modern World' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে ঐশী জ্ঞান (Revealed knowledge) ও লব্ধ জ্ঞানে (Acquired knowledge) কোন তফাৎ নেই। তাঁর মতে বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান হচ্ছে পণ্ডিতপ্রবরদের সাধনার ফল মাত্র।

২. অধ্যাপক পিটার মনে করেন, জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। মানুষ নিজে এর (জীবনের) ওপর উদ্দেশ্যের ছাপ এঁকে দেয়। শিক্ষাই অবিনশ্বরতার (eternity) স্পর্শ অনুভব করে এবং এরই ফলে মানুষ কৃচ্ছ্র সাধনা করে সম্মানিত হয়, পাশবিক আনন্দভোগকে উন্নতমানের জীবনবোধে রূপায়িত করে। (Education as Imitation, University of London, 1964. p. 41)

অন্য কথায় পিটার সাহেবও জন ভেজারীর ন্যায় ঐশ্বরিক জ্ঞানকে স্বীকৃতি দানে বিরত রয়েছেন। তিনি 'জীবনকে' একটি উদ্দেশ্যবিহীন জীব হিসেবে চিত্রায়িত করে 'মানব' আর 'মানব জীবনের' হেঁয়ালী রচনা করেছেনে। ইটারনিটি সম্পর্কে গোলক ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছেন শিক্ষার সাথে এর স্পর্শ ক্ষমতার উল্লেখ করে।

৩. লাসজোভারসেনী শিক্ষাকে আখ্যায়িত করেছেন–'Humanistic thinking' বলে, যা মানুষকে সাহায্য করে তার নিজেকে জানার ও বোঝার জন্য। [সূত্রঃ – Socratic Humanism, New Haven, 1963.]

প্রশ্ন হচ্ছে 'Humanistic thinking' শব্দযুগল নিয়ে। Humanistic শব্দটির বাচ্যার্থ-ভাবার্থ ব্যাখ্যায় নানা জনের নানা মত। যেমনঃ স্বজাতির প্রতি এক আচরণ; ভিন্ন জাতির প্রতি উল্টো অন্যায় আচরণ– উভয়টাই Humanistic বলে Nationalist গণ ব্যাখ্যা করে থাকেন।

www.pathagar.com

৪. পি. কে. হিট্টি শিক্ষাকে "Scientific attitude" হিসেবে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। শিক্ষাকে বিজ্ঞানভিত্তিক রূপ দেওয়ায় 'ঈমান' বা 'বিশ্বাস' শিক্ষাঙ্গন থেকে লুপ্ত হয়েছে এবং তদস্থলে 'বিজ্ঞান ও গবেষণা' শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য লাভ করছে ব্যাপকভাবে।

[সূত্রঃ Education as a Human Enterprise, Washington, 1973.]

৫. ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক বেন মরিসের মতে শিক্ষা "Deals with fresh issues as these arise out of man's changing actions and experiences."

[সূত্রঃ Objectives and Persectives in Education: Ben Morris.]

অর্থাৎ তিনিও শিক্ষাকে মানুষের নিরেট কর্ম ও অভিজ্ঞতা হতে সৃষ্ট সমস্যাদির (issues) আলোচ্য বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন।

উক্ত প্রখ্যাত পাঁচজন শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা বিষয়ে সুস্পষ্ট ও নির্ভেজাল মিল দেখা যায়, সে বিষয়টা হচ্ছে তাঁদের কেহই ধর্ম ও ধর্মশিক্ষার ব্যাপারে কোন আলোকপাত করেন নি। তাঁদের মতে অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানপ্রযুক্ত গবেষণাই হচ্ছে শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু।

আধুনিক শিক্ষার পরিণাম ঃ

আজ থেকে ২০/২৫ বছর পূর্বে শিক্ষাঙ্গনের যে চিত্র পাওয়া যায় তা বর্তমানে আরো বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। শিক্ষাবলয় হতে ধর্ম ও নীতিকথাকে ইতিবাচকভাবে বাদ দেওয়ায় সম্প্রতি শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তা গোটা মানব জাতির জন্য শুধু কলঙ্কই নয়, আত্মঘাতিমূলকও বিবেচিত হচ্ছে। ভয়েস অব আমেরিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি ১,১৮,২১৩ জন ছাত্রের একটি সাক্ষাৎকার গৃহীত হয় এবং সাক্ষাৎকারের ফলাফলটি ছিলএরূপ ঃ

১. অধিকাংশ ছাত্রই উচ্ছৃংখল

২. অধিকাংশ ছাত্রই স্কুল পালায়

৩. অধিকাংশ ছাত্রই স্কুলে অনুপস্থিত থাকে

৪. অধিকাংশ ছাত্রই উচ্ছৃংঙ্খল কাজে লিপ্ত থাকে।

বিগত ৭ বছরের এক জরীপে দেখা যায় যে, আমেরিকার কোন গ্র্যাজুয়েটই শুদ্ধভাবে কোন দরখাস্ত পর্যন্ত লিখতে পারেনি। (ভয়েস অব আমেরিকার ২৫.৪.৮০ শুক্রবারের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান।) অপর একটি ঘটনায় দেখা যায় যে, পঞ্চম হতে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্ররা তাদের "Substitute Teachers"-কে ভীষণভাবে উত্যক্ত করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে থিনবো ডাস্ত্রের সেন্ট জোসেফ এলিমেন্টারী স্কুলে।

www.pathagar.com

ইন্ডিয়ানায় এক জরীপ চালিয়ে দেখা যায় যে, প্রতি বছর কমপক্ষে ১১,০০০ কিশোর ছাত্র চুইংগাম খাওয়া থেকে শুরু করে শিক্ষক প্রহারের বিভিন্ন অপরাধে চড়-থাপ্পড় খাচ্ছে।

[News Week, Feb, 25/80. P. 41]

'আমেরিকার শিক্ষা সমস্যা এবং পরামর্শ' শীর্ষক এক নিবন্ধে আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার এক করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নিবন্ধটির তথ্যগুলো হচ্ছে ঃ

১. আমেরিকার প্রধান সমস্যা এখন 'সন্ত্রাস' বা 'তাপশক্তি' নয় বরং 'শিক্ষা'।
২. 'জাতীয় গণতন্ত্রের উৎকর্ষ' সাধনে নিবেদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান অবনতির দিকে যাচ্ছে।
৩. টেস্ট ও অন্যান্য পরীক্ষায় ছাত্রদের এমনকি মেধাবী ছাত্রদেরও ফলাফল নৈরাশ্যজনক।
৪. শিক্ষকগণ ছাত্রদের দ্বারা প্রহৃত হচ্ছেন (mayhem) । ছাত্রদের অপরাধের তালিকাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

১৯৭৫ সন : ৬৩,০০০ শিক্ষককে আক্রমণ
২,৭০,০০০ সিঁধেল চুরি
২০০ লক্ষ ডলার মূল্যের স্কুলের আসবাবপত্র তছনছ করা।

ছাত্রদের বদভ্যাসগুলো হচ্ছে

১. বেপরোয়া ধ্বংসযজ্ঞ, ২. বিলম্বিত ও অনিয়মিত উপস্থিতি, ৩. আভিজাত্য প্রদর্শন ও বাবুগিরি, ৪. মদ, সুরা ও ধুমপানের জন্যে পয়সা কামাইয়ের নেশা এবং ৫. গরুর গোশত ভক্ষণের নেশা।

ছাত্র শিক্ষক-অভিভাবকের অবস্থাটা ছিল নিম্নরূপ

১. বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শিক্ষক কর্তৃক স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি
২. শিক্ষক-অভিভাবকের অপ্রীতিকর সম্পর্ক
৩. ফেলকরা ছাত্র কর্তৃক শিক্ষকদেরকে পাঠদানে অক্ষমতার দোষারোপ
৪. শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রদেরকে নিয়মিতভাবে বাড়ির কাজ না দেওয়ার অভিযোগ.
৫. ছাত্রদের বাড়ির কাজ দেখাশোনা না করার জন্যে শিক্ষকগণ কর্তৃক অভিভাবকদের প্রতি দোষারোপ
৬. নির্দিষ্ট সময়ের এমনকি ১ মিনিট পর্যন্ত বেশি সময় পাঠদানে শিক্ষকদের অসম্মতি।

আমেরিকার শিক্ষাঙ্গনে উক্ত বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষের কারণ হিসেবে নিবন্ধটিতে বলা হয় ঃ

www.pathagar.com

১. থ্রী আর'স (3R's) Reading, Writing and Arithmatice যথাযথ শিক্ষা না দেওয়া
২. নিরেট Method বা পদ্ধতির ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ
৩. প্রকৃত শিক্ষাকে বাদ দিয়ে শুধু গণতন্ত্রের ওপর গুরুত্ব প্রদান
৪. শিল্পকলা ও সঙ্গীতের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া
৫. অপ্রয়োজনীয় নির্বাচনী বিষয় (Elective Subjects) চাপানো
৬. অতিরিক্ত কুইজ ও শর্টটেস্টের কুফল
৭. শিক্ষক-অভিভাবক উভয়ের পক্ষ থেকে ছাত্রের প্রতি দায়িত্ব পালনে দোষারোপ প্রবণতা। [Time Nov. 14, 1977.]

এসব সমস্যা সমাধানের জন্যে আমেরিকার শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও অভিভাবকগণের অনেকেই একমত হন যে, স্কুল জীবনে শাস্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বেত্রাঘাত ও দৈহিক শাস্তি আরোপ করতে হবে। লসএঞ্জেলসে বিগত ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ হতে বেত্রাঘাতকে আইনসঙ্গত করা হয়েছে। ইন্ডিয়ানায়ও শিক্ষক এবং অভিভাবক মহল বেত্রাঘাত প্রচলনে একমত হয়েছেন। এখনো অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীতে এর অনুশীলনী হচ্ছে সংযত ও পরিমিতভাবে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ইদানিং কতিপয় প্রসিদ্ধশিক্ষাবিদ কি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাও এখানে লক্ষণীয়।

'The State of Education in this Troubled World' বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে ওয়াল্টার লিপম্যান বলেন যে, স্কুল-কলেজসমূহের ছাত্রেরা 'নীতিশিক্ষা' হতে বঞ্চিত হওয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ডঃ এলবার্ট জি. সিম্স প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করে বলেন, 'অভিজ্ঞতা ও প্রয়োগভিত্তিক' শিক্ষার ফলে আমেরিকা মানবিক গুণাবলি হারিয়ে ফেলেছে। ডঃ এলবার্ট হচ্ছেন Institute of International Education-এর সহ সভাপতি।

স্যার ওয়াল্টার মোবার্লে "The Crisis in the Universities" প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, "জ্ঞানের বিভক্তিকরণ মানুষকে জীবনের উদ্দেশ্যের দায়িত্ব প্রতিপালনে মূর্খ করে রেখেছে।"

অধ্যাপক হ্যারল্ড টিটাসের মতে বর্তমান শিক্ষায় 'আদর্শ ও প্রত্যয়ের' অনুপস্থিতির ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 'আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ লাভ থেকে বঞ্চিত'।

www.pathagar.com

উক্ত মনীষীদের উদ্ধৃতি থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা গোটা মানবজাতিকে ধর্ম-কর্ম-জীবন-দর্শন-অর্থ-রাজনীতি-সমাজনীতি তথা জীবনের সর্বস্তরের সমস্যার সমাধান অপেক্ষা এসব ক্ষেত্রে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সমাধানের চেষ্টায় আজকের ধর্মনিরপেক্ষ পন্ডিতগণ মাকড়সার জালের মতো বরং আরো দুর্দশা ও জটিলতা সৃষ্টি করে যাচ্ছেন চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রে।

[সম্প্রতি (২০০৪) মানবতা ও নীতি শিক্ষা বিবর্জিত যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ এবং যুক্তরাজ্যের ইরাক আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্রের দোসর হওয়াটা এই শিক্ষারই একটি উলঙ্গ উন্মোচন। -গ্রন্থকার]

ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি ঃ

আধুনিক শিক্ষা-সংকট উত্তরণের প্রয়োগ ঃ শিক্ষাকে সার্বজনীন রূপ দেওয়ার জন্যে জাতিসংঘ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৪৮ সালে Declaration of Human Rights বা মানবাধিকারের ঘোষণা দিতে গিয়ে জাতিসংঘ উল্লেখ করে, "Everyone has the right to education". শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয় যে শিক্ষাঃ "shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations".

শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জাতিসংঘ যে রূপরেখা নির্দিষ্ট করে দেয় তাও এ প্রসংগে লক্ষণীয়ঃ

"A teacher's influence should be an influence on the growth of individual in his class room, it may end in time as an influence on the growth of partnership on a world-wide scale".

জাতিসংঘ উক্ত নির্দেশাবলি, বিশেষ করে শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকে নিম্ন অনুরোধ জানায় ঃ

"To be disseminated, displayed, read, and expounded principally in schools and other educational institutions".

কিন্তু দুঃখের বিষয়, জাতিসংঘের এ অনুরোধ কার্যকর হয়নি। বরং এর পরিবর্তে প্রতিটি রাষ্ট্রই, বিশেষ করে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো তাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবৈষম্যকে হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে পদানত এবং কুক্ষিগত করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল ক্ষুদে রাষ্ট্রের শিক্ষার ইতিহাসে এ সত্যই আজ উন্মোচিত।

www.pathagar.com

জাতিসংঘ আর একটি পদক্ষেপ এক্ষেত্রে নেয়। এর অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিক্ষার একটি সাধারণ ভিত্তি রচনার জন্যে ১৯৭৩ সালে দু'টি আলোচনা বৈঠকের আয়োজন করে। এ দুটি বৈঠকের রিপোর্টের ভিত্তিতে জাতিসংঘ "Charter of the United Nations University" শীর্ষক একটি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে হচ্ছে ঃ

১. জাতিসংঘভুক্ত সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সার্বজনীন অর্থে সাদৃশ্যমূলক বিষয়গুলোর ভিত্তিতে শিক্ষা গবেষণার অনুশীলনী ও প্রসার;
২. আন্তর্জাতিক শিক্ষাজগতে চিন্তা, ধ্যান-ধারণা ও নিয়ম-শৃংখলার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা;
৩. জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রগুলো শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান।

জাপানের অনুরোধে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় দপ্তরটি আপাতত টোকিওতে স্থাপিত হচ্ছে।

উদ্যোগটি সুন্দর ও প্রশংসনীয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সংশয় হচ্ছে এ উদ্যোগটির বাস্তবায়ন সম্পর্কে। কারণ গোটা বিশ্ব সম্প্রতি ৪টি শিবিরে বিভক্ত।

১. পুঁজিবাদী, ২. কম্যুনিস্ট বা সমাজতন্ত্রবাদী ৩. নিরপেক্ষবাদী বা তৃতীয় বিশ্ব এবং ৪. ইসলামিক বিশ্ব।

এ গ্রুপগুলোর প্রত্যেকটির নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ ও মতবাদ রয়েছে। আর এ আদর্শ ও মতবাদের ভিত্তিভূমি হচ্ছে শিক্ষাগার। প্রতিটি শিবির বা গ্রুপের সাথে অপর গ্রুপগুলোর বৈসাদৃশ্য ও রাজনৈতি দ্বন্দ্ব অনেক ক্ষেত্রে এত প্রবল ও আক্রমণমুখী যে, এদের সবার ঐক্য অপেক্ষা 'অনৈক্যের স্বীকৃতিতে ঐক্য'ই অধিক সম্ভব এবং বাস্তব। যেমন ঃ

* বর্ণবৈষম্যবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও এর অপবাদ তারাই করছে, যাদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে এগুলোর অবসান চাচ্ছে না—কায়েমী, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও স্বার্থের খাতিরে।
* কোন দেশের সরকার পরিবর্তন অনেক সময় সে দেশের রাজনৈতিক আদর্শ ও বৈদেশিক নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করে বসে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

* সবশেষে লক্ষণীয়, 'জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের' শিক্ষা ও দর্শন যেহেতু ধর্ম ও নৈতিকতার স্বীকৃতিতে বিরচিত নয়, সেহেতু এর অস্তিত্ব ও আয়ুষ্কাল লীগ অব নেশনস বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মতই সুন্দর ও ক্ষণস্থায়ী। কারণ, বিশ্বাসের ভিত্তিতে পারস্পরিক যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে একমাত্র 'ধর্ম ও ধর্মীয় নৈতিকতা' ব্যতীত অন্য কোন স্বাভাবিক শক্তি বা সত্তা এ বিশ্বে নেই। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ A.N. Whitehead এ স্বীকৃতিটি দিয়েছেন এভাবেঃ "শিক্ষার সার হতে হবে ধর্মীয়।"

আন্তর্জাতিক শিক্ষা সমস্যা নিরসনে কতিপয় মূলনীতি ঃ

এ প্রসংগে শিক্ষার কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতি আলোচনা করা যাচ্ছে, যেগুলোর অভাবে বর্তমান বিশ্বের শিক্ষাঙ্গন মারাত্মক সঙ্কটে নিপতিত ও আবর্তিত।

মানুষের জন্মলগ্নই শিক্ষার সূচনাকাল। ইংরেজিতে বলা যায় ঃ Education is as old as man। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রিস্টান, ইহুদী ও মুসলমানদের ধর্মের মধ্যে কতকগুলো বৈশিষ্ট্যও বিশ্বাস এক এবং অদ্বিতীয়। এগুলো হচ্ছে ঃ

১. আল্লাহর একত্ব;
২. মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে যুগে যুগে আল্লাহর নবী ও রাসূল প্রেরণ;
৩. মানুষ ও বিশ্বের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ; এবং
৪. প্রত্যেক নবী ও রাসূল কিতাব বা সহীফার (ক্ষুদ্র পুস্তক) ভিত্তিতে আল্লাহ ও দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারে শিক্ষা দিয়েছেন যুগে যুগে।

The World Book of Encyclopaedia-শীর্ষক নিবন্ধে উক্ত বিষয়গুলোর উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নভাবে ঃ

1. Oneness of God who rules the universe.
2. He has revealed Himself to man through Holy Books, by Prophets.
3. In these Sacred books man finds his ultimate meaning and basic duty. [Volume E.Edn.U.S.A1976.]

বিশ্বের বর্তমান লোকসংখ্যা আনুমানিক ৭০০ কোটি। তন্মধ্যে সাড়ে ৫৩% জন খ্রিস্টান ৩২% জন মুসলমান এবং ১% জন ইহুদী। অন্য কথায় বিশ্বের মোট

www.pathagar.com

জনসংখ্যার শতকরা ৮৬% জন আল্লাহ্, রাসূল এবং নাযিলকৃত গ্রন্থের (Revealed Books) উপর বিশ্বাসী, অবশিষ্ট ১৪% জন অন্যান্য ধর্মের বিশ্বাসী ও অনুসারী। (দ্রষ্টব্যঃ Religio-Political Map of the World– Published by Begum Aisha Bawany Wakf, Karachi, Pakistan, and Living Religions of the World, by Zafar Ishaque Ansari, Ed, 1962, p. 25)

শিক্ষার অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতি ঃ আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় ঃ

এ তথ্যের ভিত্তিতে অনায়াসে বলা যায় যে, আল্লাহ্, রাসূল ও আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাসীদের সংখ্যা বিপুল এবং এ বিপুল জনসংখ্যার ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ীঃ গোটা বিশ্ব ও মানুষ এবং যাবতীয় প্রাণী ও সম্পদের একমাত্র ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা আল্লাহ্। তিনি অনাদি ও অনন্ত। গোটা সৃষ্টি তাঁর অধীনস্ত ও তাঁর আজ্ঞাধীন। ইহুদীদের তাওরাত, খ্রিস্টানদের ইঞ্জিল ও মুসলমানদের কুরআনে আল্লাহর এ পরিচয় বিধৃত। আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয় সত্তার বিশদ পরিচয় দান ও শিক্ষার এতদ দায়িত্ব পালন ছিল নবী-রাসূলদের। তাঁরা এই দায়িত্ব যথাযথ পালন করে গেছেন বলে তাঁদের নামের সাথে 'আল্লাহর' পবিত্র নামটি সংযুক্ত থাকত নিম্নভাবেঃ

ক. হযরত আদম সফিউল্লাহ্, খ. হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্, গ. হযরত মুসা কলিমুল্লাহ্. ঘ. হযরত দাউদ খলীফাতুল্লাহ ঙ. হযরত ঈসা রুহুল্লাহ্ চ. হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্।

আল্লাহ্র অস্তিত্ব এবং তাঁর পরিচয় সম্পর্কে অন্য ধর্মাবলম্বীরাও ইতিবাচক বিশ্বাস রাখে। 'Mohammad and the Islamic Tradition' গ্রন্থে এমিলি ডার্মেনগেম আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অত্যাবশ্যকতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, বিধাতার অসীম শক্তি ও ক্ষমতার উপর দৃঢ় বিশ্বাসই মানুষের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে এবং এ বিশ্বাসই মানুষকে মানুষের দাসত্ব হতে মুক্তিদানে সক্ষম (পৃষ্ঠা ১৮৮)। সুতরাং **শিক্ষার প্রথম মূলনীতি** (first core principle of educaion) **হওয়া উচিত "আল্লাহ্র একত্ব ও পরিচয়।"** এ মূলনীতিই মানুষকে একমাত্র যথাযথ মর্যাদা ও আযাদী দিতে সক্ষম।

❑ দ্বিতীয় মূলনীতি ঃ মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি

দ্বিতীয়ত মানুষ সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদানের জন্যে শিক্ষার সংস্কার ও সংশোধন অত্যাবশ্যক। 'Forbidden tree' বা নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করে

www.pathagar.com

মানুষ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে এবং মানুষের আদি পিতা Adam বা হযরত আদম আলাইহিস সালাম। এ ইতিহাস ও প্রত্যয়ে ইহুদী-খ্রিস্টান -মসুলমান সবাই একমত ও সন্দেহমুক্ত। আদম বা মানুষ ডারউইনের উদ্ভট বিবর্তনবাদ প্রসূত Ape বা বানরের অধস্তন নয়। অথবা সে আধুনিক বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'physico-chemical machine"– বস্তু সংমিশ্রণজাত একটি নিরেট যন্ত্র নয়। নয় সে নিছক প্রকৃতির সন্তান— a product of Nature.

হযরত আদম (আ) প্রথম মানুষ। স্রষ্টার অতি প্রিয় সৃষ্টি। খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। স্বয়ং স্রষ্টা তাঁকে জ্ঞান শিক্ষাদান করেছেন বস্তু জিনিস ও এদের গুণ-প্রকৃতি বিষয়ে। সুতরাং মানুষ সৃষ্টি থেকেই সুশিক্ষিত ও সম্মানিত। সে বর্বরতা ও অসভ্য পরিবেশ থেকে পর্যায়ক্রমে সুসভ্য হয়নি। বরং সুসভ্য ও সম্মানিত পর্যায় থেকে কালক্রমে সে অসভ্য ও বর্বর হয়েছে আল্লাহ-দ্রোহিতা ও পাপাচারে নিমজ্জিত হয়ে। তাকে সংশোধিত করার জন্যে যুগে যুগে তারই স্রষ্টা নবী ও মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন প্রতি দেশে ও জাতিতে। সবশেষে গোট বিশ্বের জন্যে নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে পাঠিয়েছেন ধরণীর বুকে।

❑ তৃতীয় মূল নীতি ঃ মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারিত

সব মহাপুরুষই মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন পবিত্রতা ও তত্ত্বজ্ঞান (হিকমত), যাতে সে তার স্রষ্টা ও তাঁর নিদর্শনকে (আয়াত) চিনতে ও জানতে পারে এবং তদনুযায়ী চরিত্র ও কর্ম গঠনে সক্ষম হয়। উদ্দেশ্যঃ তাখাল্লাকু বিআখলাকিল্লাহ— আল্লাহর গুণাবলির সমন্বয়ে নিজের চরিত্র গঠন কর। অন্যকথায় মানুষ নিছক–Rational Animal নয়। এপিকিউরিয়ানদের মত 'Eat, drink and be marry, because tomorrow we will die– 'খাও দাও' স্ফূর্তি কর, কারণ আগামীকাল ত মরেই যাব।" এমনটি মানব জীবনের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য নয়।

মানুষ সৃষ্টির সেরা। সে মূলত নৈতিক জীব ঃ Man is basically a moral being. তাকে নিজের কৃতকর্মের জন্যে স্রষ্টার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এ দায়িত্বজ্ঞান ও চেতনাই তাকে নৈতিকতার শিক্ষা দান করে এবং এ নৈতিকতাই তাকে মহৎ ও সংযমী জীবন যাপনে বাধ্য করে। বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা বা নৈতিক শিক্ষার অনুপস্থিতিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অধ্যাপক বার্বাসি যে মন্তব্যটি করেছেন তা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, বুদ্ধি ও নৈতিকতার অধ্যয়ন পাশাপাশি চালু থাকা উচিত। আনবিক প্রয়োগেও (Atomic Fission) বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে

www.pathagar.com

নৈতিক তত্ত্বও এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অতএব শিক্ষার তৃতীয় আবশ্যিক মূলনীতি হওয়া উচিত, মানুষকে প্রধানত নৈতিক জীব হিসেবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

❑ চতুর্থ মূলনীতি ঃ শিক্ষার যথার্থ বিষয়বস্তু নিরূপিত

মানুষ যেমন সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট, ঠিক তেমনি মানুষ অধ্যুষিত এই পৃথিবী এবং সমগ্র বিশ্বজাহানও। এর কোনটাই আকস্মিক ও অপরিকল্পিত নয়। সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত, পিপীলিকা হতে মানুষ, তৃণ হতে পাহাড়-পর্বত, আকাশ-বাতাস-জলবায়ু সব কিছুই একটি নিয়ম বা শৃঙ্খলায় সুসজ্জিত ও পরিচালিত। বিশ্বজাহানের এই সুনিয়ন্ত্রিত কারখানাই প্রমাণ করে যে, এর সৃষ্টি অনুপম ও অদ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রকাশ। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-বাদল, গ্রীষ্ম-বর্ষা, দিবারাত্রির পরিক্রমণ লক্ষ্য করে বৈজ্ঞানিক একে 'Law of Nature' বা' Order of the Universe' বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকৃতির এই 'ল' বা শৃঙ্খলা সম্পর্কে জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করাই হচ্ছে মানুষের অপর একটি অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব, আর এ জ্ঞান ও শিক্ষার অনুবর্তী হয়ে চলার মধ্যেই রয়েছে জীবনের প্রকৃত সার্থকতা ও সাফল্য। আগুনের দাহ্য শক্তি, পানির পিপাসা নিবৃত্তির ক্ষমতা, দিবাভাগে সূর্যের আগমন, রাত্রিতে চাঁদের উদয়, ইত্যাদি নিয়ম ও শৃঙ্খলা যেরূপ প্রকৃতির রাজ্যে স্থিরীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত, ঠিক তেমনি মানুষকেও তার নিজের চিন্তা ও কর্মজীবনের কতিপয় শাশ্বত নিয়ম দৃঢ়তার সাথে মেনে চলতে হয় এ বিশ্বের উপকরণ উপভোগ ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে। এ উপভোগ ও উদ্ভাবনের নিয়ন্ত্রক হবে তার স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত নৈতিকতা ও ধর্মীয় নীতিমালা। উদাহরণস্বরূপ ঃ

১. সম্পদ উপার্জন, ভোগ ও ব্যয়ে ন্যায়-নীতি, সততা ও সংযমী হতে হবে, যাতে অপর কোন মানুষ এমনকি ইতর প্রাণীও বঞ্চিত বা নির্যাতিত না হয়।
২. অসহায়, ইয়াতীম, পঙ্গু ও বেকার লোকদের জন্য নিজের উপার্জিত ধনের অংশ থেকে নিঃস্বার্থভাবে দান খয়রাত করতে হবে।
৩. মানুষের সৃষ্টি নয় এমন প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ যেমনঃ নদী-সাগর, পাহাড়-পর্বত, বায়ু, তাপ ইত্যাদির ব্যবহার ও উপভোগ ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করে দুর্বল মানুষ বা দুর্বল রাষ্ট্রকে বঞ্চিত রাখা চলবে না। ইত্যাদি।

অন্যকথায় পার্থিব সম্পদের সম্ভোগ ও প্রতিপত্তির নেশায় সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, সম্প্রসারণবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ ইত্যাদি 'ইজমের' যে বিষময় আবহাওয়া গোটা বিশ্বকে শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছে, তার মূলে রয়েছে মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে স্বার্থান্বেষী ও অপব্যাখ্যামূলক শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাব্যবস্থা।

www.pathagar.com

❑ পঞ্চম মূলনীতি ঃ মানুষ ও প্রাকৃতির সম্পর্ক নীতি-নৈতিকতাভিত্তিক

শিক্ষার আর একটি অন্যতম আবশ্যিক মূলনীতি হওয়া উচিত "বিশ্বপ্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত" করা।

এই আলোচনার সামগ্রিক ফল দাঁড়ায় ঃ

১. স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয়।
২. মানুষ ও বিশ্বজাহান স্রষ্টার দ্বারা পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সৃষ্ট।
৩. নৈতিকতা ও ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যই হচ্ছে মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির সম্পর্কের ভিত্তি।

এগুলোর সমষ্টিকেই এক কথায় মেনে নিয়ে ধারণ করাকে ঐশী ধর্ম বা Divine Religion বলা হয়। এ ধর্ম সংকীর্ণ অর্থে গির্জা, মন্দির বা মসজিদের অনুষ্ঠানসর্বস্ব নয়, বরং এটা মানুষের জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান। মানব জীবনের সমগ্র অঙ্গনে এ বিধান কার্যকরী।

✻ ধর্মীয় শিক্ষা ও পাঠক্রম প্রসংগ

এ প্রসঙ্গে এও লক্ষণীয় যে, শুধু 'ধর্মীয় শিক্ষা' নামে একটি বিশেষ বিষয়কে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করলেই জীবনের ক্ষেত্রে নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি রচনা সম্ভব নয়, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখাই ধর্মীয় বোধ ও নৈতিকতার ভিত্তিতে উজ্জীবিত ও সম্প্রসারণশীল হতে হবে। শুধু 'ধর্মীয় শিক্ষা' নামে একটি বিশেষ বিষয়ই মানুষকে ধর্মপরায়ণ ও নীতি নিষ্ঠাবান যে করতে পারে না, প্রচলিত 'ধর্মীয় শিক্ষাই' এর প্রমাণ। বিশ্বের বহুদেশের 'ধর্মীয় শিক্ষা' পাঠ্য বিষয় হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্নিবেশ করার কোন সামগ্রিক সুফল আজও পরিদৃষ্ট হয়নি। কারণ এসব ক্ষেত্রে ধর্মকে একটি আলাদ ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে অসম্পৃক্ত বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়—এটা সমষ্টিগত ব্যাপার, ধর্ম শুধু আধ্যাত্মিক ব্যাপার নয় বরং বৈষয়িক ব্যাপারও—এ অর্থে ধর্মের শিক্ষা ও প্রভাব জীবন ও জগতের প্রতি অঙ্গনে চর্চা ও অনুশীলন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, উক্ত অর্থে ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মীয় শিক্ষা তথা স্রষ্টার নির্দেশনামা বা ঐশ্বরিক গ্রন্থ গ্রহণ করলে 'শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে'—এ প্রশ্নটির নিখুঁত সমাধানও পাওয়া যায়। কারণ তথাকথিত ধর্মে নিষ্ঠাবান ও ধর্মভীরু (অর্থাৎ ধর্মকে মানেন ও শ্রদ্ধা করেন, অথচ কাজে কর্মে প্রতিপালন করেন না) ইহুদী, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান, এমন কি নিছক মূর্তি বা প্রাকৃতিক শক্তির পূজারীও 'ধর্ম ও স্রষ্টাকে' স্ব-স্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে হলেও সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। আরও মজার ব্যাপার এই যে, নাস্তিক সম্প্রদায়ও নিদেনপক্ষে 'বিধাতা নেই' এ ধরনের প্রমাণ দিতে পারেন নি। ফলে 'বিধাতা বা সৃষ্টিকর্তা'কে কেন্দ্র করে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করাটাই একমাত্র সহজ ও স্বাভাবিক সমাধান। শিক্ষার

www.pathagar.com

পরিভাষায় এ কথাটিকে গুছিয়ে বললে দাঁড়ায় God and Holy Scripture is by nature the core curriculum of mankind.

* এখন বাকি থাকল—কে ঐ কারিকুলাম বা পাঠক্রম নির্ধারণ করবে। এর জবাবে স্বাভাবিকভাবে বলা যায়, এ কারিকুলামের প্রচারক যিনি, তিনিই এ পাঠক্রমের নির্ধারক। কেননা এর বার্তাবাহক হবেন এমন একজন যিনি এ পাঠক্রমের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আমরণ সংগ্রাম করেছেন এবং নিজের জীবন ও কর্মকাণ্ড দ্বারা তার সত্যতা প্রমাণ করে গেছেন। তাকেই নবী-রাসূল বা Prophet হিসাবে বিশ্ব ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত ও খ্যাত করা হয়েছে। অন্য কথায় তিনি হলেন স্রষ্টা ও তাঁর নির্দেশ সম্বলিত ঐশী গ্রন্থের কালজয়ী ও অম্লান, অক্ষয় বাস্তব ও জীবন্ত রূপকার– Eternally a living practical model for mankind.

ভাষা, পরিবেশ ও উপকরণের বৈসাদৃশ্যের পটভূমিতে যে সত্তার ঐশীগ্রন্থ ও বার্তাবাহক মানুষের সামগ্রিক প্রয়োজন ও চাহিদা ইহ ও পারলৌকিক জীবনের সর্বস্তরে– ব্যক্তিগত হতে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত—মেটাতে সক্ষম, তা-ই হবে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সঙ্কটের একমাত্র প্রতিষেধক। বর্তমান বিশ্বের মানুষকে ঐশী জ্ঞান যুক্তি ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে আজ এরই অনুসন্ধানব্রতী হয়ে সেই সত্তা ও তার নির্দেশাবলির প্রতিপালনে সরল ও পক্ষপাতবিহীন মন নিয়ে শিক্ষা সংস্কারে অগ্রসর হতে হবে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব-শিক্ষাসঙ্কট নিরসনের জন্য আজ শিক্ষার সংস্কার তাই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ঈপ্সিত শিক্ষার অভাবের তীব্রতা উপলব্ধি করে A.N. Whitehead বলতে বাধ্য হয়েছেন ঃ "শিক্ষার সার কথা হবে ধর্মীয়।" এ শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করেই 'Education" নিবন্ধে Encyclopaedia আমেরিকানদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছে "Many found religion essential for the U.S. as stability and progress." (The World Book Encyclopaedia, Education, U.S.A. Edn.1976.) ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তরাজ্য ১৯৪৪ সাল হতেই বাধ্য হয়েছে 'ধর্মশিক্ষাকে' আবশ্যিক করতে এ উদ্দেশ্যে, কারণ ধর্ম-শিক্ষা ব্যতীত সত্যের সন্ধান সম্ভব নয় (Education Act of 1944 দ্র.)। তথাকথিত কট্টর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পর্যন্ত এ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন ঃ Religion has the right place on the formation of right motives. (The Hindu Weekly Review, Sept. 10, 1956.)

www.pathagar.com

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইটালির রাষ্ট্রদূত মিঃ পিয়েত্রো এর সাম্প্রতিক মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ্য। তাঁর মতে বর্তমান বিশ্ব একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। মুসলিম বিশ্বের সাথে পশ্চিমা দেশের দূরত্ব ক্রমশই বাড়ছে। এতে উভয়পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী বস্তুবাদের প্রসার ঘটছে। এবং মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাতে পৃথিবীর অশান্তি ও হানাহানি বাড়ছে আর মানবতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। এ অবস্থার উত্তরণে তিনি আন্তঃসভ্যতা ও আন্তঃধর্ম সংলাপের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সম্প্রতি ২৮/১১/০৩ বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষণরত ইমামদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেয়ার সময় তিনি এই মন্তব্য করেন। তাঁর মতে "ধর্ম"-ই হচ্ছে বিশ্বশান্তি ও প্রীতির ভিত্তি।

রাষ্ট্রদূত বলেন, খ্রিস্টান এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই অন্যের ধর্ম সম্পর্কে তো জানেনই না এমনকি নিজ ধর্ম সম্পর্কেও উদাসীন থাকেন। এজন্যই এত দ্বন্দ্ব-সংঘাত। ইউরোপ-আমেরিকাসহ পশ্চিমা মিডিয়ায় ইসলামকে তুলে ধরা হয় একটি সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে। এটা ইসলাম সম্পর্কে তাদের নেহায়েতই অজ্ঞতা। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, ইউরোপে ইসলামের জিহাদ বলতে মনে করা হয় অন্য ধর্মের লোক খুন করা। বাস্তবিকপক্ষে ইসলামে জিহাদ হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, এমনকি নিজের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা।

পরিশেষে কবি ইকবালের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি দিয়েই এ অধ্যায়ের ইতি। তিনি বলেছেন, "God is the birth right of man"। God বা আল্লাহকে বাদ দিয়েই বর্তমান বিশ্বের মানব সমাজ আজ হাবুডুবু খাচ্ছে নৈরাশ্য আর আতঙ্কের নীতিবিগর্হিত 'সভ্যতার' সাগরে; আর এটা অমোঘ সত্য যে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে আল্লাহর অস্তিত্ব ও নির্দেশভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া বিশ্বমানবের মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

1. World Problems In Education : Jean Thomas, UNESCO Press, Paris, Ed. 1976
2. Selection from Educational Research : Sharp.
3. Government of Education: W. O. Lester Smith, Edition 1968.
4. World Book Encyclopaedia, Vol. E. – U. S. A, Edition 1976.
5. Objectives and Perspectives in Education : Ben Morris, Ed. 1972.
6. Islam and Modernism : Mariam Jamila.
7. The English Tradition of Education : Murry.

পত্র-পত্রিকা

8. UNESCO Report, Autumn, 1972.
9. News Week, Feb, 25/80.
10. Time, Nov. 14/77.
11. The Hindu Weekly Review, Sept. 10/56.
12. Daily Sangram: March 3/80 3 May 29, 2003.

www.pathagar.com

৩য় অধ্যায়

বাংলাদেশের শিক্ষা ঃ ঐতিহ্য ও ইতিবৃত্ত

আর্য যুগ ঃ

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে কিছু বলার পূর্বে, পটভূমি হিসেবে অতীতের খানিকটা আলোচনা প্রয়োজন, নইলে প্রতিপাদ্য বিষয়টি অনেকের সঠিকভাবে সম্যক হৃদয়ঙ্গম সম্ভব না-ও হতে পারে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সূচিত হয় খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতা নিদর্শনের উন্মোচনে। এই সভ্যতার নিদর্শন দৃষ্টে ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেন যে, সেই সময়কার জনগণের শিক্ষা ব্যবস্থাও উন্নত ধরনের ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই সময়কার শিক্ষা ব্যবস্থার কোন ইতিহাস অদ্যাবধি খুঁজে পাওয়া যায় নি।

পরবর্তীকালের ইতিহাস ছিল আর্য ও দ্রাবিড়দের সংঘর্ষ ও বিবর্তনের ইতিহাস। এই সংঘর্ষও বিবর্তনে দ্রাবিড়গণ আর্যদের হাতে পরাভূত হয় এবং আর্যদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। আর্যদের আমলের ইতিহাস বর্তমান কালের ইতিহাসের মত লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় নি। তাদের সামাজিক ও শিক্ষা জীবনের যেসব তথ্য এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে তা তদানীন্তন ধর্মীয় ও পুরাণ কাহিনীমূলক সাহিত্যের ভিত্তিতেই সম্ভবপর হয়েছে। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

আর্য যুগের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত। আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ও প্রার্থনাস্তোত্র ছিল শিক্ষার বিষয়বস্তু। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত সমাজ সৃষ্টি। বংশপরম্পরায় আর্য শিক্ষা ছিল নিয়ন্ত্রিত ও সঙ্গোপনে সংরক্ষিত। ফলে আর্য-শিক্ষার প্রচার ও প্রসার থেকে সাধারণ লোক ছিল বঞ্চিত।

আর্য যুগের নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ফলে সমাজে শ্রেণীভেদের জন্ম হয়েছিল ঃ ১. ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত সমাজ, ২. ক্ষত্রিয় বা অভিজাত যোদ্ধা সমাজ, ৩. বৈশ্য বা কৃষিজীবী ও বণিক সমাজ, ৪. শুদ্র বা নীচু সমাজ। এই শ্রেণীগুলোর মধ্যে প্রথম দুটি সমাজ ছিল অবশিষ্ট সমাজ দুটোর শাসক ও দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। জন মেথী (John Mathi) তাঁর Village Government in British India গ্রন্থে (৪০ পৃষ্ঠায়) এ সম্পর্কে বলেনঃ প্রাচীনকাল থেকে দেশে যে বিপুল সরকারী

www.pathagar.com

শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছে এই শ্রেণীগুলো (শুদ্র ও বৈশ্য) তার আওতায় কখনো পড়েছে বলে কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ বছর পর্যন্ত বৈশ্য ও শুদ্র সম্প্রদায় শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ অভিমত প্রকাশ করেন।

আর্য যুগের শিক্ষাকাল থেকে প্রধানত দুটো জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে– ১. শিক্ষার সুযোগ ছিল শুধু সমাজের উপর তলার লোকদের জন্য, ২. এ শিক্ষার বুনিয়াদ ও বিস্তৃতির উৎস ছিল ধর্ম, যা ছিল একমাত্র ব্রাহ্মণদের সম্পদ। অর্থাৎ স্রষ্টা ও তার নির্দেশ (ধর্ম) সম্পর্কে অজ্ঞ রাখা হত দেশের আপামর জনসাধারণকে।

এ প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের উক্তিটি লক্ষণীয়। তিনি History of Bengali Language and Literature গ্রন্থের এক স্থানে সে সময়কার বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নভাবে ঃ

"পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ ক্ষমতার বলে অত্যাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। গতানুগতিক কৌলিণ্য প্রথার দরুন জাতিভেদের নিয়ম-কানুনগুলো কঠোর হতে কঠোরতর হয়েছিল। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্য শিক্ষায়তনের দ্বার করে রেখেছিল চিররুদ্ধ। শুধু তা-ই নয়, বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ন্যায় পৌরাণিক ধর্মে ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের একচেটিয়া অধিকার।"

এ সময়টিতে ৩ শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচয় মেলে। তা হচ্ছে ঃ

১. পরিষদ –এখানে প্রবীণ ও বয়স্ক ব্রাহ্মণবর্গ ধর্মচর্চা ও অনুশীলনে জীবন অতিবাহিত করত। পরিষদ প্রকৃতপক্ষে অনেকটা 'খানকা' ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বৈ অন্য কিছুই নয়।

২. টোল–প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো, যাতে শিষ্যগণ সংস্কৃত ভাষা সমাপনান্তে দেব-দেবীর কাহিনী পাঠ ও স্তোত্র -ভজন অর্চনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারে। টোলও ছিল শুধু ব্রাহ্মণ জাতির জন্য সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত।

৩. পাঠশালা– এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুদ্র ছাড়া আর সবার জন্যই ছিল উন্মুক্ত।

বিষয়বস্তু

এসব পাঠশালায় বিষয়বস্তু বা পাঠক্রম ছিল পৌরাণিক কাহিনী সমৃদ্ধ। দেবদেবী ও তাদের অশ্লীল প্রেম-প্রণয়, অবাধ যৌন সম্ভোগ, পাহাড়, পর্বত, অরণ্য তথা প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা, তন্ত্র-মন্ত্র ও পূজা-অর্চনায় রসপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। তাছাড়া গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যাও চর্চা হত। মানুষ ও তার জীবনের প্রতিফলন এতে স্থান পায়নি। অন্য কথায় সে সময়কার শিক্ষার জগৎ ছিল দেবদেবীদের একচেটিয়া সম্পত্তি, আর এ সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ও খবরদারী করত সুচতুর ব্রাহ্মণগোষ্ঠী।

www.pathagar.com

স্কুলগৃহ

আর্য যুগে স্কুলগৃহ বলতে আধুনিক ভবন বা কাঁচা ঘর ও আঙ্গিনার মত সুপরিকল্পিত কোন বিদ্যালয় বুঝাত না। সে সময়ে গাছতলা, মন্দির বা উপাসনালয় অথবা কোন বাড়ির দু'একটি প্রকোষ্ঠকে শিক্ষাগার হিসেবে ব্যবহার করা হতো। প্রতি শিক্ষক ১৫/২০ জন ছাত্রকে পাঠদান করতেন। নিষ্কর জমি বা ফসলের অংশ প্রদানে শিক্ষকের পারিশ্রমিক মিটানো হতো।

শিক্ষা পদ্ধতি

আর্য যুগে শিক্ষা পদ্ধতি (Method of Teaching) ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. আনুষ্ঠানিক চর্চা বা Ceremonial or Ritual exercise.

২. স্মৃতি চর্চা ও স্মৃতিচারণ (Cramming and Recitation).

৩. বক্তৃতা (Lecture/ Sermon).

আর্য যুগের এহেন শিক্ষার ফলে সে সময়ে সন্ন্যাসবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। এ সময়ে প্রকৃত শিক্ষা ও তমদ্দুনের অনুপস্থিতিতে ভারতের যে করুণ অবস্থা ছিল তাও অনুধাবনযোগ্য। এ অবস্থার একটি বাস্তব বর্ণনা মোগল সম্রাট বাবর দিয়েছেন নিম্নভাবে ঃ

"হিন্দুস্তান এমন একটা দেশ যেখানে আমোদ-প্রমোদ কিছুই নেই। ------ তাদের কোন প্রতিভা নেই, মনের কোন প্রসার নেই, সামাজিক আদব কায়দা, সৌজন্য ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি বলতে কি বোঝায়, তা তারা জানেই না। সেদেশে গোসলখানা নেই, কলেজ বা উচ্চ শিক্ষায়তন নেই। ---- সে দেশের কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা প্রায় উলঙ্গ অবস্থাতেই চলাফেরা করে। অল্প এক টুকরা কাপড় কোন রকমে মালকোছার মতো পরে তারা তাদের নগ্নতা ঢাকে। এটাকে তারা বলে 'লেঙ্গটি'। মেয়েদের কাপড়েরও একই অবস্থা। তবে তাদের কাপড় একটু বড় । তারা এ কাপড় কোমরে বাঁধে আবার একটা দিক মুড়িয়ে মাথায় ঘোমটাও দেয়।"

[Memoirs of Babur, Vol-II, পৃষ্ঠা ২৪১-২৪২]

পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুও উক্ত বর্ণনার পরোক্ষ স্বীকৃতিটুকু দিয়েছেন এভাবে ঃ "ভারতীয়দের মনে সহজাত প্রবৃত্তির দরুন জীবনের অবস্থার প্রতি ঔৎসুক্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।" [Discovery of India, পৃষ্ঠা ২১৩]

বৌদ্ধ যুগ ঃ

আর্য যুগের পরে বৌদ্ধ যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, এ যুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্ণবাদ বা বর্ণ শ্রমের স্বীকৃতি ছিল না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ঃ ১. শুদ্ধ জীবন, ২. নিঃসঙ্গ জীবন, এবং ৩. মঠভিত্তিক সমষ্টিগত ভিক্ষু জীবন। চীন পর্যটক ইউয়েন-সাং-এর মতে ৬২৯-৪৫ খ্রিস্টাব্দ

www.pathagar.com

পর্যন্ত বৌদ্ধ যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। পরে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনর্জাগরণের ফলে বৌদ্ধমতের পরাজয় ঘটে। বৌদ্ধ যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার সুফল এই হয়েছিল যেঃ ১. এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্ণভেদের অবসান স্বীকৃত হয়, ২. 'অহিংসা পরম ধর্ম' মূল জীবনাদর্শন হওয়ায় শিক্ষার বিষয়বস্তু সন্ন্যাসবাদের জন্ম দেয়।

Roller ও Morphet বৌদ্ধ যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থাটি নিম্নভাবে উল্লেখ করেন ঃ

এ যুগে "বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নজির পাওয়া যায়; যেগুলো আধুনিক কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ বলে মনে করা যেতে পারে। সেখানে হাজার হাজার ছাত্র ও শিক্ষক এক সঙ্গে বাস করে জ্ঞানের চর্চা করতেন।"

[Comparative Educational Administration, পৃষ্ঠা ২৩৩]

বৌদ্ধধর্ম সদ্যজাত বলে এ ধর্মের অনুসারী বৃদ্ধি করার জন্য বৌদ্ধগণ "শিক্ষা"-কে তখনকার ব্রাহ্মণ-পুরোহিত বা পোপ-পাদ্রীদের মত একচেটিয়া সম্পত্তি করে রাখে নি। অন্যকথায় এ যুগে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র সবারই সমানাধিকার ছিল। সম্ভবত এ কারণেই পরবর্তী কালে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ প্রমাদ গণেছিলেন এই ভেবে যে, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী বৃদ্ধি পেলে তাদের আধিপত্য ও সমর্থকদের জনশক্তিতে ভাঁটা আসবে।

মুসলিম যুগ ঃ

বৌদ্ধযুগের পর মুসলিম যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এবার আলোচনা করা যাক। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে (৭১২ খ্রীঃ) তদানীন্তন ভারত উপমহাদেশে আরব বণিক, নাবিক ও ধর্মপ্রচারকগণ আগমন করেন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের পাঞ্জাব ও মুলতান রাজ্য শাসন এবং ১০০১ খ্রিস্টাব্দে গজনীর সুলতান মাহমুদের পাক-ভারত আক্রমণ থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে মুগল শাসনের অবসান পর্যন্ত প্রায় ৭০০ বছর তদানীন্তন ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব

মুসলমানদের আমলে শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা হয় এ উপমহাদেশের প্রত্যেক নরনারীর জন্য। ইসলামই মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, 'ইকরা' পড়– পাঠ কর, হৃদয়ঙ্গম কর এবং তদনুযায়ী জীবন গঠন ও নিয়ন্ত্রিত কর। ইসলামের শেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স) ঘোষণা করেন, "জ্ঞান আহরণ প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য ফরয।" তিনি আরও বলেন, "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান আহরণ কর।" শিক্ষার মর্যাদার গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি এ-ও ঘোষণা করেন, শহীদের খুনের চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির কলমের কালি অধিক মর্যাদাবান। প্রখ্যাত মুসলিম শাসক ও সূফীগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে নিজেদের জীবনে শিক্ষার মূল্য ও তদনুযায়ী চরিত্র

www.pathagar.com

গঠনে এত নিবেদিত ও নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, তাঁরা এ উপমহাদেশে বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সুন্দর চরিত্র এবং কর্মদৃষ্টে স্থানীয় জনগণ ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বিপুলভাবে। আর এরই ফলশ্রুতি হিসেবে এ উপমহাদেশের জনগণ সর্বপ্রথম শিক্ষাকে পেল একটি গণতান্ত্রিক তথা জনসম্পদ হিসেবে।

শিক্ষার মূলভিত্তি

মুসলিম শাসকগণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে। গুসশান রায় 'Our Education Problems' প্রবন্ধে বলেন, "ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানের জন্য একটি শিক্ষা বিভাগ এই প্রথম স্থাপিত হয়েছিল বলে মনে হয়।" শিক্ষাকে বিশেষ করে, ইসলামভিত্তিক শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদাভুক্ত করার প্রথম এবং পরম পবিত্র কর্তব্য পালন করেছেন মুসলিম শাসকগণই। এ প্রসঙ্গে এটাও স্মরণীয় যে, মুসলমানদের আমলেই ব্রাহ্মণদের কুক্ষিগত দেবভাষা সংস্কৃতের বেড়ীকে ভেঙ্গে বাংলা ভাষাকে তারা জনগণের মুখের ভাষা হিসাবে সহজ-সরল ও সমৃদ্ধশালী করেছেন। নিরীহ বিদ্বান ও পণ্ডিতদেরকে আর্থিক অনুদান প্রদান এবং বিদেশী ভাষাকে অনুবাদ করে বাংলা ভাষায় সমৃদ্ধি আনেন। এ কাজ ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় হতেই শুরু হয়েছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত UNESCO-র Studies on Compulsory Education-এ এর উল্লেখ নিম্নভাবে করা হয়েছেঃ 'মুসলিম শাসনকালে শিক্ষা ও ধর্মকে অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিবেচনা করা হতো। ইসলামে পুরোহিততন্ত্রের কোন স্থান নেই এবং বর্তমান জীবনের জন্য প্রস্তুতি হিসেবেই শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো'। Jams K. Haider তাঁর 'India: Impression and Suggestions' গ্রন্থের পাঁচ পৃষ্ঠায় বলেন যে তৎকালীন বাংলাদেশে (যার অধিকাংশ বর্তমান বাংলাদেশে) ৮০.০০০ অর্থাৎ জনসংখ্যার প্রতি ৪০০ জনের একটি স্থানীয় বিদ্যালয় ছিল। William Adam নামে এক মিশনারী শিক্ষাবিদ ১৮৩৫-১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের সময়টুকুতে এক জরীপ পরিচালনা করে দেখান, তৎকালীন দেশে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বিদ্যালয় চালু ছিল। মুসলিম শাসনের সময় আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তা উক্ত দৃষ্টান্ত থেকে সহজে আঁচ করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির মুক্ত আলো ও হাওয়ার মত শিক্ষাকে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুসলিম জাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতিই এমন উদার ও প্রশস্ত হৃদ্যতার পরিচয় দিতে পারেনি। পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে মুসলিম শাসকদের জ্ঞানের চর্চা ও প্রসারে কী আগ্রহই না ছিল তার কিছুটা নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

www.pathagar.com

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের অবদান ঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, একমাত্র ইসলামই (জীবন বিধান অর্থে) শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে সবার উপর; আর এরই ফলে শিক্ষা পেয়েছে একটি সার্বজনীনরূপ। অন্য কথায় ইসলামই প্রকারান্তরে ঘোষণা করেছে যে "Education is the brithright of every human child."— বিদ্যার্জন প্রত্যেক মানব শিশুর জন্মগত অধিকার। তাই বলা হয়ঃ "Education is the state-enterprise." এ অধিকার ভোগ করানোর দায়িত্ব প্রত্যেক সরকার তথা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে প্রত্যেক মুসলিম শাসক, সুলতান ও বাদশাহ্ মানব সভ্যতার বেদীমূলে যে নজীর রেখে গেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কতিপয় শাসকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো ঃ

ফিরোজশাহ্ তুঘলক (১৩৫১–৮৮ খ্রিঃ)ঃ তিনি তাঁর রাজত্বকালে শিক্ষাখাতে সর্বমোট ১,৩০,০০,০০০ তংকা ব্যয় করেছেন। এ থেকে আলিম ও শিক্ষকগণ পেয়েছেন ৩৬,০০,০০০ তংকা। অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও আইন, ধর্ম, ইতিহাস, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনায় ব্যয় করা হয়।

সুলতান আবুল কাসিম মাহমুদ গজনভী (৯৯৮–১০৩০ খ্রিঃ)ঃ পক্ষপাতদুষ্ট অমুসলিম ঐতিহাসিক যে সুলতান মাহমুদকে নিছক আক্রমণকারী হিসেবে বিশ্বের ইতিহাসে কলংকিত করে রাখার অপপ্রয়াস চালিয়ে ছিলেন, সেই সুলতান মাহমুদের রাজদরবার জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশে আলোকিত থাকত। কালজয়ী মহাকাব্য 'শাহনামা'র রচয়িতা কবি ফেরদৌসী সহ ঐতিহাসিক আল- বিরুনী, উৎবী, ফরুকী ও আমজাদী প্রমুখ অভিজন শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অপরিসীম দান রেখে গেছেন, তা সুলতান মাহমুদকে ইতিহাসের পাতায় চির উজ্জ্বল করে রেখেছে। গজনী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরই একটি অনুপম কীর্তি। তিনি প্রত্যেক কবি ও পণ্ডিতকে বাৎসরিক চার লক্ষ দিনার দান করতেন।

কুতুবুদ্দীন আইবেক (১২০৬–১২৩৩ খ্রিঃ) ঃ মামলুক বংশের গৌরবময় শাসন ও ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান কুতুবুদ্দীন শুধু প্রজারঞ্জক শাসকই ছিলেন না; বরং শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন একজন অদ্বিতীয় দানবীর। ইতিহাস তাঁকে 'লাখ বক্স' বা লক্ষ টাকা দানকারী হিসেবে চির আখ্যায়িত করেছে।

সুলতান ইলতুৎমিশ ঃ তিনিও ছিলেন তাঁর পূর্বসুরি সুলতান কুতুবুদ্দীনের সার্থক উত্তরাধিকারী। তাঁর শাসনামলে গোটা দিল্লী নগরী তদানীন্তন ভারতের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গৌরব ও মর্যাদা লাভ করেছিল। অনুরূপ জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষার দিগন্ত প্রসারী কর্মতৎপরতা এবং অনুরাগ মোগল সম্রাটদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ ঃ

www.pathagar.com

নিরক্ষর সম্রাট আকবর (১৫৫৬–১৬০৫ খ্রিঃ) ঃ তার ব-কলমী অযোগ্যতা ও অপারগতাকে সুযোগ্য শাসন হিসেবে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল নবরত্নের আশ্রয়দান ও পৃষ্ঠাপোষকতায়। জানা যায়, সম্রাট আকবরের সময়ই শিশুস্তরের পাঠদান পদ্ধতিকে সার্থকভাবে কার্যকরী করার জন্য নিম্ন চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছিল।

ক. বর্ণমালা শিক্ষা, খ. সংযোজন, গ. পূর্বপাঠের পর্যালোচনা, ঘ. যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট ছোট্ট কবিতার পদপাঠ।

লক্ষণীয়, উক্ত পাঠ-বিন্যাসের প্রায় ৭০% ভাগ প্রতিফলন বর্তমান যুগের পাঠ-পরিকল্পনায় (Lesson Plan) সন্নিবেশিত হয়েছে।

সম্রাট-আওরঙ্গজেব ঃ (১৬৫৮–১৭০৭ খ্রিঃ)ঃ বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ খ্যাত সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর জিন্দাপীর ছিলেন ধর্মভীরু শাসক বা রাজর্ষি। তাঁর শাসনামলে মোগল সাম্রাজ্যে 'দুনিয়া এবং আখিরাতের' বিষয়বস্তুর সার্থক সমন্বয় বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর সূচনা হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে পাঠক্রম ছিল অনেকটা নিম্নরূপ ঃ

১. মানবজাতির ইতিহাস ২. প্রতিবেশী দেশসমূহের ভাষা ৩. পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ৪. দর্শনশাস্ত্র। ধর্মীয় তথা 'ইসলাম' শিক্ষা সে সময়ে অত্যাবশ্যক ছিল। উক্ত বিষয়সমূহের উপর শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জন ছিল অপরিহার্য। Francois-এর কথায় এ সময়কার শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল ঃ আত্মা ঔদ্ধতভাবে উল্লাসিত যেন না হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা।

[Tarvels In the Mughal Empire, A. D. 1656—1668, P 184-85; London Edition 1891].

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের প্রভাব

কি শিক্ষিত, কি মূর্খ, কি সম্ভ্রান্ত, কি দাস বংশ– যে শ্রেণীরই হোক না কেন, প্রত্যেক মুসলিম শাসক বিদ্যা বা জ্ঞান চর্চাকে সবার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য মনে করতেন। এ ক্ষেত্রে তাদের হৃদয়-মন ছিল আকাশের মত উদার, সাগরের মত ছিল এঁরা দানবীর। এর প্রধান কারণ এই যে, তাঁরা 'শিক্ষাকে যুগপৎ তাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় অপরিহার্য সম্পদ হিসেবে কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করতেন।' এ বিশ্বাস আল-কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা ও প্রভাবের তাগিদেই তারা ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় পর্যায়ে উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রবৃদ্ধি করেছেন। ফলে দেখা যায় ঃ

১. প্রত্যেক মুসলিম শাসকই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষা ও শিক্ষিতের কদর এবং পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। ঐতিহাসিক পানিকরের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মুসলমান শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় দেশীয় ভাষায় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের তরজমা এ সময়কারই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলাম এদেশের ইতিহাসে যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল, তার ফলে ধর্ম ও সাহিত্য কোন বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার না হয়ে ক্রমান্বয়ে সর্বসাধারণের বিষয় হলো।

[Panikar, A Survey of Indian History: P.164]

অধ্যাপক মুজীব 'দুনিয়া কি কাহিনী' গ্রন্থের ১৭১ পৃষ্ঠায় মুসলমানদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঃ

----- *জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সকলের সমান সুবিধা এবং প্রতিভার বিকিরণের বেলায় সকলের সমান সুযোগের ব্যবস্থাও মুসলমানেরাই করেন। আজকের দিনে উপরোক্ত সবকিছুই ভারতীয় সংস্কৃতিতে ওৎপ্রোতভাবে মিশে গেলেও এ সমস্তের প্রণয়ন, প্রবর্তন ও পরিপোষণের জন্য মুসলমানরাই একমাত্র গৌরবের অধিকারী।*

২. প্রত্যেক মুসলিম শাসকই কম্‌বেশি শিক্ষাদান ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় তথা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে পালন করে গেছেন।

৩. প্রত্যেক মুসলিম শাসকই অল্প-বিস্তর অনুবাদ-সাহিত্যের প্রবর্তন ও প্রসার ঘটিয়ে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে ব্যাপক ও সার্বজনীন করার প্রয়াস পেয়েছেন। স্যার যদুনাথ সরকার এ স্বীকৃতিটি দিয়েছেন এই বলে ঃ

পুরাকালে হিন্দু লেখকগণ যখন সাধারণত তাদের লেখা লুকিয়ে রাখা পছন্দ করতেন তখন পুস্তকের নকল ও প্রচার করে জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা করার জন্য আমরা মুসলমানদের কাছে ঋণী। [India Through the Ages, P. 68.]

৪. মুসলিম শাসকগণই শিক্ষা ও সাহিত্যের আঙ্গিনায় মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর্যযুগে দেব-দেবী ও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসসমূহ ছিল শিক্ষার বিষয়বস্তু। মুসলিম শাসকদের প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লেখকগণ দেবভাষা সংস্কৃতকে স্থানীয় ভাষায় তরজমা করে সাধারণ মানুষকে এর বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিত করে তোলেন। দেবদেবীর পরিবর্তে সাহিত্যে তখন হতেই মানুষের প্রতিষ্ঠার সূচনা হলো।

৫. তদানীন্তন ভারত উপমহাদেশের ভাষা ও সাহিত্যের পরিমণ্ডলে ইসলামী ভাবধারা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করে যুগপৎ বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যা ও সমাধান বিধানের পথ-নির্দেশ মুসলিম শাসকদের আমলেই সূচিত হয়েছিল। এ সময়েই মুসলিম শাসকদের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় দরবেশ ও সুফীগণ এদেশের ভাষা ও সাহিত্যের শুধু উৎকর্ষ সাধনই করেননি, বরং একটি মহৎ মনন ও আধ্যাত্ম জীবনের পূর্ণ উপলব্ধির প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান।

www.pathagar.com

৬. তদানীন্তন গোটা ভারত মুসলিম শাসকদের নিকট হতেই সামাজিক আদব-কায়দা, শিক্ষালাভ করেছে। ডঃ স্পীয়ার এ প্রসঙ্গে মুঘল সম্রাটদের কৃতিত্ব তুলে ধরেন এভাবে ঃ

যতদিন পর্যন্ত মুঘল দরবারের স্থায়িত্ব ছিল, ততদিন পর্যন্ত তা সমগ্র হিন্দুস্থানের আদব-কায়দা ও সৌজন্য শিক্ষার শিক্ষায়তন ছিল।

—Twilight of the Mughals: Spear, P 82.

শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান ঃ একটি উদ্ধৃতি

পরিশেষে প্রখ্যাত প্রবন্ধকার এম. ওয়াজেদ আলীর "শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমান" শীর্ষক প্রবন্ধটির একটি সুবিস্তৃত উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো। এ থেকে পাঠক সমাজ সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন তদানীন্তন মুসলমানদের জ্ঞান চর্চা ও এর পৃষ্ঠপোষকতার নিষ্ঠা ও ব্যাপকতাকে। তিনি লিখেনঃ

"মুসলিম জগতের সহস্র বর্ষব্যাপী বিজ্ঞান-চর্চার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, অমুসলিমরা জ্ঞানের এই দীপালি-উৎসবে সমানভাবে অংশ নিতেন। সে যুগের মনীষীদের মধ্যে কেউ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কেউ ইহুদি, কেউ অগ্নিপূজক ছিলেন, কেউ আবার লুপ্ত প্রায় আদিম ধর্মের অনুসরণ করতেন। মনীষীদের ধর্ম, তাঁদের উন্নতি কিংবা প্রতিপত্তির পথে বিশেষ কোন বিঘ্নের সৃষ্টি করতো না। সর্বধর্মের, সর্বজাতির এবং সর্বদেশের ছাত্রদের জন্য শিক্ষানিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। সুদুর জার্মানি, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশ থেকে খ্রিস্টান বিদ্যার্থীরা এসে মুসলিম বিদ্যালয়সমূহে প্রবেশ করতো। আর সেখান থেকে বিদ্যা আহরণ করে চিন্তার গৌরবময় পতাকা উত্তোলন করতো। তাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে।

মুসলিম জগতের স্বাধীন চিন্তার এই দীপালি-উৎসবের যুগেই মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসেন।

মুসলমান নরপতি এবং শাসনকর্তারা গোড়া থেকেই একান্তভাবে বিদ্যানুরাগী এবং বিদোৎসাহী ছিলেন। স্থলপথে গজনীর সুলতান মাহমুদই প্রথম ভারতবর্ষে অভিযান করেন এবং পাঞ্জাবের কতক অংশ নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। গজনী বংশের রাজত্ব প্রায় দুই শত বৎসর ধরে চলেছিল (১০০০-১২০০ খ্রিঃ)। সুলতান মাহমুদ স্বয়ং জ্ঞানচর্চার বিখ্যাত একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শত শত পণ্ডিত, সাহিত্যিক, দার্শনিক, কবি, প্রভৃতি গুণী লোক তাঁর দরবারে প্রতিপালিত হতেন। মহাকবি ফেরদৌসী এবং সুধী শ্রেষ্ঠ আলবেরুণীর নাম কে না শুনেছে? সুলতান রাজধানী গজনী নগরে বিরাট এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন পুস্তকাগার এবং মিউজিয়াম (Museum) তখনকার যুগে বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের বস্তু ছিল। মাহমুদের বংশধরেরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপন করে তাঁরা প্রজাপুঞ্জের শিক্ষার সুব্যবস্থা করেছিলেন।

ভারত-বিজয়ী সুলতান শাহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী সর্বদা রাজাকার্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ভোলেন নি। আজমীর প্রদেশে তিনি অনেকগুলি মক্তব এবং মাদ্রাসা স্থাপন করেন। নিজের ক্রীতদাসের শিক্ষার তিনি যে সুব্যবস্থা করেন, ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া যায় না। তাঁর ক্রীতদাসের মধ্যে দিল্লীর প্রথম সুলতান বাদশাহ কুতুবুদ্দীন, বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার খলজী প্রভৃতি ইতিহাসে অমর কীর্তি রেখে গেছেন। শাহাবুদ্দীনের সন্তানের অভাব তাঁর দাসেরাই পূরণ করেছিলেন।

ভারতের প্রথম মুসলমান সম্রাট সুলতান কুতুবুদ্দীন আয়বক একজন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি পণ্ডিতদের যথেষ্ট সম্মান করতেন। তিনি সাম্রাজ্যে বহু সংখ্যক মসজিদ স্থাপন করেন এবং সেইসব মসজিদে শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করেন।

সুলতান আলতামাস একজন বিদোৎসাহী নরপতি ছিলেন। মহাকবি আমীর খসরু, পণ্ডিতপ্রবর ফখরুল মূলক ওসমানী, দার্শনিক কুহানী প্রভৃতি সুধী এঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন। তিনি দিল্লীতে একটি উচ্চ শ্রেণীর মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

আলতামাস-দুহিতা সুলতানা রাজিয়া সাহিত্যিকদের যথেষ্ট সমাদর এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি মাদ্রাসা-ই-মুইজী নামক বিরাট এক শিক্ষানিকেতন স্থাপন করেন।

সুলতান নাসিরুদ্দীন সুধী ব্যক্তিদের যথেষ্ট সমাদর ও সাহায্য করতেন। তৎকালে লেখক মিনহাজ সিরাজ তাঁরই দরবারের একজন সভাসদ ছিলেন। সুলতান নতুন এক মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং মিনহাজ সিরাজকে এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন শিক্ষার বড় একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর যুগে মোঙ্গলদের দৌরাত্ম্যে মুসলিম-রাজ্যসমূহ ধ্বস্তবিধস্ত হচ্ছিল। অসংখ্য মুসলিম সুধী এবং পণ্ডিত বিভিন্ন দেশ থেকে এসে তাঁর দরবারে আশ্রয় নেন। তিনি মুক্ত হস্তে তাঁদের সাহায্য করেন; ফলে তাঁর দরবারে প্রতিভাশালী সুধীমণ্ডলীর বিস্ময়কর এক সমাবেশ ঘটেছিল। আমীর খসরু, শেখ ওসমান তিরমিজী, শেখ আকবর গাঞ্জ প্রভৃতি প্রতিথযশা মহাপণ্ডিত তাঁর দরবার অলঙ্কৃত করতেন।

www.pathagar.com

বলবন তাঁর কর্মচারীদের আদেশ দিয়েছিলেন, "জ্ঞানী, গুনী এবং বিদ্বান লোকদের উপকার করতে যত্নবান হবে। তাঁদের আদর-যত্নে ত্রুটি করবে না, অকাতরে তাঁদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করবে। তাঁদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তোমাদের কর্মধারাকে সুপথে পরিচালিত করবে, তাঁদের পরামর্শে তোমাদের শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।"

বলবনের পুত্র মোহাম্মদ সুধী এবং পণ্ডিতদের এক সমিতি স্থাপন করেন। মহাকবি আমীর খসরু এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন। সমিতিতে বিভিন্ন দার্শনিকতত্ত্ব এবং সাহিত্য-সমস্যার ধারাবাহিক আলোচনা চলতো। বাদশাজাদাদের দৃষ্টান্ত দেশময় অনুসৃত হত। দেশের সুধীজন উৎসাহের সঙ্গে সাহিত্য এবং দর্শনের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

বলবনের দ্বিতীয় পুত্র বুগরা খাঁ একজন সুরসিক রাজপুত্র ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের গায়ক, নর্তক, নট, কথক প্রভৃতিদের এক সভা স্থাপন করেন। এই সভায় বিভিন্ন চারুশিল্পের নিয়মিত চর্চা এবং আলোচনা হতে থাকে। রাজ্যের আমীর-ওমরাহ্ প্রভৃতি বড়লোক বাদশাহের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। ফলে দেশের চারুশিল্পের এক অভিনব এবং সমৃদ্ধ যুগের সূত্রপাত হয়। খিলজী বংশের প্রথম নরপতি সুলতান জালালুদ্দীন একজন পরম বিদ্যোৎসাহী বাদশাহ ছিলেন। পণ্ডিত এবং সুধীজনের তিনি যথেষ্ট সমাদর করতেন।

সে যুগের বাদশাহের মধ্যে ফিরোজ শাহ্ তোঘলকের নাম এই উপলক্ষে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বয়ং একজন সুপণ্ডিত, সাহিত্য-সেবী ছিলেন এবং সাহিত্যিকদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন। "ফতুহাতে ফিরোজ শাহী' নামক স্বরচিত এক গ্রন্থে তিনি তাঁর রাজত্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর দরবারে বহু সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, ভৌগোলিক প্রতিপালিত হতেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বারুনী তাঁরই সভায় একজন বিশিষ্ট রত্ন ছিলেন।

সাম্রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে তিনি সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। শিক্ষার পথ জনসাধারণের জন্য সুগম করবার উদ্দেশ্যে তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ পণ্ডিতদের প্রেরণ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষা দেশময় বিস্তারলাভ করে।

ফিরোজ শাহ্ প্রাচীন, লুপ্তপ্রায় মক্তব, মাদ্রাসা প্রভৃতি সংস্কার সাধন করেন এবং বহু নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পঞ্চাশটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সর্বপ্রথম বিদ্যালয়টির নাম 'ফিরোজ শাহী মাদ্রাসা' রাখা হয়। এই বিদ্যালয়টিকে এক উদ্যানের দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়। অতিথিদের থাকার জন্য এবং বিদ্যার্থীদের আহার-

www.pathagar.com

বিহারেরও সমুচিত ব্যবস্থা হয়। উপাসনার জন্য সুন্দর এক মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন এক হৌজ বা চৌবাচ্চা নির্মাণ করা হয়। আজকালকার পরিভাষায় প্রথম শ্রেণীর একটি 'আবাসিক মহাবিদ্যালয়' (Residential College) প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রিয় পুত্র শাহজাদা ফতেহ খাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে ফিরোজ শাহ্ কদম শরীফে অনুরূপ আর একটি শিক্ষা নিকেতন স্থাপন করেন। রাজ দরবারে দাসদের শিক্ষার জন্য ফিরোজ শাহ্ সুন্দর ব্যবস্থা করেন।

দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় বাদশাহ্‌রাও জনসাধারণের সুবিধার ব্যবস্থা করতে অবহেলা করেন নি। তাঁদের যুগে বদায়ুন এবং কুটের নামক স্থান দুটি শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এখনও এই দুই স্থানে বহু উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা-নিকেতনের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

লোদী বংশের প্রথম নরপতি বাহ্‌লুল অনেকগুলি নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বাহ্‌লুলের পুত্র সেকেন্দার লোদী একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর কবিনাম বা ভনিতা হচ্ছে গুলরুখা। তিনি পণ্ডিত এবং সাহিত্যিকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতে ভালবাসতেন। সাম্রাজ্যে তিনি বহু নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় তিনিই সর্বপ্রথম সৈনিক বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়। বহু বৈদেশিক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় এবং বৈদেশিক চিকিৎসকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই বিদ্যোৎসাহী নরপতির যুগে চিকিৎসাবিষয়ক এক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়। সুলতানের নামানুসারে গ্রন্থের নাম 'তীবে সেকেন্দারী' রাখা হয়। রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে সে যুগে এ গ্রন্থ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য রূপে (Authoritative) বিবেচিত। সুলতান বিভিন্ন দেশ থেকে বহু বৈজ্ঞানিককে রাজধানীতে আনয়ন করেন এবং বহু অর্থব্যয়ে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি সংগ্রহ করেন। সুলতানের আদেশে এই সব গ্রন্থের ফার্সি অনুবাদ রচিত হয়।

সেকেন্দার লোদী রাজধানী দিল্লী থেকে আগ্রায় স্থানান্তরিত করেন। নূতন রাজধানীতে শিক্ষা এবং সাহিত্য আলোচনার সমুচিত ব্যবস্থা করতে তিনি ত্রুটি করেন নি। আগ্রায় কয়েকটি উচ্চাঙ্গের নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

এই বিদ্যোৎসাহী নরপতির যুগে ভারতের হিন্দুরা শাহী বিদ্যালয়াদিতে আরবি-ফার্সি শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। ফার্সি শিক্ষায় তাঁরা বিশেষ আগ্রহ দেখান। অতি অল্প দিনের মধ্যে ফার্সি শিক্ষায় তাঁরা আশ্চর্যজনক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক Blochman লিখেছেনঃ

www.pathagar.com

"Hindus from the sixteenth century took so zealousy to Persian education that before another century had elapsed they had fully come up to the Muhammadans in point of literary acquirements."

শিক্ষার বিষয়বস্তু

ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার প্রাক্কালে মুসলিম শাসিত ভারত ও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তদারক করার জন্য যথাক্রমে ডঃ লিট্‌নার ও মিঃ এডাম দায়িত্ব নেন। মিঃ এডাম বাংলাদেশ সম্পর্কে এই রিপোর্ট পেশ করেন যে, তদানীন্তন বাংলায় এক লক্ষ স্কুল ছিল। প্রসংগত **জেনারেল স্লীমেন** এসময়কার শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে **'রেমব্লস এণ্ড রিক্যালেকশন'** গ্রন্থে যে তথ্য পরিবেশন করেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

ক. প্রাথমিক স্তর ঃ

১. ধর্মীয় শিক্ষা ২. পঠন ৩. লিখন ৪. গণিত

খ. উচ্চতর স্তর ঃ

১. আরবি	২. ফারসি	৩. ব্যাকরণ	৪. অলংকার শাস্ত্র
৫. দর্শন	৭. আখলাক	৭. বিজ্ঞান	৮. শিল্পকলা
৯. গণিত	১০. ধর্মতত্ত্ব	১১. ইতিহাস।	

শিক্ষার স্থান

ইসলাম শিক্ষাকে ফরয করেছে। শিক্ষা ব্যতীত ইসলাম কি তা বোঝা যায় না; ইসলাম না বুঝে কেহ মুসলমান হতে পারে না। অন্যকথায় অশিক্ষিত লোক সঠিক মুসলমান নয়; মুসলমান হতে পারে না। ফলে মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ছিল ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। এ জন্যই মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং মসজিদ সংলগ্ন গৃহে মক্তব, মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। তাছাড়া কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও অন্যত্র স্থাপন করা হয়েছে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে।

নারী শিক্ষা

যেহেতু ধর্মীয় ভাবধারা দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম শাসকদের রাজত্বে প্রাধান্য পেয়েছিল সেহেতু নারী-শিক্ষার সুযোগ আধুনিক বিশ্বের মত অযাচিতভাবে অবারিত ও মুক্ত ছিল না। এ প্রসঙ্গে রলিনসনের উক্তিটি উল্লেখ্য ঃ

"পর্দা প্রথার তাগিদে নারীরা খোলাখুলি কোন কোন শিক্ষাসদনে যোগ দিতে পারতেন না, কিন্তু প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারেই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী অথবা অভিভাবিকা নিয়োগ করা হতো। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুসলিমরা স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করতো। এ প্রয়োজনের অনুভূতিতেই বিদ্যোৎসাহী সম্রাট আকবর

www.pathagar.com

ফতেহপুর সিক্রিতে একটি নারী শিক্ষালয় স্থাপন করেন। অনেক মুসলিম মহিলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন এবং অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। সম্রাট আকবরের ফুফু গুলবদন বেগমের 'স্মৃতিকথা' ছিল জনসমাজে সুবিদিত। আকবরের ধাত্রী-মাতা মাহারু আনাজা একটি কলেজের ব্যয়ভার বহন ও পরিচালনা করতেন। আকবরের স্ত্রী সেলিমা সুলতানা, সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল এবং আওরঙ্গজেবের ভগিনী শাহজাদী জাহানারা খ্যাতনাম্নী মহিলা কবি ছিলেন। পর্দা প্রথা মেনে নিয়েও মুসলিম মহিলারা বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করতেন; যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনাও করতেন। এঁদের মধ্যে দিল্লীর সুলতানা রাজিয়া, আহমদ নগরের বীরাঙ্গনা চাঁদ বিবি ও দিল্লীর নূরজাহানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

শিক্ষার প্রতি আগ্রহ

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্লীম্যান তাঁর 'Rambles and Recollections' গ্রন্থে লিখেন ঃ

"ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার যতটা ব্যাপ্তি পৃথিবীর আর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ততটা নেই। যিনি মাসিক মাত্র বিশ টাকা রোজগার করেন, তিনিও প্রায় একজন প্রধান মন্ত্রীর মতোই স্বীয় সন্তানদিগকে শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করেন। তারা আরবি, ফারসি ভাষাগুলোর মাধ্যমে ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র ও দর্শন ইত্যাদিতে শিক্ষা লাভ করে"। (পৃষ্ঠা ৫২৩) জ্ঞান চর্চা ও বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ ও অনুরাগ মুসলিম শাসকবর্গ কী পরিমাণই না সৃষ্টি করেছিলেন তা উক্ত আলোচনা থেকে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। 'শুধু শিক্ষিত হওয়াই যথেষ্ট ছিল না তখন; বরং কোন ভাল পুস্তাকাগার বা লাইব্রেরী না থাকলে কোন ব্যক্তিকেই সম্ভ্রান্ত বলে মনে করা হতো না।"

[এস. এম. ইকরাম ঃ ভূমিকা ঃ পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, পৃষ্ঠা ৩০ দ্রঃ]

এ প্রসঙ্গে দিল্লীর সুলতানাতের সময় শিক্ষক তথা আলিম সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মর্যাদা ও প্রভাবটুকুও লক্ষণীয়। নিম্নে এর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

দিল্লীর সুলতানাত আমলে শিক্ষক সমাজের মর্যাদা

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইশতিয়াক হোসেন কোরেশী দিল্লীর সুলতানাতের সময় আলিম সমাজ ও শিক্ষকদের সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা মানবজাতির শিক্ষার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় বিশেষ। তিনি ঐতিহাসিক বারণীর 'মাসালিকুর আবসার' (পৃষ্ঠা ৫৮০) গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলেন যে, সে সময় জেলা প্রধানদের (সদর উস-ছুদুর) প্রধান কাজ এই ছিল যে তারা উচ্চ মেধা সম্পন্ন ও সুশিক্ষিত

www.pathagar.com

ব্যক্তিদেরকে রাজকীয় বৃত্তি প্রদানের জন্য সুলতানদের নিকট সুপারিশ পেশ করতেন। এই উদ্দেশ্যে যেন এ ধরনের সুধী ব্যক্তিবর্গ জ্ঞানচর্চায় নিরবিচ্ছিন্ন মনোনিবেশে সমর্থ হন। এতদসঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে, সে সময়ে আলিম সমাজকে কোন আইনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রভাবান্বিত করার কোন নজীর সুলতানাত আমলে পরিদৃষ্ট হয়নি। রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম আইন ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন আলিম মৌলিক যোগ্যতার পরিচয়ে ব্যর্থ হলে তবে তাকে অভিযুক্ত করা হতো। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে আলিম এত প্রবল ছিলেন যে তিনি সুলতানের শাসন ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করতে শুধু সাহসই পেতেন না, বরং সুলতান তাঁর কাছে পর্যন্ত জবাবদিহি হতে বাধ্য হতেন। উদাহরণস্বরূপ সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীকে তার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কাজীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হতে হয়েছিল।

সুলতানাত আমলে কলেজসমূহ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত পুরোমাত্রায়। বিপুল পরিমাণ আর্থিক ও জমি সংক্রান্ত দান ছিল এসব প্রতিষ্ঠানের একমাত্র আয়ের উৎস। শিক্ষার্থীরা নিঃখরচায় থাকা খাওয়াসহ লেখাপড়া করার সুযোগ পেত। সে সময়ের মাদ্রাসাগুলো ছিল মধ্যযুগের বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সংরক্ষণাগার। প্রকৃতপক্ষে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের প্রাক্কাল পর্যন্ত সুলতানাতের আমলে দিল্লী ছিল ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণাগার। জনাব ইশতিয়াক এ প্রসঙ্গে বলেন,

"At that time the Muslim Empire of India was the vanguard of human progress, not a fallen wayfarer abandoned by the caravan to muse on its past glories.

[Ishtiaque Hossain Qureshi: The Administration of the Sultanate of Delhi, 5th Edition, June 1971, Taj offset Press, Delhi—6, India, P. 177]

মুসলিম আমলে ভারতের শিক্ষা-চিত্র ঃ

মুসলিম পরিবারের শিশুদের হাতে খড়ি হতো পবিত্র কোরআনের কিছু অংশ শিক্ষা দানের মাধ্যমে। এ. আর. মল্লিকের বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান শীর্ষক ইংরেজী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

"বাংলার মুসলমানদের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যখন কোন সন্তানের বয়স চার বছর চার মাস চার দিন পূর্ণ হতো, তখন তার বিদ্যাশিক্ষার সূচনা করা হতো। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ শিশুকে পাঠ করে শুনানো হতো এবং শিশু তা পুনরাবৃত্তি করতো। এ ছিল প্রতিটি মুসলিম পরিবারের অপরিহার্য প্রথা।

[A.R. Mallick, British Policy And the Muslim in Bengal, P. 149]

www.pathagar.com

তদানীন্তন মুসলিম শাসিত ভারতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য শাসকদের ও সুফী সাধকদের অবদান কীরূপ ছিল এর উল্লেখ রয়েছে "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস"—এ নিম্নভাবে ঃ

ভারতের মুসলিম শাসকগণ বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জনকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। এবং এর জন্য প্রভূত অর্থ বরাদ্দ করেছেন। রাজ দরবারে জ্ঞানীগুণী ও পণ্ডিতগণ বিশেষভাবে সমাদৃত হতেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য রাজ্যের বিভিন্নস্থানে প্রভূত পরিমাণে লাখেরাজ ভূসম্পদ দান করা হতো। এমন কোন মসজিদ অথবা ইমামবাড়ি ছিলনা যেখানে আরবি ও ফারসি ভাষায় অধ্যাপকগণ অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন না। যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বেশি, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মক্তব খোলা হতো। মুসলিম শিশুগণ সেখানে আরবি, ফারসি ও ইসলামী শিক্ষা লাভ করতো। বিশেষ করে বাংলার সুলতানগণ বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অধিকতর অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁরা সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম জমিদার, লাখেরাজদার, আয়মাদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মুসলিম প্রধানগণ তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় মক্তব, মাদরাসা কায়েম করতেন এবং এসবের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রভূত ধন-সম্পদ ও জমিজমা দান করতেন।

[আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২য় সংস্করন, ১৯৯৫ পৃঃ ১৪০-১৪১]

অনুরূপ অবদানের চিত্র পাওয়া যায় জনাব এফ. ফজলুর রহমানের The Bengali Muslim And English Education গ্রন্থের ১৪০ পৃষ্ঠায়। চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ ডাবলিও এডম এর মতে, সেখানে অতি সুলভে এমনকি বলতে গেলে বিনে পয়সায় শিক্ষা লাভ করা যেত। প্রতি মসজিদ ছিল মুসলিম জনগণের কেন্দ্রীয় আকর্ষণস্থল। আর মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল মাদরাসা। সেখানে যেকোন ছেলে মেয়ে বিনে পয়সায় লেখাপড়া শিখতে পারতো। অবশ্য উচ্চ শিক্ষার জন্য কিছু বেতন দিতে হতো। কিন্তু তাও ছিল সামান্য। উল্লেখ্য, ইংরেজদের আগমনের পর খ্রিস্টান মিশনারী স্কুলসমূহে ইংরেজি শিক্ষা দেয়া হতো। সেখানে কেউ বিনা বেতনে পড়াশুনা করতে পারতো না। কেউ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে তার সন্তানাদির বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ দেয়া হতো। মুসলমানদের বিনে পয়সায় অথবা অল্প খরচে বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ ছিল, তার একমাত্র কারণ হলো-মুসলমান শাসকগণ এবং বিত্তশালী মুসলমানগণ বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে অকাতরে ধন সম্পদ জমিজমা প্রভৃতি দান করতেন।"

www.pathagar.com

মুসলিম যুগে হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষা

ভারতের মুসলিম শাসন শুধু মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষার উন্নয়ন ও প্রগতিতে সীমিত ছিল না; বরং এদেশের অমুসলিম তথা 'অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ' সমাজকেও শিক্ষার আলোকে অবগাহিত করে মানব সভ্যতার আঙ্গিনায় ঠাঁই করে দিয়েছিল। তাছাড়া মুসলিম সাধক ও পর্যটকগণও তদানীন্তন হিন্দু পণ্ডিতদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করে 'শিক্ষার' বলয় বিস্তৃততর করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন প্রাণপণে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মুসলমানদের আগমনের পূর্বে ভারতের তথাকথিত পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কঠোরভাবে রক্ষণশীল ছিলেন। ফলে ভারতের 'শিক্ষার বন্ধ্যাত্ব' উপড়িয়ে ফেলার দায়িত্ব মুসলমান পরিব্রাজক ও শাসকদিগকেই প্রথম নিতে দেখা যায়। হিজরী ২২৫ হতে ৩৪০ পর্যন্ত সময়টুকুতে সুলাইমান তাজের, আবুজায়েদ শিরানী, আবুল হাসান মাসউদী, আবু ইসহাক ইস্তিখিরী প্রমুখ মুসলিম পর্যটক ভারতে আগমন করেন। চতুর্থ শতক হিজরীতে আবু দালাক মাশআর নীবোয়ী ও বাশশারী মুকাদ্দাসী নামক দুজন পর্যটক ভারত সফর করেছেন বলে জানা যায়। এরা ভারতের, বিশেষ করে মুলতান, মনসুরাহ ও বোম্বাই এলাকায় শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে ব্রতী হন। ঐতিহাসিক মাসউদীর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে তৎকালীন হিন্দু রাজা মুসলমানদের সাথে ধর্মালোচনায় আনন্দ পেতেন।

বিখ্যাত পর্যটক ও ঐতিহাসিক আল-বিরুনীর 'কিতাবুল হিন্দে' উল্লেখ আছে যে, তিনিই প্রথম হিন্দুদের ভাষা ও তৎকালীন হিন্দু পুস্তকাদি অধ্যয়ন করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেন। 'হিন্দী সংখ্যাবিজ্ঞানের চেয়ে আরবি সংখ্যা বিজ্ঞান' যে অনেক উন্নত, এ শিক্ষাও তিনি সে সময়কার ভারতবাসীকে তালিম দিয়ে বুঝান। আল-বিরুনীর সৃজনশীল প্রতিভা ও জ্ঞানের গভীরতায় বিমুগ্ধ হয়ে তদানীন্তন হিন্দুরা তাকে 'বিদ্যার যাদুকর বা বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করতে মোটেই কার্পণ্য বোধ করেন নি।

বেনারসের ভুজয় ব্রাহ্মণ নামক জনৈক হিন্দু কাজী নুরুদ্দীন নামক জনৈক মুসলিম মনীষীর নিকট হতে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করেন। এমনিভাবে কাশ্মীরের নরপতি সুলতান জয়নুল আবেদীন (৮২৬ হিঃ) হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য আরবি ও ফারসি কিতাব সংস্কৃতে অনুবাদ করান।

১৪২ হিজরীতে দেখা যায় আদেল শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আদেল (ন্যায়পর) শাহ ভারতীয়দের সুবিধার্থে ফারসির পরিবর্তে হিন্দী ভাষা প্রবর্তন করেন।

www.pathagar.com

মোগল আমলে ফারসি ভাষার কদর হিন্দুদের মধ্যেও বিপুলভাবে পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুদের ঘরে ঘরে ফারসি ভাষা চর্চার ধুম পরে যায়। জন্নাব আবুল ফজলের 'আইনে আকবরীতে' ফারসি বিশারদ তেত্রিশজন প্রখ্যাত হিন্দু পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে দেবব্রজন অন্যতম, যিনি 'মহাভারতের' ফারসি তর্জমা করে অমরত্ব লাভ করেছেন।

ব্রিটিশ আমলে জ্ঞানের সর্বজনীন পৃষ্ঠপোষক এই মুসলমানদেরকে প্রদমিত ও অবনত রাখার জন্য যুগপৎ ইংরেজ ও হিন্দু সম্প্রদায় 'ফারসি' ভাষা উঠিয়ে দিয়ে 'ইংরেজী' ও সংস্কৃতবহুল বাংলা চালু করে।

হিন্দু পণ্ডিতদের মর্যাদা

মুসলমান বাদশাহ-সুলতানগণ প্রাচীন ভারতের জরাজীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা উত্তরণে শুধু পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎকর্ষই সাধন করেন নি; বরং এর সাথে সাথে তদানীন্তন হিন্দু পণ্ডিতদেরকে অচিন্তনীয় মার্যাদাও দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক ফরশ্‌তার বর্ণনায় পাওয়া যায়, কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদীনের আমলে শ্রীভট্ট নামক জনৈক পণ্ডিত চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষাদান করেন এবং এজন্য তাঁকে রাজদরবারে উচ্চ সম্মানের আসন দেয়া হয়।

আকবরের নবরত্নের একরত্ন তোডরমলের রাজকীয় মর্যাদা, সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক সূর্যসিংহ নামক কবিকে 'ইনাম' স্বরূপ হাতি প্রদান, ইত্যাদি আজও জাতিভেদ প্রথা, শ্রেণী-সংগ্রাম ও বর্ণ-সংগ্রাম বিযুক্ত তথাকথিত মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানবতা সম্প্রসারণের সমুজ্জ্বল অধ্যায় বিশেষ।

বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার ঃ

'মুসলিম -পূর্ব যুগে' যে বাংলা ভাষা 'এক পৃষ্ঠার'ও মালিক ছিল না সে ভাষাকে সাধারণ মানুষের ও সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করে শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মুসলমানরাই অগ্রণী ও অদ্বিতীয়। 'Promotion of the Learning in India' গ্রন্থটির মূল উপসংহারই হচ্ছে এই যে বাংলার সুলতানগণের প্রচেষ্টাতেই বাংলা ভাষা উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হতে পেরেছে। নাসের শাহের (১৮২৮ খ্রিঃ) পৃষ্ঠপোষকতায় 'মহাভারতের' প্রথম বঙ্গানুবাদ, সুলতান হুসাইন শাহের আমলে 'ভগবত পুরাণের' বঙ্গানুবাদ, পরবর্তীতে পণ্ডিত **গিরিশ চন্দ্র ঘোষের** 'কোরআন শরীফ, তাজকেরাতুল আওলিয়া ও মেশকাত শরীফের' বঙ্গানুবাদ উক্ত মন্তব্যের চির অম্লান স্বাক্ষর।

www.pathagar.com

মোটকথা বর্তমান পাক-ভারত-বাংলাদেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতার যে, বিচ্ছুরণ ও বিকিরণ ঘটছে, এর পাদমূলে রয়েছে তদানীন্তন মুসলিম শাসক ও পরিব্রাজকদের অতৃপ্ত সাহিত্যানুরাগ, শিক্ষা-পিপাসু মন ও তাদের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জনকল্যাণের অপার আগ্রহ। তাদের অসি-মসি বিরচিত করেছে ভারত-ইতিহাসের মানবিক শিক্ষা-সভ্যতা, সাংস্কৃতিক ময়দান ও সৌন্দর্য। অথচ অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই বিংশ শতাব্দীতেও অমুসলমানগণের অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তা মুসলমানদের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সেই ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে না ধরার জন্য বিবেক-দংশনটুকু পর্যন্ত অনুভব করছেন না।

[হীনমন্যতা ও মুসলিম আমলে হিন্দুদের শিক্ষা ব্যবস্থা–সুলায়মান নদভী, দ্রষ্টব্য।]

ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা ঃ

মুসলিম যুগের অবসান ঘটে বেনিয়া ইংরেজদের আগমনে। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহে সিপাহী দমনের মাধ্যমে সমগ্র পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশে বেনিয়া ব্রিটিশ তাদের কূট শাসন ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

ব্রিটিশরা প্রথমে এসেই মুসলমানদেরকে সমূলে উৎপাটনের কাজে সর্বপ্রকার শক্তি, ক্ষমতা-বুদ্ধি ও কলাকৌশল কঠোর ও সুচিন্তিতভাবে নিয়োজিত করে। তারা হৃদয়ঙ্গম করে, রাজ্যহারা মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও ধর্মীয় দিক থেকে পঙ্গু ও সর্বশান্ত না করতে পারলে মুসলমানেরা সুযোগ পেলেই পুনরায় ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু করে দেবে। তাই ইংরেজরা প্রথম নীতি হিসেবে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে বিশেষ মনোযোগী হয়। **উইলিয়াম হান্টারের** কথায় ব্রিটিশরা মুসলমানদেরকে সন্দেহের চোখে দেখত। তারা মনে করত যে যেহেতু তখন পর্যন্ত মুসলমানরাই ছিল ভারতের প্রকৃত শাসক, কাজেই তাদেরকে ব্রিটিশদের বশ্যতা স্বীকার করাতেই হবে। হান্টার সাহেব অন্যত্র বলেন, "এদেশ আমাদের অধিকারে আসার আগে তারা (মুসলমান) শুধু যে রাজনৈতিক নিয়ন্তা ছিল তা-ই নয়, চিন্তার ক্ষেত্রেও ছিল তারা প্রধান শক্তি। তাদের শিক্ষাব্যবস্থা মোটেই উপেক্ষণীয় ছিল না। ---- এবং এ ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা চিন্তার ক্ষেত্রে এবং বৈষয়িক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল।" মুসলমানদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব খর্ব এবং নির্মূল করার উদ্দেশ্যে হান্টার সাহেব লিখেন,"ইতিমধ্যে আমরা আমাদের নিজস্ব এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছি এবং যেই মাত্র এই নতুন ব্যবস্থায় যথেষ্ট নতুন লোক শিক্ষিত হয়েছে তখনই আমরা পুরনো মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি, আর

www.pathagar.com

মুসলমান যুবকদের সামনে কর্মসংস্থানের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।" [দ্রষ্টব্যঃ The Indian Mussalmans] ব্রিটিশদের এই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল H. Sharp-এর কথায়, 'তারা হবে এমন এক শ্রেণীর যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়; কিন্তু রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।' [Selection from Educational Research. Part—1, P. 23] ইংরেজদের এ উপমহাদেশে আগমন ও শাসন প্রতিষ্ঠায় হিন্দু এবং শিখ সম্প্রদায় অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়েছিল। এ সম্পর্কে ১৮৪২ সালে জনৈক ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারী একখানা পত্র ডিউক অব ওয়েলিংটনের কাছে পাঠান। তার কিয়দংশ প্রণিধানযোগ্য ঃ "আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, যারা (মুসলমান) আমাদের দয়ার উপর বেঁচে আছে, তারা মোটেই আমাদের হিতৈষী নয়। পক্ষান্তরে আমি দেখছি হিন্দুরা আমাদের বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে ----- কাজেই আমাদের নীতি হওয়া উচিত হিন্দুদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত করা এবং তা'দিগকে সর্বতোভাবে সমর্থন করা।" মোটকথা, তদানীন্তন ব্রিটিশ আমলে মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখার জন্য ব্রিটিশ এবং হিন্দুরা একযোগে মুসলিম আমলের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করে যে এই অভিশাপ থেকে আজও বাংলাদেশের মুসলমান পূর্ণ মুক্তি পায়নি।

ইংরেজরা মুসলিম শাসনামলের প্রবর্তিত শিক্ষার শুদ্ধি অভিযানের জন্যে প্রথমে ফারর্সি এবং পরে আরবি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষাকে এই উপমহাদেশে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে চালু করে। রাজা রামমোহন রায় ও অন্যান্য হিন্দু ব্যক্তিবর্গ এ দেশের শিক্ষার বাহন 'ইংরেজি' করার জন্য কোম্পানীর সহযোগিতায় তখন মেতে উঠেন। মেকলে ব্রিটিশ শিক্ষার প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বলেন ঃ "We are withholding from them the learning for which they are craving, we are forcing on them the much-learning which they nauseate."

—এরা (মুসলমানগণ) যা শিক্ষার জন্য উদগ্রীব, তা থেকে তাদেরকে নিবৃত্ত করছি। আর যা তাদের ঘৃণার উদ্রেক করে তা বহুল পরিমাণে শিক্ষার জন্য বাধ্য করছি।

উইলিয়াম হান্টার এ জন্যই বোধ হয় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন নিম্নভাবে ঃ "নিঃসন্দেহে আমরা ভারতে অনেক স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেছি। কিন্তু মুসলমানগণ এসব স্কুল ও কলেজে তাদের সন্তানদিগকে পাঠাতে অনিচ্ছুক।" অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেন যে, ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষায় মুসলমানদের হৃদয়ের ৩টি প্রগাঢ় অনুভূতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তা হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

১. ফারসি ও আরবি ভাষার পরিবর্তে তদানীন্তন বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ ও একাজে হিন্দু শিক্ষক নিয়োগ।
২. মুসলমানদের জীবনের মর্যাদা ও স্বীয় ধর্মের চর্চা ও অনুশীলনসমৃদ্ধ ভাষা ও বিষয়বস্তু বঞ্চিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন।
৩. মুসলমান যুবকদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা উপেক্ষা করণ।

ফলে ব্রিটিশভারতের শিক্ষা মুসলমানদের নিকট শুধু অগ্রহণযোগ্য ও বর্জনীয়ই হয়ে উঠেনি; বরং তা তাদের জাতীয় সত্তা ও স্বীকৃতির কবর রচনার বিকটরূপও পরিগ্রহ করে।

হিন্দু ও অমুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে। তারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ-ভারতে চাকুরী-বাকুরী ও এর প্রভাব প্রতিপত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। অপরদিকে মুসলমানগণ ইংরেজি ভাষা ও ফিরিঙ্গী সভ্যতা পরিহার করার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের শাসন ও প্রভাব থেকে নিজেদেরকে বিমুক্ত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। পরিণামে এরা তদানীন্তন ভারতে শুধু শাসকের মান-মর্যাদা ও শান-শওকতই হারাননি; বরং আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেওলিয়াও হয়ে পড়েন।

ব্রিটিশ আমলের প্রবর্তিত শিক্ষা ভারত উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রিধারার জন্ম দেয়।

১. ইংরেজি-মাধ্যম বিশিষ্ট দেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
২. অমুসলিম ও দরিদ্র ভারতবাসীদেরকে ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্যে খৃষ্টান মিশনারী স্কুল।
৩. ইংরেজদের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে পরিমুক্ত রেখে স্বীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য সন্তানদেরকে শিক্ষা দানের জন্য মুসলমান কর্তৃক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ইংরেজি মাধ্যম বিশিষ্ট দেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হিন্দু শিক্ষকদেরকে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত করা হয়। তারা এসব প্রতিষ্ঠানে যুগপৎ ব্রিটিশ এবং হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে নিবেদিত হন। বাইবেল ও রামায়ণ-মহাভারতের বিষয়বস্তুর আলোকে এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণীত ও নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ইংল্যান্ডের সাথে পরিচিত হবার জন্য সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ ডিগ্রী লাভের জন্য বহু ভারতীয় (বাঙালিসহ) তখন সাগর পাড়ি দেয়। অবশ্য পরে মুসলমানদেরও কিছু সংখ্যক উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় সে দেশে পদার্পণ করেছিলেন বৈকি।

www.pathagar.com

ক. কলিকাতা বুক সোসাইটির অবদান

এই প্রসঙ্গে দেশের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, উন্নয়ন ও বিকাশে আর একটি শাখা বা বিভাগের অবদান অপরিসীম, যা শুধু সাধরণ্যই নয় অনেক সুধীও এর খবর রাখেন না,বা রাখেন নাই বলে প্রতিভাত হয়। এটি হচ্ছে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটিও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকধর্মী খ্যাত লেখক অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদের "কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি" তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধটি এ গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে না পড়লে হয়তো আজও এ সম্পর্কে তার-ই মতো অজ্ঞতার তিমিরে বাস করতে হতো অনেককে। প্রবন্ধের নামকরণটিতে প্রথমেই মনে হয় এটি একটি নিছক "বই ব্যবসার" সংগঠন বা ফার্ম। কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পর এই ধারণার চমৎকার পরিবর্তন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতার এই দুই সোসাইটি মৌলিক ভাবে আমাদের শিক্ষার উন্মেষ ও সম্প্রসারণে যে অবদান রেখেছে তা শুধু বিস্ময়করই নয়, বরং আমাদের শিক্ষা জগতের অমূল্য অহংকারও বটে। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮ খ্রিঃ) এর জন্ম বৃটিশদের উদ্যোগে, ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম শিক্ষিত জনতার সহযোগিতায়। এদুটো নন্ একাডেমিক আকারে আমাদের একাডেমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে স্বচ্ছ স্বাতন্ত্রিক ভূমিকা ও অবদান রেখেছে।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে আসার পর (১৮১৩ খ্রিঃ) এদেশ শিক্ষাখাতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকার মঞ্জুরী পায়। এ অর্থ এত অপ্রতুল ছিল যে এতে ভারতবর্ষের শিক্ষান্নোয়ন সম্ভব হতো না। তাছাড়া শিক্ষানীতি সার্বিক ব্রিটিশ শাসিত ভারতে কি হবে তা-ও নির্দিষ্ট ছিল না। ফলে হ-য-ব-র-ল অবস্থায় তদানীন্তন ভারতের শিক্ষা জগত ছিল নিপতিত। একদিকে মুসলমানদের বৈরী ভাব ব্রিটিশ শাসন ও শিক্ষাদানের উপর বিরাজমান; অপরদিকে ব্রিটিশ শাসকদের মুসাবিদায় হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষী তৎপরতায় শিক্ষার প্রয়োজনীয় ও সুস্থ বিকাশ ছিল একটি বিরাট সমস্যা। ১৮১৭ সালে 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার জটিলতা ও জঞ্জাল ধীরে ধীরে অপসৃয়মান হতে লাগল। এই কলেজের মাধ্যমেই প্রথম উচ্চ শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়। বাংলা, সংস্কৃত, ফারসির সাথে ইংরেজিশিক্ষা শিক্ষাক্রমে সংযুক্ত হয়ে কলেজটি অভিজাত হিন্দুদের আধিপত্যে পরিচালিত হতে থাকে। এই অবস্থায় ভারতের আপামর জনসাধারণের শিক্ষা বঞ্চিত চিত্রটি ছিল বড়ই মর্মপীড়াদায়ক। Provisional Committee of the School Book Society এর রিপোর্টের একাংশে সেসময়কার জনগণের অবস্থা নিম্নভাবে বিবৃত করা হয়।

www.pathagar.com

"এখানে আমরা বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে দেখি যারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছে; তাদের মধ্যে কোন উচ্চাশা নেই, কোন উদ্দীপনা নেই, জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনরূপ বুদ্ধির সংগ্রাম নেই। আমাদের সামনে একটা জ্ঞানের সাম্রাজ্য মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে হবে।" [Hindoustanee press, Calcutta, 1817, P = 3]

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি এই করুন রিপোর্টের বিষয়বস্তু হৃদয়ংগমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হয়। নিজস্ব গঠনতন্ত্র তৈরি করে ২৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি বানিয়ে প্রতিটি সোসাইটি শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের জন্য মাঠে নেমে পড়ে। কমিটির সদস্য-বিশ্লেষণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

সেক্রেটারি ২জন

১ জন ইউরোপীয় প্রথম সেক্রেটারি ঃ এফ আর্ডিং

১ জন দেশীয় দ্বিতীয় সেক্রেটারিঃ তারিনী চরণ মিত্র (ফোর্ড উইনিয়াম কলেজের উর্দু বিভাগের প্রধান)

অবশিষ্ট ২২ জন দেশীয় হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ে।

সোসাইটির উদ্দেশ্যে ছিল নিম্নগুলো

১. পুস্তক রচনা, প্রকাশ ও সস্তা দামে বা অনুদান হিসাবে বিদ্যালয় ও পাঠশালায় সরবরাহ করা।

২. সোসাইটি শুধু মাত্র চরিত্র গঠন সহায়ক ঐ ধরনের নীতিমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করবে যা কোন ধর্মের উপর আঘাত হানবে না, পাশাপাশি ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার থেকে বিরত থাকবে।

ভাষার ক্ষেত্রে সোসাইটি উর্দু, ফারসি এবং ইংরেজি এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিল এজন্য যে প্রথম দুটি ভাষা সাধারণ ও সুধীদের ব্যবহারিক ভাষা, এবং শেষটি ইউরোপীয়দের সাথে লেন-দেন এবং চাকুরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা।

যে কোন অংকের বার্ষিক চাঁদা নিয়ে সোসাইটির সদস্য করে তহবিল গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রথম বছর (১৮১৭-১৮) চাঁদা দাতাদের সংখ্যা ছিল ২২৫ জন। এদের মধ্যে ১২৭ জন ছিলেন ইউরোপীয়, ৬৮ জন মুসলমান এবং অবশিষ্ট ৩০ জন হিন্দু। এই সদস্যদের মধ্যে ইংরেজ বা ইউরোপীয়দের পরে দ্বিতীয়টি ছিল মুসলমান যাদের সংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় দ্বিগুনেরও বেশি। এও লক্ষণীয় মোটা অংকের চাঁদা দাতাদের মধ্যেও মুসলমানরা ছিলেন অগ্রগামী। যেমন ঃ

www.pathagar.com

লখনৌর নবাব ইমতিয়াজদৌলা, মুর্শিদাবাদের নবাব জয়নুল আবেদীন এবং ঢাকার নসরত জঙ্গ। ১৮১৭-১৮ সালেই পরবর্তীতে সংশোধিত দাতাদের নাম প্রকাশ করলে দেখা যায় সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ছিল ২০৮ জন যার শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরূপঃ

ইউরোপীয় = ১১৪ জন, মুসলমান ৬৬ জন এবং হিন্দু = ২৮ জন।

এক্ষেত্রেও হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা আড়াই গুণ বেশী, তাছাড়া মুসলমান চাঁদা দাতাদের মধ্যে একজন মুসলিম মহিলাও ছিলেন, তিনি হচ্ছেন মুর্শিদাবাদের ফয়েজুননিসা বেগম।

এখানে যেটি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষণীয় তা হচ্ছে এই যে ঃ

১. সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে ২$\frac{১}{২}$ গুণ বেশি ছিল।

২. মুসলিম মহিলাও ছিলেন সোসাইটির সদস্য।

৩. মুসলিম লেখকদের বিশেষ করে ফারসিভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তকের অবদানও ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ

মৌলভী হায়দর আলী ও তোফাজ্জল হোসেন খানের জ্যোতিষ বিষয়, জ্যামিতি ও বীজগণিতের পাণ্ডুলিপি যা পরে আরবিতেও অনুদিত হয়।

৪. প্রকাশনা শিল্পেও মুসলমানদের অবদান খুবই প্রশংসনীয়। যেমন সৈয়দ হাব্বান আফগানীর প্রেস, মুন্সী মীর্জা আব্বাসীর প্রেস, প্রকাশক হিসাবে হিদায়াতুল্লাহ এণ্ড কোং, মুনসী দিলার আলী, মুনশী মীরজান অমূল্য অবদান রেখেছেন পুস্তক-প্রকাশনার জগতে। জনাব F. Fazlur Rahman এর "The Bengali Muslims and English Education" গ্রন্থে প্রকাশনা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে এই ভাবে ঃ

"It is ...... a strong proof of spirit of enterprise on one hand, and of curiosity on the other, among the Natives." [Ed. Dhaka, 1973, P= 54]

এই উদ্ধৃতি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে স্থানীয় প্রেস মালিকেরা (মুসলমান) বই প্রকাশ করে একদিকে যেরূপ বীরত্বপূর্ণ তেজোদীপ্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন, অপর দিকে তাদের জ্ঞান প্রসারণে অশেষ কৌতূহল ও আগ্রহের অভিব্যক্তিও ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ "ইকরা" 'পড়' এর ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্বের প্রেরণা যে তখন-ও বৃটিশ শাসিত ও হিন্দু আধিপত্য মুসলিম বিদ্বেষী ভারতে জ্ঞানের স্ফূরণ ও বিকাশে মুসলমানরা কতই না উদার ছিল, সোসাইটির ইতিহাস এর উজ্জ্বল সাক্ষী! ছাপাখানার বদৌলতে সে সময়ে ভারতের জ্ঞান রাজ্যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত,

www.pathagar.com

ফরাসি বিপ্লব, ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব, ওয়াহাবী আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ের প্রবেশ ঘটেছিল। প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের সংখ্যা ১৮২১ সালে ছিল ১,২৬, ৪৪৬ টি। এই সময়ে বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দুস্তানী (উর্দু), ফারসি ও আরবি ছিল এই মহাদেশের গণভাষা।

খ. কলিকাতা স্কুল সোসাইটি প্রসঙ্গ

এবার কলিকাতা স্কুল সোসাইটি সম্পর্কে কিছুকথা ঃ ১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এই সোসাইটি গঠিত হয়। স্কুল বুক সোসাইটির কর্মকর্তারাই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। এই সোসাইটির বিশেষ লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপঃ

১. প্রচলিত বিদ্যালয়সমূহের উন্নতি বিধান ও এসব প্রতিষ্ঠানে সাহায্যদান।

২. প্রয়োজনবোধে নতুন বিদ্যালয় ও পাঠশালা স্থাপন ও এগুলোকে সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করণ।

৩. ভারতের সাধারণ মানুষের এবং বিশেষ ভাবে ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সীর প্রদেশগুলোর অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করণ।

৪. প্রাথমিক ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে প্রতিভাবান ছাত্রদের নির্বাচন করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রেরণ।

৫. উক্ত প্রতিভাবানদের থেকেই যোগ্য শিক্ষক ও অনুবাদক বাছাই করে শিক্ষার সাধারণ পদ্ধতির উন্নতি বিধান।

৬. সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যপুস্তকের অনুমোদন, নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষাপদ্ধতির অনুমোদন।

উক্ত লক্ষ্য অনুযায়ী স্কুল সোসাইটি যেসব কৃতিত্বের অধিকারী হয় তা ১৯২০ সালের সোসাইটির রিপোর্ট অনুযায়ী সংক্ষেপে এইঃ

ক. ২,৪০০ ছাত্র সোসাইটির তত্ত্বাবধানে আসে।

খ. একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

গ. ১৮১৮ সালের নভেম্বরে "ঢাকা স্কুল সোসাইটি" এবং ১৬ই জুন "মুর্শিদাবাদ স্কুল সোসাইটি" স্থাপিত হয়।

যাহোক, পরবর্তীতে ছাত্র সংখ্যা ২৩৮৭ তে উন্নীত হয় এবং স্কুলের সংখ্যা ৮৫তে দাঁড়ায়।

এভাবে যখন কলিকাতা স্কুল সোসাইটি গরীব ছাত্রদের লেখাপড়া ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি সহ স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল, কালক্রমে এই ধারা ব্যাহত হয়ে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যায়। ১৮৩৩ সালে অর্থাৎ ১৫ বছরের মধ্যে এই সোসাইটি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ ভাবে। এই দুটি সোসাইটির কর্ম-

www.pathagar.com

পরিচিতির মধ্যে আমরা মোটামুটি দুটো জিনিস সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পাই; তা হচ্ছেঃ

১. তদানীন্তন ভারতে টেক্সটবুক লিখন, মুদ্রণ, প্রকাশ ও সস্তাদামে বই সরবরাহ করার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়া-লেখার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল।

২. এই সোসাইটির অর্থ তহবিল গঠন ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের অর্থ ও মেধা ছিল বেশি নিয়োজিত।

মাত্র পাঁচ বছর পর্যন্ত সোসাইটির কার্যক্রম যথাযথ পরিচালিত হওয়ার পর কতিপয় কারণে চাঁদা দাতাদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। যেমনঃ

১. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদের মধ্যে নানা স্বার্থ নিয়ে চরম কোন্দল মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।
২. এদেশের শিক্ষা নীতি, শিক্ষাদর্শন ও পদ্ধতির অনিশ্চয়তা ও অপরিচ্ছন্নতায় জনমনে সংশয় সৃষ্টি হয়।
৩. রাজা রামমোহন রায়ের "আত্মীয় সভা" (১৮১৫) সংগঠনের প্রভাবে হিন্দুবুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সোসাইটির বিপরীতে একাধিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সৃষ্টি হয়।
৪. ১৮৩০ সালে সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভীর নেতৃত্বে সীমান্ত সংগ্রামের সূচনা হয়।
৫. "ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি" (১৮৩৯)-এর মাধ্যমে মুসলিম জমিদারসহ জমিদারদের সংগঠন কায়েম হয়।
৬. ১৮৩১ সালে বালাকোটের যুদ্ধের জের এবং
৭. ১৮৩৩ সালে টমাস মেরিনটন ম্যাকলের শিক্ষা সংক্রান্ত "মন্তব্য পত্রের" প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট

বিভিন্নমুখী কারণের সাংঘর্ষিক মনোভাব ও দুশ্চিন্তায় সোসাইটির নিবেদিত চাঁদা দাতাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে চরম ভাবে। এভাবে একমাত্র "ক্যালক্যাটা স্কুল বুক সোসাইটি" ১৮৬২ সালে "ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি" এর সাথে সংযুক্ত হয়ে বিলুপ্ত হয় বলে জানা যায়।

গ. বৃটিশ আমলে মাদ্রাসার পটভূমি ও স্বরূপ

যাহোক বেনিয়া ইংরেজ রাজদণ্ড হাতে নেওয়ার পর সম্যক উপলব্ধি করে যে এদেশকে শুধু দেশী স্কুলের মাধ্যমে ইংরেজদের অনুগত বা Most obedient servant বানালেই চলবে না; বরং ধর্মান্তরিত করে কিছু নেটিভ খ্রিস্টান বানিয়ে

www.pathagar.com

ক্ষুদে লর্ড বা His Master's Voice রচনা করা দরকার। এ উদ্দেশ্যে উইলিয়াম এডামের সময় হতেই অর্থাৎ উনবিংশ শতকের সূচনাতেই মিশনারী স্কুল খোলার অলিখিত ও অঘোষিত পরিকল্পনা নেওয়া হয়। আর্ত-পীড়িত ও বেকারদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য ও বিদ্যাদানের আকর্ষণীয় অভিনয়ে; বিশেষ করে বিয়ে সাদীর সুযোগসহ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর লোকদেরকে সহজেই এরা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রয়াস পায়। হাসপাতাল, এতিমখানা ও পরে মিশনারী স্কুলের মাধ্যমে 'মগজ ধোলাই' এর শিল্প নৈপুণ্য কাজ এরা চালিয়ে যায়। গস্‌পেল ও বাইবেলের আলোকে চরিত্র ও জীবন দর্শন রচনা করাই হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানের ফাদার ও সিস্টার (শিক্ষক/শিক্ষিকা নয় বরং বাবা-মা সদৃশ অর্থেই) সম্প্রদায়ের কাজ। এদের ত্যাগ ও নিষ্ঠার প্রভাব কী পরিমাণ গভীর ও সূক্ষ্ম ছিল তা শ্রী মধুসূদন দত্তের 'মাইকেল'-এ রূপান্তরিত হওয়ার দৃষ্টান্তটিই যথেষ্ট।

তদানীন্তন ভারত উপমহাদেশের মুসলমানগণ উক্ত দু'ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষময় ফল পূর্বেই আঁচ করেছিল। আর এরই জন্য এরা প্রথম দিকেই ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজ প্রণীত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাঙ্গনে নিজেদের সন্তান সন্ততিদিগকে পাঠায়নি। বিকল্প হিসেবে মুসলমানগণ নিজেদের ধর্ম, তাহযীব-তমুদ্দুন সংরক্ষণের জন্য মক্তব, মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুসলিম জনগণের অকাতরে দান-খয়রাত ও সাহায্য সহযোগিতায় মূর্ত হয়ে উঠে। ধর্মীয় ভাষা আরবি ও ইসলামের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ফারসির মাধ্যমে পাক কুরআন, হাদীস বা সিয়াসিত্তা, ফিকাহ্‌সহ চরিত্র গঠনমূলক গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ ইত্যাদি পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি দ্বারা এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কর্তৃক প্রবর্তিত 'দারসে নিজামীর' অনুসরণেই এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার প্রয়াসী হয়। আজও এ-ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তায় আপন প্রত্যয় ও প্রভায় টিকে রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে আমাদের 'কওমী' বা 'খারিজী' মাদ্রাসাসমূহ। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবীর (র) দেওবন্দ মাদ্রাসা হচ্ছে এর প্রথম ঐতিহাসিক নিদর্শন।

এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ ভারতে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্করণ ও প্রসারে যাঁরা প্রাণপণ প্রয়াসী ছিলেন তাঁদের কর্মকাণ্ডের উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ সংখ্যায় জনাব মুহাম্মদ আব্দুল্লাহর এর "মুসলিম ও ব্রিটিশ যুগে উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষা" শীর্ষক একটি তত্ত্ব ও তথ্যবহুল দুর্লভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের আলোকে দেখা যায় বৃটিশ আমলের পূর্বে পূর্ব বাংলার মাদ্রাসা সমূহের শিক্ষা বিষয়ক যথাযথ কোন তথ্য বা ইতিহাস ছিল না।

www.pathagar.com

এই অবস্থায় "এই উপমহাদেশের আরবি মাদ্রাসার ইতিহাস আলোচনায় সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হন মাওলানা শিবলী নুমানী"। তাঁর আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, সে সময়ে মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি শিক্ষাবর্ষে বিন্যস্ত ছিল না। পাঠ্যবিষয় হিসাবে তিন ধরনের গ্রন্থ ছিল ঃ ১. উচ্চ মানের গ্রন্থ, ২. মধ্যমানের গ্রন্থ ৩. নিম্নমানের গ্রন্থ। এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থ ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদান করা হতো এবং এর ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়া হতো। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মর্তব্য ঃ এই উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার চর্চা মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। ১০৬৫–৬৭ খ্রিঃ সেলজুকী মন্ত্রী নিযামুল মুলক তুসী দু'লক্ষ দীনার ব্যয়ে বাদগাদে "নিযামিয়া" নামে যে বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবে বাংলাদেশসহ তদানীন্তন গোটা ভারতে আরবি শিক্ষা কেন্দ্র ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠে। ফলে বর্তমানে "দারসে নিযামিয়া" নামে যেসব মাদ্রাসা আমাদের দৃষ্টিগোচরীভূত হয়, তা' ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই অপূর্ব দান।

মাওলানা শিবলীর কথায়

"নিযামিয়ার প্রাণ সঞ্চারক প্রভাব প্রত্যেকটি দেশকে অদ্ভুত ভাবে প্রভাবিত করে। এ শিক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ইসলামের আবির্ভাবের পঞ্চম শতকে। ষষ্ঠ শতকে স্পেন ছাড়া আর কোন দেশই এর প্রভাব থেকে মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনি।"

[মালাকাত-ই-শিবলী (৩) আযমগড়, ১৯৩২, পৃঃ ৪৩]

"দারসে নিযামিয়া"তে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং পাঠ্যসূচি অনুসরণে পাঠদান ও মূল্যায়ন করা হয়। পরবর্তীতে দারসে নিযামিয়ার অনুসরণে লখনৌতে প্রতিষ্ঠিত দারসে নিযামিয়ার পাঠ্যসূচিতে ঈষৎ পরিবর্তন সহ যে কয়টি বিষয় পড়ানো হতো; এর মধ্যে একমাত্র হাদীস গ্রন্থ মিশকাতুল মাসাবীহসহ প্রাচীনত্ব মুখী ধর্ম নিরপেক্ষ যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনে সবিশেষ জোর দেয়া হতো বটে তবে অংক এবং সাহিত্যের মূল্যায়ন ছিল অতি নগণ্য। জনাব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ তাঁর উক্ত প্রবন্ধে এই উপমহাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্রম বিকাশ পাঁচ যুগে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। সংক্ষেপে এর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

প্রথম যুগ (১২০১ থেকে ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দ)

এই যুগে আরবি পাঠক্রমে নিম্ন বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

সরফ, বালাগাত, ফিক্‌হ, উসুলই ফিক্‌হ, মানতিক, কালাম, তাসাউফ, তাফসীর, হাদীস।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় যুগ (১৫০১ থেকে ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দ)

এই যুগের পাঠক্রম প্রথম যুগের মতই ছিল প্রায়। ব্যতিক্রম হিসাবে পাঠ্যবিযুক্ত হয়েছিল কাযী আযুদ রচিত 'মাতালী' ও মাওয়াকিক' এবং সাক্কাকী রচিত 'মিফতাহুল উলুম'। এছাড়া ক্রমান্বয়ে 'শরহ-ই মাতালী' সহ আরো ৮টি গ্রন্থ পাঠ্য করা হয়।

তৃতীয় যুগ (১৬০১ থেকে ১৭৯৯ খ্রিঃ পর্যন্ত)

এই সময়টিতে আরবি ফারসির শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী তাঁর আত্মচরিত "আল জুযউল লতীফ" গ্রন্থে তদানীন্তন সময়ের পাঠ্যসূচির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

চতুর্থ যুগ (১৭০১ থেকে সূচিত হয়ে মুসলিম শাসনের পতন কাল ১৭৫৭ খ্রিঃ ও পরবর্তী সময়)

এ যুগের সূচনা হয় মোল্লা কুতুবুদ্দীনের প্রণীত পাঠ্যসূচি দিয়ে। এতে তিনি শাহ ওলীউল্লাহর পাঠসূচিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করেন। এতদসত্ত্বেও দারসে নিযামিয়া ও লখনৌ দারসে এর প্রভাব এযুগে বেশ পরিলক্ষিত হয়। মাওলানা শিবলীর মন্তব্য হচ্ছে এই যে, লখনৌর দারসে নিযামিয়ার প্রভাব "বর্তমান ভারতের কলকাতা থেকে পেশওয়ার পর্যন্ত" বিস্তৃত এবং এ পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে 'আলেম' বলে গণ্য করা হয় না।

পঞ্চম যুগ ঃ (মুসলিম শাসনের শোচনীয় পতনের যুগ ঃ ১৭৫৭–১৮৫৭ খ্রিঃ)

এই যুগে মুসলিমশাসন-পতনের সিঁড়ি বেয়ে ইসলামী শিক্ষার নিম্নমুখী ধারা সূচিত হয়। ফলে এ যুগে আরবিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধঃপতন ঘটে। লাখনৌর দারসে নিযামিয়ার বিকৃতি ঘটে। কোরআন-হাদীসের গ্রন্থগুলোর চেয়ে যুক্তিবিদ্যা, যা' সেকেলে ও গ্রিক তত্ত্বধর্মী ছিল, প্রাধান্য লাভ করে। এই সময়টিতে ইতিহাস, ভূগোল ও কুরআনের মূলনীতি বিষয়ক কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না। হযরত মাওলানা ওবায়দুল্লাহ পঞ্চম যুগের চিত্রায়ন করতে গিয়ে বলেনঃ

"We have seen in many works of modern logicians of Lucknow that they have been actually led into a most ridiculous system of indulging in vain subtleties and captious contests. The excessive pursuit of it in our schools has been productive of fruitless quibbling and cavilling. It is indeed, deplorable that this vain, pendantic knowledge has so much engaged the attention of the learned Muslims of India in later

www.pathagar.com

days that it has almost prevented them from pursuing other useful branches of learning".

[Report of the Muslim Education Advisory Committee, 1934, p= 72]

অর্থাৎ লাখনৌর আধুনিক যুক্তিবাদীদের অনেক রচনায় দেখা যায় যে তাদেরকে বাজে ও হাস্যস্পদ তর্কবিতর্ক ও ছিদ্রান্বেষী কথাবার্তার প্রতিযোগিতায় পরিচালনা করা হয়েছিল। এ ধরনের বাড়াবাড়িতে নিষ্ফল বাক-বিতণ্ডা ও মনোমালিন্য সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠানগুলো জড়িয়ে থাকত। এ ধরনের বাজে পাণ্ডিত্য জাহির করতে গিয়ে মাদরাসার উচ্চ শিক্ষিত জনেরা এতই মশগুল হয়ে পড়তেন যে জ্ঞানের অন্যান্য প্রয়োজনীয় শাখায় অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনে তারা সময়ই পেতেন না। এটা সত্যিই নিন্দনীয় ও লজ্জাস্কর বৈ কি।

প্রাক-ব্রিটিশ আমলে আরবি তথা মাদ্রাসা শিক্ষার বিশেষ লক্ষণীয় দিক ছিল এই যেঃ

১. শিক্ষা দানের মাধ্যম ছিল আরবি, এবং এই কারণে আরবি সাহিত্য অপেক্ষা আরবি ভাষা শিক্ষাদানের গুরুত্ব দেয়া হতো অত্যধিক।

২. মাদ্রাসা শিক্ষা বলতে "ইসলাম"কে নিছক ধর্ম হিসাবে শিক্ষা দানের ফলে শিক্ষার্থীরা দুনিয়া ও জাগতিক জ্ঞান সম্পর্কে অনবহিত ও অজ্ঞাত ছিল চরমভাবে।

৩. ১৭৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবে ধর্ম-হানির প্রশ্ন,(কার্তুজে শূকরের মাংস মাখানোর প্রচারণা) মুসলিম ঐতিহ্য ও শিক্ষা-বিদ্বেষী ইংরেজদের হিন্দু-প্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব, মাদ্রাসা শিক্ষায় ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি ভাবাদর্শ বিশিষ্ট ভালমন্দ নির্বিশেষে পাঠ্যপুস্তক পাঠ্যসূচিভুক্ত করার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে বিরূপ ভাব প্রচণ্ড আকার ধারণ করে।

এই প্রসঙ্গে এটাও লক্ষণীয়, মুসলিম শাসনামলে মাধ্যম হিসাবে ফারসির ভাষার যে প্রভাব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোর্ট কাছারী ও প্রশাসনে ছিল তা দ্বিতীয় শাহ আলমের (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রিঃ) শাসন ভার ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে সমর্পণ করার পরও বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত ফারসি সরকারী ভাষা হিসাবে মর্যাদাসিক্ত থাকার ফলে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সুধী সমাজের নিকট আরবিসহ ফারসি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন তখনো ছিল একটি আভিজাত্যের প্রতীক। যাহোক ইতোমধ্যে ১৮২৯ সালে ব্রিটিশ শাসকদের এক ফরমানের বলে প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক কাজকর্মে ইংরেজি ভাষাকে পর্যায়ক্রমে জারী করার ঘোষণা দেয়া হলে এই ফরমানের পরিণামস্বরূপ উক্ত ১৮৩৭ সালেই ফারসির

www.pathagar.com

অবলুপ্তি ঘটতে থাকে লক্ষণীয় ভাবে। সেইসময় থেকেই ছয়শত বছরের ব্যবহৃত ফারসি ভাষা বাংলাদেশ থেকেও সর্বোতভাবে বিদায় নেয়। অর্থাৎ প্রশাসন, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজি চালু হওয়ায় বাংলাদেশ সহ গোটা ভারতের মুসলমানেরা নাগরিক হিসাবে চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা দীক্ষায় অযোগ্যও অকেজো হয়ে পড়ে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে।

ধূর্ত ইংরেজ এটা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে ক্ষমতাহারা মুসলিমদের শাসিত ভারতকে 'বাগে' রাখতে হলে মুসলমানদেরকে ছলে বলে কৌশলে অবনত মস্তক রাখা অপরিহার্য। তাই তারা শিক্ষাঙ্গনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করে। উদাহরণস্বরূপ **ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ সালের অক্টোবরে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপনের** মাধ্যমে মুসলিম সেন্টিমেন্টকে প্রশান্ত করার প্রয়াসী হন। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে এটাই ছিল সর্বপ্রথম সরকারী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৭৯০ সাল পর্যন্ত এ মাদ্রাসায় দারসে নিযামী চালু ছিল। এর পূর্বে মুসলিম শাসনামলে মাদ্রাসা শিক্ষা বেসরকারী ভাবে চালু ছিল। ধর্মীয় বোধে উদ্বুদ্ধ দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ, আমীর ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতা ও তাদের মুক্ত হস্তে অর্থ বিত্ত-সম্পদ দানে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুশিক্ষা দানের মাঝে আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সুখ্যাতি অর্জনে। পরে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে নিউ স্কীম মাদ্রাসা প্রবর্তন করা হয়। এই স্কীমের মাদ্রাসা বাংলাদেশেও চালু হয়। এই ধরনের মাদ্রাসায় আরবি ভাষার সাথে সাথে আরবি সাহিত্য চর্চা পাঠ্যভুক্ত করে এর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ঘ. মাদ্রাসার পাঠক্রমে ইংরেজি অন্তর্ভুক্তির কারণ

ইতোমধ্যে কলিকাতা মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিবর্তনের প্রতিফলন বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ইংরেজরা এই মাদ্রাসার মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত নিস্ফল চেষ্টা চালায়। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কলিকাতা মাদ্রাসাকেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে এরা ব্যর্থ হয়। এর কারণ ছিল মুসলমানদের সচেতন ধর্মীয় অনুভূতি যার আলোকে মুসলমানরা দেখলেন, ধর্ম-নিরপেক্ষ, ধর্ম বিবর্জিত ইংরেজদের শিক্ষা প্রকারান্তরে ইসলামী শিক্ষা, আদর্শ ও ঐতিহ্যের ধ্বংস সাধনের একটি সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্র বিশেষ। এ ধরনের আশংকায় তারা ইংরেজদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি একদিকে যেরূপ বিরূপ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে

www.pathagar.com

উঠেছিল, অপরদিকে ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যকে প্রবলতর ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে রাখার প্রাণপাত প্রচেষ্টায় আরবি শিক্ষাকে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার বাহন হিসেবে আরো সমৃদ্ধ করার প্রয়াসী হন। ফলে সাহারানপুর, দেওবন্দ, দিল্লী, লখনৌ, রামপুর ইত্যাদি স্থানে কওমী মাদ্রাসা গড়ে উঠে। এসব মাদ্রাসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঃ কুরআন-হাদীস ও অন্যান্য সহায়ক পুস্তকের মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা, মুসলিম ঐতিহ্য বিধৃত ইসলামী সভ্যতার সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতাকরণ। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আরবি-ফারসি প্রচলিত ছিল তখন। এই সময়টিতে নওয়াব আব্দুল লতিফ কওমী মাদ্রাসার প্রচলিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ইংরেজি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেন। কারণ হিসাবে তিনি বলেন ঃ

Let it not be supposed that the combined study of the English with the Persian and Arabic will be any evil. On the contrary the fruits of English education will show off to the best advantage in conjunction with scholarship in the Mohammedan Classics. Unless a Mohammedan is a Persian and Arabic scholar, he cannot attain a respectable position in Mohamedan society. i. e. he will not be regarded or respected as a scholar and unless he has such a position, he can have no influence in the Mohamedan community. Consequently a Mohamedan who has received an English education, and has omitted the study of the Persian and Arabic, is little able to impart the benefits of that education to the members of his community; he cannot persuade others into an appreciation of the beneficence of the British rule, and the greatness of the British power. But, if he knows Persian and Arabic along with English, he acquires inflnence in society, and is of course sure to use his influence in the interests of the Government. The Goverment should, therefore, in my humble opinion, devise such means whereby the Mohamedan may be taught at once English and Persian and Arabic. [Abdul Lateef Knan Bahadoor, Minute of the Hooghly Mudrussa, Alipore, Calcutta, 1877, P=4]

www.pathagar.com

এ উদ্ধৃতি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে ফারসি আরবির সাথে ইংরেজি অধ্যয়নে কোন ক্ষতি তো নেই -ই, বরং ইংরেজিসহ ফারসি আরবি শিক্ষিত মুসলমান ব্রিটিশ শাসন ক্ষমতার উপলব্ধি ও মূল্যায়নে সক্ষম হবেন। এতে ব্রিটিশ শাসকদের নিকট একদিকে তার কদর যেরূপ বৃদ্ধি পাবে; অপরদিকে সামাজিক ক্ষেত্রেও তিনি সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে সমাদৃত হয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়নে ফলপ্রসূ ভূমিকাসহ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবেন। নওয়াব আব্দুল লতিফের এহেন বাস্তবধর্মী প্রজ্ঞাবিধৃত প্রতিবেদনের রূপায়ন ঘটে ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হুগলী মাদ্রাসা ও কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় আরবি-ফারসি ছাড়াও ইংরেজি সহ উর্দু ও বাংলা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ পেশ করার ফলে,এবং এরই ফলশ্রুতিতে স্যার সৈয়দ আহমদের প্রচেষ্টায় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতের আলীগড়ে আলীগড় স্কুল এবং এর দুবছর পর ১৮৭৭ সালে আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইতোমধ্যে অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে একটি করে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য, তদানীন্তন বাংলার লেফট্যান্টে গভর্ণর ক্যাম্পবেল হাজী মুহসীন ফান্ডের সাহায্য নিয়ে এই মাদ্রাসাগুলো প্রতিষ্ঠা করেন। এহেন পদক্ষেপে তাঁর মুসলিম শিক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল হৃদয়ের পরিচয় ফুটে উঠে বলে গবেষকরা মন্তব্য করেন। এই ৩টি মাদ্রাসার পাঠক্রম কলিকাতা মাদ্রাসার অনুকরণে অনুসৃত হয় এবং ইংরেজিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে প্রবর্তন করা হয়। এ প্রসংগে Education Advisory Committee এর সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

It had for some years been a subject of regretful comment that Moslems did not send their sons to the Government schools. In primary schools there was fair sprinkling; but in middle and zilla schools the number was small, while in high schools and colleges scarcely any Moslem appeared. It was a matter of complaint that Government schools and colleges did not supply the course of education which Moslem gentlemen desired their sons to receive. It was with this defect that the Madrasahs at Chittagong, Dhaka and Rajshahi were established. The encouragement of the study of Oriental literature for its own sake was a very subsidiary part of the plan; the main purpose was to found institution which should realise the Moslem ideals of a liberal education.

www.pathagar.com

যাহোক, পাঠ্যসূচিতে ইরেজি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে মুসলমান অভিভাবকদের সন্তান সন্ততি মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে ও পর্যায়ক্রমে তারা ধর্ম-হিসাবে ইসলামের জ্ঞান চর্চা করার পাশাপাশি তদানীন্তন আমলের ইংরেজ শাসকদের পরিবেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হয়। হযরত মাওলানা শিবলীর মার্চ ১৮৯০ সালে প্রদত্ত দিক নির্দেশক বক্তব্যে সে সময়কার মুসলমানদের "শিক্ষা পরিবেশ" এর একটি চমৎকার চিত্র ফুটে উঠে। তিনি বলেন ঃ

"আমি বারবার বলছি, আর এখনো বলছি যে, মুসলমানদের জন্য শুধু ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, আবার প্রাচীন আরবি মাদ্রাসার শিক্ষাও পর্যাপ্ত নয়। আমাদের সমস্যার প্রতিকার হলো, একটি মিশ্র ঔষধ, যার একটি অঙ্গ হবে প্রাচ্য, অপরটি হবে পাশ্চাত্য। (মালাকাত, পৃঃ ১৬৩) মাওলানা শিবলীর এই উক্তি থেকে দুটো বিষয় পরিচ্ছন্ন ভাবে উদ্ভাসিত ঃ

১. তিন সম্যক হৃদয়ংগম করতে পেরেছিলেন যে রাজ্যহারা মুসলমানদের শিক্ষা-সাহিত্য সংস্কৃতির পুনরুত্থান ও বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠায়ন পাশ্চাত্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ব্যতীত সম্ভব নয়।

২. এই ধরনের প্রচেষ্টা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বরং গোটা মুসলিম বিশ্বব্যাপী এর চেষ্টা-চরিত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। শুধু তথাকথিত ধর্মের আকারেই নয়, বরং ইসলামের সামগ্রিক দিকের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে "Pan Islam" এর কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হবে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতেও এই ধরনের জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব বা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে নিবিড় সংযোগ ও সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাদ্রাসার অঙ্গনে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তা-চেতনা ও কর্মতৎপরতার উন্মেষ ঘটে।

পরিবর্তনের এই স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হয়ে তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার মাওলানা আবু নসর ওহীদ (১৮৭২-১৯৫৩), নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯), নওয়াব সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ে **'নিউ স্কীম মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা'** চালু করেন। এই ব্যবস্থায় ইংরেজি বাধ্যতামূলক হয় এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ফারসি রহিত হয়ে যায়। পাঠ্যসূচি হিসাবে কুরআন, উর্দু, বাংলা, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজী, আরবী ও অংকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে বঙ্গ বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) পশ্চাদপদ মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে। ড. এস. এম হুসাইন, ডঃ সেরাজুল হক, ডঃ এম. এ. বারী, ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ প্রমুখ নমস্যব্যক্তি এই স্কীমেরই প্রত্যাশিত উপহার।

www.pathagar.com

যাহোক এমনিভাবে মাদ্রাসা শিক্ষায় পরিবর্তনের জোয়ার বেগবান হতে থাকে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মাদ্রাসাকে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত করন, তদ্রূপ চট্টগ্রাম ও হুগলী মাদ্রাসাকে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত করা সহ সিরাজগঞ্জের হাই মাদ্রাসাকে কলেজে পরিণত করন-ই প্রমাণ বহন করে আধুনিক বিশ্বের মোকাবেলায় ইংরেজি ও অনান্য আধুনিক বিষয় শিক্ষাদান মাদ্রাসা শিক্ষায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আমলে অর্থাৎ ১৯৫১ সাল থেকে নিউ স্কীম মাদ্রাসাগুলোকে হাই স্কুলে এবং ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোকে সাধারণ কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। নিউ স্কীমের এহেন পরিবর্তনের হাওয়া ওল্ড স্কীমের মাদ্রাসাগুলোকে স্পর্শ করলে এখানেও পরিবর্তনের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯০০ সালে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে "মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা" বাংলাদেশের একমাত্র প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; যেখানে উচ্চ পর্যায়ের কুরআন-হাদীস শিক্ষার (Higher studies of the holy Quran and Hadis) শিক্ষাক্রম প্রথম চালু করা হয়। বিভিন্ন কমিটি যেমন ঃ আল কনফারেন্স (১৯০৭), হর্নেল কমিটি (১৯১৪), হালী কমিটি (১৯১৫) সামসুল হুদা কমিটি (১৯২১), মুমিন কমিটি (১৯৩১), মওলা বখশ কমিটি (১৯৩৮), সৈয়দ মুআ'যযম হোসেন কমিটি (১৯৪৬), ইত্যাদি কমিটির বিবিধ কার্যক্রম ও প্রস্তাবনার ফলে এই মাদ্রাসাসহ অন্যান্য মাদ্রাসা শিক্ষায় সম্প্রতি যুগপোযোগী সংস্কারে আধুনিকায়নের ধারা রচিত হয়, যার ফলে বর্তমানে ওল্ড স্কীমে ও নিউ স্কীম মাদ্রাসার মাঝে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে যে ব্যবধান ছিল তা ব্যাপক ভাবে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এমনকি অধুনা স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচির সন্নিকটস্থ হয়ে পড়েছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম। এর প্রধান বোধগম্য কারণ এই যে সনাতন মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত জনেরা রাষ্ট্র ও সমাজে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির বাহিরের কোন কাজ-কর্ম, তথা চাকুরী-বাকুরী, প্রশাসনে কোন অর্থবহ ও সৃজনশীল অবদান রাখা থাক দুরের কথা অংশগ্রহণেও নিজেদেরকে সংযুক্ত রেখে তেমনিভাবে জীবিকা উপার্জনক্ষম হতে পারছেন না। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা প্রধানত দুর্বল ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকছেন, অবশ্য সামান্য ব্যতিক্রম ধর্মী কতিপয় ব্যক্তিত্ব ব্যতীত।

দ্বিতীয়ত, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রচলিত পাঠক্রম দুনিয়াদারীতেও মুসলমানদেরকে যোগ্যতা অর্জন ও দুনিয়া পরিচালনায় দক্ষ ও নিপুণ হওয়ার যে সবক দিচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের ঔদাসীন্য ও গাফলতি বিদূরিত হতে থাকে আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে আসার কারণে।

www.pathagar.com

একটি বিস্ময়কর বিস্মৃত দিক ঃ

এটাও বিস্ময়কর যে, যদিও প্রাচীনকাল ও ব্রিটিশ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ন্ত্রিত ছিল, সেই সময়কার অনেক ওস্তাদ ও আলিম "ইসলামের মর্যাদা ও জুলুস" রক্ষার জন্য নাসারা ও পৌত্তলিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, বিপ্লবী হিসাবে জীবন বাজী রেখে অন্যায়ভাবে জেল-জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত মাওলানা হুসাইন আহমেদ মাদানীর নাম সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ্য। তিনি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় (১৯১৪) তুর্কী খিলাফতের পক্ষ সমর্থনের কারণে সর্ব প্রথম ব্রিটিশের হাতে বন্দী হয়ে মাল্টা দ্বীপে কারা জীবন যাপন করেন। পরে 'রেশমী পত্র ষড়যন্ত্র" (রেশমী রুমাল আন্দোলন) এর অভিযোগে "রাওলাট কমিটি রিপোর্ট"এর ভিত্তিতে তিনি মাওলানা মুহাম্মদ হাসান সহ দ্বিতীয় বার বন্দী হন। মক্কার কারাগারে রাখার কয়েকদিন পর ১৯১৭ সালের ১২ই জানুয়ারী তাঁদের দুজনকেই মিশরের কারাগারে ও পরে ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে মাল্টা দ্বীপের জেলখানায় স্থানান্তর করা হয়। মাল্টা কারাগারে ৩ বৎসর ৭ মাস অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে অন্যান্য সঙ্গীদের সহ হযরত মাদানী মুক্তি লাভ করেন। তাঁর এহেন সংগ্রামী জীবনাদর্শও সম্প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক জ্ঞানে সুসজ্জিত হতে উজ্জিবীত করেছে পরমভাবে।

মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ মিআস এর "আসীরানে মাল্টা" গ্রন্থে এর করুণ ও লোমহর্ষক বর্ণনা রয়েছে। এই বর্ণনার সংক্ষিপ্ত অবতারণ। এখানেও করা এই তত্ত্বটুকু উন্মোচিত করতে হচ্ছে এই যে তদানীন্তন সময়ে যদিও মাদ্রাসার শিক্ষাদীক্ষা প্রধানত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত ছিল, তথাপি সে সময়কার মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ প্রয়োজনবোধে সংগ্রামী, বিপ্লবী ও আত্মত্যাগী হয়ে দীন ইসলাম ও মুসলিমদের ঈমান-আমল সংরক্ষণে শত্রুর ইবাদত মোকাবেলায় জীবন উৎসর্গীকৃত ছিলেন। ইসলামে শিক্ষকতা শুধু মসজিদ আশ্রিত নয়, প্রয়োজনে এতে তরবারী ধারণ-ও অপরিহার্য– এই নমুনা সেকেলে মাদ্রাসার শিক্ষাকতা এবং শিক্ষাঙ্গনেও ছিল প্রাণবন্ত ও উৎসাহব্যঞ্জক, যা বর্তমান জমকালো ও বর্ণ্যাঢ্য প্রাঙ্গন সংযুক্ত অনেক মাদ্রারাসার মুদারেচ্ছদের শিক্ষকতায় কদাচিতও সেই ত্যাগ তীতিক্ষা প্রতিভাত নয়। কুরআন-হাদীস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষাদান বর্তমানে পুঁথি ও অনুষ্ঠান তথা পৌরহিত্যবাদ সম হয়ে যাওয়ায় এবং ইসলামের জিহাদ ও রাজনীতি পাশ্চাত্য প্রচারণার মোহাবিষ্ট হওয়ায় আজকের অনেক মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ পরোক্ষভাবে হলেও ইসলাম বিকৃতকারী ও বিরোধীদের 'তাবে' হয়ে পড়েছেন; এবং ইসলামী শিক্ষকতাকে ক্লীবত্বে রূপান্তরিত করেছেন বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

www.pathagar.com

সংক্ষেপে ব্রিটিশ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষার আবর্তন ও বিকাশের ইহাই ছিল প্রাথমিক রূপ। এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে ভারত সহ বাংলাদেশের শিক্ষার জগতে মোটামোটি ৩টি আদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটে ঃ

১. ইংরেজি মাধ্যম দেশী প্রতিষ্ঠান সমূহে ধর্মনিরপেক্ষতা তথা বাঙালি-খ্রিস্টীয় শংকর ঐতিহ্য।

২. খ্রিস্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠানসমূহের খ্রিস্টবাদ।

৩. কওমী মাদ্রাসাসমূহের রাজনীতি বিবর্জিত ইসলাম শিক্ষা।

ফলে ব্রিটিশ ভারতে রাজ্যহারা মুসলমানগণ নিজেদের স্বকীয়তা ও আদর্শ বজায় রাখার জন্য ইসলামের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার আধার হিসেবে কওমী মাদ্রাসা স্থাপন করেন বটে; অপরদিকে ইংরেজি শিক্ষা ও এর প্রভাব বর্জন করায় এরা আর্থিক, সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সব সুযোগ হারিয়ে বিজাতীয় শাসন, ক্ষমতার দয়া ও সহানুভূতির পাত্র হয়ে পড়েন। এ করুণ অবস্থা তদানীন্তন কতিপয় ইংরেজ এবং কতিপয় শিক্ষিত মুসলমানের হৃদয়ে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। যেমনঃ

ক. উইলিয়াম হান্টারের শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার ধীরে ধীরে স্কুল এবং কলেজে আরবি এবং ফারসি বাধ্যতামূলক করে। দুটো বিষয় পড়ানোর জন্যে 'মৌলভী' শিক্ষকতার পদও রচনা করা হয়। এতে ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে মুসলমানরাও তাদের সন্তানদের স্কুল-কলেজে পাঠাতে শুরু করলেন।

খ. অন্যদিকে স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর মত প্রখ্যাত মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তৎপর হন। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে। স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে মোরাদাবাদে একটা মাদ্রাসা এবং ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে গাজীপুরে প্রথম একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' নামের প্রতিষ্ঠানটিরও স্থাপয়িতা ছিলেন তিনি। এ প্রতিষ্ঠানটির স্থাপন কাল হচ্ছে ১৮৭৫ সাল। আল-বিরুনীর কথায়ঃ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তিনিই এক নতুন সমন্বয় সাধন করেছিলেন, তাদের দিয়েছিলেন এক নূতন রাজনৈতিক চেতনা এবং নূতন শিক্ষা ও জীবন দর্শন। [—Makers of Pakistan:পৃষ্ঠা ৬০]

www.pathagar.com

গ. 'কওমী' বা খারিজী মাদ্রাসার পদাঙ্কানুসরণ করে ধীরে ধীরে নিউস্কীম বা আলীয়া মাদ্রাসারও জন্ম হল। এ সব মাদ্রাসার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ইসলামিক আদর্শ ও সংস্কৃতির সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষার বিষয়বস্তুও সন্নিবেশ করা হয়। এ মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ আরবিতে বুৎপত্তিসহ আধুনিক কলেজের ছাত্রদের মত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সনদ লাভ করার গৌরব অর্জন করে।

এমনিভাবে ইসলামী ঐতিহ্য ও আদর্শ শিক্ষার সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহ ও সুযোগ সৃষ্টি হলো বিপুলভাবে। সঙ্গে সঙ্গে ত্রুটি হিসাবে এটাও লক্ষণীয়, এ সুযোগেই ইসলামী আদর্শ এবং মূল্যবোধকে অদূর ভবিষ্যতে যথেষ্ট বিকৃত্ব ও বিকারগ্রস্ত করা হয়েছে। ইসলামে এ ধরনের ইংরেজি শিক্ষার জোড়াতালির বিষময় ফল কালক্রমে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠক্রম ও পাঠসূচীর ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে; যার ধ্বংসাত্মক ও নৈরাশ্যজনক চিত্র পরবর্তীতে তুলে ধরা হয়েছে। মোটামুটি ব্রিটিশ যুগের প্রভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার দেদীপ্যমান ছুরত-ছিরাত ছিল এমনটি।

মিশনারী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার ঃ

এবার মিশনারী শিক্ষার প্রতি দৃস্টি দেয়া যাক।

১৪৯৮ সাল। ভাস্কোদাগামা পানিপথে ভারতে পদার্পণ করার পর হতেই ইউরোপীয় বণিকদের সাথে তদানীন্তন ভারতের যোগাযোগ সূত্র স্থাপিত হয়। এ পথ ধরেই বেনিয়া ইংরেজদের সাথে সাথে তাদের ধর্মযাজকগণও ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেন। বাইবেলের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে এসব ধর্মযাজক ভারতীয় ভাষাসমূহ আয়ত্তে আনতে যত্নবান হন। ১৬০৮ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদে (Charter) মিশনারী কার্যপ্রচার ও প্রসারের একটি ধারাও এতদসঙ্গে সন্নিবেশ করা হয়। এ ধারার বলেই কোম্পানী এর বাণিজ্য কর্মশালাগুলোতে ধর্মযাজক নিয়োগ এবং স্কুল স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করে।

উক্ত ধারার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে 'খ্রিস্টীয় জ্ঞান প্রচার সমিতি' (Society for Promoting Christian Knowledge) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সমিতির প্রভাবে মাদ্রাজে সেন্ট মেরিজ চ্যারিটি স্কুল (১৭১৫ সালে) স্থাপিত হয়। জিগেল বাল্ক ও প্লুসাউৎ নামক দুজন যাজক ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। অনুরূপভাবে মাদ্রাজ, কলকাতা ও বোম্বেতে ধীরে ধীরে দু' একটি করে অসংখ্য মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল।

www.pathagar.com

কোম্পানী এসব স্কুলের আর্থিক যোগান দেওয়ার জন্যে ঃ

১. পৌনঃপুনিক সাহায্য দান;
২. লটারীর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহকরণ (বর্তমানে আমাদের দেশেও এ বদ্ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকা সঞ্চয় করতে দেখা যায়);
৩. স্কুলের সঞ্চিত তহবিল সুদে খাটিয়ে আয় বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করছিল।

মিশনারী শিক্ষকদের মধ্যে শ্রীরামপুরের তিনজন মিশনারীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। তাঁরা হচ্ছেন ১. উইলিয়াম কেরী, ২. মার্শম্যান ও ৩. ওয়ার্ড। এ তিন জনের মধ্যে কেরী ছিলেন অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ। তারই প্রচেষ্টায় ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার মাদ্রাসা এবং ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। আলীয়া মাদ্রাসার নেছাব বা পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও চালু করার ক্ষেত্রে উইলিয়াম কেরীর অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে জিহাদ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইত্যাদি পার্থিব বিষয় কাটছাট করে ইসলামকে নিছক একটি বৈরাগ্যবাদী ধর্মে রূপান্তরিত ও ক্লীব করার ক্ষেত্রে কেরী মুসলিম সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মিশনারীর শিক্ষার পরিণাম

১৮১৩ সালে গৃহিত মিশনারী এ্যাক্ট কোম্পানীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়ঃ

১. খ্রিস্টান মিশনারীগণ ভারত ও বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেন।
২. মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দারিদ্রক্লিষ্ট ভারতবাসী বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা দলে দলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে।
৩. অনুবাদের মাধ্যমে বাইবেল ধর্মগ্রন্থ এদেশের সাহিত্যে সম্মান ও মর্যাদা পেতে শুরু করে।
৪. প্রথম অবস্থায় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি চালু হয়।
৫. ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে বহু ভারতীয় ও বাংলাদেশী শিক্ষিত ব্যক্তি ভাল ভাল চাকুরী ও পদমর্যাদা লাভ করে দেশীয় কৃষ্টি, তমুদ্দুন ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে হীন ও ক্ষয়িষ্ণু করে তোলে।
৬. সর্বোপরি ব্রিটিশ সরকার মিশনারীদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে কেন্দ্র করে গোটা ভারতে বৃটিশ সভ্যতার শিকড় মজবুতভাবে প্রোথিত করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে, এবং

www.pathagar.com

৭. মিশনারী শিক্ষার মাধ্যমেই তদানীন্তন ভারতে তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার ভিত্ ও সৌধ নির্মাণ সহজতর হয়ে ওঠে। তাছাড়া কলেজ ও ইউনিভার্সিটি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রসার তখন থেকেই সূচনা লাভ করায় জাতি ও বর্ণে ভারতীয়, রুচি এবং প্রকৃতিতে 'ইংরেজ' দাসানুদাসের বহর সৃষ্টি হতে থাকে।

প্রসঙ্গত ইহাও উল্লেখ্য, এই সময়ে এই উপমহাদেশের মুসলমান, বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানগণ ফিরিঙ্গী সভ্যতাকে অত্যন্ত ঘৃণাভরে এড়িয়ে চলত। তারা ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রমাদ গণল;

ক. এই শিক্ষার মধ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং খ. এরই মাধ্যমে মুসলিম তথা ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বিকৃতির ভয়াবহ বীজ প্রচ্ছন্নভাবে প্রোথিত করা হচ্ছে।

শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে ইংরেজিকে (ইংরেজ সভ্যতাসহ) এই উপমহাদেশে চাপিয়ে দেয়ার ফলে ইংরেজি মূর্তমান হল দুটো রূপ নিয়ে। ডঃ জিল্লুর রহমান এ প্রসঙ্গে বলেন, "English remained at once an asset and a liability; an asset for the clever, and a liability for the ordinary. এখানে clever বলতে হিন্দু সম্প্রদায় এবং ordinary বলতে মুসলমানের অধিকাংশকেই ধরা যেতে পারে। কারণ হিন্দুরা ইংরেজি ভাষা ও সভ্যতাকে উন্নতি ও ক্ষমতা প্রতিপত্তির শিখরে আরোহণ ও তদানীন্তন মুসলিম জনগণের উপর দমননীতি প্রতিষ্ঠার প্রধান ও একমাত্র পন্থা হিসেবে ব্যবহার করেছিল। অপরদিকে মুসলমানেরা ইংরেজি ভাষা ও সভ্যতাকে ফিরিঙ্গী ভাষা ও সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে বর্জন করেছিল তামুদ্দনিক মর্যাদা ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে।

খ্রিস্টান মিশনারীদের শিক্ষার সামগ্রিক পরিণাম

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের সম্পর্ক রয়েছে ব্রিটিশ মিশনারীদের যীশুর বাণী বা সমাচার প্রচারের সাথে। বোর্ড অব ডিরেক্টর্স ১৬৫৯ সালে একটি বার্তায় সকল সম্ভাব্য উপায়ে যীশুর বাণী প্রচারের গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। মিশনারীদেরকে তাদের জাহাজে করে ভারত ভ্রমণের অনুমতি দেয়া হতো। এবং এখানে এসে দরিদ্র ও অজ্ঞ লোকদের মধ্যে যীশুর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে এ দেশের মাতৃভাষা শিক্ষা করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হতো। এ দেশে ইংরেজদের শিক্ষা বিস্তারের ধারা ছিল পর্যায়ক্রমিক। প্রথম

www.pathagar.com

পর্যায়ে খ্রিস্টান মিশনারীগণ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষায় স্কুল স্থাপন করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তাহযীব -তামাদ্দুন শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করে।"

[আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১-১৫২]

জনাব ফজলুর রহমানের গ্রন্থেও এই উদ্দেশ্যেটি নিম্নভাবে ব্যক্ত করা হয়েছেঃ

"মিশনারীগণ বছরের পর বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যায়। তারা হুগলী শ্রীরামপুরে একটি ছাপাখানা স্থাপন করে তার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বই পুস্তক প্রকাশ করে। এভাবে ১৮১৫ ঈসায়ী সালের মধ্যে একমাত্র কোলকাতার আশেপাশেই তারা ২০২টি স্কুল স্থাপন করেন। খ্রিস্টান মিশনারীগণ বাংলা ও ইংরেজি স্কুল স্থাপনের নাম করে খ্রিস্টিয় মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে ইসলাম ও তার মহান নবীর বিরুদ্ধে প্রচারণা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। উইলিয়াম কেরীর সভাপতিত্বে ১৮১৮ ঈ. সালে শ্রীরামপুর (হুগলী) কলেজ স্থাপিত হয়। এ কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞানদান করা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে এ দেশের লোককে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। শ্রীরামপুর কলেজ সেকালে এশিয়ার মধ্যে একমাত্র ডিগ্রী কলেজ। অথচ সেখানে কোন মুসলিম ছাত্র ছিল না। কারণ, প্রথমত এ কলেজের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল খ্রিস্টানধর্মের প্রচার এবং দ্বিতীয়ত, এতে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দেয়া হতো, যা মুসলমানদের মোটেই জানা থাকার কথা নয়।

এম. আর. মল্লিকের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয় ঃ

মিশনারীগণ কর্তৃক স্থাপিত স্কুল কলেজগুলোতে এবং সরকার কর্তৃক স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ৮০০ হিন্দু শিক্ষকদের সহযোগিতায় সংস্কৃত ভাষার প্রণালীতে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে থাকে। আর এ ধরনের বাংলা ভাষা মুসলমানদের কাছে অপরিচিত ছিল। যদিও নিম্ন বংগের মুসলমানেরা বাংলা বলতো; কিন্তু তাঁদের বাংলা ছিল আরবী ফার্সী মিশ্রিত।"

[এম, আর মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৬]

মোট কথা, "মিশনারীদের জানা ছিল যে, তাঁদের যোগাযোগের ফলে বেশি সংখ্যক হিন্দু খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করছে। সে জন্যই তাদের সকল প্রচেষ্টা হিন্দুদের প্রতি নিয়োজিত ছিল। অপরদিকে মিশনারীদের কাজে সাহায্য সহযোগিতার জন্য ইউরোপীয় বণীকগণও এগিয়ে আসে এবং বাংলায় প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি শিক্ষার গোড়াপত্তন তাদের দ্বারাই সূচিত হয়।

www.pathagar.com

জনাব আব্বাস আলী খানের 'বাংলার-মুসলমানদের ইতিহাস' গ্রন্থের বিবৃত তদানিন্তন বৃটিশ ভারতের মুসলমানদের শিক্ষা ও এর একটি প্রামাণ্য খতিয়ান যা' পাঠকদের জানা অতীব প্রয়োজন হিসাবে উদ্ধৃত করা হলো।

"এ দেশের লোকের শিক্ষা ও সুখ সুবিধার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তা বিলাত থেকে আনতে হতো না। এদেশের অর্থই এ দেশের লোকের জন্যে ব্যয় করা যেতো। এবং তা কখনো অনুগ্রহ অনুকম্পা বলেও বিবেচিত হতো না। এ ছিল এ দেশবাসীর অধিকার। কিন্তু এ অধিকার থেকে মুসলমানদেরকে করা হয়েছিল বঞ্চিত। সরকারী তহবিল থেকে মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে ব্যয় বরাদ্দ করা ত দূরের কথা, মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে প্রদত্ত দানকেও তাঁরা আত্মসাত করেছেন এবং অপাত্রে ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের দানের কথাই ধরা যাক। এ সম্পর্কে মুসলমানদের বক্তব্য পেশ না করে জাঁদরেল ইংরেজ ও খৃষ্টান হান্টার সায়েব কি বলেছেন তাই বিধৃত করা হচ্ছে ঃ

'১৮০৬ সালে হুগলী জেলার একজন ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান মৃত্যুর সময় তার বিরাট জমিদারী সৎকার্যে ব্যয়ের জন্যে দান করে যান। পরে তাঁর দু'জন ট্রাস্টীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। ১৮১০ সালে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সম্পত্তি অপব্যবহারের অভিযোগ আনলে সংকট চরমে উঠে এবং জেলার ইংরেজ কালেক্টর আদালতের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সম্পত্তির দখল নিয়ে নেন। ১৮১৬ সাল পর্যন্ত মোকাদ্দমা সরকার নিজ হতে গ্রহণ করেন। একজন ট্রাষ্টীর দায়িত্ব সরকার নিজে গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় জনের স্থলে নতুন একজনকে মনোনীত করেন। পরের বছর নির্ধারিত রাজস্ব প্রদানের শর্তে সমস্ত সম্পত্তি ইজারা দেয়া হয়। মামলা চলাকালীন বকেয়া পাওনাসহ ইজারা বাবদ প্রাপ্ত মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৫,৭০০ স্টার্লিং পাউন্ড। (এ আয় থেকেই কলেজ বিল্ডিং এর মূল্য পরিশোধ করা হয়। এ ছাড়াও জমিদারীর বার্ষিক আয় থেকে এ পর্যন্ত ১২০০০ স্টার্লিং পাউন্ড অধিক উদ্বৃত্ত হয়।

"আগেই বলেছি, জমিদারীর আয় বিভিন্ন সৎ কাজে ব্যয় করার জন্যে ট্রাস্ট গঠিত হয়। উইলে যেসব সৎকাজে ব্যয় করার কথা বলা হয়, তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় ধর্মীয় প্রচার অনুষ্ঠান প্রতিপালন, হুগলী ইমামবাড়া বা বড়ো মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ, একটি গোরস্থান, কতিপয় বৃত্তি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ যোগান দেয়া ট্রাস্ট গঠনের উদ্দেশ্যের আওতায় পড়ে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছানুসারে সেটাকে মুসলমানদের রীতিমাফিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে হবে। মুসলিম দেশগুলিতে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের জন্যে

www.pathagar.com

কলেজ প্রতিষ্ঠা করাকে ধর্মীয় কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এই উইলের অর্থ কোন অ-মুসলিম কলেজের কাজে ব্যয় করা উইলকারীর ইচ্ছার ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হবে এবং সেটা ট্রাস্টীদের ক্ষমতার গুরুতর অপব্যবহার হিসাবেই গণ্য হবে।

"সুতরাং এই তহবিলের টাকা একটি ইংরেজী কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করায় মুসলমানরা কিরূপ ক্রোধের সাথে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের অভিযোগ আনতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কার্যতঃ হয়েছেও তাই। কেবলমাত্র ইসলাম-ধর্মীয় কাজে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সম্পত্তির টাকা দিয়ে সরকার এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে যেখানে ইসলামের নীতিবিরোধী বিষয়সমূহ শিক্ষা দেয়া হয় এবং যে প্রতিষ্ঠান থেকে মুসলমানদেরকে কার্যত বাদ দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ একজন ইংরেজ ভদ্রলোক যিনি ফার্সী বা আরবী ভাষার একটি বর্ণও জানেন না। মুসলমানরা ঘৃণা করে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেয়ার জন্যে এ অধ্যক্ষ কেবলমাত্র মুসলমানদের কাজে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত তহবিল থেকে বছরে ১৫০০ স্টার্লিং পাউন্ড বেতন পেয়ে থাকেন। অবশ্য এটা ঐ অধ্যক্ষের কোন অপরাধ নয়। এজন্যে অপরাধী হচ্ছেন সরকার যারা তাকে এ দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন। গত পঁয়ত্রিশ বছর যাবত সরকার ঐ বিরাট শিক্ষা তহবিলের অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে তছরূপ করে আসছেন। সরকার নিজের গুরুতর বিশ্বাস ভংগের অপরাধ ঢাকা দেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস হিসাবে ইংরাজী কলেজটির সাথে একটি ছোট মুসলমান স্কুলকে (হুগলী মাদ্রাসা) সংশ্লিষ্ট করেন। কলেজ বিল্ডিং নির্মাণের জন্যে উক্ত তহবিলের টাকা তছরুপ করা ছাড়াও কলেজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে উক্ত তহবিল থেকে বার্ষিক ৫০০০ স্টার্লিং পাউন্ড ব্যয় করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই যে, তহবিলের ৫২৬০ স্টার্লিং পাউন্ড আয়ের মধ্যে মাত্র ২৫০ স্টার্লিং পাউণ্ড উক্ত ক্ষুদ্র মুসলিম স্কুলের জন্যে ব্যয় হচ্ছে এবং ট্রাস্টের মৌল বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ হিসাবে এ ক্ষুদ্র মুসলিম স্কুলটিই শুধু টিকে আছে।

"এ তছরুপের অভিযোগ নিয়ে বাদানুবাদ করা খুব কষ্টকর ব্যাপার কারণ এ অভিযোগ খন্ডন করা সম্ভবপর নয়। মুসলমানরা অভিযোগ করে বেড়াচ্ছে যে, মুসলমানদের এ বিরাট ধর্মীয় সম্পত্তির মালিকানা দখলের অসদুদ্দেশ্যে বিধর্মী ইংরেজ সরকার সম্পত্তির মুসলিম ট্রাস্টীদের অব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছেন এবং তারপর দাতার পবিত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যের বরখেলাপ করে সরকার মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন যার ফলে

www.pathagar.com

সরকারের কৃত অপরাধ অধিকতর গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছে। বলা হয়েছে যে, কয়েক বছর আগে আলোচ্য ইংরাজী কলেজটির মোট তিনশ' ছাত্রের মধ্যে এক শতাংশও মুসলমান ছিল না। তারপর এই অবমাননাকর বৈষম্য হ্রাস পেলেও অবিচারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অসন্তোষ এখনও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছেন এমন এক সিভিলিয়ান লিখেছেন—

"এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ সরকার নিজের কাজের দ্বারা যে ঘৃণ্য ও অবমাননা কুড়িয়েছেন তাকে অতিরঞ্জিত করে দেখা অসুবিধাজনক বলে আমি মনে করি। আমার মন্তব্যের ভাষা কঠোর মনে হতে পারে, কিন্তু আমি প্রমাণ করে দেখাতে পারি যে, ভারতে আমার আটাশ বছর বসবাসকালে আমি বিষয়টির সত্যাসত্য যাচাই করে দেখেছি। এ দেশে প্রথম আগমনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি হুগলী সফর করি এবং আমি বলতে পারি যে, তখন এদশীয় বা ইউরোপীয় কারো কাছ থেকেই অন্য কিছু আমি শুনিনি। যথার্থ হোক বা না হোক, মুসলমানরা মনে করে যে, এ ব্যাপারে সরকার তাদের প্রতি অন্যায় ও সংকীর্ণমান আচরণ করেছেন, এবং তাদের কাছে এটা একটা স্থায়ী তিক্ত অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়েছে।"

(W. W. Hunter : The Indian Mssalmans, বাংলা অনুবাদ এম আনিসুজ্জামান, পৃঃ ১৬৩-১৬৫)।

এ ছিল দু'জন ইংরেজ সায়েবের স্পষ্টোক্তি যাঁরা ব্রিটিশ সরকারের অতীব দায়িত্বশীল কর্মচারী হিসাবে এদেশে এসেছিলেন। মুসলমানদের প্রতি চরম অবিচার দেখে তাঁদের অন্তরাত্মা হয়তো ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। তারই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল তাঁদের লেখায়। কিন্তু এতেও কি অবিবেক ও অত্যাচারী সরকারের টনক নড়েছিল? তাঁরা এ দেশের এক শ্রেণীকে মনে করতেন তাঁদের দুশমন এবং আর এক শ্রেণীকে জানের দোস্ত। দুশমনের ন্যায্য হক আত্মসাৎ করে তাই দিয়ে মনতুষ্টি সাধন করেছেন দোস্তের। ব্রিটিশ শাসনের শেস তক্ এ অবিচার অব্যাহত রয়েছে। গ্রন্থকার ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত উক্ত কলেজ সংলগ্ন ছোট্ট মুসলিম স্কুলে বাল্যজীবন কাটিয়েছে। হান্টার সায়েবের বর্ণিত অবস্থার তখনো কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। ধর্মীয় দানের এর চেয়ে বড়ো আত্মসাৎ ও অপব্যবহার আর কোথাও হয়েছে বলে মানব ইতিহাসে খুঁজে যে পাওয়া যাবে না তা নিঃসকোচে বলা যেতে পারে। মুসলমানদের দুর্ভাগ্যই বলতে

www.pathagar.com

হবে যে, ব্রিটিশ এ দেশ থেকে চলে যাওয়ার পর উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত দানের সম্পত্তি ও তহবিল লাভ করেছেন তাদেরই সেকালের দোস। অতএব অবস্থার পরিবর্তন অচিন্তনীয়।

ইংরেজ-শাসকগোষ্ঠী, খৃষ্টান মিশনারী ও বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী —এ ত্রিচক্রের গভীর ষড়যন্ত্রের ফলেই মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয় এবং তার ফলে শিক্ষা দীক্ষা ও জীবিকার্জনের পথ তাদের রুদ্ধ হয়ে যায়। ১৮৩৭ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে সরকারী কাজকর্মে অফিস আদালতে ইংরেজী ভাষা চালু করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজরা কুটবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে চুপে চুপে ইংরাজীকরণ নীতি চালু করে; তার জন্যে কোন পূর্ব ঘোষনা না করেই। এর একমাত্র উদ্দেশ্যে ছিল, জনসমষ্টিকে সচেতন না করে, নিজের সংকল্প কার্যকর করা। তাদের প্রিয়পাত্র শ্রেণীটির কিন্তু এ গোপন ষড়যন্ত্র জানা ছিল। তাই পয়লা এপ্রিল থেকে হঠাৎ ইংরাজী ভাষা হওয়ার সাথে সাথে তারা সকল সরকারী অফিসগুলিতে জেঁকে বসে গেল। এদিকে ইংরেজ মিশনারীদের কূট চালে আরবী ফার্সী শব্দাশ্রিত মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ ভাষা-অবদান উর্দুকেও স্থানচ্যুত করে সংস্কৃত শব্দবহুল হিন্দুস্থানী ভাষাও সৃষ্ট হয় এবং সরকার অনুমোদিত একমাত্র দেশীভাষা হিসাবে চাকুরী প্রাপ্তির সনদ হিসাবে স্বীকৃত হয়।

(আবদুল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ .... পৃঃ ৯৮-৯৯)। এর উদ্দেশ্যে ছিল মুসলমানদের জন্যে সকল চাকুরীর দ্বার রুদ্ধ করে দেয়।

এভাবে ইংরাজী শিক্ষার বোধন হয়েছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক গরজে এবং নগরবাসী একটিমাত্র শ্রেণীর মংগল বিধানে। বাস্তবপক্ষে ইংরেজী শিক্ষাই হলো এদেশীয়দের সরকারী অফিস আদালতে চাকুরী লাভের একমাত্র পাসপোর্ট। আর এজন্যে এ ভাষাটার শিক্ষা হয় দ্রুত, নিশ্চিত ও সর্ব্বব্যাপক। কিন্তু এ শিক্ষানীতির সবচেয়ে মারাত্মক দিক হলো, মাত্র মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজেই তা সীমিত করা হয়েছিল, জনসাধারণ মর্মান্তিকভাবে উপেক্ষিত হলো। আবার ইংরাজী শিক্ষার সমস্ত সুযোগ সুবিধা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুরাই আত্মসাৎ করলো, অভিজাত হিন্দুরা এবং সমগ্র মুসলিম দূরে পড়ে রইলো। দেশকে ইংরেজীয়ানা করণের এই অনুপ্রবেশ-যুদ্ধে মেকলে পন্থীরাই জয়ী হয়েছিলেন। (আবদুল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ .... পৃঃ ৯৯-১০০; John Marshall: An Advanced History of India. pp 818-19)।

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাঙ্গন ও চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের কি অবস্থা ছিল সে সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির জন্যে নিম্নে কিছু খতিয়ান সংযোজিত হলো।

www.pathagar.com

১৮৫২ সালের ৩০শে এপ্রিলে সরকারী স্কুল কলেজে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রসংখ্যাঃ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
হিন্দু কলেজ	৪৭১	০	০	৪৭১
পাঠমালা	২১৬	০	০	২১৬
ব্রাঞ্চ স্কুল	২৫৫	০	০	২৫৫
সংস্কৃত কলেজ	২৯৯	০	০	২৯৯
মাদ্রাসা	০	৪৩৩	০	৪৩৩
হুগলী কলেজ	৩৮৯	৬	২	৩৯৭
হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল	১৬০	২	২	১৬৪
হুগলী মাদ্রাসা	১৮	১৪৫	০	১৬৩
হুগলী মক্তব	৯	৪৭	০	৪০
সীতাপুর মাদ্রাসা	০	৪০	০	৪০
ঢাকা কলেজ	৩২৩	২৯	৩১	৩৮৩
কৃষ্ণনগর কলেজ	২০৫	৭	১	২১৩
চট্টগ্রাম কলেজ	৯৭	৮	২০	১২৫
কুমিল্লা কলেজ	৮১	৬	৪	৯১
সিলেট কলেজ	৮০	১১	১	৯২
বাউলিয়া কলেজ	৮৩	০	২	৮৫
মেদিনীপুর কলেজ	১১৭	৭	১	১২৫
যশোর কলেজ	৯৬	৭	০	১০৩
বর্ধমান কলেজ	৭১	৩	০	৭৪
বাঁকুড়া করেজ	৭৪	০	০	৭৪
বারাসাত কলেজ	১৭৪	০	০	১৭৪
হাওড়া কলেজ	১২৩	৬	০	১২৯
উত্তরপাড়া কলেজ	১৭৫	০	০	১৭৫
বারাকপুর কলেজ	৮৮	২	০	৯০
রসপাগলা কলেজ	১০	৩৭	০	৪৭
মোট	৩৮১৪	৭৯৬	৬৪	৪৬৭৪

(A. R. Mallick : British Policy & the Muslims Bengal. P. 280)

উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৮৫৬ সালের এপ্রিল মাসের ছাত্রসংখ্যা। ইতিমধ্যে

www.pathagar.com

হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়েছে এবং কোলকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষার জন্যে অ্যাংলো পার্সীয়ান বিভাগ (A.P.) খোলা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
প্রেসিডেন্সী কলেজ	১২৭	০	৫	১৩২
হিন্দু কলেজ	৪৬২	০	০	৪৬২
কলুটোলা স্কুল	৫৬৭	০	০	৫৭১
মাদ্রাসা (আরবী)	০	৫৯	০	৫৯
মাদ্রাসা (এপি)	০	১১১	০	১১১
কলিংগ স্কুল	১২৪	১৫	৪	১৪৩
সংস্কৃত কলেজ	৩৩৯	০	০	৩৪৫
পাঠশালা	৩৪৫	০	০	৩৪৫
মেডিক্যাল কলেজ	১৪৮	৯৬	৩৪	২৭৮
হুগলী কলেজ	৪৫৫	৭	৬	৪৬৮
হুগলী মাদ্রাসা	৪	১৭৫	০	১৭৯
হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল	১৬৯	৮	০	১৭৭
ঢাকা কলেজ	৩৯০	২৪	৪১	৪৫৫
কৃষ্ণনগর কলেজ	২৪০	৭	০	২৪৭
বহরমপুর কলেজ	২২৭	১০	৫	২৪২
হাওড়া স্কুল	২২৯	৩	৪	২৩৬
উত্তরপাড়া স্কুল	২০৩	০	০	২০৩
বীরভুম স্কুল	১০৪	১০	০	১১৪
মেদিনীপুর স্কুল	১৪৫	১০	০	১৫৫
বাঁকুড়া স্কুল	১৪৬	১	০	১৪৭
বাউলিয়া স্কুল	১২৯	৫	০	১৩৪
রসপাগলা স্কুল	৪০	৬৩	০	১০৩
বারাসত স্কুল	১৯২	৩	০	১৯৫
বারাকপুর স্কুল	১১৬	২	০	১১৮
যশোর স্কুল	১৩৪	৫	২	১৪১
পাটনা স্কুল	১৪৪	৪	০	১৪৮
ফরিদপুর স্কুল	১০২	৪	০	১০৬

www.pathagar.com

বরিশাল স্কুল	২০৯	২২	৩	২৩৪
কুমিল্লা স্কুল	৯৩	১৬	৭	১১৬
নোয়াখালী স্কুল	৬৬	১	৪	৭১
চট্টগ্রাম স্কুল	১৬৬	৪২	১৪	২২২
বগুড়া স্কুল	৮৫	৬	০	৯১
দিনাজপুর স্কুল	১১৪	৮	৪	১২৬
ময়মনসিংহ স্কুল	১৬৭	৯	৮	১৮৪
সিলেট স্কুল	১৫৭	৫	২	১৬৪
মোট	৬৩৩৮	৭৩১	১৪৭	২২১৬

(A.R. Mallick : British Policy & the Muslims in Bengal. P. 281)

বাংলায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চাকুরীক্ষেত্রে এপ্রিল ১৮৭১ সালে মুসলমানদের স্থান কোথায় ছির তার একটি খতিয়ান সংযোজিত করেন হান্টার সায়েব তাঁর গ্রন্থে। তা নিম্নরূপ ঃ

	ইউরোপীয়	হিন্দু	মুসলমান	মোট
চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস				
(মহারানী কর্তৃক ইংলণ্ড থেকে	২৬০	০	০	২৬০
নিয়োগপত্র প্রাপ্ত)				
রেগুলেশন বহির্ভূত জেলাসমূহে				
বিচার বিভাগীয় অফিসার	৪৭	০	০	৪৭
এক্সট্রা অ্যাসিষ্ট্যানটট কমিশনার	২৬	৭	০	৩৩
ডেপুটি ম্যাজিষ্টট ও ডেপুটি কালেক্টর	৫৩	১১৩	৩০	১৯৬
ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেসর	১১	৪৩	৬	৬০
রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ	৩৩	২৫	২	৬০
স্মল কটেজ কোর্টের জজ ও				
সাব-অর্ডিনেটজজ	১৪	২৫	৮	৪৭
মুন্সেফ	০	১৭৮	৩৭	২১৬
পুলিশ বিভাগ, সকল গ্রেডের গেজেটেড অফিসার	১০৬	৩	০	১০৯
গণপূর্ত বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং				
এষ্টাবলিশমেন্ট	১৫৪	১৯	০	১৭৩
গণপূর্ত বিভাগ, সাব-অর্ডিনেট				
এষ্টাবলিশমেন্ট	৭২	১২৫	৪	২০১
গণপূর্ত বিভাগ, একাউন্ট				
মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, মেডিক্যাল				

www.pathagar.com

কলেজে, জেলখানায়, দাতব্য				
চিকিৎসালয়ে, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও				
রোগ প্রতিষেধক বিভাগে নিযুক্ত	৮৯	৬৫	৪	১৫৮
কর্মচারী এবং জেলা মেডিক্যাল				
অফিসার ইত্যাদি				
জনশিক্ষা বিভাগ	৩৮	১৪	১	৫৩
শুল্ক, নৌ চলাচল জরিপ, আফিম				
নিয়ন্ত্রণ,ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ	৪১২	১০	০	৪২২
মোট	১৩৩৮	৬৮১	৯২	২১১১

W. W. Hunter : The Indian Mussalmans, Bangladesh Edition 1975. p. 152)।

পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশের শিক্ষা সমাচারঃ

পাকিস্তান আমল

ব্রিটিশ শাসনের পর পাকিস্তানের জন্ম হল ১৯৪৭ এর ১৪ই আগষ্ট। এ দেশের জন্ম ও প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল তা তদানীন্তন ভারতের আন্ডার সেক্রেটারীর ঘোষণাটুকুতেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

"Undoubtedly there will be a separate register for Muslims. To us here at first sight it looks an objectionable thing because it discriminates between people and self, segregates them in classes based on religions but it cuts deep into tradition of historic past and is also differenitated by the habit and social customs of the communities."

পাকিস্তান সৃষ্টির পর এ উপমহাদেশের বিশেষ করে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের মুসলমানগণ ভেবেছিল যে পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে তারা শিক্ষা-সংস্কার ও সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়নে তাদের হারানো ঐতিহ্য ও শৌর্যবীর্য পুনরুদ্ধার করবে। কায়েদে আযমের কথায় পাকিস্তান ইসলামিক আদর্শ মতে সামাজিক ন্যায় নীতির ওপর ভিত্তি করে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ২৫ বছরের ইতিহাস কায়দে আযমের উক্ত উক্তিকে সার্থক রূপ দিতে পারেনি। এই বিফলের প্রধান কারণসমূহের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতিদানে অস্বীকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় ভাবধারা রচনায় ব্যর্থতা ও ইসলামী আবরণে বৈষম্যমূলক আচরণ, সর্বোপরি শিক্ষানীতি ও আদর্শের ক্ষেত্রে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ঐক্যসূত্র নির্মাণমূলক পাঠ ও পাঠক্রমের অভাব। ফলে বাংলাদেশের সৃষ্টি হল

www.pathagar.com

মূলত আদর্শিক অনৈক্য ও দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্ম ও ঐক্যসূত্র হিসেবে ইসলাম যে আদর্শ ও শক্তি হিসেবে চেতনা ও শক্তি যুগিয়েছিল সে আদর্শকেই তদানীন্তন পাকিস্তান অধিকাংশ ক্ষেত্রে Lip service ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত করেনি।

এ প্রসঙ্গে পাকিস্তান সৃষ্টির পটভূমি বিশেষকরে দ্বিজাতিত্বের ঐতিহাসিক পটভূমিটি স্মরণ করা যেতে পারে। তা হচ্ছে এইঃ

১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বালগংগাধর তিলকের গো-রক্ষা সমিতির আন্দোলন, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রদে মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু আন্দোলন, উগ্র মুসলিম বিদ্বেষমূলক বঙ্কিম বাবুর দুর্গার বন্দনায় রচিত 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ, ম্লেচ্ছযবন হিসেবে চিত্রিত মুসলমান সম্প্রদায়কে দমন করে শিবাজীর মত দস্যি চরিত্রকে ভারতের জাতীয় বীর হিসেবে আখ্যায়িত করন এবং শিবাজী উৎসব' (রবীন্দ্রনাথের হোলিখেলাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য) পালন, ইত্যাদি ঘটনাই প্রমাণ করেছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ উগ্র হিন্দু ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের সাথে শান্তিপ্রিয় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের সহ-অবস্থান সম্ভব নয়। এরই ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত পরিণামেই পাকিস্তানের সৃষ্টি।

প্রকৃত প্রস্তাবে পাকিস্তানের প্রাথমিক অবস্থা ছিল (১৯৫৯ সনের) জাতীয় শিক্ষা কমিশনের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ "বিগত শতাব্দীতে যেসব পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি জাতির জীবনধারার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিল সেগুলো ক্রমে ক্রমে মাথা তুলে আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে তুলল। একের পর এক দেখা গেল নিষ্ক্রিয়তা, শৃংখলাহীনতা, সুযোগপ্রিয়তা এবং আঞ্চলিকতাসহ নানা পুরনো মনোভঙ্গীর পুনরাবির্ভাব।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিতদের অধিকাংশেরই সামনে লক্ষ্য ছিল শুধু সরকারী চাকুরী। সরকারী চাকুরীর সুরক্ষিত দেয়ালের বাইরে নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করার প্রয়াস ছিল এই উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে খুব কম জনেরই। বিদেশী শাসনের অবসান হলেও লোকের মনে একটি শাসক চক্রের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেড়ে বসেছিল।"

অন্যত্র শিক্ষা কমিশন এ স্বীকৃতিটুকু দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও নিজেদের ভবিতব্যের নিয়ন্তা জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, স্বভাব বা দক্ষতা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলেন। আমাদের পাঠক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শাসন ব্যবস্থা , পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি সব কিছুতে পুরাতন ব্যবস্থার ছাপ রয়ে গেল।

www.pathagar.com

শিক্ষা কমিশনের উক্ত উদ্ধৃতি থেকে এটাই ফুটে উঠছে যে পাকিস্তান সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ও আমলাগণ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, আর এরই ফলে শিক্ষাব্যবস্থার কোন সংস্কারই জাতীয় আশা-আকাঙক্ষা ও ঐতিহ্যের পরিপূরক ও পরিস্ফুটক না হওয়ায় এদেশের মানুষ নিজের দেশকে ভালবাসতে ও স্বীয় আদর্শ ও স্বাতন্ত্র্যে উন্নত ও মজবুত হতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং নিছক নামকরণ ব্যতীত গোটা দেশটাই তখন পরাধীন ছিল শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচার-বিশ্লেষণে। ফলে ঐতিহাসিক পটভূমির নিরিখে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানগণ যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানীর বিনিময়ে স্বতন্ত্র আবাসভূমি 'পাকিস্তান'কে ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেই পাকিস্তানই দীর্ঘ ২৫ বছরের খাপছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণতি হিসেবে 'জয় বাংলা' বনাম 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' রক্তক্ষয়ী আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে দুটুকরো হয়ে গেল– সাবেক পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নামে, আর পশ্চিম পাকিস্তান শুধু 'পাকিস্তান' হিসেবে।

[পাকিস্তান আমলে শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তা পরবর্তী 'বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশ' শীর্ষক অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।– গ্রন্থকার]

বাংলাদেশের শিক্ষা ঃ

বাংলাদেশ মুসলিম তথা ইসলামী বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। এদেশের শতকরা ৯০ জন মুসলমান। সে হিসেবে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কি বাস্তবতা, কি গণতন্ত্রের বিশ্লেষণে ইসলামী হওয়াই স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা ত হয়ই-নি; বরং মুসলমানত্ব যতটুকু এ পর্যন্ত জন-জীবনে বেঁচে রয়েছে তা-ও ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে।

শিক্ষার কিম্ভূত কিমাকার আকৃতি

এ অবলুপ্তির কারণ কি? এর অনেক কারণ-ই রয়েছে, তন্মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রধান ও মূল কারণ। যে কোন জাতি এর স্বীয় আদর্শ, স্বকীয়তা ও স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তির সূচনা ও উন্মোচন, বিকাশ ও প্রসারণ শিক্ষার মাধ্যমেই করে থাকে। এ দৃষ্টিতে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার বিষয়বস্তু বাংলাদেশী তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা, আদর্শ-ঐতিহ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে রচিত হয়নি। বরং এদেশের শিক্ষার উপকরণ ও সমন্বয় ঘটেছে বিদেশী ও বিজাতীয় সংকর-উপকরণ দ্বারা । সংক্ষেপে এগুলো হচ্ছে ঃ

১. ইংরেজ ও মার্কিন শিক্ষা নীতির দর্শন ও প্রশাসন
২. হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্যবাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও অর্থনৈতিক শোষণ

www.pathagar.com

৩. সংরক্ষণশীল মুসলমানদের স্থবির ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও আচার-অনুষ্ঠান।

তদানীন্তন ব্রিটিশ যুগের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাকিস্তান আমলের শিক্ষা ব্যবস্থায় এদেশের শিক্ষার্থীরা যে ধরনের মন-মানসিকতা ও জীবন প্রণালীর পরিচয় দিচ্ছে তা জনগণ তথা বাংলাদেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের কোন স্বচ্ছও সুস্থ পরিচয়ই বহন করে না। এতদসঙ্গে সম্প্রতি নিযুক্ত হয়েছে আমেরিকান প্রেগমেটিক শিক্ষা দর্শন। ফলে একই দেশে তিন রকমের শিক্ষা ব্যবস্থা- যথা (১) পাশ্চাত্য ভাবধারা পুষ্ট ইংলিশ বা মিশনারী স্কুল কলেজ (২) দেশী তথা বাঙালিবাদের উপকরণে সমৃদ্ধ বাংলা মাধ্যম স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় (৩) রাজনীতি বিবর্জিত ও অর্থনৈতিক চেতনা বিহীন মাদ্রাসা ও জামেয়া–একই দেশের ছাত্র-সমাজকে বিপরীত এবং কখনও বা সংঘর্ষমুখী (contradic-tory and contrary) দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধে বিভক্ত করেছে। ফলে যে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি জাতি সুসংহত ও শক্তিশালী হয়, সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্যে হয়ে উঠল আত্মঘাতীমূলক। মিশনারী বা ইংলিশ মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তৈরী হচ্ছে 'সাহেব', বাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হচ্ছে 'বাবু' বা 'মশাই' আর মাদ্রাসা ও জামেয়াতে তৈরী হচ্ছে 'মোল্লা বা হুযুরের' সম্প্রদায়। এই ত্রিবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ–ছাত্র-শিক্ষক-বই-পুস্তক, শাসন পদ্ধতি– এত বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যমূলক যে, এই তিন প্রতিষ্ঠানের কোন একজন ছাত্রও আমাদের দেশজ বলে পুরাপুরি মনে হয় না– কী মনে, মগজে, চলনে-বলনে বা কথনে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চাণক্যচাল

বিশেষ করে আমাদের শিক্ষাঙ্গণে প্রতিবেশী ভারতের অনুপ্রবেশ এদেশের শিক্ষা বিপর্যয়ে যে অবস্থাটা সৃষ্টি করেছে তা অনেকটা ময়ূরপুচ্ছ বিশিষ্ট কাকের মতো; নিজের জাতও হারাল, পরের জাতেও উঠতে পারল না। এ দুর্ভাগা দেশ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন জাতির শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ধরনের দুর্গতি ও অবমাননাকর অবস্থা আছে কি-না তা বলা মুশকিল।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে আদর্শিক নানাবিধ বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ উন্মোচন প্রসঙ্গে জনাব মোহাম্মদ তোজাম্মুল হোসেইনের সুচিন্তিত সংশ্লিষ্ট পর্যালোচনাটি অতীব জুতসই হবে বিবেচনায় তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"Culturally too, India dominates Bangladesh. The vital sector of education is flooded with Indian philosophical ideas based in Hinduism, a pantheistic and pagan religion which 90% of its strictly monotheistic population deeply abhor in

www.pathagar.com

the core of hearts. The University of Dhaka, the oldest and premier seat of higher learning, based at the capital city, is virtually controlled almost in every aspect by the Indian lobbists within the country.

Many of the post 1971 generation of students have succumbed to their sinister influences and turned irreverent towards their religion. They chant slogans of "secularism" and pay homage to Bengaliculture. Some of them have been ensconced to positions of leadership in the student community by the Indian elements among the elite. They wield immense influence in the precincts of the universities and of the educational institutions and in the country's politics. Power corrupts. ----- But the stark political reality is that these student leaders, converted as they are to secularism, work only to further India's hegemonistic and cultural design in Bangladesh. They have no concern for the values and cultural aspirations of the common people whose 90% are devout and simple Muslims. In fact, to undermine Islam and its culture is their very goal".

[Mohammad Tajammul Hossain, Bangladesh: Victim of Black Propagand, Intrigue and Indian Hegemony, Ed. May 1996, p–5–6]

"সাংস্কৃতিকভাবেও বাংলাদেশ ভারতের কর্তৃত্বের শিকার হয়ে পড়েছে। শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি হিন্দুবাদ, সর্বেশ্বর ও বহুদেবত্ববাদের ভারতীয় দার্শনিক ধ্যান ধারণায় সয়লাব। তৌহিদবাদী জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জনই তাদের হৃদয়ের গভীর প্রদেশ থেকে এটাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করে। সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রথম উচ্চ শিক্ষার পীঠস্থান রাজধানী-ভিত্তিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত পক্ষে প্রায় সর্বাঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরীণ ভারতীয় চাটুকারদের দ্বারা।

১৯৭১-উত্তর প্রজন্ম ছাত্রদের অনেকেই তাদের কুপ্রভাবের শিকার হয়েছে, এবং তাদের স্বীয় ধর্মের প্রতি হয়ে পড়েছে বৈরী ও অসহিষ্ণু। এরা "ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদের" কোরাস শ্লোগান দেয়। বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাদের কতিপয়কে ভারতীয় 'এলিটদের কতিপয় ক্রীড়নক' দ্বারা ছাত্র সমাজের নেতৃত্বের পদে মজবুত ভাবে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও দেশের রাজনীতিতে বিপুল প্রভাব খাটাচ্ছে। এতে ক্ষমতা হয়ে পড়েছে দুনীর্তিবিযুক্ত। ----- কিন্তু রূঢ়

www.pathagar.com

রাজনৈতিক বাস্তবতাটি হচ্ছে এই যে, এসব ছাত্র-নেতৃবৃন্দ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদে দীক্ষিত হয়ে বাংলাদেশে ভারতীয় কর্তৃত্ব ও সংস্কৃতির দুরভিসন্ধিকে আরো প্রাগ্রসর করিয়ে দেয়ার কাজটি করে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের, যাদের শতকরা ৯০ জন সরল ধর্মপরায়ণ মুসলমান, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাদের কোনই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নেই। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও এর সংস্কৃতির অমর্যাদা করাটাই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য।"

এই উদ্ধৃতির আলোকে এটা নিঃসন্দেহে প্রতিভাত হয়ে উঠে যে, প্রতিবেশী ভারতের কূটচালের ফলেই এই দেশে বসবাসরত তথাকথিত কতিপয় বাংলাদেশী অথচ দেশদ্রোহী ভারতীয় দালালদের ক্রমাগত ষড়যন্ত্রের কারণেই শতকরা ৯০ জন মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের স্বাতন্ত্রিক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের "মুসলিম" ও ইসলাম" পারিভাষিক পদসমূহের তিরোধান ঘটেছে। দৃষ্টান্তঃ জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল, নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর 'মুসলিম' শব্দটি বর্জন, এমনিভাবে কবি নজরুল ইসলাম কলেজ" নাম করণের 'ইসলাম' শব্দের উচ্ছেদ ইত্যাদিই হচ্ছে প্রতিবেশী ভারতের দেশীয় "মীরজাফরদের" অপকর্ম যা' বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে আদর্শ বিচ্যুত আত্মঘাতী সংগ্রাম ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপপ্রয়াস পাচ্ছে বেপারোয়াভাবে। শুধু কি তা-ই? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে খচিত পবিত্র কোরআনের আয়াত **রাব্বী জেদনী এলমা** টি পর্যন্ত অপসারিত হলো দেশীয় ভারতীয় এজেন্টদের দুষ্কর্মের পরিণামে। এদেশের জলবায়ু সেবনে, এদেশের অন্ন বস্ত্র পরিধানে লালিত-পলিত হয়ে এদেশেরই কতিপয় অপাংতেয়-সন্তানের এহেন কীর্তিতে বিদেশী চক্র উল্লসিত, এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনের সাম্প্রতিক একটি মারাত্মক পরিস্থিতি। এমনিভাবে তদারক ও নিয়ন্ত্রণ-বিহীন বিদেশী মিশনারী ও এন.জি.ও. গুলোও প্রচ্ছন্ন ভাবে এদেশের শিক্ষানীতি ও মূল্যবোধে secular ও pragmatic চিন্তাধারার প্রবাহ সৃষ্টি করে যাচ্ছে নানা কৌশলে।

গ্রাম বাংলার শিক্ষা প্রসঙ্গ

এবার বাংলাদেশের শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলোর প্রতি পর্যালোচনামূলক দৃষ্টি দেয়া যাক। প্রথমেই গ্রাম বাংলার দিকে দৃষ্টিপাত শ্বাশত সত্যের ন্যায় বাংলাদেশ 'গ্রাম বাংলা' হিসেবে বিশ্বে সুপরিচিত। ৬৮ হাজার গ্রাম সমষ্টিতে এদেশ। এদেশের শহর-বন্দর-নগর ৬৮ হাজার গ্রামবাসীর আর্থ-সামাজিক শ্রমের স্বর্ণফসল। বাংলাদেশের উন্নতি ও উৎকর্য বিধানে গ্রাম-উন্নয়ন যে অপরিহার্য তা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আর এ উন্নয়ন যথার্থভাবেই নির্ভর করে শিক্ষা উন্নয়নের উপর।

www.pathagar.com

শিক্ষা উন্নয়ন গ্রাম ভিত্তিক হওয়া শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়, বরং অপরিহার্য। এদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি, এর শতকরা ৯০ ভাগ গ্রামে বাস করে। অর্থাৎ এদেশের বিপুল জনসম্পদ তথা জনশক্তি গ্রামীণ। এই বিপুল জনশক্তিকে সুশিক্ষিত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার উপর নির্ভর করছে গোটা বাংলাদেশের সার্বিক প্রগতি ও উন্নয়ন।

গ্রামের মাটি ও মানুষের ধর্ম ও প্রকৃতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন। এই দৃষ্টিতে দেহ ও মনের সুষম কল্যাণকর বিকাশই হচ্ছে শিক্ষার মূল লক্ষ্য। অন্যকথায় শিক্ষা হচ্ছে a process of changing the attitude of the learners to the desired direction."– শিক্ষার্থীদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিবর্তন করার মাধ্যম বা পদ্ধতিই হচ্ছে শিক্ষা। অভিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারিত হয় দেশজ ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে।

সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গ্রামবাসীকে শিক্ষার আলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় অর্ধ লক্ষ; তন্মধ্যে অন্যূন ৪০.২৫০টি গ্রাম এলাকায় অবস্থিত। এছাড়া প্রায় ২ লাখ মসজিদের মধ্যে ১ লাখ ২৫ হাজারের মত মসজিদ গ্রামে রয়েছে। এসব মসজিদের অধিকাংশই মক্তব ও ফোরকানিয়া ভিত্তিক শিক্ষাদান করে আসছে পল্লীর শিশু-কিশোরদেরকে। বড়দের মধ্যে শিক্ষাদানের জন্যে "বয়স্ক শিক্ষা পরিদপ্তর"সহ "সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর","বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী" ও সমাজ-সেবামূলক দেশী-বিদেশী অন্যূন ২০০০ সংস্থা অর্থকরী ও পেশাগত বিভিন্নমুখী শিক্ষাক্রম চালু রেখেছে। তাছাড়া প্রায় প্রতি গ্রামেই হস্ত ও কুটির শিল্প পরিবারভিত্তিতে বংশপরম্পরায় চলে আসছে আবহমান কাল ধরে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মসজিদ মিশন, মসজিদ সমাজ, কম্যুনিটি স্কুল, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক সাধারণ শিক্ষা প্রদানের সাথে সাথে কৃষি, বৃক্ষ রোপণ, মাছ চাষ, হাঁস-মুরগীর খামার, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রাম বাংলার অর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রয়াসী রয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পল্লী বাংলার শিক্ষান্নোয়ন আশানুরূপ নয়, কারণঃ

১. বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা আজও জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য যথাযথ নির্ধারণে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

২. সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের সংযোগ প্রায় নেই বললেই চলে।

www.pathagar.com

৩. দারিদ্র্যের তীব্রতা ও কষাঘাতে অনেক অভিভাবক স্বীয় সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর পরিবর্তে ক্ষেত খামারে দিনমজুর হিসেবে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছেন।

৪. প্রচলিত শিক্ষা শিক্ষার্থীদেরকে প্রচণ্ডভাবে শহরমুখী করে তোলছে যার ফলে শিক্ষিত সমাজ জনসেবা অপেক্ষা চাকুরীর স্বার্থে গ্রামোন্নয়নে নিযুক্ত রয়েছেন।

৫. প্রচার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচি অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবন বিকাশ অপেক্ষা 'কলা' বা 'শিল্প' হিসেবে উত্তরণের প্রয়াসী।

মোটামুটি উক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে পল্লী বাংলার শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সরকার অধুনা শাসন ও বিচারের যে বিকেন্দ্রীকরণ করেছেন এর সাথে শিক্ষা উন্নয়নের জন্যে চীন-রাশিয়ার মত ছুটিকালীন সময়ে ছাত্র-শিক্ষকদের দ্বারা পল্লীতে অন্ততপক্ষে খণ্ডকালীন স্বল্প মেয়াদী শিক্ষাদানের আশু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। হাতে কলমে কৃষি ও অন্যান্য পেশা শিক্ষাদানের জন্য কৃষি কলেজ ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদেরও এ ক্ষেত্রে কর্মসূচি গ্রহণ অতীব প্রয়োজন। 'পিলসুজ' সদৃশ গ্রামগুলোকে শিক্ষা ও কর্মদক্ষতায় উন্নত এবং নিপুণ করার জন্য শহুরে বিলাস জীবনের মোহ পরিত্যাগ করার মাঝেই রয়েছে পল্লীবাংলা উন্নয়ন। এজন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকও কম্যুনিটি সেন্টারগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সাধারণ্যের শিক্ষাগার হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। শিক্ষা হচ্ছে জীয়ন কাঠি। এর পরশে পাষাণপুরীর মত স্থবির গ্রামবাসীর জীবন ও পরিবেশকে কর্ম চঞ্চল ও উন্নয়নমুখী করার দায়িত্ব রাজপুত্র সদৃশ শহুরে শিক্ষিত সমাজের। বলাবাহুল্য এই অনুভূতির জাগরণ ও এর বাস্তব প্রয়োগই হচ্ছে পল্লী বাংলার প্রকৃত শিক্ষা উন্নয়নের অন্যতম উপায়।

শিক্ষা প্রকৃতির আলো-হাওয়া পানির মত সর্বজনীন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার সবার। বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই দৃষ্টিতে শিক্ষা একটি State entrprise বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। এই কর্তব্য পালনে যুগপৎ সরকার ও সুধী সমাজের যৌথ ও সমষ্টিগত দায়িত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ঃ কতিপয় সমস্যা

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তার মতে, "শিক্ষা অধিদফতরই বিদ্যালয় শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রধান অন্তরায়।" তিনি ও চাকরিরত অপর একজন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে আলোচনাকালে শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার যেসব দোষত্রুটি জানতে পারা যায় তা যেরূপ মারাত্মক, ঠিক তেমনি শিক্ষা বিভাগের জন্যে এহেন দোষত্রুটি কলংকজনকও বটে। যেমনঃ

www.pathagar.com

শিক্ষা অধিদফতর ঃ প্রসঙ্গ ঃ অন্তরায় সমাচার

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞদেরকে শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দানে অনীহা

প্রথমেই শিক্ষা অধিদফতরের কথা ধরা যাক। শিক্ষা অধিদফতরের সৃষ্টি হয়েছে এই অধিদফতরের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে। 'শিক্ষা' নিছক একটি Liberal art নয়, বরং ইহা দস্তুর মতো একটি Applied বিজ্ঞান। অর্থাৎ Literature বা সাহিত্যের মতো এটি একটি অবারিত ও মুক্ত বিষয় নয় যে, যে কেউ স্বেচ্ছায় অধ্যয়ন করে সার্থক শিক্ষক বা শিক্ষা কর্মকর্তা হতে পারবেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশলী বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের মতো শিক্ষাও একটি 'স্পেশাল সাবজেক্ট' যা' বিশিষ্ট জ্ঞান ও প্রয়োগ ক্ষমতার ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ ব্যতীত অর্জন সম্ভব নয়।

গোটা বাংলাদেশে শিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তি সৃষ্টির জন্যে সরকারী বেসরকারীসহ বর্তমানে ৪২টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং ৭৩টি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটি্উট রয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনষ্টিটিউটে অনার্স সহ এম.এড. ও শিক্ষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা এম.এ. ইন এডুকেশন কোর্সও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্বাভাবিকক্রমে চালু রয়েছে। এ লক্ষ্যে এ দেশের শিক্ষা ও এর ব্যবস্থাপনার আশু সংস্কার ও উন্নয়নের জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদফতরের অস্তিত্ব ও অবয়বের প্রকাশ। কিন্তু চরম পরিতাপ ও আশ্চর্যের বিষয়, এই দুটো দফতরের বিশেষ করে শিক্ষা অধিদফতরের শিক্ষা-প্রশাসন, কারিকুলামের নীতি প্রণয়নও প্রয়োগ, মূল্যায়ন ইত্যাদির দায়িত্বভার যে প্রধান কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত করা হয়ে থাকে তাঁর শিক্ষকতায় ও শিক্ষা প্রশাসনে এম. এড. ও শিক্ষায় প্রশিক্ষণ যে অত্যাবশ্যক সেই বোধ নেই। শিক্ষায় এহেন অনভিজ্ঞ ও অপ্রশিক্ষণ-প্রাপ্তদের দ্বারা শিক্ষা পরিষদ গঠন বা এমনিভাবে "কাউন্সিল অব এডুকেশন" বা শিক্ষা পরিষদ গঠন ও করা হয়ে থাকে। এই পরিষদেও প্রশিক্ষণসহ অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন সদস্য রাখা অত্যাবশ্যক করা হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে শিক্ষায় প্রশিক্ষণ ডিগ্রীপ্রাপ্ত অভিজ্ঞজনকে মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দিয়ে শিক্ষা পরিষদে রাখা হয়না।

এ ছাড়া ১০ থেকে ১৫ বছর বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত থানা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের এই পরিষদে সদস্য হওয়ার স্বাভাবিক পথ বা সুযোগ নেই। বিপরীতে কলেজের জনৈক অধ্যাপক যাঁর "শিক্ষা" এর উপর কোন প্রশিক্ষণ নেই এবং যিনি প্রাথমিক শিক্ষালয়ে কোনদিন

www.pathagar.com

শিক্ষকতাও করেননি, তাঁকেও এই পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমন নজীর আছে, অর্থাৎ "আদা ব্যাপারীর" দ্বারা জাহাজের খবর নেয়ার মতো ব্যাপার স্যাপার ঘটেছে।

পদমর্যাদা ও পে-স্কেল প্রদানে অনীহা

পদমর্যাদা ও পে-স্কেলের দিক থেকেও বাংলাদেশের শিক্ষা কর্মকর্তাগণ ন্যায়বিচার ও সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত বলে অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপঃ ৮ বা এর অধিক সংখ্যক উপজেলা নিয়ে গঠিত প্রত্যেকটি জেলার কৃষি, স্বাস্থ্য, পশু ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রত্যেক জেলা কর্মকর্তাকে উপ-পরিচালকের মর্যাদা ও পে-স্কেল দেয়া হয়েছে। এমনকি অন্যান্য ক্ষুদে জেলার উক্ত বিভাগসমূহের জেলা কর্মকর্তাকে সহকারী পরিচালকের মর্যাদা ও পে স্কেল প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা বিভাগের সমপর্যায়ের জেলা কর্মকর্তাদেরকে এই মর্যাদা ও সুযোগ দেয়া হয়নি। একই দেশের একই সরকারের অধীনস্থ শিক্ষা ও অন্যান্য বিভাগের জেলা কর্মকর্তাদের মধ্যে এহেন বৈষম্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক আচরণ শুধু ন্যায়ের পরিপন্থীই নয়, বরং তা আত্ম-অবমাননামূলকও। এই অবিচার ও অবমাননামূলক অবস্থার অবসান ঘটিয়ে ন্যায় ও মর্যাদাসম্পন্ন পরিবেশ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের। এই দুটো দফতর এদের শিক্ষা কর্মকর্তাদেরকে এই অবাঞ্ছিত পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের সমমর্যাদা ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাতারে প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে অসমর্থতা অথবা অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। জাতির মেরুদণ্ড 'শিক্ষার' কর্মকর্তাদের প্রতি এই আচরণ বা বঞ্চনা জাতির জন্যে চরম দুর্ভাগ্য।

শিক্ষা অধিদফতরের এহেন আচরণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে, অধিদফতরের দায়িত্বশীল উচ্চ পদসমূহ তথাকথিত রেওয়াজ অনুযায়ী শিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞদের পরিবর্তে অনভিজ্ঞদের দ্বারা পূরণ করে রাখা হয় এবং শিক্ষায় বাস্তবভাবে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জুনিয়র শিক্ষা কর্মকর্তাগণ ঐ স্তর পর্যন্ত পদোন্নতি পাওয়ার পূর্বেই চাকরি জীবন হতে অবসরপ্রাপ্ত হন। বড় জোর জেলা পর্যায় পর্যন্ত পদোন্নতরি পরই তাদের চাকরি জীবনের অবসান ঘটে। ফলে অধিদফতরের শিক্ষায় অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ও এ ধরনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বেশ জুতসই সহকারে শিক্ষা দফতরের কাঙ্ক্ষিত সংস্কারমূলক পরিবর্তনে অনভিজ্ঞ মেধা ও মগজ দিয়ে প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছেন ফী বছর।

www.pathagar.com

প্রণীত চাকরি বিধির অকার্যকারিতা

প্রাথমিক শিক্ষা ও এর প্রশাসনের যথাযথ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সরকার পৃথকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর প্রতিষ্ঠা করেন। এই অধিদফতর কর্তৃক ১৯৮৫ সালে রিক্রুটমেন্ট-রুল বা চাকরিতে নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করা হয়। সাবেক এ. ডি. পি. আই. জনাব আজিজুল হক চৌধুরী এই বিধি প্রণয়ন করেন বলে জানা যায়। যা হোক, কয়েক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৯৮৯ সালে উক্ত বিধি অনুমোদিত হয় ও গেজেটে প্রকাশিত হয়। এই নিয়োগ-বিধিতে বলা হয় ঃ

১. এ. ডি. পি. ই. ও. বা অতিরিক্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার শুণ্যপদসমূহের ৮০% ভাগ পদ থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের দ্বারা পূরণ করা হবে। অবশিষ্ট ২০% বি.এড. বা এম. এড. ডিগ্রীসহ স্নাতকোত্তর বা স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্তদেরকে সরাসরি নিয়োগ দানে পূরণ করা হবে। এই বিধি অনুযায়ী সর্বমোট ৬৪ জন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র একজন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে ১৯৮৫ সালে এ.ডি.পি.ই. ও. হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়। এই পদোন্নতিটিও আবার বন্ধনীযুক্ত "ভারপ্রাপ্ত" ছিল বলে রটনা রয়েছে।

গোটা বাংলাদেশ বর্তমানে ৬৪টি জেলায় বিভক্ত। সর্বমোট উপজেলা/থানা হচ্ছে ঃ ৫০৭টি। সর্বমোট উপজেলা/থানা ও জেলাওয়ারী বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা কর্মকর্তাদের পরিসংখ্যান (১৯৯৫) চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ

মোট জেলা ৬৪, মোট শিক্ষা কর্মকর্তা ২২ জন, জেলা কর্মকর্তার প্রয়োজন ৪২ জন, মোট উপজেলা/থানা ৪৬০ টি উপজেলা/শিক্ষা কর্মকর্তা ৫৪ জন, উপজেলা/ শিক্ষা কর্মকর্তার প্রয়োজন ৪১০ জন।

এ থেকে সহজেই বুঝা যায়, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা কি পরিমাণ দুর্দশায় নিপতিত ও বিপর্যস্ত।

এছাড়া উল্লেখিত চাকরি নিয়োগ বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ৪ বছর চাকরি করার পর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তায় পদোন্নীত হবেন এবং প্রত্যেক জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ৩ বছর চাকরি করার পর সহকারী পরিচালক পদে উন্নীত হবেন। ১৯৯০ সালের জুন মাস হতে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার কথা থাকা সত্ত্বেও উক্ত বিধি অনুযায়ী কোন প্রমোশন অদ্যাবধি যথাযথ কার্যকরী করা হয়নি। অনুরূপভাবে "এ.ডি.পি.ই.ও"-দের "ডি.পি.ই.ও" হওয়ার কথা। ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত এক্ষেত্রেও প্রমোশনের নীতিমালা মূক ও স্থবির হয়ে রয়েছিল বলে জানা যায়। ফলে সেসময়কার ৩৮ জন এ.ডি.পি.ই.ও-এর ন্যায্য পাওনা পদোন্নতি পেন্ডুলামের মতো অনিশ্চয়তার দোল খাচ্ছিল।

www.pathagar.com

পি.এস.সি – র কার্যক্ষমতার পরিধি

কেন এমনটি হচ্ছে তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, বাংলাদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পি.এস.সি) উক্ত ৩৮ জনকে এত পেছন থেকে টেনে প্রমোশন দেয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করে নজীর স্থাপনের সাহস পাচ্ছেন না। এ ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপ একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানই নিতে পারেন বলে কমিশন কর্তৃপক্ষ রসনাচর্চা করেন। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট এই বিধিটি প্রণয়ন করা সত্ত্বেও এর কার্যকারিতা তবুও বাধাযুক্ত করা হয়েছে বা বাধাযুক্ত রয়েছে। ফলে এ সময়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে পাস করা শিক্ষা কর্মকর্তাদের গঠিত সমিতির সচিবের মাধ্যমে উক্ত প্রমোশনবিধি কার্যকরী করার জন্যে সাবেক স্বৈর রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে যোগাযোগের জোর তৎপরতা চালানো হয়েছিল বলেও প্রকাশ। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে শিক্ষান্নোয়নের জন্যে প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রমোশন ও তাদের দ্বারা শিক্ষাকর্ম বিস্তারের পথটি এখনও মোটেই "সোজা হয়নি" বলা চলে।

অন্যান্য অন্তরায়সমূহ ঃ

শিক্ষা বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আরো নানাবিধ সমস্যা অন্তরায় হয়ে আছে। সংক্ষেপে এগুলোর প্রকার ও স্বরূপ নিম্নরূপ ঃ

১. শিক্ষার লক্ষ্যহীনতা

শিক্ষার লক্ষ্য ঃ প্রাথমিক শিক্ষা তথা গোটা বাংলাদেশের শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও আদর্শ কি তা আজও সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট নয়। গণমুখী, বৃত্তিমূলক, উৎপাদনমুখী ইত্যাদি মুখরোচক শব্দ কচলানো হচ্ছে বটে তবে আদর্শিক ভিত্তি দর্শনের রূপরেখা ও লক্ষ্য কি হবে তা আজও বাস্তবভাবে ব্যক্ত হয় নি।

২. বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে সরকারের অথর্বতা

বিদেশীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচির মাধ্যমে যা শেখানো হচ্ছে তার উপর এদেশের সরকারের কোন তদারকী ও নিয়ন্ত্রণই নেই। ফলে এদেশের শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষাদর্শনে বিদেশী ও বিজাতীয় চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি কারুময় ও চাকচিক্য প্রসাধনীতে অনুপ্রবেশ ঘটছে। লক্ষণীয়, অন্য দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও খবরদারী প্রতিষ্ঠিত আছে। কারণ সার্বভৌমত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নৈতিক দায়িত্বেই এই নিয়ন্ত্রণ সরকারের নিকট জাতির পক্ষ হতে পালন একটি পবিত্র আমানতবিশেষ।

www.pathagar.com

৩. স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের অযোগ্যতা

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি। কারণ এক্ষেত্রে শিশুতোষ বই পুস্তক প্রণয়নের জন্যে শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও শিশু শ্রেণীতে শিক্ষাদানে অভিজ্ঞদের দ্বারা পুস্তক রচনার কোন বাধ্যবাধকতা ত নেই-ই, বরং স্কুল পর্যায়ে শিক্ষাদানে অনভিজ্ঞ ও আনাড়ী থাকা সত্ত্বেও ডক্টরেট বা অধ্যাপকদেরকে দিয়ে শিশুতোষ বই লেখানোটা ফ্যাশন ও এরিষ্টোক্রেসি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ডকে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, নির্বাচন ও পাঠ্যকরণের সর্বময় ও একচেটিয়া ক্ষমতা প্রদান করার ফলে বর্তমানে এটি আদর্শ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও এর পৃষ্ঠপাষকতা অপেক্ষা এ ধরণের কর্মকাণ্ডের একটি নিছক "কমার্শিয়াল সেন্টার"-এ রূপ নিয়েছে বলে জনৈক প্রবীণ শিক্ষাকর্মকর্তা মন্তব্য করেন। ফলে নানা রকমের প্রভাবের চাপ ও তাপে আদর্শ শিশু পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা জাতীয় আদর্শ বিরোধী ও নিকৃষ্টমানের বিদেশী শিশুপাঠ্যপুস্তকের ছড়াছড়ির বাজার সৃষ্টি ও কায়েম হয়েছে গোটাদেশ জুড়ে। লক্ষণীয় বিদেশী শিশুপাঠ্যপুস্তক যা মান, গুণ, ছাপা ও বাঁধাইয়ে বলতে গেলে বেশ উন্নত ও আকর্ষণীয় সেসব বই পুস্তক সামান্য প্রতিযোগিতাতে সহজেই দেশের বাজে ও অপরিকল্পিত বইয়ের বাজার দখল করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢুকে পড়ছে ফীবছর।

শিশুপাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে উচ্চস্তরের যে কোন শ্রেণীর বইপত্র আমলাতান্ত্রিক ভাবে নিয়ন্ত্রণের রেওয়াজটি বাতিল ও পাঠ্যপুস্তক লেখার ক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না রেখে বরং বিভিন্ন লেখকের বাজারজাত যাবতীয় পাঠ্য পুস্তকের বাছাই ও অনুমোদনের দায়িত্বটুকু যদি টেক্সট বুক বোর্ডকে প্রদান করা হয় তাহলে সুস্থ পাঠ্য বইয়ের বাজার যথেষ্ট উন্নতমানের হবে বলে আশা করা যায়। জাতীয় আদর্শের প্রতিফলন, এর পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচর্যার বিষয়সম্বলিত ও শ্রেণী উপযোগী ভাষা ও অভিব্যক্তির মূল্যায়নে এ ধরনের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের শর্তারোপসহ প্রতিযোগিতার অবাধ সুযোগ থাকা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ নিয়ন্ত্রণ অর্থে নিম্ন ধরণের আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগও থাকা অত্যাবশ্যক বৈ কি।

(ক) কোন পাঠ্য পুস্তক জাতীয় আদর্শ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী প্রমাণিত হলে সেই লেখক, প্রকাশক, বিক্রেতা ও এ ধরণের বই অনুমোদনকারীর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ।

www.pathagar.com

(খ) এমনিভাবে যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দেশের আদর্শ ও জাতীয় মর্যাদা সম্বলিত কোন পুস্তক অনুমোদনে কারচুপিকরণ, উৎকোচ গ্রহণ বা অযোগ্যতার প্রমাণ বহন করেন বা/ এবং জাতীয় স্বার্থ ও উন্নয়ন মূলক আদর্শ পাঠ্য পুস্তক বাতিল করেন তবে এ জন্যে জবাবদিহি করা ও প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রদানে আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত রাখা একং

(গ) ইংল্যান্ড, জার্মানী ও ফ্রান্সে একই শ্রেণীর জন্যে একাধিক পাঠ্য পুস্তক বিভিন্ন স্কুলে পাঠ্যকরণ ও পাঠদানের মতো অবাধ স্বাধীনতা এদেশেও থাকতে হবে। কারণ এতে এক লেখক নন বরং অনেক লেখকের বৈচিত্রময় প্রতিভাস্ফুরণ ও এর উপকারিতার সঞ্চারণ ঘটবে। তৎসঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের একচেটিয়া ব্যবসার অপকারিতা ও দুর্নীতির আশু অবসান ঘটবে।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী কর্মকর্তার সভাপতিত্ব প্রসংগ

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও প্রশাসনে সরকারী কর্মকর্তাকে সভাপতি হিসাবে মনোনীত করার রেওয়াজটিও এখানে বিচার্য। কারণ এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শিক্ষা সংক্রান্ত অনুকূল পরিবেশ রচনা অপেক্ষা আমলাতান্ত্রিক অপশাসন ও ক্ষমতার অপব্যবহার সহজেই পরিদৃষ্ট হয়। ফলে এর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিশোধন নাহলে সরকারী অপক্ষমতার মোকাবেলায় উচিত ব্যবস্থা গ্রহণে নাভিশ্বাস দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনগণের আর্থিক দান ও সহযোগিতায় গড়ে ওঠে বলে 'সরকারী কর্মকর্তা' সভাপতি হলে জনগণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় উৎসাহ ও উদ্দীপনায় চরম ভাটা পড়ে। বিশেষ কারণ বা ব্যতিক্রমী প্রেক্ষাপট ব্যতীত প্রত্যেকটি বেসরকারী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের সভাপতির পদ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি নির্বাচন বা প্রয়োজনে মনোনয়ন দ্বারা পূরণ করা বাঞ্ছনীয়।

খ. এও লক্ষণীয়, স্থানীয় জনগণের দান ও সহযোগিতায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে বিধায় এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রয়োজনীয় অর্থ স্থানীয়ভাবে আদায় করার রীতি চালু করা যেতে পারে। অন্যান্য ট্যাক্স বা করের মত **শিক্ষা কর বা এডুকেশন** সেস স্থানীয়ভাবে আদায় করার মাধ্যমে প্রতিটি এলাকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় জনগণকে অংশীদার ও দায়িত্বশীল করা হলে সরকারের শিক্ষা প্রশাসনের অনেক ঝামেলা ও দুর্নীতির অবসান ঘটতে পারে। মনোনিবেশ সহকারে বিচার করলে দেখা যায় যে বর্তমান প্রচলিত প্রশাসন অনুযায়ী বিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

অনুমোদন, স্বীকৃতি, অনুদান ও অন্যান্য কাজে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের যে সময়, শ্রম, ও ফালতু (ঘুষ) ইত্যাদি বাবদ খরচাদি হয় তা এমনিতেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে বহন করতে হচ্ছে বিভিন্ন খাত সৃষ্টি করে; যেমন সেসন চার্জ, বিল্ডিং চার্জ, ইত্যাদি যা অভিভাবকেরাই দিয়ে থাকেন; যা এডুকেশন সেস নামকরণের মাধ্যমে আদায় করলে কোনই অসুবিধা হয় না। এতে কমপক্ষে ৩টি প্রধান সুফল পাওয়া যাবেঃ

১. সরকারের মুখাপেক্ষী হওয়া ও এজন্য সময় শ্রম ও মর্যাদার খেসারত ও জিল্লতী এবং দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্তি সম্ভব।

২. স্বাবলম্বী হয়ে মর্যাদা সহকারে অন্ততপক্ষে অপেক্ষাকৃত নির্মল ও স্বাস্থ্যকর শিক্ষা পরিবেশ রচনা ও পরিচালনায় বাস্তব দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হতে পারে।

৩. এভাবে স্থানীয় উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবৈতনিক শিক্ষাদানের কর্মসূচিটিও স্বাভাবিক ও সর্বজনীনভাবে কার্যকরী হতে পারে।

৫. **'শিক্ষা আদালত' প্রসঙ্গ ঃ** এই সুযোগে প্রাসঙ্গিক না হলেও অবাস্তব নয় হিসাবে আর একটি কথা। বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায় হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

	বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা (সর্বপ্রকার বিশ্ববিদ্যালয়সহ)	= ৯টি
o	মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদিসহ কলেজ সংখ্যা	= ৬৫৪টি
o	পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	= ১৭টি
o	মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়	= ৮,৪৬৯টি
o	প্রাথমিক বিদ্যালয়	= ৪৩,৫১৪টি (অন্যূন)
o	মাদ্রাসা	= ২,৮৬৪টি
	সর্বমোট	= ৫৫,৫১৭টি

বাংলাদেশের এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় মামলা মোকাদ্দমার আশু ও সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য শিক্ষা আদালত স্থাপন অত্যাবশ্যক, এই গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রস্তাব। শ্রম-আদালত, পারিবারিক আদালতের মতো 'শিক্ষা আদালত' চালু করা অতীব প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক সংক্রান্ত দুর্নীতি-অভিযোগ ছাড়াও শিক্ষা দপ্তরের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাও কর্মচারীদের মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বাংলাদেশে কম নয়। সরকারী-বেসরকারী- প্রাইভেট স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সহস্রাধিক হওয়ায় ও এসব প্রতিষ্ঠানের লক্ষাধিক মামলা-মোকদ্দমার আশু সমাধান অত্যন্ত স্বচ্ছ ও দ্রুত

www.pathagar.com

নিষ্পত্তিতে " "শিক্ষা আদালত" কল্যাণকর ও দৃষ্টান্তনীয় ভূমিকা ও নজীর রাখবে, সন্দেহ নেই। বর্তমানে যেভাবে যে পরিবেশে প্রচলিত কোর্ট-আদালতে এসব মামলার শুনানী ও বিচার হয়; এমন কি শিক্ষা বোর্ডের আরবিট্রিশন কোর্টেও যেভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করা হয় তাতে দেখা যাচ্ছে এদেশের মামলাযুক্ত শিক্ষকও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে "Justice delayed, Justice denied" rather justice hackneyed এর অবস্থা দাঁড়াচ্ছে প্রায়শ। এছাড়া শিক্ষা জগতের বিচার কার্য সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ পরিচালনার জন্য পরিক্ষিত সৎ বিচারক দ্বারা "শিক্ষা-কোর্ট" গঠন করাটা এই হতভাগা দেশটির জন্য একটি বিরাট আর্শীবাদ হবে বৈ কি! কারণ এতে শিক্ষা জগতের দুর্নীতি উচ্ছেদ ও শিক্ষা পরিবেশ—সামগ্রিক অর্থে- উন্নয়নের চমৎকার ফল বয়ে আনবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ এদেশের প্রায় ৯৭% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুলও সূক্ষ্ম দুর্নীতিতে জরাগ্রস্থ, এবং ন্যায়বিধান ও প্রতিকারে তথাকথিত ভীতু অথচ সৎ (?) কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নৈরাশ্যের রাহুগ্রস্ত।

কিন্ডার গার্টেন ও সমজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গ ঃ

এটাও লক্ষণীয় অন্যূন দু হাজার কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এদেশে রয়েছে। এছাড়াও মসজিদভিত্তিক ও সাধারণ মক্তব এবং ফোরকানিয়া সংখ্যা হবে ২ লাখের অধিক। অর্থাৎ এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মামলা মোকদ্দমা, চাকরি সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তের জন্যেও "শ্রম আদালত" বা "পরিবার আদালতের" মত আলাদাভাবে একটি "শিক্ষা আদালত" থাকাও অপরিহার্য। শিক্ষা আদালতের সপক্ষে আরো যুক্তি হচ্ছে এই যে, বর্তমানে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাধারণ কোর্ট কাছারীতে "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মামলা সাধারণের মামলা মোকদ্দমার মতই সময়ক্ষেপন, অর্থের শ্রাদ্ধ ও মামলাবাজদের খপ্পরে পড়ে অনেক ভাল ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও গুণগতমানহ্রাস পাচ্ছে ভয়ংকরভাবে। কত শিক্ষক, কত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক দিক থেকে যে দেউলিয়াও হয়ে যায় বর্তমানের প্রচলিত কোর্ট কাছারীর শরণাপন্ন হয়ে, এর সার্বিক পরিসংখ্যান সরকারী ভাবে পাওয়ারও বিধান নেই। প্রায়ই দেখা যায় অনেক শিক্ষক তিন হতে ১৩/১৪ বছর মামলার পর যখন রায় পেয়েছেন তখন তাদের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়েছে বা নির্বাপিত হওয়ার পথে। পুনশ্চ উল্লেখ্য, "আপীল এন্ড আরবিটেশন কোর্ট" নামে যে একটি বিচারালয় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে রয়েছে। সেই কোর্টের প্রধান বোর্ডের স্বয়ং চেয়ারম্যান যিনি বিচারপতি নন।

www.pathagar.com

ফলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা কোন শিক্ষক-শিক্ষিকার যদি এই প্রতিষ্ঠানের (বোর্ডের) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অথবা কোন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থেকে থাকে তবে এর সুবিচার পাওয়া বা করাটা যথেষ্ট ক্লেশকর। উদাহরণ স্বরূপ কোন এক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাঁর সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক ও তদীয় বিদ্যালয়ের সভাপতি জনৈক সরকারী কর্মকর্তা (যিনি পদাধিকার বলে এই পদে সমাসীন) বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকায়" আপীল ও আরবিটেশন বোর্ড" তাদের বিরুদ্ধে তদন্তসহ কোন পদক্ষেপ নেনইনি, বরং উল্টো প্রধান শিক্ষককে বরখাস্ত করার অনুমোদন দানে ঐসব অভিযুক্তদের সাহায্য করে আনুকূল্য অর্জনের জঘন্য স্বাক্ষর রেখেছেন। ফলে বেশ কয়েক বছর মামলায় নাকানিচুবানি খেয়ে কোর্টে এর নিষ্পত্তি হলে এটা প্রমাণিত হলো যে এ আপীল ও আরবিটেশন বোর্ডের মানসিকতা ও অস্তিত্ব কতই না মারাত্মক ও ক্ষতিকর।

শিক্ষা প্রশাসনে অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মকর্তা প্রসঙ্গ

এটিও লক্ষণীয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ, সহকারী শিক্ষক বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এনে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার চেষ্টা করা হয়, তা যদি বিচার ও সাক্ষ্য প্রমাণে অভিযোগ আনায়নকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা, দুর্নীতি বা আক্রোশ তথা ক্ষমতার অপব্যবহার বলে প্রমাণিত হয় তবে এর জন্যে ঐ কর্তৃপক্ষকেও পাল্টা কঠোর শাস্তি প্রদানের বিধান নেই। সরকারী বড় কর্মকর্তা হলে তিনি অপরাধী বা দুর্নীতিপরায়ণ হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার জন্যে তাকেও শাস্তি দেয়া প্রয়োজন। তিনি তো আইন ও বিচারের উর্ধ্বে নন। এতে আর যাই হোক ক্ষমতাসীনদের দ্বারা নিরীহ অধীনস্থদেরকে ঘায়েল বা সর্বশান্ত করার স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার যথেচ্ছা ব্যবহার ও দুর্নীতির যথেষ্ট অবসান ঘটবে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ "ভক্ষকরূপী" রক্ষকের উচ্ছেদ ও উৎপাটন না হওয়ার জন্যেও যে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকবৃন্দ এবং কর্মচারী দুর্নীতিবাজ ও ধুরন্ধর কর্মকর্তাদের দ্বারা ধ্বংস হচ্ছেন তা বলাই বাহুল্য। দৃষ্টান্তঃ রাজধানী ঢাকায় জনৈক সরকারী কর্মকর্তা পদাধিকার বলে বেশ কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হওয়ায় তার সভাপতিত্বের বদৌলতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই উন্নয়নের মুখ প্রদর্শন অপেক্ষা সমস্যা ও কোন্দলে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে। লর্ড ক্লাইভের 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি অবলম্বন করে তিনি ক্ষমতার অপপ্রয়োগে অনেক ফায়দা হাসিল করে নির্বিঘ্নে। আসনের মজা ভোগ করে যাচ্ছেন এভাবে।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গের কলেবর আর বৃদ্ধি না করে শেষ হচ্ছে কথা এই যে, বিপুল সংখ্যক এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মামলা মোকদ্দমা যথার্থ ও স্বচ্ছভাবে নিস্পত্তির জন্যে "শিক্ষা আদালত" সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে স্থাপন করা যায়। মামলা মোকদ্দমার বিচার বিভাগীয় খরচ যোগানোর কৃচ্ছতা অনেক কম হবে; এমনকি সাবধানতা অবলম্বন করলে এতে হয়ত সরকারের বিচার প্রশাসনের জন্যে আর্থিক তহবিল সঞ্চিত হওয়ারও উজ্জ্বল ভবিষ্যত রয়েছে বৈ কি!

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ঃ সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গ ঃ

বাংলাদেশ একটি নতুন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। তাই এ রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদকে নতুন নামকরণে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' বলে। প্রশ্ন হচ্ছে, 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ যে পর্যন্ত সঠিক ও বাস্তবভাবে (Objective and specific way) না নির্ণয় করা হবে, সে পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থারও সঠিক সংস্কার ও পুনর্গঠন করা কি সম্ভব? কোন স্বাধীন দেশ বা রাষ্ট্রের শিক্ষার মূল দর্শন ও লক্ষ্যই হচ্ছে সে দেশের 'জাতীয়তাবাদকে' পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সুন্দর ও সার্থকরূপে সন্নিবেশিত ও প্রতিফলিত করে তোলা। কারণ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য ও জাতীয় সত্তা এবং শক্তির সাথে পরিচিত হয়ে স্বাবলম্বী ও মর্যাদাশীল হতে শেখে। এ হিসেবে বিবেচনা করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এদেশের জনগণের ধর্ম-কর্ম, রুচি-প্রকৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য-আদর্শকে ভিত্তি করে সর্বপ্রথম 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের' সঠিক ভিত্তি রচনা করতে হবে। এই ভিত্তি রচনায় ভুল, গাফলতি বা ষড়যন্ত্র হলে গোটা বাংলাদেশেরই সার্বভৌম অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। অন্যকথায় গণতন্ত্রের দৃষ্টিতেও এটা অগ্রাহ্য নয় যে যেহেতু এদেশের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান, সেহেতু মুসলমানদের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন-সংস্কৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের শিক্ষানীতিও জাতীয়তা বিনির্মিত হবে বৈকি। এই দৃষ্টিতে "জাতীয়তাবাদের" ভিত্তি স্থাপিত না হলে এদেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই কচুরীপনার মতো মূল্যহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন থাকবে।

মানুষের সংজ্ঞা ও পরিচয়

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্তও আমরা মানুষ হিসেবে আমাদের নিজস্ব পরিচয়টুকুর একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। আমরা কি পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বিশ্বাস করি যে, ১. Man is a rational animal অথবা ২. He is an economic being

www.pathagar.com

অথবা ৩. He is a biological being only, ইত্যাদি? অন্য কথায় মানুষ কি ডারউইনের বানর বংশোদ্ভুত একটি আকস্মিক জীব, না বিশ্ব স্রষ্টার আদি নবী ও মানুষ হযরত আদম (আ)-এর অধঃস্তন? অর্থাৎ শিক্ষা নীতি নিরূপণ করার পূর্বে 'শিক্ষা ব্যবস্থা' যে জীবটির (অর্থাৎ মানুষের) জন্যে তৈরি হচ্ছে প্রথম তার সংজ্ঞা ও পরিচয় সূত্র নির্ণয় করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন।

এদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান বিধায় এদেশের শিক্ষায়, বই-পুস্তক-গ্রন্থরাজিতে মানুষকে হযরত আদমের (আ.) সন্তান হিসেবেই চিত্রিত, রূপায়িত ও সম্মানিত করে দেখান উচিত। মানুষ পূর্ব থেকেই মানুষ; লেজখসা বানর সে নয়। পূর্ব থেকেই তাকে নৈতিক জীব হিসেবে বানান হয়েছে এবং এই নৈতিকতার ভিত্তিতে তাকে ইহ ও পরজগতে জবাব দিহি হতে হবে–এই দর্শনই হওয়া উচিত মানব জীবনের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি। এই দৃষ্টির সার কথা হল 'Man is basically a moral being." –এই Morality-ই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে সৃষ্টি জগতের অন্যান্য প্রাণীকুল ও বস্তুনিচয়ের উপর। এই মূল্যায়নে মানুষের শিক্ষা ব্যবহার রূপায়ন অত্যাবশ্যক।

শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ

মানব জীবন তথা গোটা জাতির আদর্শ ও লক্ষ্য অনুযায়ীই শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য নির্ণীত হয়। এদিক থেকে প্রথমত 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' এবং দ্বিতীয়ত, 'মানুষের জন্ম ও পরিচয়ে'র প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির উপর বিপুলাংশে নির্ভর করে আমাদের জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ। আমাদের শিক্ষামন্ত্রীরা Patened কথা বলেন যে, সরকার 'শিক্ষা ব্যবস্থাকে' 'গণমুখী' ও উৎপাদনমুখী' করতে চান। কিন্তু 'গণমুখী' ও উৎপাদনমুখী'র বাচ্যার্থ ও ভাবার্থ (Denotation and Connotation) নৈতিক এবং ধর্মীয় ভিত্তির উপর কায়েম না থাকলে তা অবশ্যই অকল্যাণকর হবে। তাই উক্ত দুটো পরিভাষার (ব্যাপক অর্থে) স্বচ্ছ ও প্রশস্ত ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

পৃথিবীর যতরকম জ্ঞান-শিল্পকলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি যা-ই আমরা পাঠ করি না কেন, যেপর্যন্ত জাতীয় আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে আমাদের লক্ষ্যভিত্তিক না রাখবো, সেপর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা-শ্রম-পরিশ্রমই জাতীয় ঐক্য-আদর্শ ও সংহতির আনুকূল্য লাভ করবে না। বরং এতে দেশের ভেতর ও বাহিরের শত্রুরা সুযোগ নেবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো ভংগুর ও বিপর্যস্ত করে গোটা দেশটাকে ধ্বংস করতে, যার চিত্র প্রায়শই এদেশের শিক্ষাঙ্গনে ভেসে উঠে।

www.pathagar.com

পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সমন্বয় সাধন

স্কুল-কলেজ -বিশ্ববিদ্যালয়-মাদ্রাসায় পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে একটি বিশেষ মান পর্যায়ের সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য থাকা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বাংলা, অংক, ধর্ম, বিজ্ঞান বা সমাজপাঠ,—এ ধরনের কতিপয় মৌল বই-পুস্তককে সমপর্যায়ের (same level and status) প্রতিষ্ঠানগুলোতে চিন্তা ও শিক্ষার ঐক্যসূত্র রচনার লক্ষ্যে পাঠ্য রাখা উচিত।

দ্বিতীয়ত, মিল-ফ্যাক্টরী ও চাকুরী-বাকুরীতে যেরূপ স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছাত্ররা কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়, ঠিক তেমনি মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্যেও অনুরূপ সুযোগ সুবিধা রচনার জন্যে প্রয়োজনীয় পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বাধ্যতামূলক করা উচিত। Mr. Barger has a pig. He goes to church every Sunday, অথবা ঋষি পূজায় বসিল, কনা বীণা বাজায়, ঊষা গান গায়, বা হাট্টিমাটিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম–এ ধরনের বিজাতীয় ও অখাদ্য ভাবধারা সম্পন্ন বই-পুস্তকের চাপ ও কুপ্রভাব থেকে আমাদের শিক্ষার্থীর মন-মগজকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। এ প্রসঙ্গে আমাদের জনৈক মন্ত্রীবরের (১৯৮৪) কথার সাথে সুর মিলিয়ে বলা যায় যে, বর্তমান পাঠ্যবইতে 'অখাদ্যের' পরিমাণই বেশি। দ্বিতীয়ত, বই-পুস্তকের বোঝা ও রকমারি, তৎসঙ্গে এক এক শ্রেণীতে হাট বাজারের মত অসংখ্য ছাত্রকে পাঠদানের কসরত ও গিজ গিজ শ্রেণী পরিবেশের সমাধানের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে এটিও স্মরণীয়ঃ দেশীয় কিন্ডারগার্টেন সমূহে বিদেশী বই-পত্র পাঠ্যকরণও নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত। নইলে অনিয়ন্ত্রিত পাঠ্যসূচির মাধ্যমে দেশের স্বকীয়তা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্টকারী মগজ ও চরিত্র সৃষ্টি হবে মজবুত ভাবে।

তৃতীয়ত, বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির খবরদারী করা উচিত যাতে এসব প্রতিষ্ঠান আমাদের মাটিতে অবস্থান করে শিক্ষার আবরণে আমাদের স্বাতন্ত্র্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তথা সার্বভৌমত্বের সর্বনাশ করার সুযোগ না পায়।

এই প্রসঙ্গে রাজধানীর বাংলাবাজার কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'বুক পয়েন্ট'-এর সম্পাদক ও প্রকাশ এম. এ. মুসা খান প্রকাশনা শিল্পের সমস্যা সম্পর্কে বলেন, এ শিল্পের পদে পদে সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়, এ শিল্পের ৯০ ভাগ পুঁজি কাগজ কিনতেই বিনিয়োগ হয় অথচ কাগজের বাজার স্থিতিশীল নয়। কাগজ উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলেও উৎপাদন যথেষ্ট সন্তোষজনক; কিন্তু দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোন ভূমিকা নেই। ফলে যে যেভাবে পারছে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি করেই চলেছে, কমার লক্ষণ নেই। গত ৬

www.pathagar.com

মাস থেকে প্রতিরিম কাগজ ৭০ থেকে ৯০ টাকা হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ প্রকাশকদের বছরের শুরুতে বই'র যে মূল্য নির্ধারণ করতে হয় সারাবছর ঐ মূল্যেই বই বিক্রি করতে হয়।

অস্থিতিশীল বাজারে কাগজের মূল্য বাড়লেও বছরের মাঝামাঝি সময় পুনঃমুদ্রিত বই'র দাম আর কিছুতেই বাড়ানো যায় না, যা বহু ক্ষেত্রেই প্রকাশককে লোকসানের মুখে ঠেলে দেয়। অন্যদিকে কিছু অসাধু প্রকাশক নিজেদের নিম্নমানের বই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অর্থ ও উপহারাদি দিয়ে প্রলুব্ধ করে থাকেন। কমিটির কর্তাব্যক্তি এবং এ ধরনের শিক্ষকরা উৎকোচ পেয়ে এসব বই শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন বলে অনুমোদন দিয়ে থাকেন। এতে প্রকৃত প্রকাশকরাই ক্ষতিগ্রস্ত ও মানসম্পন্ন বই প্রকাশে শুধু নিরুঃসাহিত হচ্ছেন না; কোমলমতি শিক্ষার্থীরাও নিম্নমানের বই কিনে প্রতারিত হচ্ছেন। তাদের শিক্ষা জীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোন তদারকি ও খরবরাদি না থাকায় নৈরাজ্য চলছে বলা যায়। তাঁর প্রস্তাব মানসম্পন্ন বই প্রকাশের জন্য দেশে প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট থাকা দরকার এবং পাঠ্যবই অনুমোদনের ক্ষেত্রে লেখক, প্রকাশক, শিক্ষক ও সরকারের মতবিনিময় ও সমন্বয় থাকা দরকার। সরকার পরিচালিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) নানা খামখেয়ালিপূর্ণ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে তিনি বলেন,একটা বই বাজারে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকাশককে যথেস্ট পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু এনসিটিবি খেয়াল খুশিমত ঘনঘন সিলেবাস পরিবর্তন করে থাকে। এমনকি আমুল পরিবর্তনও করে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্তমানে নবম শ্রেণীর (২০০৫ সালের) ইংলিশ বই'র প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের উল্লেখ করে তিনি বলেন ইংরেজি এই বইটির ১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৪ বার সিলেবাস পরিবর্তন হয়েছে। এতে প্রকশকরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এতে লেখকরাও নিরুৎসাহি হচ্ছেন। এটা শিক্ষার মান ও একই সাথে প্রকাশকদের ব্যবসার ক্ষতি করছে। তাঁর অভিযোগ ক্যারিকুলাম তৈরির ব্যাপারে সরকার দেশের খ্যাতনাম শিক্ষকদের কোন মতামত নেন না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ওপর বিদেশী এক্সপার্টদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই বিদেশী এক্সপার্টরা এদেশের মাটিও মানুষের চাহিদার সাথে সম্পর্কহীন ও অনভিজ্ঞ থাকায় তারা তাদের দেশীয় ক্যারিকুলাম চাপিয়ে আমাদের শিক্ষাক্রমকে বিজাতীয় ও বিকৃত করছে। তাছাড়া স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচির বাইরে বর্তমানে শিক্ষামূলক

www.pathagar.com

গবেষণাধর্মী বই বাজারে খুবই কম। তাছাড়া একই লেখা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন প্রকাশক বই ছাপাচ্ছেন। এতে নতুনত্ব নেই কোথাও। নেই কোন নৈতিকতা সম্পন্ন পেশাদারিত্বের ছাপ। যথাযথ সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত মেধাসম্পন্ন শিক্ষকগণের বই লিখতে যে সময়, ধৈর্য দরকার তাতে তারা আজকাল আর আগ্রহী নন। তারা বর্তমানে নগদ টাকায় কোচিং টিউশনি নিয়েই বেশি ব্যস্ত ও উৎসাহী, কারণ বই লেখায় পয়সা তেমন নেই, সময়ের-ও সংকুলান হয়না।

প্রকৃত মূল্যের কয়েকগুণ মূল্য বেশি লিখে কমিশনের প্রলোভন দেখিয়ে নিম্নমানের বই বিক্রি করা হচ্ছে বলেও তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন। ফলে শিক্ষার্থীরা মান সম্পন্ন ও কমমূল্যে বই প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবিধ ঃ

সম্প্রতি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জোট সরকার সম্প্রতি (জুন, ২০০৫ ইং) যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ পেতে পারেন। তবে নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকদের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগদানের পূর্বাহ্নে প্রত্যেকের একটি মৌখিক পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেয়া হবে বলে যে শর্তটি দেয়া হয়েছে তা পুর্নর্বিবেচনার দাবী রাখে। কারণ, এক্ষেত্রে অহেতুক ভাবে 'ঘুষ' ও 'সুপারিশের' ব্যধি নতুন ভাবে নব কৌশলে মাথা চাড়া দেয়ার আশংকা ও প্রবণতার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষক নিয়োগের বয়স সীমা নির্ধারণ করা উচিত। ২০ থেকে ৪০ বছর তা হতে পারে। অবসর গ্রহণের সময় সীমাও সবার জন্য ৬৫ করার সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। তৃতীয়ত, স্নাতকোত্তর পাশের পাশাপাশি স্নাতক-পাশদেরকেও শিক্ষকতায় সুযোগ দেয়ার বিধান থাকাটা উচিত। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্নাতকপাশদের মধ্যেও শিক্ষকতায় বেশ যোগ্য ও নিবেদিত শিক্ষক পাওয়া যায়। এই তিনটি বিষয় ব্যতীত মোটামুটি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের বিবিধ সিদ্ধান্ত অবশ্যি শিক্ষার মান উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখবে, সন্দেহ নেই। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের প্রতিবেদনের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

'দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে কেউ শিক্ষক হতে পারবেন না। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন বিধিমালা ২০০৫ প্রণয়নের লক্ষ্যে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম. ওসমান ফারুকের

www.pathagar.com

সভাপতিত্বে এক সভায় শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়। এই নীতিমালা প্রণয়নের জন্য গত ২০ মার্চ ২০০৫, থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের সকল প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল। ২০০৫ সালের আগষ্টের শেষ সপ্তাহে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং নভেম্বর থেকে বেসরকারি স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ শুরু হবে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে, একটি নির্বাহী বোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হবে। বছরে এক বা একাধিকবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশ নেয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা মাস্টার্স পাস। ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেটে এই পরীক্ষা একযোগে এবং একই দিনে অুনষ্ঠিত হবে।

অনেকটা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আদলে এই পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা গ্রহণের ৬০ দিন আগে নিয়ম-কানুন, তারিখ ও সময় পত্রিকার মাধ্যমে জানানো হবে। ২০০ নম্বরের মধ্যে এ পরীক্ষা হবে। তন্মধ্যে ১০০ বিষয়ভিত্তিক এবং ১০০ এমসিকিউ পদ্ধতিতে। এমসিকিউর মধ্যে থাকবে বাংলা, ইংরেজী, গণিত, এবং সাধারণ জ্ঞান। পরীক্ষায় যোগ্যতা নির্ধারণী নম্বর ৪০। অর্থাৎ মোট ২০০ নম্বরের মধ্যে ৮০ নম্বর পেতে হবে। পরীক্ষার সিলেবাসের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এনসিটিবিটিকে। পরীক্ষার পাসের পর নির্বাহিবোর্ড প্রত্যেককে একটি প্রত্যায়নপত্র দিবে। প্রত্যয়নপত্র প্রদানের তারিখ থেকে ৫ বছর এটি কার্যকর থাকবে। প্রত্যয়নপত্র পাওয়ার পর চাকরি প্রার্থীকে চূড়ান্ত নিয়োগের জন্য বেসরকারি স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসায় মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন বয়স নির্ধারণ করা হয়নি।

পরীক্ষা পরিচালনার জন্য নির্বাহী বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান, তিনজন সদস্য–মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ডিজি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান, এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন। নির্বাহী বোর্ডের প্রধান কার্যালয় থাকবে ঢাকাতে। বোর্ড বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ, জাতীয়ভাবে শিক্ষক মান নির্ধারণ ও যোগ্যতা নিরূপণ এবং শিক্ষকতা পেশায় উন্নয়ন ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সরকারকে পরামর্শ দিবেন। বোর্ড কর্তৃক প্রণীত শিক্ষকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, নিবন্ধিত ও প্রত্যয়নকৃত না হলে কোন ব্যক্তি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। এ আইন কার্যকর হবার পূর্বে পাঠদানে অনুমতি প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

[সূত্রঃ ইত্তেফাক জুন ২০, ২০০৫]

www.pathagar.com

প্রশাসনিক সংস্কার

বাংলাদেশের সর্বপ্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান একই ধরনের নিয়ম ও প্রশাসনে পরিচালনা করার চেষ্টা নেয়া যেতে পারে। এ দৃষ্টিতে নিম্ন পদক্ষেপগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ মহাপরিচালকের জনশিক্ষা দফতর থেকে শুরু করে থানা শিক্ষা বিভাগ পর্যন্ত সর্বপ্রকার ও সর্বস্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক প্রতিনিধির স্থানীয়ভাবে প্রতিনিধিত্ব করার উপায় করা যেতে পারে। এতে দুটো উপকার হবে, (১) সরকারী শিক্ষা দফতরের সাথে দুরপ্রত্যন্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি। (২) সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী কর্তৃক শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতি অন্যায় বা অবিচারমূলক ব্যবহার ও কার্যকলাপের প্রতিরোধ ও অবসান। (৩) প্রতিষ্ঠান প্রধানের পদকে সরকারী গেজেটেড অফিসারের ক্ষমতা ও মর্যাদা দান। এই পদক্ষেপটি কার্যকরী করতে পারলে (ক) অনেক ম্যানেজিং কমিটির দৌরাত্ম্য ও দুর্নীতি বন্ধ হবে, (খ) যেহেতু প্রতিষ্ঠান প্রধান সরকারী অফিসার বা গেজেটেড অফিসারের সমপর্যায়ভুক্ত, সেইহেতু গোটা স্কুল প্ল্যান্টই (Plant) জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে উন্নত ও মর্যাদাশীল হতে বাধ্য থাকবে।

স্থানীয়ভাবে শিক্ষাকর আদায়

পুনশ্চঃ স্থানীয়ভাবে শিক্ষার প্রয়োগ ও আদায়ের মাধ্যমে প্রতিটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী ও সচ্ছল করার প্রচেষ্টা নেওয়া যেতে পারে। ছাত্রসংখ্যার তুলনায় বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই নগণ্য ও অপ্রতুল। সরকারী অর্থে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চালানোও সম্ভব নয় বলেই দান, অনুদান ও ভর্তুকি প্রাপ্ত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও চালু হয়ে শিক্ষা সমস্যার বিপুল হ্রাস ঘটিয়েছে। এ দৃষ্টিতে সরকার যদি 'শিক্ষা কর' সার্থকভাবে প্রয়োগ ও আদায় করতে পারেন, তবে– ১. স্থানীয়ভাবে জনগণের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হবে; ২. বিভিন্ন গ্রান্টের পরিবর্তে শুধু ভর্তুকি দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সজীব ও সক্রিয় রাখার পথ রচনা হতে পারে; ৩. যেহেতু ট্যাক্স এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের পয়সা এ প্রতিষ্ঠানে আছে সেহেতু প্রতিষ্ঠানের তহবিল তসরূপ বা অপচয়ের আংশকাও তিরোহিত হবে; তাছাড়া ৪. স্থানীয় কর আদায়ের ফলে ফি/ হাফ ফ্রীর রেওয়াজটুকু তুলে দিয়ে বিনা বেতনে উপবৃত্তি-দিয়ে শুধু মেয়ে নয় বরং ছেলে-মেয়ে উভয়কে সমসুযোগদানে পড়ানোর ব্যবস্থা-বুদ্ধির উন্মেষ ঘটবে স্থানীয় লোকদের মধ্যেই।

www.pathagar.com

শিক্ষক বেতন, ছাত্র বেতন ইত্যাদি নির্ধারণ প্রসঙ্গ

হাতের আঙ্গুলের মত মানানসই ব্যবধান শিক্ষকদের বেতন-স্কেল ও ছাত্র বেতন-ফি ধার্যে অবশ্যই তারতম্য থাকবে– এলাকা ও অঞ্চল ভিত্তিতে। সরকার মোটামুটিভাবে শিক্ষকদের বেতন বাবদ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমারেখা টেনে দিতে পারেন। M. P. O. (Monthly Pay Order) ভুক্তির ব্যাপারেও সরকারী নয় বরং জাতীয়ভাবে নীতি থাকা উচিত যাতে ফি বছর এ নিয়ে আন্দোলনের সুযোগ না থাকে। তেমনিভাবে ছাত্র-বেতন ধার্যের ব্যাপারেও একই ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম কার্যকর করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে এও স্মরণ রাখা উচিত, সরকারী স্কুলের পাশে বেসরকারী ও ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুস্থভাবে টিকিয়ে রাখতে পারলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা পায়।

প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে দুর্নীতি প্রসঙ্গ

এটি-ও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক শিক্ষান্নোয়নের ক্ষেত্রে। এক জরীপে দেখা গেছে বাংলাদেশের প্রায় ৭০% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের অস্বচ্ছতা ও দুনীর্তির কারণে বছরের পর বছর অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তার আবর্তে নিপতিত থেকে শিক্ষার মান ও পরিবেশ ধ্বংস করে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে শিক্ষাগার। ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকের সরাসরি সংযোগ এবং পরোক্ষভাবে অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়ে শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ লাভ করে। অন্য কথায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সাথে এদের সবার কম-বেশি সম্পর্ক রয়েছে। এ দৃষ্টিতে পরিদর্শনের পরিসীমা বেশ ব্যাপক ও গুরুত্ববহ।

পরিদর্শনের প্রচলিত ইংরেজি শব্দ হচ্ছে Inspection. কোন কোন শিক্ষাবিদের দৃষ্টিতে পরিদর্শন Supervision অর্থে অধিক যুক্তিসঙ্গত। কারণ পরিদর্শন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর কাজেরই সবিশেষ ব্যবস্থা বোঝায়; শিক্ষাগারের অসুবিধা বা ভুল-ক্রটি মূলধন করে এর বিপর্যয় ঘটানো নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আজহার আলী পরিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, পরিদর্শন হচ্ছে, "An act of carrying the message and materials of co-operation to the teachers in action." অর্থাৎ পরিদর্শন, তথা পরিদর্শকের কাজ হচ্ছে ১। শুভবার্তা বহন ২। প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কাজের পথ প্রশস্তকরণ, যাতে শিক্ষকবৃন্দ পরিদর্শক সাহেবের সহযোগিতায় আপন ভুল-ক্রটি ও দুর্বলতা পরিহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে স্বাচ্ছন্দ ও নৈপুণ্য অর্জন করতে পারেন। রোগীর সাথে আদর্শ ডাক্তারের মতোই হবে শিক্ষকও পরিদর্শকের সুহৃদ সম্পর্ক।

www.pathagar.com

ডাক্তারের প্রাণবন্ত উজ্জ্বল মুখাবয়ব যেরূপ চিকিৎসার প্রারম্ভেই রোগীর রোগের অনেকটা উপশমিত হয়, তেমনি আদর্শ পরিদর্শকের পদার্পণে সমস্যাপীড়িত শিক্ষক তথা শিক্ষাগারটিও স্বস্তি ও সমস্যামুক্ত হওয়ার প্রত্যয়ে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে। এটাই হচ্ছে পরিদর্শক তথা পরিদর্শনের যথার্থ সার্থকতা। ভুল সংশোধন, অন্যায়ের উচ্ছেদ ঘটিয়ে শিক্ষাঙ্গনে সুস্থতা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দানই হচ্ছে তাঁর কাজ। বাস্তবে এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, বিদ্যালয় পরিদর্শন অনেক ক্ষেত্রে 'নিরাপদ' অপেক্ষা 'আপদেরই' কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গোলামী যুগে অর্থাৎ ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আমলে কোনো [এমন কি হালেও] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'পরিদর্শক সাহেব' আসছেন খবরে তদীয় প্রতিষ্ঠানে স্বস্তি অপেক্ষা ত্রাসের সৃষ্টি হয়ে যেতো এমনভাবে যে কি ছাত্র, কি শিক্ষক, কি অভিভাবক গলদঘর্ম হয়ে উঠতেন দারুণভাবে। মনে হতো, পরিদর্শক নয়তো যেন সাক্ষাত 'যমদূত' আসছেন প্রতিষ্ঠানের 'বারোটা' বাজাতে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোনো দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা অথবা কোনো দোষ-ত্রুটির কথা জেনে বা এটাকে মূলধন করে শুভ (!) পদার্পণ করাটা ছিলো তখনকার সময়ের পরিদর্শকদের মহান খেদমতের লক্ষ্য। এতে শরৎ বাবুর গফুর মিয়ার শেষ সম্বল 'মহেশটি' সাবাড় করার মতোই কূট সুযোগ নেয়ার ফন্দি আঁটতেন। শুধু তারা কেন তাদের গোটা দপ্তরটাই জাল পেতে রাখতো 'টুপাইস' কামাবার জন্যে। নিয়মমাফিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে চালু করতে সাহায্য করলে এ 'টুপাইস' ইনকামটা ভেস্তে যাবে বলে 'পান থেকে চুন খসার মত' ওজর দেখিয়ে অনেক সময় সচ্ছল আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও তারা বিপাকে ফেলে রাখতে বিবেকের দংশন টুকুও অনুভব করতেন না। তখন ছিলো গোলামীর যুগ; তাই এমনটি হওয়া অস্বাভাবিক ছিলো না।

এখন বাংলদেশ হয়েছে। স্বাধীন দেশ। সোনার দেশ। এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় সোনার সন্তান তৈরি হবে। এটাই জাতি ও দেশবাসীর আশা। ব্রিটিশ যুগের দাসত্ব ও পরে পাক আমলের দুঃশাসন হতে মুক্তি পাওয়ার জন্যে অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষক-সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবী প্রাণ দিয়েছেন। "এক সাগর রক্তের বিনিময়ে" নয় বরং "সাগর-সাগর" রক্ত-গোছলে সোনার বাংলা জন্ম নিয়েছে। উদ্দেশ্যঃ স্বাধীন বাংলার মানুষ সুস্থ স্বাধীন পরিবেশে সুন্দর দেশ রচনা করবে। পূর্বে এটা সম্ভব হয়নি অপশাসন-শোষণ ও আমলাতান্ত্রিকতার জন্যে। এখন তো আর সেই 'কাল' নেই। আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বস্তুত আদর্শ দেশ ও জাতির সূতিকাগার। তাই বলা হয়ঃ The destiny of a nation is being shaped in the class room.

www.pathagar.com

–জাতির ভাগ্য নির্মিত হয় শ্রেণীকক্ষে। এই দৃষ্টিতে পরিদর্শনের ভূমিকা ও নিষ্ঠা যে কতো গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। দুঃখের বিষয়, মুক্ত বাংলা, স্বাধীন বাংলায় শিক্ষা প্রশাসন বিশেষ করে এর পরিদর্শন আজও তেমন গোলামী মন মানসিকতা হতে মুক্ত হতে পারেনি। এর প্রধান বা অন্যতম কারণ প্রশাসনে দেশপ্রেম ও নৈতিকতার চরম ঘাটতি। শিক্ষক নিয়োগ, কমিটি বদল বা স্কুল নির্বাচন, বা মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম হলে বা অনিচ্ছায় কোনো নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে এর প্রতিকার অপেক্ষা প্রতিবন্ধকতার বহর বৃদ্ধি করা হয় পরিদর্শন দফতর থেকে। অন্য কথায় ৮ পায়ের মাকড়সার জালে আটক পোকার মতো বিদ্যালয়গুলো দুর্বল করার প্রবণতা ও পদক্ষেপ দেখা যায় প্রায় ক্ষেত্রে। অবশ্য এ জন্যে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ কেউ দুর্নীতির পলিটিক্স করে না তা নয়, বরং এ ধরনের ইনস্টিটিউশনে এহেন পলিটিশিয়ানের জন্ম ও প্রসারের ক্ষেত্রে শিক্ষা দফতরের অনুরূপ ব্যক্তিবর্গের যোগসাজশে এ দু'টি চক্রের মুখ-বুক-পিঠ একাকার হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে পরিদর্শন বিভাগকে যথাসম্ভব দুর্নীতিমুক্ত করণের জন্যে সৎ অথচ সাহসী কর্মকর্তার আওতায় আনা উচিত যাতে দুর্বল অথচ পরিচ্ছন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবল হতে পারে; পাশাপাশি দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন কর্মকর্তা ও স্টাফ যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রাপ্তি থেকে নিস্কৃতি না পায় এর সুনিশ্চিত ব্যবস্থা কার্যকরী করা উচিত। তা নইলে এদেশের শিক্ষাঙ্গন সার্বিক অর্থে কখনো কল্যাণকর মানবসম্পদ তৈরীতে সফলকাম হবে না।

কোচিং সেন্টার সমাচার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের মান নিম্নমুখী হয়ে যাওয়া, রাজনৈতিক দলের সাথে ছাত্র রাজনীতির কুটিল সংযোগ ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-প্রশাসনে অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘুষ চর্চার মাধ্যমে শিক্ষা পরিবেশ বিনষ্ট করাসহ ইত্যাদি কারণে সময়-অসময় পড়াশুনা ব্যাহত হয়ে শিক্ষা কার্যক্রমে অনগ্রসরতা ও বিশৃংখলা এবং এহেন আনুষঙ্গিক কারণে 'কোচিং সেন্টার'-এর জন্ম, প্রসার ও এর প্রচন্ড প্রভাব বাংলাদেশের শিক্ষা-জগতে প্রকটভাবে পরিদৃষ্ট হচ্ছে বললে তিল পরিমাণও অত্যুক্তি হবে না। ফলে প্রকৃত অর্থে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অধিকাংশই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখা ও শিক্ষাদানের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন চরমভাবে। সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বিশেষ করে পরীক্ষা দিয়ে তার 'সার্টিফিকেট' প্রাপ্তির সুনিশ্চিত আশায় কোচিং সেন্টারে পড়ানোর জন্য অভিভাবক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খরচাদি বহন করার পরও মোটা অংকের কোচিং ফি দিয়ে সন্তানের পড়াশুনার ধারাবাহিকতা রক্ষায় প্রাণপাত করে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

সাধারণত কোচিং সেন্টারগুলো অপছাত্র রাজনীতি মুক্ত। এর পরিবেশ শান্ত-স্নিগ্ধ, শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর। উপরন্তু নিয়মিত টেষ্ট শৃংখলার নিগড়ে শিক্ষার্থীরা যেভাবে কোচিং সেন্টারে যাওয়া আসা করে তা সত্যিই পরম স্বস্তিদায়ক বৈকি–এই হচ্ছে অভিভাবক-মনের রং ও প্রত্যয় রশ্মি। অপরদিকে অথর্ব ও অপদার্থ শিক্ষক সম্প্রদায়ও এসব কোচিং সেন্টার part time teaching এর মাধ্যমে নিয়মিত চাকরির বেতনের উপরতি অর্জনে বেশ নাদুস-নুদুস হয়ে উঠেন এমনিভাবে, যেমনটি পাষাণ্ড সুদের ব্যবসায়ী আসল অর্থের চেয়ে সুদের টাকার মোহমায়ায় আবিষ্ট হয়ে পড়েন। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বা শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছাত্র-শিক্ষকেরাও এসব কোচিং সেন্টারে যোগদান করে দু'টো পয়সা অর্জনের সুযোগ লাভ করে থাকেন নিরুপদ্রবে। এভাবে কোচিং সেন্টারের তথাকথিত একাডেমিক স্ফূরণ ও বিকাশ ঘটে।

মূল প্রশ্ন হচ্ছে, এতে শিক্ষার্থীর পড়ালেখা প্রকত অর্থে কি পরিমাণ হচ্ছে, বিশেষ করে গুণগত দিক থেকে? অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, কোচিং সেন্টার-এর পড়াশুনা Mechanical ও Methodical; Humanizing নয়। সেট করা প্রশ্নভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি হওয়ায় বিষয়বস্তুর সামগ্রিক হৃদয়ঙ্গম করানো অপেক্ষা 'পরীক্ষায় পাস' করার কৌশল ও নাম্বার অর্জনের শৈল্পিক কুশলতায় শিক্ষার্থীদেরকে আত্মপ্রত্যয়শীল করে তোলা। আর তাতো হবেই। কারণ, বিষয়ভিত্তিক Exhaustive teaching দানের সময় ও যোগ্য শিক্ষকের ঘাটতি আবডালে থেকে যায় প্রশ্নপত্রের Luxury show, printing and setting এ পরীক্ষা পরিচালনা এবং ফলাফল প্রকাশের শিল্প-কুশলতায়। এ যেন প্রসাধনী প্রলেপে 'অচল পাত্রীকে' পাত্রস্থ্ করার মতো, যা বর-বধু উভয়পক্ষই আপাত দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ বিপর্যয় ঠাহর করতে অপারগ হয়ে পড়েন। ফলে সত্যিকার অর্থে পড়ালেখা অর্জনের জন্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই যেখানে ৩৬৫ দিনের মাঝে গড়ে ১৮০ দিন পাঠদানে কোর্স সমাপনে ব্যর্থ হয় উপরোল্লিখিত কারণের জন্যে, সেখানে কোচিং সেন্টারের স্বল্পমেয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আর যাই হোক শিক্ষার ঈপ্সিত উন্নয়ন বলতে গেলে হয়ই না। যেসব শিক্ষার্থী কোচিং সেন্টারে পড়াশুনার পর আচমকা ভাল ও অবাক করা ফলাফল পাবলিক পরীক্ষায়ঃ এসএসসি/এইচএসসি ইত্যাদিতে করছে তাদের এই কৃতিত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে একান্তই ব্যক্তিগত শ্রম, মেধা ও তৎসঙ্গে অভিভাবকদের সতর্ক পরিচর্যার জন্যেই, এতে সন্দেহ নেই। কোচিং সেন্টারের অবদান বলতে গেলে শুধু এটুকু যে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে তাদের

www.pathagar.com

পড়ালেখার জীবনে সুশৃংখল শিক্ষা-পরিবেশ দিতে ব্যর্থ হয়েছে, কোচিং সেন্টার যেন সেই সাফল্যটুকু তাদেরকে এনে দিয়েছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ভাবে প্রপীড়িত কিছু বেকার যুবককে অর্থোপার্জনেরও একটা অজবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে উপার্জনের পথ করে দিয়েছে। সবশেষে স্মর্তব্য, কতিপয় কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, ভর্তি পরীক্ষাসহ পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করানোর মত কারসাজি ইত্যাদির অভিযোগ এবং অপবাদও রয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষায় দুর্নীতির আর একটি ফ্রন্ট সৃষ্টি হয়েছে কোচিং সেন্টার ব্যবসার মাধ্যমে। সুতরাং কোচিং সেন্টার আশু পদক্ষেপে বন্ধ করা উচিত, বেআইনী ও ক্ষতিকারক হিসেবে এর উচ্ছেদ সাধন করা উচিত। নইলে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মানোন্নয়ন আশানুরূপ কখনো হবে না, অভিভাবকদেরও দ্বিগুণ খরচ হ্রাস পাবেনা। অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোচিং সেন্টারে পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহের খেসারত থেকে গোটা জাতির পরিত্রাণও যে ঘটবে না -তা প্রতিদিনের সূর্যোদয়ের মতই ধ্রুব সত্য।

প্রাইভেট কোচিং সমাচার

এবার প্রাইভেট কোচিং এর মূল্যায়ন করা যাক। প্রকৃতপক্ষে কোন দেশ ও জাতির মৌলিক উন্নতি ও অগ্রগতি যে শিক্ষার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তা বলাই বাহুল্য। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাইভেট কোচিং-এর অপকারিতা ও অপ্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে প্রাইভেট কোচিং উচ্ছেদের সম্প্রতি যে পদক্ষেপ নিতে চাচ্ছে যার কতিপয় বাস্তব অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচরীভূত করা অপরিহার্য। কারণ পদক্ষেপ নেয়ার আগে এর কার্যকারিতা ও সাফল্য নিশ্চিত করা না গেলে এতে হিত অপেক্ষা অনিষ্টের সম্ভাবনা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে বৈকি। যেমনঃ

১. বাংলাদেশের সামগ্রিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রাইভেট কোচিং বা টিউশনি একটি স্থায়ী পেশা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। ব্রিটিশ ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আমলেও প্রাইভেট কোচিং দিয়ে ও গৃহশিক্ষক রেখে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাদান পদ্ধতি বলবৎ ছিল। পার্থক্য যদি কিছু থাকে তবে তা হচ্ছে সে সময়ে জনসংখ্যার স্বল্পতা ও স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী থাকায় কোচিং বা প্রাইভেট টিউশনি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচরীভূত হতো। এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির কারণে উক্ত পেশাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে; বরং বৃদ্ধি পেতে বাধ্য হয়েছে।

www.pathagar.com

২. বর্তমানে ছাত্র-সংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সেই অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি না পাওয়ায় শিক্ষাদানের পরিবেশ যথেষ্ট ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিতে আদর্শ শিক্ষাদানের জন্যে প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে যেখানে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত ১:২৫/৩০ হওয়া উচিত, সেখানে বর্তমানে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়সহ) ১:১৫০ পর্যন্ত শিক্ষক ছাত্রের শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। এমতাবস্থায় কার্যকরীভাবে শিক্ষাদান মোটেই সম্ভব নয় বিধায় অনেক শিক্ষার্থীকে বাধ্য হয়েই প্রাইভেট কোচিং এর শরাণপন্ন হতে হয়।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানরত সব শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি সমভাবে ফলপ্রসূ ও প্রশংসনীয় নয়। অনেক শিক্ষক আছেন যে তারা নিজেরা ভাল শিক্ষিত ও জ্ঞানী নন। অনন্যোপায় হয়ে অসৎ পন্থায় ঘুষ দিয়ে, মামা-ভাগ্নের সম্পর্কিত জোরে, প্রয়োজনে পেশীর আশ্রয় নিয়ে শিক্ষকতায় প্রবেশ করছেন। ফলে শিক্ষার মানও পরিবেশের চরম অবনতি ঘটেছে। ফলে স্বাভাবিক কারণে অন্ততপক্ষে পরীক্ষায় পাস করার নিমিত্তে প্রাইভেট কোচিং অনেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

৪. প্রাইভেট কোচিং তুলে দেয়ার লক্ষ্যে শিক্ষকদেরকে স্বীয় স্কুলে ছাত্র পড়ানোর অনুমতিদানের কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভাবছেন। যদি এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয় তা হলে একাডেমিক তথা প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষাদানের ঐতিহ্যগত গুণ ও প্রথার চরম বিপর্যয় ঘটবে; সন্দেহ নেই। কারণ এ ধরনের কোচিং ক্লাসে শিক্ষকদের মাঝে ক্লাস ভাগাভাগি ও বিষয় নির্বাচনে বেশ তর্ক-বিতর্ক ও বিরোধ-বিভক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। এছাড়া ক্লাসে শিক্ষাদান অপেক্ষা কোচিং ক্লাসে শিক্ষাদানের প্রাধান্য অবশ্যি অবশ্যি মন-মানসিকতায় প্রভাব বিস্তার করবে।

৫. প্রাইভেট কোচিং থেকে শিক্ষকদের রহিত করলে অধিকাংশ শিক্ষক অর্থনৈতিক দুরবস্থার শিকার হবেন। বিশেষ করে শহর-বন্দর-নগরীর শিক্ষকবৃন্দ, যাদের বেতন গড়ে যদি ৬ হাজার টাকাও ধরে নেয়া হয়, তাদের পক্ষে কমপক্ষে ২/৩ হাজার টাকার বাড়ি ভাড়া দিয়ে বাকি অর্থে পরিবার নিয়ে শহর-নগর-বন্দরে জীবন কাটান অত্যন্ত ক্লেশকর হবে বৈকি। ফলে তারা অন্য উপায়ে বাড়তি আয়ের জন্য অবশ্যি সচেষ্ট হবেন; ফলে কোচিং প্রফেশন ছাড়া অন্য কোন পেশা তাদের শিক্ষকতা-পেশার মান ও মেধার যথেষ্ট অবনতি ঘটাতে বাধ্য।

www.pathagar.com

৬. বাংলাদেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক ত নাই-ই; বরং অনেক শূন্য পদেও শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে এসব শিক্ষকের ক্লাস নেয়ার জন্য 'এবসেন্টিজ' রুটিন করে অন্য বিষয়ের শিক্ষকদেরকে দিয়ে ক্লাস করানোর কারণে পাঠদানের অবনতি ঘটছে।

৭. এ প্রসঙ্গে এটাও বিবেচ্য, প্রতি ঘন্টায় পাঠদানের যে সময়টুকু বরাদ্দ থাকে এ সময়টুকু-ও যথেষ্ট অপর্যাপ্ত। ৩৫ থেকে ৪০/৪৫ মিনিটে বড় শ্রেণীতে ধরুন শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত যদি ১:৪০ ও হয়, শিক্ষাদান ও পাঠ আদায় যথাযথভাবে সম্ভব হয়ে উঠে না।

৮. আর একটি মারাত্মক দিক হচ্ছে পাঠ্য-পুস্তকের মান ও রচনাশৈলী। সম্ভবত সমাজ পাঠের কতিপয় পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের, বিশেষ করে অংক, বিজ্ঞান, এবং ইংরেজি পাঠ পরিবেশনা ছাত্রদের মেধা, বয়স, বিদ্যার্জনের স্তর অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে এতো দুর্বোধ্য ও কষ্ট-কল্প, কঠিন শব্দ এবং পরিভাষার জন্য এত ক্লেশকর, তৎসঙ্গে অনুশীলনীর কাঠিন্য ও নতুনত্বের এত বাহার যে, ছাত্র কেন, অনেক শিক্ষক, বিশেষ করে মফস্বল অঞ্চলের অনেক শিক্ষকের নিকট এসব পাঠ্যপুস্তক কঠিন ও দুর্বোধ্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার জন্যে শিক্ষকদেরও কতিপয় বিষয়ে কোচিং অভিজাত ভাষায়, 'ট্রেনিং' নিতে হচ্ছে এসব বিষয়ে। শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে এসব পুস্তক রচনা করার ক্ষেত্রেও তেমন মনযোগ দেয়া হয়না বলে এই দুর্গতি ঘটছে শ্রেণীকক্ষে।

৯. এটা ঠিক সমালোচনা নয়, তবে বাস্তবতার খাতিরে বলা অসমীচীন হবে না যে, 'মেটার্নিটি লিভ' বা মাতৃত্বজনিত (তিন মাসের) ছুটির কারণে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাদান যথেষ্ট বাধাগ্রস্ত হয়। ক্রমবর্ধমান হারে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ফলে এই বাধা আরো বিস্তৃতি লাভ করছে। প্রক্সি বা সাবস্টিটিউট শিক্ষক দিয়ে এ ধরনের শিক্ষাদানে প্রকৃত ঘাটতি মেটানো সম্ভব নয়। প্রাইভেট কোচিং এর কিছুটা বিকল্প হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করছে।

১০. প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কিছু এক্সট্রাঅর্ডিনারী বা মেরিটোরিয়াস ছাত্র থাকে। এসব ছাত্রের এক্সট্রা টিচিং প্রয়োজন, যুগপৎ তাদের নিজের জ্ঞান-তৃষ্ণা মেটানো ও দেশের সেবায় কোয়ালিটি জনশক্তি সরবরাহের জন্যে। এক্ষেত্রে অভিভাবকবৃন্দও আর্থিক অভাব-অনটনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে স্বীয় সন্তানকে সোৎসাহে প্রাইভেট কোচিং প্রদানে নিবেদিত হন। তারা চান নামী দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মতো তাদের সন্তানেরাও বিশেষ মর্যাদাসহ সনদপত্র পাক ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক।

www.pathagar.com

১১. ভাল ও নামকরা শিক্ষক যারা তারা শ্রেণীকক্ষে সফল শিক্ষা দেন বলে এদের কাছে অন্য স্কুলের মেধাবী ছাত্ররা পর্যন্ত কোচিং এর জন্য ছুটে আসে; নিজের গরজেই। এটাও বিশেষভাবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈকি। অযোগ্য ও অপদার্থ শিক্ষকরাই প্রাইভেট কোচিং বা এর ব্যবসা দিয়ে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার অবনতি ঘটান। বাংলাদেশের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের বিপর্যয়ে এদের মত শিক্ষকরাও কিন্তু কম দায়ী নন। পাশাপাশি সৎ-চরিত্রবান নিবেদিত ও দায়িত্বশীল শিক্ষকদের প্রাইভেট কোচিংও অনুরূপভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশংসনীয় ও কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্টের জন্য তারা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ, এটা ও হিসেবে রাখতে হবে।

১২. সবশেষে পুনশ্চ সেই কথা, শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতিবিযুক্ত প্রশাসন ও অদক্ষ কর্মকান্ড আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেপরোয়াভাবে ধ্বংস করে চলছে। জাল সার্টিফিকেট বিক্রি, ভূয়া রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ইত্যাদি গর্হিত কাজ ছাড়াও বৈধভাবে ছাত্র রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য বৈধ কাজেও ঘুষের দাপট যথেষ্ট বিদ্যমান। মোটা অংকের টাকা খেয়ে শিক্ষক নিয়োগ, বদলী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্তি ইত্যাদিতে বদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কত বড় যে চতুর অর্থসন্ত্রাসী তা নির্ণয় করে কে? চাকরির পয়সা ও চাকরির বয়স অনুযায়ী শিক্ষাবোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় দপ্তর, শিক্ষা ভবন ও মন্ত্রণালয়ের সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর আয়-ব্যয়ের হিসাব, জোতজমি ও বাড়িঘরের মালিকানার খোঁজ নিলেই সহজে উন্মোচিত হবে শিক্ষা খাতে দুর্নীতি কী পরিমাণ এ দেশে হয়েছে ও হচ্ছে।

এ প্রসংগে সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট আর একটি বিষয় তুলে ধরলে অপ্রাসংগিক হবে না। তা হচ্ছে এই যে, এ দেশের চরিত্রবান, সুশিক্ষিত ও মেধাবী অনেকেই শিক্ষকতা পেশাটিকে সৎ-জীবনযাপনের অনন্য পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তারা Coaching টিকেও আর্থিক অনটন লাঘবের একটি সৎ উপায় মনে করে এ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। এ দৃষ্টিতে প্রাইভেট কোচিং বন্ধ করতে হলে ধীরস্থিরভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষকদের আপাতত আর্থিক অবস্থা দূরীকরণ, তাদের আবাসিক ব্যবস্থাকরণ, সম্মানজনক বেতন ও মর্যাদা প্রদান এবং বিশেষ করে শিক্ষাদপ্তরসমূহের ঘুষখোর ও দুনীতিবাজদের খপ্পর থেকে পরিত্রাণ দিয়ে শিক্ষক সমাজকে প্রতিষ্ঠিতকরণের আশু পদক্ষেপ প্রয়োজন।

এটাও অনস্বীকার্য, কোচিং ও প্রাইভেট পড়ানোর রেওয়াজ সর্বোতভাবে উচ্ছেদ সাধন করার মাঝেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নয়ন একান্তভাবে নির্ভরশীল; কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা যায় শিক্ষার্জনের জন্য, অথচ এই

www.pathagar.com

শিক্ষার ঘাটতি পূরণের জন্য প্রাইভেট কোচিং প্রয়োজন হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতাও মর্যাদা রইল কোথায়? সে হিসাবে আগামী ৫ বছরের মধ্যে এই ধরনের বাণিজ্যিক পড়াশুনার ইতি ঘটানোর কার্যক্রম গ্রহণ করা অপরিহার্য বৈকি।

সেশন জট ঃ কারণ ও প্রতিকার

বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যার বিশেষ একটি চলমান উপসর্গ হচ্ছে সেশন জট। এটা সাম্প্রতিককালের একটি নতুন সৃষ্টি বা উপহার। উচ্চ শিক্ষা, বিশেষ করে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গনে ঘটেছে এর প্রসার অনেকটা সংক্রামক ব্যাধির মতো। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে বহু লেখালেখি হয়েছে পত্র-পত্রিকা, সাময়িকীতে। কিন্তু তবু এর সুষ্ঠু প্রতিবিধান এ পর্যন্ত হয়নি। যথা নিয়মে যথাসময়ে শিক্ষাবর্ষের শুরু ও শেষ না হওয়ায় বা না করতে পারায় বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে সেশন জট বাসা বেঁধেছে উর্ণনাভের মতো। ফলে লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা লাভের পথ প্রতিবছরই হয়ে উঠেছে অনিশ্চিত ও বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ। অভিভাবক মহলে দেখা দিয়েছে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে সংশয় ও হতাশা। এর কতিপয় কারণও বিশেষ আঙ্গিক নিচে সংক্ষেপে বিবৃত করা হলো।

প্রথম কারণ ঃ ছাত্র-শিক্ষকের নৈতিক ও সৌজন্য বিধৃত সুহৃদ সম্পর্কের ক্রমাবনতি। শিক্ষাঙ্গন বলতে বুঝায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সুস্থ শিক্ষা পরিবেশ। শিক্ষক হচ্ছেন জীবন্ত পাঠক্রম বা Living Curriculium, শিক্ষার্থী হচ্ছে তাঁর একনিষ্ঠ ও আত্মনিবেদিত অনুসারী বা এক এ দৃষ্টিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান শিক্ষা পরিবেশের দিকে তাকালে শুধু নিরাশই হতে হয় না, বরং মর্মাহতও হতে হয় চরমভাবে। পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়ার জন্য শিক্ষার্থী কর্তৃক আন্দোলন ও শিক্ষক ঘেরাও, নকল প্রতিরোধের জন্য অথবা নকল সরবরাহের দায়ে শিক্ষক নাজেহাল, উগ্র ছাত্রদের আক্রমণ হতে জীবন বাঁচানোর জন্য দ্বিতল/ত্রিতল হতে লাফ দিয়ে শিক্ষকের প্রাণ বাঁচানোর শঙ্কাপূর্ণ ঘটনা, ইত্যাদি নিঃসন্দেহে এই অপ্রিয় সত্যটিই প্রকাশ করে যে, আমাদের ম্যাচিউরড শিক্ষার্থীদের সাথে এক্সপেরিয়েন্সড শিক্ষকদের সুহৃদ সম্পর্ক স্থাপনে কোথায় যেন মারাত্মক গলদ রয়ে গেছে।

এ গলদ থাকতে পারে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুতে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর চরিত্র বা ব্যক্তিত্বে অথবা সহ-শিক্ষার পরিবেশগত শালীনতার লালন-পালনের অভাবে। অথবা হতে পারে শিক্ষাদাতার শিক্ষাদানে অযোগ্যতা বা ব্যর্থতার কারণে। তবে এটাও অস্বীকার করার জো নেই যে শিক্ষক অনুপাতে শিক্ষার্থীর বিপুলসংখ্যার জন্য শিক্ষাদান পরিবেশের বিঘ্নতা এজন্য কম দায়ী নয়। আসল কারণ যেটাই

www.pathagar.com

হোক না কেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুহৃদ সম্পর্ক স্থাপনে বৈষয়িক বা বস্তুগত প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাব অপেক্ষা নৈতিক ও আদর্শিক পরিচর্যা ও অনুশীলনের তীব্র অভাব এজন্য বেশি দায়ী। এই সচেতনতা ও তদানুযায়ী শিক্ষা পরিবেশ সংস্কারের পদক্ষেপ যে অপরিহার্য তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক অধিকার ও এর প্রয়োগ পরিসীমার অস্পটতা ও বহুমুখী ব্যাখ্যামূলক শব্দ দ্বারা সমস্যা-সমাধানের পথে বিপত্তি রচনা। সহজ করে বললে দাঁড়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর শিক্ষাঙ্গনে 'অধিকার' ভোগের প্রশ্নে যেসব সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেসব সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা অপেক্ষা ইচ্ছাকৃত জটিলতা ও বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশন, বাক্য ব্যয় ও আচরণ অনেক সময় কুটিল বিপরীতের পরিবেশ সৃষ্টি করে বেশি। সৌজন্য ও নৈতিকতার প্রভাব অপেক্ষা নিকৃষ্ট যুক্তি ও রূঢ় বাস্তবতার আসক্তি প্রায়শ এসব সমস্যা সমাধানের বীভৎস প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। গুনী শিক্ষকদের আদেশ-উপদেশ এমনকি অনুরোধ-উপরোধ পর্যন্ত ছাত্র সমাজের নিকট শুধু বিফলই হয় না, বরং অনেক সময় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কেরও লজ্জাস্কর অবনতি ঘটিয়ে থাকে। যেমনঃ (ক) পরীক্ষার সময়সূচী বা প্রশ্নপত্র নিয়ে সম্প্রতি প্রায়ই ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে অশিক্ষামূলক আচরণের অভিব্যক্তি ঘটতে দেখা যায়। বিরতিসহ পরীক্ষার সময়সূচী সংশোধনের দাবি; প্রশ্নপত্র সিলেবাস বহির্ভূত হয়েছে অথবা 'কমন' পড়েনি বলে এর পরিবর্তন, পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নকল ধরার ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরকে নাজেহালকরণ–ওমুক শিক্ষক বা কর্মকর্তাকে বহিষ্কার ইত্যাদি ন্যায়-অন্যায় আবদার, পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ণে গাফেলতি, ইত্যাদি দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা বাতিল বা ফলাফল ঘোষণায় বিপত্তি ইত্যাদি কারণে সময়মতো সেশন সমাপ্তিতে ঘটে বিপর্যয়।

(খ) তৃতীয়তঃ ছাত্র রাজনীতিতে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহের স্বার্থকেন্দ্রিক প্রভাব এবং সমর্থনও অনেক সময় সেশনজট সৃষ্টি করে থাকে। সন্তানের অভাব-অভিযোগ বা আবদার মিটানোর ক্ষেত্রে মা-বাবার যেরূপ প্রধান ভূমিকা থাকে; ঠিক তেমনি ছাত্র সমাজের অভাব-অভিযোগ বা চাহিদা মিটানোর ক্ষেত্রেও অভিভাবক সদৃশ শিক্ষক সম্প্রদায়েরই উচিত প্রধান ভূমিকা পালন করা। এ ক্ষেত্রে বাইরের রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহনের প্রশ্রয়দান মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলেরই সূচনা বৃদ্ধি করে শিক্ষাঙ্গনে। এবং ছাত্র-রাজনীতির সীমা ও প্রকৃতি নির্ধারণ এবং উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা হিসেবে শিক্ষক সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে নিয়ন্ত্রণ থাকাটিই স্বাভাবিক ও যুক্তিসম্মত হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

দুঃখের বিষয়, আমাদের শিক্ষাঙ্গনে আজ শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ প্রায় নেই বললেই চলে। বিবিধ সমস্যাসহ সেশন জট আজ উচ্চ শিক্ষার পরিবেশকে চরমভাবে বিশৃংখলা ও অস্থিরতার শিকার করে দিয়েছে। উক্ত পরিস্থিতির আলোকে সেশন জটের সমাধানের জন্য ঃ

(১) ছাত্র-শিক্ষকের সুহৃদ ও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পারস্পরিক নৈতিকতা ও সৌজন্যের বিকাশ সাধনমূলক সংশোধিত পাঠক্রম ও কর্মসূচী গ্রহণ।

(২) ছাত্র-রাজনীতির রূপ রেখা ও সীমা নির্ধারণপূর্বক ছাত্র সমাজকে মাতা-পিতার মতো শিক্ষক সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন।

(৩) দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ ও শিক্ষক সমাজের যৌথ প্রচেষ্টায় শিক্ষাঙ্গনের কর্মকান্ডে শিক্ষা পরিবেশ সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি করানোর কর্মসূচী গ্রহণ।

(৪) সেশন জট নিরসনের জন্য উন্নতমানের ডিগ্রি কলেজসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিপূরক ক্লাস বা পাঠ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের উন্নয়নমূলক পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৫) সবশেষে সরকার, (সরকার) বিরোধী রাজনৈতিক দল ও শিক্ষক সমাজের মধ্যে অন্ততপক্ষে ভাবী প্রজন্মের কল্যাণার্থে সুষ্ঠু শিক্ষা পরিবেশ সংরক্ষণের খাতিরে হলেও নিঃস্বার্থ সমঝোতা সংরক্ষণ। আমাদের ভাবী বংশধরদের আদর্শিক সুন্দর জীবন, আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ রচনার নৈতিক দায়িত্ব সরকার, সুধীসমাজ ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের। তারা উক্ত চেতনা ও আগ্রহে উদ্দীপ্ত হয়ে জাতি-ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে আমাদের তরুণ সমাজের সাম্প্রতিক অবনতির গতিরোধের দায়িত্ববোধে জাগ্রত হলেই সেশনজটসহ শিক্ষাঙ্গনের সমূহ সমস্যা সমাধান সম্ভব। এ ক্ষেত্রে এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে, ভিনদেশী মুরুব্বী ও তার মতাদর্শ, ধারকরা বা খয়রাতি পরামর্শ পুঁজি হিসাবে ব্যবহার প্রকারান্তে আমাদের ছাত্র সমাজকে স্বদেশে বিদেশী চিন্তা কর্মে দীক্ষিত করে ময়ুরপুচ্ছ বিশিষ্ট কাক সম্প্রদায় তৈরি করা বৈ অন্য কিছু নয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা দান প্রসঙ্গ ঃ

ইদানীং বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব পুনরায় সচেতনভাবে উপলব্ধ হচ্ছে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে জাতিসংঘে বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন, এবং এই অনন্য দৃষ্টান্তের অনুসরণে পরবর্তিতে বাংলাদেশে সর্বস্তরে বাংলা চালু করণের সরকারি নির্দেশ প্রদত্ত হয় সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসেন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে, ৯০ দশকে। সে সময়ে ঃ

ক. সর্বস্তরে বাংলা চালুর সোৎসাহে অপরিণামদর্শী কিছু সুধী ও ছাত্রবৃন্দ ইংরেজি বিদ্বেষী মনোভাব এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যে এর আশু পরিণামে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলিত শিক্ষাক্রম রেওয়াজ উৎপাটিত হলো শিশু শ্রেণী থেকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত।

খ. ফলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পরিমন্ডলে অ-ইংরেজি ও ভুল এবং কাঁচা ইংরেজির দাপটে দেশীয় ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশনাসহ বৈদেশিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের অশনি সংকেত তীব্রভাবে প্রকাশ পেলো।

উদাহরণস্বরূপঃ

১. The Daily Sun পত্রিকার প্রথম সংখ্যার উপসম্পাদকীয়তে আফসোস করে বলা হলো ঃ ইংরেজি জানা লোকের অভাবে অন্য ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিকদেরকে 'ধার' করে এনে অদ্যকার পত্রিকার সংখ্যা প্রকাশ করতে বেশ হিমশিম খেতে হয়েছে।

২. বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত ইংরেজি পত্রাবলির মর্মার্থ অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হওয়ায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সাহায্যাদি হারাতে বসেছে।

৩. বাংলাদেশ সরকার ও তদীয় মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দের অনেকেই ইংরেজিতে দুর্বল হওয়ায় আন্তর্জাতিক মানে দেশ পরিচালনায় তাঁরা অস্বস্তি ও উদ্বেগাকুল পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন।

৪. ইংরেজি শিক্ষা ডিগ্রি পর্যন্ত উচ্ছেদ করায় বাংলা শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে মাষ্টার্স প্রাপ্ত ডিগ্রিধারীরা শুদ্ধভাবে ইংরেজি বলা ও লেখার বিশুদ্ধতা হারিয়ে আন্তর্জাতিক সংযোগ বা কর্মকান্ডে হাপিত্যেশ অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

www.pathagar.com

৫. 'ইংরেজি' বিষয় শিক্ষাদানের মাধ্যম বাংলা হওয়ায় ইংরেজিতে এম এ পাস ডিগ্রিধারীরাও ইংরেজি কথোপকথন এবং লেখাজোখায় নিম্নমানের পরিচয় দিচ্ছে।

৬. পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে 'বাংলা' ভাষার মান ও মর্যাদা সীমিত হওয়ায় ইংরেজি ভালো মতো না-জানা কোনো বাংলাদেশী উচ্চ শিক্ষিতই দেশ-বিদেশের বিদেশী সংস্থা বা কোম্পানিতে চাকরি-বাকরি পাচ্ছে না।

৭. বাংলাদেশে ইংরেজি মাধ্যম স্বদেশী ও বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ সুযোগে বেশ নামী-দামী হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে A লেভেল, O লেভেল ও English Medium শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার মতো প্রভাবশালী ধনাঢ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ফলে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজাতীয় ও ভিনদেশী ইংরেজি বই পুস্তক পাঠ্যভুক্ত করায় বিজাতীয় বিষয় ও মতাদর্শ প্রাধান্য লাভ করেছে প্রচন্ডভাবে গোটা দেশ জুড়ে। পরিণামে দেশের মেধা 'ধোলাই' সহ বিরাট অংকের ছাত্র-বেতনাদি আদায়ের মাধ্যমে বিপুল অর্থ কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে বিদেশী শক্তি তথা ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব ও প্রশাসনের।

অন্য কথায়, ইংরেজি ছেড়ে দিয়ে এদেশ এর আপন শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা বাজেট তথা তহবিল হারাতে বসেছে ইংলিশ মিডিয়াম দেশী-বিদেশী শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা কর্মসূচির একচেটিয়া অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিকল্পনার স্রোতে। ফলে আবার 'ইংরেজি' শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নতুন ভাবে অনুভূত হলো জাতীয়ভাবে। ১৯৯৫-এ 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' উদযাপনের সময় এর বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এ উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'উত্তরণ' ম্যাগাজিনে পরিবেশিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রণিধানযোগ্য।

ক. ডিগ্রি পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তন ঃ ডিগ্রি পর্যায়ে ইংরেজি বিষয়কে ১৯৯৫ সাল হতে পুনপ্রবর্তন করা হয়েছে।

খ. ইংরেজি শিক্ষকের বয়সসীমা বৃদ্ধি ঃ ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকের অভাব পুরণার্থে ইংরেজি শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করলে তাকে ৬৫ বছর পর্যন্ত সরকারি বেতন-ভাতা সহকারে চাকরির সুযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। (উত্তরণ পৃঃ ৩৫)।

উল্লেখ্য, ড. কুদরাত- এ খুদার শিক্ষা কমিশন ৭৪-এর রিপোর্টে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে 'ইংরেজি' শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিলো ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭-এর রিপোর্টে ইংরেজি ভাষাকে তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছে।

www.pathagar.com

যাহোক, শিক্ষা কমিশন, শিক্ষা রিপোর্ট ইত্যাদিতে ইংরেজি ভাষার এই হতশ্রী অবস্থান অনুধাবন করে সম্প্রতি প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজি পড়ানোর পাঠক্রম চালু করা হয়েছে প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই। প্রকারন্তরে এর অর্থ হচ্ছে সরকারিভাবে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব Grass-root লেবেল পর্যন্ত পৌছানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সরকার সম্প্রতি গ্রহণ করেছেন। ফলে ১ম শ্রেণী থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি বাধ্যতামূলক হতে চলেছে ইংরেজী ২০০৪ সাল থেকে।

আরও দুটো কথা না বললেই নয়। সেটি হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় জীবনে ইংরেজি এর ঐতিহাসিক এ সংস্কৃতিগত প্রভাবের অবমূল্যায়নটি। যেমন ঃ আড়াইশ বছরের ইংরেজ শাসন এ দেশের প্রশাসন ও গোটা সমাজ জীবনে যে ছাপ রেখে গেছে তা পাইকারিভাবে অস্বীকার করাটা নিরেট মূর্খতা বা গোয়ার্তুমী বিশেষ। কারণ আমাদের সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনেও ইংরেজি ভাষা স্বাভাবিকভাবে অন্যুন ২৫% ভাগ প্রভাবিত করে রেখেছে। সার্ট, পেন্ট-কোট ব্যবহার থেকে শুরু করে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উৎসব পালনে ফেব্রুয়ারি ও বাংলা একাডেমির একাডেমি ব্যবহার পর্যন্ত ইংরেজি প্রীতি ও রীতির বহাল আজও নির্বিকার তথা সক্রিয়ভাবে বিরাজমান। দ্বিতীয়ত, আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা ইত্যাদির প্রচার ও প্রসারের বাহন হিসেবে ইংরেজি ভাষার শনৈ শনৈ বৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা অর্জন ঘটছে বিপুলভাবে যা' অমোঘ শক্তি হিসাবে আমাদের মাতৃভাষায় বিস্তর প্রভাব খাটাচ্ছে ক্রমবর্ধমান গতিতে। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে কতিপয় ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে 'বাংলা' ভাষার চেয়ে 'ইংরেজি' ভাষা রপ্ত ও ব্যবহারে যথেষ্ট সাবলীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। বাংলার জটিলতা বিযুক্ত ৪২টি বর্ণমালার তুলনায় ইংরেজি ২৬টি বর্ণের শিখন, লিখন ও উচ্চারণে যথেষ্ট সরলতা ও স্বাচ্ছন্দ রয়েছে যা অস্বীকার করাটা Inferiority complex- এর সমতুল্য।

সবশেষে শিক্ষাদান পদ্ধতির (Teaching Method) দিক থেকে ইংরেজি ভাষায় Method শিক্ষাদানের উপর সাম্প্রতিককালের বহুপুস্তক এতো বাস্তবসম্মত ও উপযোগী যে, এর সমতুল্য বাংলাভাষায় এখনও তেমন কোনো বই পুস্তক প্রণীত হয়নি বললেই চলে।

লক্ষণীয়ঃ বক্ষ্যমান এই প্রবন্ধ থেকে এ উপসংহার টানা ঠিক নয় যে, বঙ্গভাষাকে হেয় করে ইংরেজির দালালী করা হয়েছে, বরং বাংলাভাষাকে শক্তিমান ও অধিকতর উপযোগি করার ক্ষেত্রে 'ইংরেজি'কে কাজে লাগানোর মনমানসিকতা সৃষ্টিই হচ্ছে এর মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য বাংলা ভাষার যোগ্য "attendent" হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তথা বাংলাদেশ ও

www.pathagar.com

সংস্কৃতির Vehicle বা বাহন হিসাবে 'ইংরেজি' ভাষাকে ব্যবহারের 'সাধনা' করা উচিত বরং অপরিহার্য হয়ে উঠেছে অবশ্যিই। অধুনা Communicative English-এর আমদানী এর সাংঘাতিক দৃষ্টান্ত!

Communicative English প্রসঙ্গ

সূচনাতে দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। ন্যাশনাল ক্যারিকুলাম ও টেক্সটবুক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত একটি গ্রন্থ লিখেছেন ড. বদরুদ্দিন আহমদ। এর সম্পাদনায় রয়েছেন সর্বজনাব মাজহারুল হক, ড. এস. এম. ফজলুল হক ও মেহের আফতাব। সর্বমোট ৭৭টি পাঠ ও অনুশীলনী রয়েছে এতে। মুখবন্ধে বোর্ডের চেয়ারম্যান এই বইটির উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য সম্পর্কে যে বিষয়ে, অবশ্যি এই গ্রন্থাকারের বিবেচনায়, বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তা হচ্ছে ঃ

1. Interactive and communicative metghodolgoy of tgeaching learning এবং

2. "Language activites in pair and group exercises by the students.

এই দৃষ্টিতে আমাদের দেশের ক্লাস রুটিনের বরাদ্দ সময় উর্ধ্বে ৪৫ এবং কখনো কখনো ৩০ মিনিটের মধ্যে উক্ত method - এ শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ কতটুকু সম্ভব তা বোধ করি বোর্ড বা N.C.T.B. কর্তৃক তা মূল্যায়ন করা হয়নি। বিশেষ করে দু'শিফটের উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে ৪০ মিনিটের প্রথম ঘন্টাটি বাদে ৩০ মিনিটের সময় প্রতিটি বিষয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয় এবং অধিকাংশ উচ্চ বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান, পাঠের Dramatization বা Acting সম্ভব হয়ে উঠে না। কারণ এ ধরনের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গড় অনুপাত ১: ৫০ হওয়ায় এবং শ্রেণীকক্ষের বেঞ্চ ও স্থান পরিসরের অতি অপর্যাপ্ততার দরুন ঈপ্সিত ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, Communicative English শিখানোর চেষ্টায় Exercise -এর বাহুল্য এবং English grammar - এর আচমকা নানাবিধ Exercise সন্নিবেশ করার ফলে ধারাবাহিকতা না থাকায় যুগপৎ ছাত্র-শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষাক্রমের ধারাবাহিকতা তথা Teaching-learning situation- এর Discipline maintain করা খুবই জটিল ও ক্লেশকর। Preposition, Voice, Tense ইত্যাদি এবং Multiple choice সহ বিভিন্ন প্রকার Objective Questions- এর সমাহারে প্রণীত বইটির পাঠদান, পাঠ আদায় ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সাধারণ মানের ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য এটি একটি জটিল সমস্যা

www.pathagar.com

হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে গ্রাম-গঞ্জ ও মফস্বল এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে এই বই থেকে পাঠদান ও পাঠ গ্রহণের অবস্থা আরো করুণ ও বিপর্যস্ত অবস্থায় নিপতিত।

Contents বা বিষয়বস্তু নির্বাচনেও বইটির মধ্যে সাহিত্য তথা মননশীলতা বা Subjectivity - এর উপকরণ যেমন, সৃজনশীলতা, দর্শন, কল্পনা, প্রায় নাই বলা চলে। পাঠ সংখ্যা ৭৭টির পরিসরে ১০% ও হবে না। যেমন ঃ নবম শ্রেণীর English for Today পাঠ্যপুস্তক ৭টি কবিতা ও গদ্যের মধ্যে Pied Piper of Hamelin এবং The golden Touch ব্যতীত অন্যান্য বিষয় নিছক ব্যবহারিক জীবন-কথা ও অভিজ্ঞতার শুষ্ক কথোপকথন ও বর্ণনায় পরিব্যাপ্ত ছিল। তেমনি A Million Doilar Secret, হাসান bright student এবং তার লেখাপড়ার প্রশংসনীয় কৃতিত্বের রহস্য অথবা "A Joke about Buildings"-এর Jokers (?) দের কথোপকথনে যদিও ইংরেজি কথাবার্তা বলার শিল্প-কলার শিক্ষণীয় দিক ছিল, কিন্তু তাতে, বিশেষ করে "Joking about buildings" তাও আবার বিদেশী মানুষ ও পরিবেশের আঙ্গিকে পরিবেশনা; খুবই নিম্নমানের বলা চলে। ইংরেজি ভাষা বা Language skill রপ্ত করানোর ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে A Farmer and his sacks সহ আরো কতিপয় Lesson বিদেশী ভাব, বিষয়বস্তু ও ব্যক্তিত্বের বর্ণনার বুননে ঠাঁসা। তেমনিভাবে A letter from Geneva -এর মতো A letter from Bangladesh-এরূপ একটি পূর্ণ পত্র সন্নিবেশ না করায় বইটি যথেষ্ট বিদেশী হয়ে পড়েছিল আদল ও বিষয়ে। অন্য কথায় সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে দৃষ্টান্তস্বরূপ নবম-দশম শ্রেণীর এই এই উদ্ভট ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকটি সাহিত্য-পুস্তক অপেক্ষা বিদেশী Social Science বা সমাজবিজ্ঞান বই বলে মনে প্রতিভাত হয়েছিল প্রকটভাবে। [রক্ষা, এখন এটি পাঠ্য বহির্ভূত।]

ইংরেজি ভাষা শেখার জন্যে ইংরেজি সাহিত্য শ্রী ও স্বাদের অনুভূতি (Literary taste and beauty) অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য; এই বোধ ও অনুভূতি এই ধরনের পুস্তকে প্রায় নেই বললেই চলে। ১৯৯৬ সাল থেকে প্রবর্তিত mechanical বা methodical এই series : "English For Today" ষষ্ঠ শ্রেণী হতে ক্রমান্বয়ে এইচ এস. সি. ক্লাস পর্যন্ত চালু হয়ে আসছে প্রায় নিরেট সমাজ বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান ধারায়। তথাকথিত, "Well tried out traditional sbuject" হিসেবে এহেন পাঠ্যপুস্তকের প্রভাবে ছাত্র-ছাত্রী ও

www.pathagar.com

শিক্ষক সবাই Robot-type -এর English knowing people হয়ে উঠছে সন্দেহ নেই। ফলে তাদের Humane sentiment সহ Creative scholar হওয়াটা সুদূর পরাহত। Life-art-এর অবদমনে Living-art তথা material বা wordly utility concept at the cost of humane entity -এর প্রসার ঘটছে এহেন তথাকথিত English Text Book প্রণয়ন ও পাঠ্যকরণের মাধ্যমে। এর প্রধান কারণ ঃ

বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে অধুনা bread তথা Job-oriented হয়ে পড়েছে। এটা অপ্রয়োজনীয় নয়, তাই বলে liberal art হিসেবে এর প্রাধান্য না থাকলেও চলবে; এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী পরিণামে মারাত্মক হচ্ছে। কারণ, মানব শিশু হৃদয়বিযুক্ত, অন্যান্য প্রাণী শাবকের থেকে শ্রেষ্ঠ। এর heart বা soul আছে; যার পরিচর্যা ইংরেজি ভাষা শিখনেও থাকাটা অপরিহার্য বৈকি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রবাদটি বিশেষভাবে স্মরণীয় ঃ "Man cannot live by bread alone, he also requires spiritual food." এই spirituality অর্জনের মালমসলা Board কর্তৃক পাঠ্যকৃত প্রায় বইগুলোতে নেই বললেই চলে।

সব শেষে তবু এটা স্বীকার্য যে, ইংরেজি ভাষা শিখানোর লক্ষ্যে 'English For Today' series - এর designig, presentation এবং art of teaching-learning উদ্ভাবন অবশ্যই প্রশংসনীয়। এখন শুধু দরকার ঃ

১. contents গুলোকে আরো indigeneous বা দেশজ করা

২. teaching-learning situation-এর ভৌতিক ও কাঠামোগত উন্নতি করা।

৩. পাঠদানের জন্য English Teacher-দের Inservice Training দেয়ার জন্যে অন্তত Clustered programme প্রদানের আশু ব্যবস্থা করা।

৪. ইংরেজি শিক্ষক নন, অথচ তিনি ইংরেজি পড়ান, এহেন দুর্বলও অযোগ্য শিক্ষককে English ক্লাস নেয়া থেকে ত্বরিত অব্যাহতি দিয়ে English জানা শিক্ষককেই English Class নেয়ার দায়িত্ব দিয়ে তাকে skilled বা পারদর্শী করে তোলা।

৫. English teaching - এ অভিজ্ঞ শিক্ষক যারা আছেন, কী চাকরিতে বা অবসর যাপনে, তাদেরকে Resourceful Person হিসাবে দুর্বল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজে লাগানোর পদক্ষেপ নেয়া।

www.pathagar.com

৬. শিক্ষায় প্রশিক্ষণ নাই এরূপ নিছক ডক্টরেট ডিগ্রিধারী ব্যক্তিত্বের দ্বারা নয়, Primary ও High School teaching -এ অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, ও চাকরিতে নিয়োজিত এবং অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকদের সক্রিয় সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে English সহ বিভিন্ন বিষয়ের বাস্তবধর্মী পাঠ্যপুস্তক রচনা করা।

দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশের শিক্ষা সংস্কারে যখনই কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়; তখনই দেখা যায়, এহেন সংস্কারধর্মী পদক্ষেপ সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে আরো সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। শুধু একটি উদাহরণ QMR, SIF ইত্যাদির মাধ্যমে তথা Multiple Question -এর মধ্যে ৫০ নম্বরের Objective Question -এর প্রবর্তন। এ পদ্ধতিতে S.S.C এবং H.S.C পরীক্ষার্থীর মান ও মেধা যাচাই এর চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি নবম-দশম শ্রেণীর English For Today বইটির প্রশ্ন, প্রকৃতি ও ধারার QMR পদ্ধতির অবসান হতে চলছে। আগামীতে নব আঙ্গিকে সজ্জিত English বইটির পাঠ ও এর মূল্যায়নসহ Comprehensive type এর প্রশ্নও নানাবিধ Subjective ও Objective রকমারিতে সাজানো হয়েছে। '৯২ সালে প্রবর্তিত বৃত্ত পূরণের মাধ্যমে S.S.C পরীক্ষার নিয়ম পদ্ধতি ও মূল্যায়নের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ট্রেনিংও উত্তরপত্র পর্যালোচনা ও মূল্যায়নে Computer System -এ ফলাফল ঘোষণার কার্যকারিতা চলেছে ২০০১ সালের S.S.C পরীক্ষার সূচনা থেকে। এ শ্রম, এ অপচয় এবং শিক্ষা প্রশাসনে ছাত্র-শিক্ষক, পরীক্ষার্থীকে গলদঘর্ম Tenced life এবং activity তে কেন নিপতিত করে কেনই বা আবার জাতীয়ভাবে এর অবলুপ্তি হতে যাচ্ছে? ইত্যাদির স্বপক্ষে যুক্তি ও উত্তর অনেক হতে পারে। তবে এর বিপরীতে একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শিক্ষা বিজ্ঞানে-বি-এড/এম এড এবং এই বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রিধারীদেরকে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের দায়িত্ব প্রদান করেন না। এ দায়িত্ব দেয়া হয় Edudation as science শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি প্রাপ্ত ও skilledদের পরিবর্তে আনাড়ী বা শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ ও মূর্খ, অন্যবিষয়ে ডক্টরেট অথবা মাস্টার্স ডিগ্রিধারী সরকারি পণ্ডিত ও অধ্যাপকবৃন্দকে। ফলে আদার ব্যাপারীকে দিয়ে জাহাজের খোঁজ নেয়ার রেওয়াজে আমাদের শিক্ষা-জগতের বহু অনাকাংখিত ধ্বস ও বিপর্যয় সাধন হচ্ছে। এহেন আনাড়ীদের বলয় থেকে শিক্ষার দায়-দায়িত্ব পরিমুক্ত হয়ে এর ন্যায়ানুগ কল্যাণকর পরিশুদ্ধি কাম্য।

www.pathagar.com

নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রসংগ ঃ

এ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৩ কোটির অর্ধেকই নারী বলে অনুমিত হচ্ছে। এদের উন্নয়নের সাথে সামগ্রিক জাতীর উন্নয়ন একান্ত ভাবে নির্ভরশীল এবং তা সম্ভব নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে। এই বিবেক ও চিন্তায় অধিকতর সচেতন হয়ে বর্তমান সরকার (২০০৪ সাল) মেয়েদের মাঝে শিক্ষার উৎসাহ সম্প্রসারণে অধুনা উপবৃত্তির পরিধি গ্রাম-গঞ্জ থেকে শহর-নগর তথা গোটা দেশ ব্যাপী বিস্তৃত করেছেন এবং পূর্বের দশম শ্রেণী থেকে তা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এই সুযোগ সম্প্রসারিত করেছেন। উদ্দেশ্য, সার্বজনীন নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠাকরন। এই লক্ষ্যে বর্তমান সরকার উপবৃত্তি খাতে ৬৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করছেন।

এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক পদের ৬০% ভাগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, মাতৃস্নেহে শিশুদের মাঝে শিক্ষাদানের অধিকতর সুন্দর পরিবেশ গড়া। উপবৃত্তি ভোগকারী ছাত্রীদেরকে কতিপয় শর্ত মেনে চলার বাধ্য-বাধকতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হয়। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. বিদ্যালয়ে পড়াশোনা অবস্থায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না।

২. ক্লাসে উপস্থিতি ৭৫% থাকতে হবে।

৩. পরীক্ষায় গড়ে ৪০% নম্বর পেতে হবে।

পর্যালোচনা ঃ প্রকৃত অর্থে নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ কল্যাণকর ভাবে কার্যকরী করতে হলে বর্তমান সামাজিক পরিবেশের আশু সংস্কার প্রয়োজন। যেমনঃ

(১) সহ-শিক্ষা প্রদানের সীমা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাখা উচিত।

(২) শিক্ষা পরিবেশ গৃহ থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির নৈতিক উন্নয়নের অবকাঠামো এমনভাবে নির্ধারণ ও নিষ্ঠা সহকারে বাস্তবায়ন করা উচিত যাতে চরিত্র স্খলন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এজন্য প্রচার মাধ্যমগুলোর কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

(৩) 'স্কুল-কলেজ জীবনে ছাত্রীরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না'– এ ধরনের শর্ত বাধ্যতামূলকভাবে আনানোরোপিত থাকা উচিত; বরং এক্ষেত্রে Persuation ও Motivation জোরদার করা যেতে পারে। কারণ, অনেক পিতামাতা, এবং অনেক ছাত্রীও গোপনে নানা ধরণের বিবাহের ঘটনা লুকিয়ে রেখে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উপবৃত্তি ভোগ করে থাকে, যা একটি Open secret-ও বটে। ঠিক তেমনি পরীক্ষায় ৪০% নম্বর প্রাপ্তি ও ক্লাসে ৭৫% উপস্থিতির বাধ্যতামূলক শর্তটি সততা ও নৈতিকতা উজ্জীবনে Persuation ও motivation -এ কার্যকরী করা উচিত।

www.pathagar.com

(৪) সবশেষে নারীর ক্ষমতায়ন বা Empowerment of women এর পদক্ষেপ গ্রহণে এটা স্মরণ রাখা উচিত যে Woman is woman, and man is man— এই দুয়ের gender discrimination স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট। দৈহিক, মানসিক, মানবিক ও প্রকৃতিজাত পার্থক্য বজায় রেখে নারীর ক্ষমতায়নের চিন্তা ও কর্মের সীমা এবং তৎপরতা অবশ্যই সীমিত রাখতে হবে। নইলে তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যজগতের (?) মতো আমাদের সমাজ-ধর্ম-ও সংস্কৃতি ভদ্রবেশী লম্পট পুরুষ ও মহিলাদের সাহচর্যে অবৈধ সন্তানহত্যা ও উৎপাদনে উচ্ছন্নে যাবে। জাতীয় চরিত্রের অবক্ষয় ঘটবে আরো দ্রুতগতিতে। অর্থাৎ "A child or a car" প্রশ্নে মহিলারা car এর ভোগবাদকে প্রাধান্য দেবে বেশী।

বাংলাদেশের শিক্ষায় কতিপয় দুষ্টব্যাধি ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে নৈতিক জীব হিসাবে গড়ে তোলে তার মাধ্যমে জাগতিক ও পার্থিব উন্নয়ন সাধন করা। মানুষের প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছেঃ Man is basically moral being : মানুষ মূলত নৈতিক জীব। এই নৈতিকার জন্যেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র ও মর্যাদাশীল; best of the creations of God বা আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মাঝে শ্রেষ্ঠ। এই দৃষ্টিতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রমের দিকে তাকালে আজও চরম হতাশ হতে হয়।

গোটা জাতি এ জন্যে চরমভাবে উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এটা স্বীকৃত সত্য প্রমাণিত দৃষ্টান্ত যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংগন থেকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত এই শংকা ও দুশ্চিন্তা বিরাজমান। যে কোন সময় যে কোন ইস্যু যেমন, পরীক্ষার সময়সূচি, প্রশ্নপত্রের প্রকৃতি, ছাত্র-বহিষ্কার, শিক্ষক অপসারণের দাবি, প্রশ্ন পত্র ফাঁস ইত্যাদিকে বারংবার কেন্দ্র করে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়া; এ ধরনের ঘটনা দেশের সর্বত্রই দৃশ্যমান। এর মূল কারণ "শিক্ষার মান"-এর অবনতি। যথাযথ শিক্ষাদানে শিক্ষক-ছাত্রের যে মধুর সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য, তাও আর প্রায় নেই। ব্রিটিশ আমল এমন কি তদানীন্তন পাকিস্তান আমালেও ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক আমরা প্রায়শ প্রত্যক্ষ করেছি। বর্তমানে অনুরূপ পরিবেশ-প্রতিবেশ নেই বললেই চলে।

লক্ষণীয়, শিক্ষার সামগ্রিকতা বলতে প্রধানত শিক্ষার বিষয়বস্তু তথা পাঠ্যপুস্তকের কল্যাণীয়, বিষয়াদি, শিক্ষকের পাঠদানে যোগ্যতা ও আদর্শিক দৃঢ়তা, শিক্ষা প্রশাসনের ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিক দৃঢ়তা ইত্যাদি বুঝায়। এ দৃষ্টিতে আমাদের শিক্ষার মান যে অবস্থায় আছে তা নিবিড়ভাবে বিচার্য। যেমন ঃ

www.pathagar.com

পুনশ্চ পাঠ্যপুস্তকের কথা। বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচির কথা। এ স্তরে যেসব বই পুস্তক পাঠ্য করা হচ্ছে সেগুলোর বিষয়বস্তু, ছাপা, বাঁধাই ও অংগসজ্জা অত্যন্ত সংশয় বিযুক্ত ও নিম্নমানের। প্রথমেই দেখা যাক বিষয়বস্তু প্রসংগটির। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চেতনা, বাংলাদেশের জাতীয়তা বাংলাদেশী না বাঙ্গালী, ইত্যাদিকে ভিত্তি করে বই পুস্তক রচনায় শিশু মনে সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। অথচ এই স্তর থেকেই শিশু দেশকে স্বচ্ছভাবে জানতে ও ভালবাসতে প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে থাকে। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি কিন্ডারগার্টেন, টিউটিরিয়াল ও এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু থাকায় প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম এবং বিষয়বস্তুতে এগুলো অনৈক্য এবং বিজাতীয় ভাবধারার সৃষ্টি করে যাচ্ছে। তথাকথিত স্ট্যান্ডার্ড বা মান প্রদর্শনের জন্যে জাতীয় স্বার্থের ভাল-মন্দ নির্বিচারে বিদেশী শিশুতোষ ইংরেজি বই পাঠ্যভুক্তকরণ বর্তমানে একটা স্থায়ী ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে শিশু ও কিশোর শিক্ষার্থীরা নিজের দেশে এহেন বিভিন্ন পর্যায়ের বিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে ভিনদেশী বিষয় পাঠ করে তাদের মনমস্তিষ্ক রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে মিশ্র বা সাংঘর্ষিক ভাবধারায় বিধৃত হচ্ছে। একে অপরের সুহৃদ হওয়ার চেয়ে জ্ঞানও প্রত্যয়ের দিক থেকে তারা পরস্পর alieanated বা বৈরী হয়ে চলছে। এমনিভাবে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও দেশী–বিদেশী এবং বিদেশীর ঢং-এ স্বদেশী অনেক প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এদেশের যুবসমাজ দেশপ্রেম, দেশসেবা ও জাতীয়তাবোধে ঐক্য অপেক্ষা অনৈক্য ভাবধারায় গড়ে উঠছে চরমভাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গও এক্ষেত্রে বিবেচ্য। উচ্চ শিক্ষাদানকারী নমস্য দেশজ অধ্যাপক সম্প্রদায়ের মধ্যেও চিন্তা-দর্শন এবং কর্মকান্ডে দেশী-বিদেশী ভালমন্দ চেতনা নির্বিশেষে খিচুরীসম সংস্কৃতি ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতাও পূজা-অর্চনা প্রতিভাত হচ্ছে বৈকি! রুশপন্থী, ভারতপন্থী, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীপন্থী, বাঙ্গালীপন্থী ইত্যাদি "ইজম"-এর ভাবধারায় আমাদের শিক্ষকসম্প্রদায় সাংঘর্ষিকভাবে বিভক্ত ও পারস্পরিকভাবে বিদ্বেষ প্রসূত। ফলে এদের প্রভাবে ছাত্র-সমাজ অন্তরদ্বন্দ্বে ও বাহ্যিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গন হাতাহাতি, বোমাবাজি, হত্যা ও অশ্লীলতার ময়দানে প্রায়শ রূপান্তরিত হচ্ছে। গড়পড়তায় শিক্ষাদানের পবিত্র দায়িত্ব পালন আজ ৯০% ও শিক্ষাঙ্গনে নেই বললে চলে।

আর একটি মারাত্মক দিক হচ্ছে বাধ্যতামূলক পাঠ্য পুস্তকের বাইরে সংশ্লিষ্টতা দেখিয়ে, অন্যান্য বই পুস্তক যেমন গাইড, গ্রামার, ইত্যাদি সহায়ক মোড়কে পাঠ্যকরণে 'ঘুষ' বা 'নজরানা' পদ্ধতিটি। সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ-আলোচনায় এই প্রতীতী জন্মে যে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং কমিটি সদস্য 'টুপাইস' পাওয়ার জন্যে মোটা অংকের বিনিময়ে মান যাচাই নির্বিশেষে

www.pathagar.com

সহায়ক হিসেবে বাজে ও নিম্নমানের এমনকি বিজাতীয় ভাবধারাপুষ্ট বই অন্তর্ভুক্ত করে আসছেন। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনৈক প্রধান এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "আরে ভাই, বইয়ের মান যা' হোক, এ বইটি পাঠ্য করলে ফি বছর এককালীন ৩০/৪০ হাজার টাকার দান বা ডোনেশন তো পাওয়া যাবে; যা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কল্যাণ তহবিলটি ফেঁপে উঠলে রিটায়ার্ড শিক্ষকরা বেশ কিছু টাকা পয়সা নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন," ইত্যাদি। সুতরাং পয়সা বা ডোনেশনের বিনিময়ে ভালমন্দ নির্বিচারে পুস্তক পাঠ্যকরণ আমাদের শিক্ষার শুধু মান নয় বরং বিষয়বস্তুকেও জাতিগতভাবে কি পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। নজরানা বা এমন সরাসরি ঘুষ প্রশাসনেও ঘাপটি মেরে রয়েছে। এমন আর একটি দৃষ্টান্ত এই ঃ

এটি সত্য ঘটনা। ২৫টি এসএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ফর্ম জমা দেয়ার সময় একটি ফর্মে অসাবধানতাবশত প্রধান শিক্ষকের দস্তখত হয়নি। বোর্ডে গিয়ে তা সংশোধনের জন্য প্রধান শিক্ষক স্কুলের কারণিকসহ সংশ্লিষ্ট সেকশনের 'ইনচার্জের' নিকট ঐ ফর্মটি চাইলেন। "ওটা এখন দস্তখত করা যাবে না। কন্ট্রোলারের নিকট দরখাস্ত করে স্বাক্ষর দেয়ার অনুমতি নিয়ে আসুন। "এই উত্তর পেয়ে প্রধান শিক্ষক মুষড়িয়ে পড়লেন। কারণ সেদিন ছিল ফর্ম সংশোধনের শেষ তারিখ। বেলা প্রায় ৫টা হয়ে গেছে। যাহোক, অবশেষে স্কুলের করণিক ফর্মটিকে দস্তখত করানোর বন্দোবস্ত করলেন অবৈধ পন্থায় দুশ টাকা ঘুষের বদৌলতে। ঘুষখোর এই ব্যক্তি শ্মশ্রুমণ্ডিত নামাজী, জোহর নামাজ আদায় শেষে তিনি ঘুষের টাকা নিয়ে ছিলেন নামাজটির পবিত্রতা রক্ষার্থে।

উপসংহারে ইত্তেফাকে প্রকাশিত এহেন দুর্নীতির একটি সংবাদ যা একটি প্রামাণ্য দলিলও। সংবাদটি এইঃ

গত ৭ই জুন (১৯৯৪) কুমিল্লা জেলা শিক্ষা অফিস চত্বরে বাংলাদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সরকারি কর্মচারী সম্মিলিত পরিষদের কুমিল্লা আঞ্চলিক কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কমিটির সভাপতি আক্তারুজ্জামান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (সেই সময়কার) পরিচালক প্রফেসর মোঃ যোবদুল হক, বিশেষ অতিথি ছিলেন কুমিল্লা অঞ্চলের উপ-পরিচালক প্রফেসর মোঃ আঃ মতিন, কুমিল্লা টি. টি. কলেজের অধ্যক্ষ। প্রফেসর মোঃ যোবদুল হক বলেন, "শিক্ষা বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হলে, মিথ্যা না বললে এবং হারাম পরিত্যাগ করলে অবশ্যই শিক্ষা প্রশাসন হতে দুর্নীতি দূর হবে।"
[দৈনিক ইত্তেফাক, জুন ১৪, ১৯৯৪]

সংবাদটি বাসি হলেও এর মূল্যায়ণ অদ্যাবধি বিদ্যমান।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শিক্ষা ঃ পরীক্ষা প্রসংগ ঃ

বাংলাদেশের পড়ালেখার রাজ্যে বাৎসরিক পাবলিক পরীক্ষার সময় এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয় গোটা দেশ জুড়ে। বিশেষ করে এস. এস. সি. ও এইচ. এস. সি. পরীক্ষার সময় দেখা যায় লাখ লাখ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে সারাদেশ জুড়ে এর আয়োজনে কর্মব্যস্ত ও তৎপর হয়ে পড়ে গোটা সরকার। সরকারের প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিপুল বাহিনী। বেসরকারি পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রশাসনের অধিকাংশও এ জন্যে বেচইন ও ব্যস্তসমস্ত কম নন। বিশেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ড সহ ডি. সি. পুলিশ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে পৌর ও ইউনিয়নের বড়ছোট কর্মকর্তা। মোটকথা দেশের শতকরা অন্যূন ৭০ ভাগ সরকারি-বেসরকারি প্রশাসন এ পরীক্ষার যাবতীয় কাজে বিভিন্নভাবে জড়িত হয়ে পড়ে ফী-বছর।

প্রচার মাধ্যমগুলোও এই দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা, সমালোচনা ও দিকনির্দেশনায় পিছিয়ে নেই। শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কে কোন সেন্টার পরিদর্শন করছেন, কি দেখছেন, কি মন্তব্য করছেন ইত্যাদি। নানা বিষয়ের সচিত্র প্রতিবেদন ও সংবাদ সরবরাহে সাংবাদিক সম্প্রদায়কে কম গলদঘর্ম হতে হয় না। আর একটি দিকও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য, তা হচ্ছে লাখ লাখ পরীক্ষার্থীর লক্ষাধিক শিক্ষক-অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের উৎকণ্ঠা বিযুক্ত দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি। অন্যকথায় গোটা দেশের প্রায় ৯০ ভাগ দেশবাসী বিশেষ করে এসএসসি পরীক্ষার কর্মসূচি ও পরিচালনায় প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত। অতএব এসব পরীক্ষা সোজাসুজিভাবে বলতে গেলে গোটা দেশের একমাত্র Superlative degree- এর পরীক্ষা অনুষ্ঠান বৈ কি!

নিয়মিতভাবে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ১০/১২ বছরের লেখাপড়া, অনিয়মিত ও ফেল করা পরীক্ষার্থীদের ১২/১৫ বছরের লেখাপড়ার ভাগ্য-লিপি খোদিত হয় এই পরীক্ষার মাধ্যমে, পাস-ফেল সনদপত্রের কাগুজে অবয়বে। এর জের্ জাতীয় জীবনে যে কত গভীর এবং প্রচণ্ড তা বলাই বাহুল্য। ফল ঘোষণার পর এটি পরিদৃশ্যমান হয় গণ-জীবনে। ফেল, বহিষ্কার, নকলবাজি প্রতিরোধের সময় মারপিট, ভাংচুর, পাকড়াও, আত্মহত্যা ইত্যাদি ঘৃণ্য বিষাদময় হতাশাজনক পরিবেশ রচিত হয় জাতির চতুরপাশে। আরো দুর্বিষহ আবহাওয়া সৃষ্টি হয় কম্পিউটারের ভুল, রেজিস্ট্রেশনের ভুল, শিক্ষা বোর্ডের ভুল (?), উত্তরপত্র নিখোঁজ, পরীক্ষকের কাছে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের উৎকণ্ঠা-বিযুক্ত লেখালেখি, যোগাযোগের বেচইন আচরণে। এ যেন Mr Pickwik at the court এর মতো দৃশ্য! অথচ এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে নিরিবিলি ও সুশৃংখল বিপুল আর্থিক আয় ও সাশ্রয় সরকার ও বোর্ড কর্তৃপক্ষের হয়ে থাকে। 'সাতরাজার ধন'

www.pathagar.com

পাওয়ার মত সৌভাগ্য এটি বললে অত্যুক্তি হবে না। অধিকন্তু পরীক্ষা শেষে পুনঃ উত্তরপত্র পরীক্ষণ, ইংরেজি মার্কশীট-সনদপত্র উত্তোলন, ইত্যাদি (যা সম্পর্কে পরে আরো আলোকপাত করা হচ্ছে) থেকেও বোর্ডের শ্রম ও সময় বিনিয়োগের তুলনায় কম আয় হচ্ছে না। অর্থাৎ এস. এস. সি. ও এইচ. এস. সি. পরীক্ষার নিমিত্তে দেশের বিশেষ করে শিক্ষা বোর্ডসমূহের বিপুল পরিমাণ অর্থ তহবিল গড়ে উঠছে প্রতিনিয়ত যা কেন্দ্র করে কত কর্মকর্তা ও কর্মচারি বোর্ডে চাকরির সোনালী সুযোগ-মর্যাদা ও ক্ষমতা যোগ করছেন অজবাবদিহিমূলকভাবে। এই দৃষ্টিতে এই পরীক্ষার সত্তা, গুরুত্ব ও প্রভাব নিষ্ঠা ও সাধু চরিত্রের চিন্তা ও আচরণে তত্ত্বাবধানও সংরক্ষণ করাটা যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারিও কর্মকর্তাদের কত বড় নৈতিক দায়িত্ব তা বলাই বাহুল্য। যাহোক, উক্ত বিবৃত দিকসমূহের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রেখে নিচে কতিপয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে এটিও স্মর্তব্যঃ পরীক্ষা সংক্রান্ত যেসব বক্তব্য বা দৃষ্টিকোণ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে এর অনেকগুলো Invisible fact যা বাস্তব হিসেবে নির্দ্বিধায় মেনে নিলেই প্রভূত কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

১. পরীক্ষাকেন্দ্র বিষয়ক করণীয় বিষয় ঃ সুখ ও স্বস্তির বিষয় সম্প্রতি থানার বাইরে এসএসসি পরীক্ষার কোন কেন্দ্র গ্রাম-গঞ্জে থাকছে না। তারপরও অভিজ্ঞতার আলোকে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে যেসব দুর্নীতি ও অরাজকতার চিত্র দেখা যায় এবং পত্র-পত্রিকা ও রিপোর্টে প্রকাশ পায় সেগুলোসহ অনুদঘাটিত কিছু বিব্রতকর দিক পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন, যেমন ঃ

ক. নকল সরবরাহকারীদের শ্রেণীভেদ চিহ্নিতকরণ ও প্রতিকারের পদক্ষেপ প্রসংগ। নিশ্ছিদ্রভাবে নকল বন্ধ সম্ভব নয়। কারণ স্বয়ং রাসূলে পাক (সাঃ) এর জীবনকালে যেখানে আবু জেহেলদের সংশোধনী হয়নি বা সম্পূর্ণ উৎখাত ঘটেনি সেখানে আমরা কোন 'ছার' যে নকলবাজ গোষ্ঠীর যাতনা ও উৎপাত সম্পূর্ণভাবে উৎপাটিত করতে পারব? তবুও যেটুকু সম্ভব হতে পারে সেটুকুর জন্য নিষ্ঠাসহকারে চেষ্টার প্রমাণ রাখতে তো পিছপা হওয়া উচিত নয়।

প্রথমেই ধরা যাক কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও প্রশাসনের কথা। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, কেন্দ্রের অবস্থান ও এলাকার মেজাজ ও চরিত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ ও পুলিশ অফিসার নিয়োগ করা হয়। এমতাবস্থায় নিরাপত্তা ও নকল রোধের সাহায্যার্থে মোতায়েনকৃত পুলিশই যদি টু-পাইসের লোভে নকল সরবরাহের কাজ করেন, ধৃত নকল সরবরাহকারীকে নির্দোষ হিসেবে নিষ্কৃতির সার্টিফিকেট দিয়ে দেন, তবে এত অর্থ ও শ্রমের বিনিময়ে আয়োজনের পরীক্ষার মান ও মূল্যায়ন কী পরিমান ক্ষতিকর হচ্ছে দেশ ও জাতির জন্যে তা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে প্রণিধানযোগ্য।

www.pathagar.com

খ. ঠিক তেমনিভাবে রয়েছে বেশ সংখ্যক ভদ্রবেশী দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা, অভিভাবক ও সেন্টার কমিটি। কেন্দ্রের পাসের হার ভাল হোক, নিজেদের স্কুল জি, পি, এ, তে A+ পাওয়ার গৌরব পাক; এ জন্যে অন্য পরীক্ষার্থীদের চেয়ে নিজের স্কুলের পরীক্ষার্থীদেরকে নকল সাপ্লাই-এর সুচিন্তিত উপায় উপকরণ, ইত্যাদি বদ এবং ঘৃণ্য চিন্তা ও কর্মে এরা পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে এমন বিশ্রি ও বীভৎস আবহাওয়া রচনা করে যে তা সুস্থ আদর্শবান ছাত্র এবং শিক্ষক তথা নিরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর জন্য নরককুণ্ড পরিবেশ সদৃশ।

[সম্প্রতি পরীক্ষা হলে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ব্যবহার করায় এবং প্রশ্নের প্রকৃতি ও ধারা বদলানোতে নকলবাজী ও দুর্নীতি যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। এটি লেখাপড়ার মান উন্নয়নের সাথে সাথে দুর্নীতির পথ ও রুদ্ধ করবে বলে আশা করা যায় ।]

গ. সাধারণ দৃশ্য এই যে, থানা বা সদর থেকে Invigilation Team আসার পূর্বাহ্নেই গোটা পরীক্ষা কেন্দ্র যেন অটোমেটিকেলি Alert হয়ে পড়ে; যেমনিভাবে মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট রাজপথে নামার সাথে সাথে Traffic Discipline কায়েম হয়ে যায় নিমেষে। দুর্নীতি সমাধানের ক্ষেত্রে এবং দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যেরূপ সাদা পোশাকী পুলিশ ও চর থাকে, তেমনি ধরণের একটা ব্যবস্থা পরীক্ষা কেন্দ্রে না নেয়া ছাড়া এর সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার সম্ভব নয়। এমনটি পদক্ষেপ নিলেই প্রকৃত ন্যায়পরায়ণ ও চরিত্রবান কর্মকর্তা, শিক্ষক-কর্মচারি গং-এর আত্মপ্রত্যয় বোধ বাড়বে। এভাবে সুস্থ পরিবেশ রচনার ইতিবাচক প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমেই দুর্নীতিবাজদের অনেকেই সংশোধিত হবে এবং জাতদুর্নীতিপরায়ণরাও অন্ততপক্ষে সময় সময় হতাশাগ্রস্ত ও মূহ্যমান হবে অবশ্যিই।

ঘ. দাগী আসামীরা যেরূপ থানা ও সচেতন জনসমাজে পরিচিত, তেমনি পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে দুর্নীতিবাজরাও যে আমাদের নিকট কমবেশ পরিচিত, এটাও অস্বীকার করা যায় না। অতএব দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিবিধানমূলক পদক্ষেপ না নিলে অবশেষে কিন্তু ঐ গল্পের কাহিনীর চুরির ঘটনার মতো প্রশ্রয়দানকারী 'মা'-এর মত সন্তানের কামড়ে কান কাটা মা-এর মত হতে হবে আমাদেরও ভদ্র লোকদের স্বীয় অপরাধী (?) স্বীয় সন্তানের কামড়ে। 'প্রকৃতি' এ ক্ষেত্রে বেশ সময়-সুযোগ দেয় বটে; তবে অবশেষে এর অমোঘ বিধান প্রয়োগে কার্পণ্য করে না কখনো। সুতরাং নকল সরবরাহকারীদেরকে শ্রেণীভিত্তিক চিহ্নিত করে এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পরিকল্পনা রচনা ও প্রয়োগের জন্য সামারি কোর্ট গঠনের মাধ্যমে

www.pathagar.com

শাস্তি প্রদান অত্যাবশ্যক। নইলে নকলী পাস করা বদশিক্ষিতরা সোনার দেশের হৃৎপিণ্ড কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়ে সোনার বাংলাকে কালক্রমে ধ্বংস করবে, যেরূপ ঘুণে ধরা মজবুত বাঁশকে ধ্বংস করে ঘুণ পোকার দল- অজান্তে, অদৃশ্যে।

২. ইনভিজিলেশন টিমকে ভুড়িভোজনে সাদর আপ্যায়নের রেওয়াজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধকরণ অত্যাবশ্যক। এটি আর একটি কঠিন ব্যাধি। সরকারি কর্মকর্তা এবং বোর্ডের Invigilation team - কে আতিথেয়তা করাটা একটি মারাত্মক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে অনেক কেন্দ্রে। এ আতিথেয়তার জুলুস ও বৈচিত্র অনেকটা বিয়ে বাড়ীতে বরযাত্রী আপ্যায়নের মতো বললে অতিরঞ্জিত তেমনিট হয় না। পাংগাশ মাছ, মুরগি-খাসীসহ ভোজন শেষে মিষ্টি-সন্দেশ পরিবেশন হয়ে থাকে প্রায়ই এ ধরনের আপ্যায়নে। এ সময়টিতে কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিনিঃশ্বাসে 'স্যার-স্যার' উচ্চারণসহ পরিদর্শন দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের 'তোয়াজ' করাটা দারুন বিসদৃশ্য ঠেকে। মনে হয় কেনা গোলাম আর প্রভুর আসল বাস্তবদৃশ্য এটি। শেখ সা'দীর কথাটি মনে পড়লো এক্ষেত্রে। তিনি বলেন, যে বিচারক ঘুষ খায়, সে বিচারক কখনো মজলুমের প্রতি সুবিচার করতে পারে না। অর্থাৎ এতে দুর্নীতিবাজ ও জালিমের সাহস ও দাপট সমাজে বৃদ্ধি পায়। আপ্যায়িত Invigilation team-এর ভূমিকাও কম -বেশ অনুরূপই হয়ে পড়ে। সমাধান হিসেবে এখানে দু'টি প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। (ক) Invigilation team কোন অবস্থাতেই নিজেদের আপ্যায়িত হওয়ার সুযোগ দেবেন না। (খ) টিমের সদস্যবৃন্দ সঙ্গে করে Packet lunch নিয়ে কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন, অথবা ক্ষুধার সময় যথাস্থানে নিজেরা ভাতা খরচে আপন দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত বলয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে নেবেন।

এ ব্যাপারে আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। Invigilation team-কে আপ্যায়ন করতে গিয়ে প্রায়শ গোটা কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনা ও কর্তব্য তৎপরতায় দারুন চাপা অস্থিরতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কেন্দ্রের ফাণ্ডের এ ধরনের রাজসিক ব্যয়ে যথেষ্ট খেসারতের সৃষ্টি হয়। এহেন অবৈধ খরচ দেখানো এবং অন্যান্য খরচ মিটানোর কাজকর্মে "ফলস" Voucher বানাতে হয়। এভাবে যে কেন্দ্রে নিষ্ঠা ও সততা পরিদর্শন ও প্রতিষ্ঠাকরণের জন্য Invigilation team যাচ্ছে, সেই টিমের এ ধরনের আপ্যায়ন বরন টিম সদস্য ব্যক্তিত্বের প্রতি নির্জলা অবমাননাকর; অবশ্য যদি এ নৈতিক ও সম্ভ্রম বোধ টিমের থাকে।

www.pathagar.com

৩. ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কক্ষের নিরীক্ষকের নিজস্ব রিপোর্ট হিসেবে পেশ করাটা অসত্য ও অন্যায় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। এটি কেন্দ্রের আর একটি অসত্য ও ন্যায় পরিপন্থী কাজ। নকল ধরেছেন ম্যাজিস্ট্রেট বা সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা, বহিষ্কারও করেছেন তিনি, অথচ কাগজে কলমে পেশ করতে হচ্ছে এর বহিষ্কারক সংশ্লিষ্ট কক্ষের জনৈক নিরীক্ষককে। কেন এমনটি হবে? বরং এটি স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট হলে এতে দু'টো ভাল ফল পাওয়া যাবে ঃ (ক) বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে সহজে হামলা করার সাহস পাবে না, (খ) দ্বিতীয়ত, নিরীক্ষকগণও এহেন আনুকুল্য পেলে মানসিক দিক থেকে অধিকতর দৃঢ় হবেন এবং (গ) নকলবাজ পরীক্ষার্থী ও তার সহযোগী নৈতিক দিক থেকে ম্রিয়মান হয়ে পড়বে।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জীবন ও সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর রিপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক হলে এই নীতি ও লক্ষ্যটুকুও হালে পানি পাবে বৈকি।

৪. SIF (STUDENT'S INFORMATION FORM) ফর্মের অনাবশ্যক বৃত্ত পূরণ থেকে রেহাই দানের পদক্ষেপ বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক। S.S.C পরীক্ষায় রচনামূলক ৫০ এবং নৈর্ব্যক্তিক ৫০ সর্বমোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া হয় প্রতি বিষয়ের প্রতিপত্রের। সুতরাং ৪টি বৃত্ত পূরণের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় ২টি বৃত্ত পূরণের মাধ্যমেই উত্তর অনায়াসে প্রদান করা যায়। এমনিভাবে বিষয় কোড ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বৃত্তসমূহের অস্তিত্ব বিলীন করে দিলে পরীক্ষার্থী, নিরীক্ষক, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকের বৃত্ত ভরাটে শ্রম ও তদারকীতে চোখের দৃষ্টির চাপ ও সময়ের বিপুল সাশ্রয় হবে বৈকি। এছাড়া বৃত্ত ভরাটের ভুলের Frequency -ও কমবে অনেক। সম্ভবত '৯৬ -এ বিষয় কোডের বৃত্ত ভরাটের ভুলের জন্য প্রকৃত উত্তর দানে পাশকরা অনেক মেধাবী পরীক্ষার্থীর এসএসসি পরীক্ষাই বাতিল/ অকৃতকার্য করে দিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড, তথাকথিত মান রক্ষার জন্যে মাত্র একটি যেনতেন বাক্যে। তখন ব্যক্ত করা হয়েছিল বৃত্ত ভরাটও পরীক্ষণীয় বিষয় বিধায় এক্ষেত্রে কিছুই করণীয় নেই। এ ধরনের সিদ্ধান্ত কতটুকু যুক্তিযুক্ত বা ন্যায়নিষ্ঠ সে সম্পর্কে প্রশ্ন করার ক্ষমতা-সুযোগ ও অধিকার শিক্ষক-অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা পাননি। অনাবশ্যক বৃত্তের সংখ্যা হ্রাসকরা হলে অন্তত উক্ত ধরনের দুর্গতিও অনেক হ্রাস পাবে সন্দেহ নেই।

৫. পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা মূল্যায়নে দুর্নীতিসহ শিথিলতা প্রদর্শন বা উপেক্ষাকরণের অভিযোগ থেকে যাতে দুর্নীতিবাজরা নিষ্কৃতি না পায় এজন্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থ ও তদ্বিরের

www.pathagar.com

মাধ্যমে আনাড়ী পরীক্ষক নিয়োগ এবং যোগ্য প্রধান পরীক্ষক হিসেবে দরখাস্ত করা সত্ত্বেও প্রধান পরীক্ষক সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত না হওয়ার ঘটনাও শিক্ষা বোর্ডে ঘটাটা প্রায়শ নিয়মিত ঘটনা বললে অন্যায় হবে না। আনাড়ী পরীক্ষক ও অযোগ্য প্রধান পরীক্ষক নিয়োগের ফলে কত পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়নে কত যে ভুল-ভ্রান্তি, অবমূল্যায়ন এবং অতি মূল্যায়ন হচ্ছে এবং এতে শিক্ষার মানও পরিবেশে বিপত্তি ঘটছে তার হিসাব কষা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক ও বিপজ্জনক। যন্ত্রণাদায়ক এ জন্য যে এসব বিশৃঙ্খলার রেকর্ডাদি যাদের কাছে আছে, তারা দায়িত্বশীল হলে এবং গঠনমূলক সমালোচনার প্রতি সহনশীল হলেও এর সুষ্ঠু বিহিত সম্ভব হয়ে উঠে না। দ্বিতীয়ত, দোষ-ত্রুটির প্রমাণ-দলিল-দস্তাবেজ যাতে নিরাপদে প্রশাসনে দেয়া যায়, এ ধরনের নিরাপত্তাও প্রশাসনিক নিশ্চয়তা কোথায়?

অন্য কথায় দেশের শিক্ষার যথাযথ মান উন্নয়ন ও মেধাবীদের সেবা ও কাজ নিতে হলে যথাসম্ভব যোগ্য পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ অপরিহার্য-এই নৈতিক বোধ জাগ্রত করে সৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সাহসী পদক্ষেপ নেয়া বর্তমানে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে ঐ ক্ষুদ্রকৃতির সংবাদটি পুনশ্চ স্মর্তব্যঃ

"গত ৭ জুন কুমিল্লা জেলার শিক্ষা অফিস চত্বরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সরকারি কর্মচারি সম্মিলিত পরিষদের কুমিল্লা আঞ্চলিক কমিটির সম্মেলনে..... "মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের প্রফেসর মোঃ যবদুল হক·বিশেষ অতিথি" হিসাবে বলেনঃ "শিক্ষা বিভাগের সকল স্তরের কর্মচারী কর্মকর্তাগণ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হইলে, মিথ্যা না বলিলে এবং হারাম পরিত্যাগ করিলে অবশ্যই শিক্ষা প্রশাসন হইতে দুর্নীতি দূর হইয়া যাইবে"। ৯ম পৃষ্ঠায় ১ম কলামে প্রকাশিত এই ক্ষুদ্র সংবাদটি শিশির বিন্দুর মত ক্ষুদ্র হলেও এতে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে ঘাপটি মেরে থাকা প্রশাসনের দুর্নীতি যে পূর্ণ বলয়ে প্রতিভাত তা ব্যখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

৬. Re-examination বা উত্তরপত্র পুনঃ পরীক্ষণের প্রচলিত কূটও অসত্য পদ্ধতির সংশোধন ও মুল্যায়নে সঠিক নম্বর প্রদানের নিয়ম অবশ্যই চালু করা উচিত। সে বছর সম্ভবত ৯৫/৯৬ সালে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অভিভাবকদের প্রশ্নের জবাবে Re-examination- বলতে Re-counting of marks of the answer script বুঝিয়েছেন স্বীয় পদবী ও মর্যাদার ক্ষমতা প্রয়োগে। অথচ Re-examination- এর বাংলা উত্তরমালার পুনঃ মূল্যায়ণ ও পরীক্ষণ এবং Re-counting টাকে Re-scrutinization of evaluated marks বলা যায়। অর্থাৎ Re-examination of answers এবং Re-counting of marks

www.pathagar.com

given- এ দুটোর সমার্থক করে চালিয়ে দেয়া আর যা-ই হোক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের পক্ষে এহেন কাজ বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না। প্রতিটি পত্রের জন্য ৭৫ টাকা হারে Re- examination ফি নিয়ে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও বিদ্যালয়-বা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষককে উপস্থিত রেখে উত্তর পত্রের প্রদত্ত মান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষক ও প্রধান শিক্ষক দ্বারা পুনঃ মূল্যায়ন করে সংশোধন বা মান পুনঃ নির্ধারণ করা উচিত। শুধু প্রাপ্ত নম্বরের নিছক পুনঃ গণনার জন্য পরীক্ষার্থী ও তার অভিভাবক ৭৫/- টাকা ফিস যে জমা দেন না তা বলাই বাহুল্য। দুঃখের বিষয় বোর্ড কর্তৃপক্ষ Re-examination কে এরপরও Synonym হিসাবে Re-counting of marks of the answer scripts" ধরে ক্ষতিগ্রস্তের প্রতি সত্য ও ন্যায় প্রদর্শনের পরিবর্তে, অযোগ্যতা বা অনীহা বা কাপুরুষতা প্রদর্শন করছেন পদবীর ক্ষমতা খাটিয়ে যাহা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত প্রশাসনিক সততা, গুণ ও মর্যাদার পরিপন্থীও বটে।

এক্ষেত্রে আর একটি মানসিক রোগ ক্রিয়াশীল। তা হচ্ছে Re-examination প্রকৃত ও সত্য অর্থে হওয়ার পর কোন উত্তরপত্রের নম্বর পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে বিধায় কোন পরিবর্তন হলে তা স্বীকার করে নিলে বোর্ডের সুনামও দায়িত্বশীলতা ক্ষুণ্ন হবে –এহেন লোকভয়ে কর্তৃপক্ষ ভুল-শুদ্ধ যা-ই হোক সেই নম্বরই সঠিক ও নির্ভুল হিসাবে বহাল রাখছেন। ফলে এর কাফফারা দিতে হচ্ছে পরীক্ষার্থী ও তার অভিভাবকের। বোর্ডের তথাকথিত Prestige concept এর বলি হয়ে এভাবে কত পরীক্ষার্থীর যে ভবিষ্যত জীবন বিপন্ন হয় তার খবর কে রাখে? "To err is human" মানুষ মাত্রই ভুল আছেঃ এই সার্বজনীন সত্যটি বোর্ড কর্তৃপক্ষের অনুধাবন করা উচিত কায়মনো বাক্যে এবং জ্ঞান-চরিত্র ও নিষ্ঠার ভিত্তিতে 'ভুল' সংশোধনের পদক্ষেপ নিয়ে পরীক্ষার্থীদেরকে এহেন মানবিক উৎপীড়ন ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার নব দিগন্ত তাঁর উন্মোচন করা উচিত। "হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না"–তথাপিও দেখা যায় সুপ্রীম কোর্ট কত হাকিমের কত ফয়সালা পাল্টিয়ে নতুন রায় দিয়েছেন, অথচ শিক্ষা বোর্ড এমন দুর্বল কেন উত্তরপত্রের প্রয়োজনে নম্বর পরিবর্তনের –এটাই জিজ্ঞাসা সংশ্লিষ্টদের।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা। Subjective এবং Objective এই দুই ধরণের মোট ১০০ নম্বরের প্রশ্নপত্র হওয়ায় উত্তরপত্রের Subjective উত্তরের পুনর্মূল্যায়নে পার্থক্যের Ranging তত বেশী হবে না যা পূর্বে ১০০ নম্বারের Subjective প্রশ্নপত্রের উত্তরে হতো। কারণ ৫০ -এর Subjective

www.pathagar.com

Question গুলো Specific এবং Pin-pointed - এই বিবচনায় বর্তমানে Re-examination -এর কাজ তেমন জটিল, সময়ক্ষেপণকারী ও ক্লেশকর নয় কিছুতেই।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ সদা eternally ভুলের উর্ধ্বে, এই ধারণা বা অনড় মনোভাব লালন করা ঠিক নয়। কারণ প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রশ্নপত্রে ভুল প্রশ্ন, নম্বর ফর্দ ভুল, পরীক্ষার ফল ঘোষণায় গরমিল বা ভ্রান্তি যেখানে প্রায়শই পরিদৃষ্ট হয় ও পরে তা শুধরিয়ে দিয়ে শিক্ষা বোর্ড নির্ভুল পরিবেশ রচনায় পারঙ্গম, সেখানে Re-examination- এর কারণে নম্বর সংশোধন করে তা প্রকাশে অনীহা পোষণ বা অহমিকা প্রদর্শন বা দুর্বলতা প্রকাশ পাবে মনে করাটা কিছুতেই নৈতিক, মানবিক ও পেশাগত শোভনীয় ও গ্রহণযোগ্য কর্ম হিসাবে মনে করা যায় না। যেতে পারা উচিতও নয়।

৭. ইংরেজি ভার্সনসহ নম্বর ফর্দ ও সনদপত্র প্রদান করা উচিত। শুধু বিদেশেই নয় বরং বাংলাদেশেও অবস্থিত বিদেশী কোম্পানি ও অফিসে চাকরি-বাকরির Interview-এর সময় ইংরেজিতে Certficate এবং Marksheet-এর প্রয়োজন হয়। বোর্ড থেকে বাংলায় এগুলো প্রদান করা হয়। ফলে ইংরেজি Version- এ Certificate ও Marksheet সংগ্রহের জন্য ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে ফিস জমা দিতে হয়। এতে কতই যে পেরেশানী হতে হয় তা ভুক্তভোগি মাত্রই জানেন। তাছাড়া Ordinary না Emergency হবে এরও টানা হেঁচড়াত রয়েছেই। অথচ পাকিস্তানে উর্দু এবং ইংরেজি দুভাষা মিশিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। সে দেশের ছাত্র অভিভাবকের অনুবাদের হয়রানি, আর্থিক ও মানসিক, দুটোই নেই। আমাদের দেশেও অনুরূপ সুবিধা ও উপকারটুকু প্রতিষ্ঠা করতে কোন প্রকার বাধা বা অসুবিধা নেই। সুতরাং অন্তত মানবিক ও কল্যাণকর দৃষ্টিতে ২০০৬ ইং সাল হতে এসএসসি, এইচ, এস, সি, ও অন্যান্য পরীক্ষার সনদপত্র এভাবে দেয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে এহেন সমস্যার আশু সমাধান অত্যাবশ্যক।

দুর্ভাবনার দিক হচ্ছে দেশটা স্বাধীন হয়েছে বটে, তবে মন মানসিকতায় আমরা এখনও 'দেশপ্রেমিক' হইনি, নিজেদের কল্যাণের ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক তথা কল্যাণকর সৃজনশীল তেমন কোন পদক্ষেপ বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিতে পারিনি। এস,এস,সি, ও এইচ, এস, সি, পরীক্ষা সংক্রান্ত যেসব সমস্যা ও এর সংশোধনীর এখানে আলোকপাত করা হয়েছে তা-ই প্রমাণ করে আমাদের শিক্ষা প্রশাসনের যোগ্যতা ও দক্ষতার মান কোন স্তরে বিরাজমান। একটা দেশের

www.pathagar.com

সর্ববৃহৎ পরীক্ষাগুলোর পরিবেশ ও প্রশাসনের যদি এমনটি 'দশা' হয়, তাহলে উচ্চ শিক্ষার সুষ্ঠু বুনিয়াদ ও উৎকর্ষ কিভাবে সম্ভব? জাতির প্রত্যয় ও প্রগতি কিভাবে বিরচিত হবে? জাতির মেরুদন্ড শিক্ষাই "সোনার কাঠি" যার ছোঁয়ায় অন্যায় পরিশোধিত হবে, ন্যায় ও সুন্দর, উন্নতি ও প্রগতি বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে ক্রমান্বয়ে। এই "সোনার কাঠিটি" অদৃশ্য দানবের মুষ্টি থেকে মুক্ত করে এর ছোঁয়ায়- আমাদের সুন্দর রাজকন্যা সদৃশ মূমুর্ষু জাতিটিকে সুস্থ করার ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা ও গভীর মমতা রচিত হোক এটাই কাম্য সংশ্লিষ্ট সবার।

লক্ষণীয়, এ প্রবন্ধে যা আলোচিত হয়েছে তা পুঁথিগত অপেক্ষা বরং বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক। সে হিসাবে এর প্রতিপাদ্য বিরষয়গুলো সু-নজর লাভ করলে এদেশের শিক্ষার বিবিধ সমস্যার আশু নিরসন ঘটবে। প্রয়োজনবোধে এজন্যে এদেশের অভিজ্ঞ প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দসহ শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদদেরকে নিয়ে, "বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে" একটি স্থায়ী Cell গঠন করাও যেতে পারে সদিচ্ছা ও কর্তব্যনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক সরকারী কর্মকর্তাদের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায়। নইলে এই দেশের শিক্ষা-দুর্গতির সংস্কার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশের পড়ালেখা-সংস্কৃতি বিকাশে বাংলাবাজারের প্রকাশনা শিল্প ঃ একটি সমীক্ষা

স্মর্তব্য পড়ালেখার সংস্কৃতি বিকাশ ও প্রসারে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারদের অবদান অপরিসীম। এই অবদান ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। কোন দেশের জাতীয় সত্তা-সংস্কৃতি তথা এর গোটা অস্তিত্ব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের ত্যাগ ও তিতিক্ষার বলয় কত প্রভাবশালী ও বিশাল তা সহজেই আঁচ করা যায় ইংল্যান্ডের Penguin Books Ltd., University Tutorial Press Ltd., যুক্তরাষ্ট্রের Wdsworth Publishing Company, Houghton Mifflin Company, পাকিস্তানের Doger Brothers, Standard Publisher, ভারতের RAMA BROTHERS Educational Publishers ইত্যাদি প্রকাশনা ফার্মের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট মূল্যায়নে। জ্ঞান চর্চা, সংগ্রহ, সঞ্চয়ন ও পরিচর্যায় পুস্তক প্রকাশনার বিশ্বায়নে পুস্তক প্রকাশকদের অবদান আকাশ সংস্কৃতিরও একটি মৌলিক উপাদান। মৌলিক এ জন্য যে, আধুনিক সভ্যতার একাডেমিক ও মুক্ত জ্ঞানবিজ্ঞান, অর্থনীতি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি চর্চা স্ফুরণ ও বিকাশ সবই সম্ভব হচ্ছে পুস্তকাকারে সংগৃহীত জ্ঞান-কোষের জন্য। এদিক থেকে

www.pathagar.com

বিবেচনা করলে পুস্তক-প্রকাশনার জগতই হচ্ছে মৌলিকভাবে মানবমন ও সমাজের বিনির্মাতা। পুস্তক প্রকাশনা আমাদের প্রধানত তিনটি প্রয়োজন মিটায় ঃ (১) পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনা, Publication of Text Books, (২) চিত্তবিনোদনমূলক প্রকাশনা ঃ Books for providing entertainment, (৩) পেশাগত নৈপুন্য বিকাশমূলক গ্রন্থ ঃ Professional and Technical skill learing books, etc.

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পুস্তক প্রকাশনার ইতিহাস ও গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশের পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির অবদান কি জাতীয়, কি আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে অতি তুচ্ছ ও স্বল্পপ্রাণ। বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের আবির্ভাব ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় থেকে সূচিত হলেও ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ভারত তথা কলিকাতা ও বর্তমান পাকিস্তানের প্রকাশনা শিল্পের প্রাধান্য ছিল প্রবল। সেই সময়ে এদেশের প্রকাশক অপেক্ষা পুস্তক বিক্রেতারা কলিকাতা ও তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রকাশিত বইপত্র সংগ্রহ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মাফিক যোগানে তৎপর ছিল। এই তৎপরতাকে কেন্দ্র করে পরে ধীরে ধীরে প্রথম নোট বা সহায়ক বইপুস্তক প্রকাশনায় এদেশের অধিকাংশ বই বিক্রেতা প্রকাশনার জগতে পদার্পণ করেন। উদহারণস্বরূপঃ সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে আদিল ব্রাদার্স ও ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এমদাদিয়া লাইব্রেরীর প্রকাশনা তখনকার সময়ে সুবিদিত ছিল।

বাংলাদেশ হওয়ার পর সত্যিকার অর্থে রাজধানী ঢাকায় বাংলা বাজার পুস্তক প্রকাশনার গোড়া পত্তন হয়। অন্যকথায় বাংলাদেশের পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের সম্যক ইতিহাস এসব কারণে আজও অস্পষ্টতায় অবগুণ্ঠিত। সরকারের যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য-পরামর্শের অভাবে পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের ইতিহাসের এই দুর্গতি হয়েছে 'কলিকাতা বুক সোসাইটি' ও 'কলিকাতা বুক ক্লাব সোসাইটি'র মতো এদেশের প্রকাশনা শিল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে তেমন চিন্তা-ধ্যান-ধারণা ও সুযোগ লাভ করতে পারেনি, অথবা এ ধরনের মনমানসিকতার তখন উন্মেষ ঘটেনি। ফলে দেখা যায় কে লেখক, কে প্রকাশক, কে বিক্রেতা এর সুস্পষ্ট ধারাবাহিক কোন চিত্র প্রকাশনার জগতে নেই। প্রকাশক জনাব সেরাজুল হক সাহেবের কথায় "......এখানে প্রকৃতভাবে কে প্রকাশক আর কে বিক্রেতা এটা নির্ণয় করাই কঠিন। দেখা গেছে, যিনিই প্রকাশক, তিনিই বিক্রেতা।" [পুস্তক, জুলাই, ২০০৩ সংখ্যা, পৃঃ৩]

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের পুস্তক প্রকাশনা জগত যা-ও বিকশিত হওয়ার প্রয়াস পাচ্ছিল, তা-ও অধুনা কতিপয় নিন্দনীয় কারণে তা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে। এই জগতের বাসিন্দাদের অধিকাংশই অর্ধশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, অসৎ ও নোংরা প্রকৃতির। প্রকশনা জগতের জনাব আলমগীর মল্লিক তার 'কুরুচিপূর্ণ নোট বইয়ের খপ্পরে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সৃজনশীল প্রকাশনা" শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন যে, আশিক্ষিত লেখকদের বই ছাপানোর জন্য অসৎ প্রকাশক মোটা অংকের টাকা গ্রহণ করে এ ধরনের বই ছাপেন। ......তারা ব্যবসা করতে যেয়ে ভাল রুচিশীল বইয়ের বাজার ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ...... পাঠককেও বিভ্রান্ত করে বই পাঠে নিরুৎসাহিত করছে।" তাঁর দৃষ্টিতে এহেন অশিক্ষিত ও অসৎ প্রকাশক প্রকাশনা-বাজারের মান ও বাণিজ্য ধ্বংস করে যাচ্ছে চরমভাবে। [পুস্তক, জুন ২০০৩ সংখ্যা, পৃঃ ২৯-৩০ দ্রষ্টব্য]

তাছাড়া এই শিল্পের উপর প্রচন্ড আঘাত আসে পাঠ্য-পুস্তকের অর্থ বই প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে। ১৯৬১ সালে অর্থ পুস্তকের প্রতি বৈরী ভাব প্রকাশিত হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট, ১৯৬৩ সালে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী মফিজ উদ্দিন আহম্মদের সংসদে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অর্থ পুস্তক নিষিদ্ধকরণের জন্য বিল উত্থাপন, ১৯৭৮ সালে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহম্মেদ কর্তৃক অর্থ পুস্তক নিষিদ্ধ করণের পুনঃ ঘোষণা, ১৯৮০ সালে সরকার কর্তৃক "Note Book Prohibition ACT : 1980" আইন প্রণয়ন ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ গোষ্ঠী এর বিরুদ্ধে আইনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। ফলে ১৯৯৩ সালে হাই কোর্টের সংবিধান ৩৯(২) বলে ..... ও ভাব প্রকাশের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়" বলে ঐতিহাসিক রায় দানের ফলে প্রকাশনা শিল্পের নবতর জীবন ও উদ্দীপনা লাভ ঘটে নানান চড়াই উৎরাই এর পথ অতিক্রান্ত করে। দুঃখের বিষয় এতদসত্ত্বেও এদেশের সুস্থ প্রকাশনা শিল্প বিকাশে চরম বিপর্যয় ও অস্বস্তিকর পরিবেশ অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে।

এর সাথে প্রায় প্রতিবছরই ক্রনিক রোগের মতো রয়েছে শিক্ষার মানোন্নয়নের ধুয়া তুলে ঘন ঘন পুস্তক পরিবর্তনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অশিক্ষাসুলভ ও কূটবাণিজ্যিক স্বার্থ সিদ্ধির কর্মকাণ্ড। ফলে একদিকে যেরূপ প্রকৃত প্রকাশকরা যুগপৎ আর্থিক ও মানসিক ক্ষেত্রে চরম দুরবস্থায় নিপতিত হচ্ছেন; অপরদিকে ছাত্র সমাজ এবং অভিভাবক মহলও "শিক্ষা কার্যক্রমে" বেদিশা হয়ে অনুরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ালেখার পরিবেশ চিন্তায় হতোদ্যম হয়ে পড়ছেন দারুণভাবে। উপরন্তু, পাঠ্যপুস্তকের অপরিকল্পিত ও আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে বিদেশী বইপুস্তক পাঠ্যভুক্ত হয়ে

www.pathagar.com

এদেশের প্রকাশনা জগতকে আদর্শিক, আর্থিক ও ব্যবসায়িক দিক থেকে করে তুলছে আরো নড়বড়ে ও দুর্বল।

গোঁদের উপর ফোঁড়ার মতো পুস্তক প্রকাশনা শিল্প আরো দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে BTBB ও NCTB কর্তৃক স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক নিয়ন্ত্রণ, প্রকাশনা ও বিপণনের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও তা প্রয়োগের ক্ষমতা প্রাপ্তিতে। ফলে উদার ও মুক্তভাবে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিপণনে লেখক ও প্রকাশক-উভয়েই বিশেষ ব্যবস্থা ও সুযোগের সাশ্রয় প্রাপ্তি ব্যতীত জিম্মি হয়ে পড়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একক কর্তৃত্ব ও মর্জির উপর।

বিদেশী সাহায্য ও নির্দেশনায় বইপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা ও এর সংশ্লিষ্ট শর্তাবলীও এদেশের প্রকাশনা শিল্পের জাতীয় আদর্শ ও প্রয়োজনের আলোকে বিকশিত হওয়ার পথে আর একটি যে মারাত্মক বাধা-তাও উপেক্ষণীয়। এমনিভাবে বিদেশী পুস্তক আমদানি ও দেশী পুস্তক রফতানির ক্ষেত্রে ডাকমাশুল ও প্রক্রিয়ার বিষয়াদিও কম বেড়াজালের সৃষ্টি করে রাখেনি। এই প্রসঙ্গে পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যে বিষয়সমূহ বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য তা হচ্ছে সংক্ষেপে এই ঃ

১. অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকের লেখকবৃন্দ মানসম্পন্ন বইপত্র, নোট, গাইড, সাজেশন বই লিখতে ব্যর্থ হচ্ছেন ২, স্কুলের পাঠ্যবই কলেজের শিক্ষক লিখেন, ৩. অর্থের বিনিময়ে প্রথিত যশস্বী শিক্ষক অর্থের বিনিময়ে বাজে পুস্তকের লেখক হিসেবে নিজের নাম ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে যাচ্ছেন, ৪. টিউটরিয়্যাল ক্লাসের মাধ্যমে ছাত্রদের থেকে আদায়কৃত নোট কেটে ছেঁটে নিজেই সেই নোটের মূল গ্রন্থকার বনে যাচ্ছেন, ৫. টাকা দিয়ে লিখিয়ে বিভিন্ন জনের লেখা সম্পাদনা করে অনেক প্রকাশক নিজেই লেখক বনে যাচ্ছে, ৬. A Group of Examiners/ Headmasters/Professors কর্তৃক লিখিত বই ছাপাচ্ছেন, ৭. লেখা চুরি করে এর চাতুর্য্যপূর্ণ রদবদল করে Plagyarism and Piracy করে বাজারে স্বীয় প্রকাশনার নামে বই বাজারে ছেড়ে দিচ্ছেন, ইত্যাদি জঘন্য অপরাধ এদেশের সুস্থ পুস্তক প্রকাশনাকে সর্বোতভাবে যেমন দুর্নীত নিযুক্ত করে দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী প্রকাশনার পুস্তক ছাপা, ছবি ও বাইন্ডিং স্বল্প মূল্যের উৎকৃষ্ট গুণে-মানে, প্রকাশনায় ও অপেক্ষাকৃত বাণিজ্যিক সততায়, এদেশের এহেন দুর্নীতির মোকাবেলায় বই-বাজার দখল করে নিচ্ছে- এই দেশেরই দুর্নীর্তিপরায়ণ কতিপয় প্রকাশনা জগতের কর্মকর্তাদের প্রচ্ছন্ন পৃষ্ঠপোষকতার ফলে। বাংলাদেশের উৎকৃষ্টমানের বইপত্র যাও কিছু প্রণয়ন ও প্রকাশ করার চেষ্টা চলছিল, সেসব বই-পত্র দুর্নীতির এই খরস্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত

www.pathagar.com

বিস্মৃতির সাগর তলে। হাজার নয়, লাখ টাকার ঘুষের টোপ, নজরানা ও ডোনেশনের তোড়ে অপাঠ্য, দুর্বল ও মারাত্মক ভ্রান্তিপূর্ণ বই-পুস্তক দুর্নীতিপরায়ণ স্কুল-কলেজ মাদ্রাসায় পাঠ্যভুক্ত হচ্ছে। পরিণামে দেশের তথা জাতীয় শিক্ষার মানও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ডভাবে। এই ভাবে আগাছার মতো অসংখ্য দেশী-বিদেশী জাতীয় আদর্শ বিরোধী নিম্নমান বইপুস্তকে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে এদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাঙ্গন। উক্তদুর্বিসহ চিত্রের আলোকে নিম্নে প্রতিকারমূলক কতিপয় পরামর্শ উল্লেখ করা হলো।

(১) দেশের ঐতিহ্য, আদর্শ ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যাবতীয় পুস্তক-প্রকাশনার মালিক তথা কর্তৃপক্ষকে প্রকাশনা শিল্পের প্রসারের অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া।

(২) পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশনা ও বিপণনে সরকারের জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমের আমানতদারীতে সরকারকে কর্তব্য সম্পাদনে কঠোর ও নিষ্ঠাবান হওয়া।

(৩) নৈতিকতা ও আদর্শ সাহিত্যের গুণবিচারে বাজারে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকের পুস্তক বাছাই করে পাঠ্য করার স্বাধীনতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যস্ত থাকা। এক্ষেত্রে ঘুষ, ডোনেশন বা অন্য কোনরূপের ছলচাতুরীর প্রশ্রয় গ্রহণ জঘন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করা।

(৪) বিদেশী বই-পুস্তক আমদানির ক্ষেত্রে জাতীয় আদর্শ-ঐতিহ্য ও চরিত্রের মান ও আদর্শ বিধ্বংসী বই-পুস্তক আমদানি নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করে এহেন দুর্নীতিও অপকর্ম নিয়ন্ত্রণে সরকারকে সাফল্যের নজির স্থাপন করা।

(৫) বিদেশের প্রকাশনা শিল্পের সাথে সেতুবন্ধন রচনা করার ক্ষেত্রে দেশের প্রকাশনা শিল্পের আদর্শিক মানগত ও আর্থিক দিক বিবেচনা করে সরকারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানে বিদেশে দেশের প্রকাশনা শিল্পের বাজার রচনা করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৬) বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী জাতীয় স্বার্থ ও আদর্শের দৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারকে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ কর, যাতে বিদেশী পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে এদেশের প্রকাশনা শিল্প বিদেশী প্রকাশনা শিল্পের প্রভাবধীন না হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

(৭) পুস্তক প্রকাশনা শিল্প জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যক শিল্প হিসেবে যাতে গড়ে উঠতে পারে, এই দৃষ্টিতে সরকারকে অন্যান্য শিল্পের মতো একটি গড়ে তোলার জন্য অবশ্য কর্তব্য হিসেবে আশু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ জাতীয় স্বার্থে গ্রহণ করা।

(৮) সর্বশেষে পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের কর্তৃপক্ষ, সরকার ও লেখক সমাজের মধ্যে যাতে সুহৃদ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় ও তা বজায় থাকে সেই লক্ষ্যে এই তিন শ্রেণীর সমন্বয় সাধনমূলক Work shop বা কর্ম শিবির, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, পরামর্শ সভা ইত্যাদির ব্যবস্থা জাতীয়ভাবে চালু ও সংরক্ষণের পদক্ষেপ নেয়া।

স্মরণ রাখা কর্তব্য, পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের আদর্শিক, নৈতিক ও গুণগত সৌকর্য বৃদ্ধির উপর জাতি হিসেবে বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পাঠ্যপুস্তকের উৎকর্ষ বৃদ্ধি সবিশেষভাবে নির্ভরশীল। কারণ, লেখক বই লিখেন, প্রকাশক তা ছাপান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সুধী সমাজ তা অধ্যয়ন করে একটি জাতির মানসিক জগত রচনা করেন, যা ভিত্তি করে একটি জাতি আপন স্বকীয়তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্ব দরবারে মর্যাদাসম্পন্ন হয়- জ্ঞান ও চারিত্রিক দীপ্তিতে। অর্থাৎ "Pen is mighter than the sword"- এই mightier pen-এর রক্ষক, পরিচর্যাকারী ও খবরদারী একান্তভাবে প্রকাশনা শিল্পের নৈতিকতা,দেশ-প্রেম ও প্রজ্ঞার উপরই যে নিভরশীল তা বলাই বাহুল্য।

[সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম, ৯ জুলাই ২০০৫ ইং]

শিক্ষার্থী সমাজে মাদকাসক্তি ঃ

ষাট দশক পর্যন্ত মাদকতা ও মদ্যপানের প্রভাব সম্পর্কে এদেশের জনগণ তেমন কিছু জানত না। আর জানত না বলেই তারা এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তেমন উদ্বিগ্ন ও শংকিত ছিল না। কিন্তু সেই নিশ্চিন্ততার দিন অতীত হয়ে গেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উদারতাও বদৌলতে এই 'অমৃত' এখন ছাত্র-সমাজে-ও ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

বর্তমানে মাদকতার অভিশাপ ও এর আতংক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরকে বেপরোয়া ভাবে গ্রাস করতে চলেছে। অভিভাবক-অভিভাবিকা সম্প্রদায় পর্যন্ত এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন চরমভাবে। রাজধানী ঢাকার কোন এক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ঢাকার একটি দৈনিককে জানান যে, বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির জন্যে গৃহিনীরা হিমশিম খাচ্ছেন চরমভাবে। সংসারের

www.pathagar.com

ব্যয় নির্বাহের জন্যে তাদেরকেও গৃহ সংসারের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব ও কর্তব্যকর্ম ছেড়ে উপর্জনের জন্য চাকরি বাকরি করতে হচ্ছে। ফলে তারা তাদের সন্তানদের লালন-পালন ও শাসন -সোহাগের প্রয়োজনীয় ভূমিকা ও কর্তব্য যথাযথ পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন। পিতার সাথে মাতারও আর্থিক উপার্জনের ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়ার কারণে তাদের অনুপস্থিতিতে গৃহে সন্তানেরা অন্যদের দ্বারা লালিত-পালিত হওয়ায় মানসিক দিক হতে সঠিকও সুস্থভাবে গড়ে উঠছে না। তাদের হৃদয়ে নৈরাশ্য ও নিগৃহীত মনোভাব ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠেছে। মা-বাবার স্নেহ পিয়াসী তাদের হৃদয় মন এই অভাব ও আর্তি পুরণের জন্য বিকল্প হিসাবে মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠে। ঘুমের বড়ি সিডাক্সিন দিয়ে তাদের মাদকতার সূচনা ঘটে। এবং পরে তা গাঁজা, আফিম, পেথিড্রিন ইনজেকশন ও হেরোইন আসক্তিতে উপসংহারে পৌছে।

ধনী ও বিত্তশালী পরিবারের অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের মধ্যে মাদকতা ও মাদকতাসক্তির অভিব্যক্তি বর্তমানে যথেচ্ছাভাবে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। ১৯৮৮ এর জুলাই, জাহাঙ্গীর নগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত একটি জরিপ রিপোর্টে দেখা যায় ১০ হতে ৩০ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাদকতার প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে যারা মাদকতাসক্ত হয়ে পড়ে তাদের অনেকের জীবনই যে শুধু মর্মান্তিক হয় তা-ই নয়; বরং এজন্য এদের পরিবার ও পড়শী পর্যন্ত এ দুঃখ-যাতনার শিকার হয়ে পড়ে চরমভাবে। ঢাকা নগরীর মধ্যে এ ধরণের মাদকাসক্ত শিক্ষার্থীর তথ্য সন্ধানে পাওয়া যায় বেশ কতকগুলো শিক্ষায়তন। এর মধ্যে উদয়ন স্কুল ও সেন্ট জোসেফ স্কুল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উদয়ন স্কুলের ছেলেদের মধ্যে মাদকাসক্তি ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, এই স্কুলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে অবস্থিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে মাদকদ্রব্য সহজে পাওয়া যায়। তাছাড়া আজিমপুর এলাকায়ও এই নীল নেশার ব্যবসা রয়েছে। সেন্ট জোসেফের ছাত্ররা অধিকাংশই বিত্তশালী ঘরের। এরা প্রথম প্রথম সময় কাটানোর বিলাসিতার উপকরণ হিসাবে মাদকদ্রব্য সেবন করে। পুরোপুরি মাদকাসক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই বিলাস-ভোগ অবাধ গতিতে চলতে থাকে। মা-কে ফুসলিয়ে অনুনয় বিনয় করে এসব ছেলে মাদক সেবনের পয়সা সংগ্রহ করে। নিকটবর্তী ঔষধের দোকান হতে তারা এসব নেশা দ্রব্য ক্রয় করে দিব্যি আরামে সেবন করে থাকে। মাতৃসোহাগের সুযোগ নিয়ে এসব মদ্যপ নেশাখোর ছাত্ররা অবশেষে চলে যায় নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। তখন পিতা-মাতা পাড়াপড়শীদের অসহায় হয়ে তাদের সন্তানদের ধীর

www.pathagar.com

অধঃপতন অবলোকন করা ছাড়া বিশেষ কোন বিকল্প পথ থাকে না। মেরেপিটে, এমনকি চিকিৎসায় পর্যন্ত তাদেরকে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়ে উঠে না। এই অবস্থার আলোকে সম্প্রতি মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কালেভদ্রে জোর পুলিশী তৎপরতা দেখা যায়। "মাদকদ্রব্য সেবনের মারাত্মক পরিণতির" উপর সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সভা-সমিতি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও শোভাযাত্রাও হয় অনেকটা জমকালোভাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ঃ

(১) সতর্কতার নিরীখে মাদক-দ্রব্যের লাইসেন্স প্রদান ও বিশেষ ক্ষেত্রে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বিধির অনুমোদন,

(২) মাদকাসক্তির পটভূমি হিসাবে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায়-যেমন পিতামাতার অনুপস্থিতিতে চাকর-বাকর দ্বারা সন্তানদের তত্ত্বাবধান,

(৩) শিল্প সংস্কৃতির নামে চরিত্র হননকারী –ছায়াছবি-ব্লুফিল্ম, নাচ গান, ফর্ণো সাহিত্য, ক্লাব-বার রেস্তোরাঁর উচ্ছেদ সাধন না করে

শুধু মাদক পাচারকারীদের ধর-পাকড় ও ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট ছাড়া শাস্তি প্রদানে এদেশের যুবসম্প্রদায়কে এর মারাত্মক প্রভাব থেকে হেফাজত করা বালির বাঁধসদৃশ।

আর একটি বিষয়ও এ ব্যাপারে চূড়ান্ত বিবেচনার দাবি রাখে। তা হচ্ছে এই যে, বিদেশীদের জন্যে মদ ও এ জাতীয় নেশার আমদানি ও এদের জন্যে এসব চরিত্র হননকারী দ্রব্যাদি ব্যবহারের অনুমোদন সরকারের পক্ষ হতে প্রদান করাটা কতটুকু ন্যায়সংগত ও বিধেয়? সরকার কর্তৃক মদ-আফিম-এর ব্যবসার জন্য তথাকথিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান এবং বিদেশী কূটনীতিকদের জন্যেও অনুরূপ সুযোগ প্রদানের বদান্যতা আর যা-ই হোক ধর্মীয় মর্যাদা বাদ দিয়ে হলেও এটা যুগপৎ মানবতা ও নৈতিকতার দিক থেকে যে সমর্থনযোগ্য হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য।

ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করায় উক্ত ধরনের ব্যবসার লাইসেন্স ও বিদেশীদের জন্য মাদকদ্রব্য প্রদানের অনুমতি প্রদানের প্রচলিত আইন ও প্রকৃতি আর চলতে পারে কিনা তা-ও সরকারকে চরম নিষ্ঠার সাথে ভাবতে হবে। এদেশের তরুণ সম্প্রদায়কে মাদকাসক্তির দ্রব্যাদি ও এর পরিবেশ হতে মুক্ত রাখার আমানতদারী যুগপত সরকার ও জনগণের। এ ব্যাপারে কোন অবহেলা বা কোন দুর্বলতা স্থান পেলে ভাবী প্রজন্মের সর্বনাশ সাধনও এর বেদনাদায়ক মাশুল গোটা জাতিকেই যে দিতে হবে সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

স্কুল-কলেজে চলতি বছর হতে শিক্ষার মানোন্নয়নে নতুন নিয়ম জারী ঃ

২০০৪ সাল থেকে দেশের প্রতিটি স্কুল-কলেজে তিন মাস অন্তর সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণ বাধ্য করা হচ্ছে এবং বাজার থেকে প্রশ্নপত্র কিনে এসব পরীক্ষা নেয়া যাবে না। উপজেলার মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে এক ও অভিন্ন রুটিন অনুসরণ করে বার্ষিক পরীক্ষা নিতে হবে । মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার এই নির্দেশনা প্রদান করেছে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত দুটি সার্কুলার জারি করেছে।

মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার এবং নকলমুক্ত পরিবেশে বার্ষিক পরীক্ষা ও দশম শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষা পরিচালনার জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দু'টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বাধীন ১১ সদস্যের জেলা কমিটির সদস্যরা হলেন জেলার এমপি, সিভিল সার্জন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা), জেলার চারটি সরকারি-বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, আনসার ভিডিপি অফিসার ও শিক্ষা অফিসার। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বাধীন ৯ সদস্যের উপজেলা কমিটিতে আছেন সহকারি কমিশনার (ভূমি), সরকারি স্কুলের দু'জন প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, আনসার ও ভিডিটি অফিসার, সদরের ইউপি চেয়ারম্যান ও প্রকল্প অফিসার।

উপজেলা ও জেলা কমিটি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষা ও নির্বাচনী পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবে। বার্ষিক পরীক্ষা ও নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণের জন্য অভিন্ন রুটিন প্রণয়ন করবে। এ দু'টি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র স্কুলগুলো নিজেরা প্রণয়ন করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অপর সার্কুলারে বলা হয়, শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্থ এসএসসি, এইচএসসি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল, পরীক্ষার প্রশ্ন বিভাগীয় কমিশনারগণ বিভাগওয়ারী সংগ্রহ করবেন এবং জেলা প্রশাসকদের মধ্যে বিতরণ করবেন। নির্বাচনী (টেস্ট) পরীক্ষায় একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য কোন ছাত্র-ছাত্রীকে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।

www.pathagar.com

পর্যালোচনা

শিক্ষার মান উন্নয়ন লক্ষ্যে সরকার যেসব পদক্ষেপ কার্যকরী করতে যাচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও কল্যাণকর। কিন্তু এরপরও আরো যেসব বিষয় সরকারের বিবেচনায় আনতে হবে তা হচ্ছেঃ

১. দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য শিক্ষক থেকে শিক্ষাঙ্গণ মুক্ত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে শিক্ষার মান উন্নয়ন ত হবেই না বরং এতে ছাত্র সমাজের মেধা ও চরিত্রের আরো অধঃপতন ঘটবে একাডেমির সুযোগ-সুবিধার আবরণে।

২. নৈতিক চরিত্রন্নোয়ন মূলক পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন ও পাঠ্যভুক্ত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষকে নির্মোহভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ বর্তমানে ডোনেশনের নামে টাকা পয়সা খেয়ে বাজে বই-পুস্তক পাঠ্যভুক্ত করা, বিদেশী বই কমিশনে সমাদৃত করা একটি মযণভ্রণডরর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩. গাইড বুক, সাজেশন, সিওর সাকসেস ইত্যাদি বাণিজ্যিক প্রকাশনা উচ্ছেদ করে মূল Text Book পড়ানোর পরিবেশ রচনায় কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই জ্ঞান ও মেধার পরিচর্যাগার। এজন্যে সরকার ও জনগণ অর্থ-শ্রম সাহায্য করে বিনিয়োগ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েন। সুতরাং কোচিং সেন্টার, Guide Book ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে ছাত্র-অভিভাবক পাশের চিন্তা করবেন; তা চলতে দেয়া যায় না। ৪.৮ ছক বাঁধা প্রশ্ন ও এর উত্তরের সনাতন পদ্ধতি পরিহার করে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষার খাতা; বিশেষ করে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল্যায়নে মেধা-চরিত্র ও নিষ্ঠায় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বি. এড, এম. এড. ডিগ্রিধারী শিক্ষকবৃন্দকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। পয়সা খেয়ে পরীক্ষক নিয়োগ তথা বিষয় ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষক ব্যতীত অনভিজ্ঞ ও অপদার্থ শিক্ষককে পরীক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষার মান নির্ণয়ে জাতীয়ভাবে যে খেসারত ঘটছে এর বিহিত করাও অত্যাবশ্যক। কূপে পঁচা কূপে ইদুর রেখে পানি শোধনের অপচেষ্টার মতো হবে আমাদের শিক্ষান্নোয়নের কর্মকান্ড যদি না কমপক্ষে আপাতত উক্ত ৪টি পদক্ষেপ জরুরী ভিত্তিতে না নেয়া হয়।

www.pathagar.com

শিক্ষা পরিবেশ

আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি ব্যতীত আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা মানে উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মতোই বেয়াকুফী ও নির্বুদ্ধিতা। সে হিসেবে সরকারকে 'আইন ও প্রচারের' মাধ্যমে জাতীয় আদর্শ ও নীতি সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার নিরলস শ্রম নিয়োগ করতে হবে। যেসব ছায়া-ছবি, নাচ-গান, বই-পুস্তক ও বিজ্ঞাপন চরিত্রের নৈতিকতা ও দৃঢ়তাকে ধ্বংস করে দেয় তা থেকে জনসম্পদ বিশেষ করে শিশু ও তরুণ সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যেই আদর্শ শিক্ষা ও চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ নির্ভরশীল। এই চেতনায় রাষ্ট্রের প্রশাসনের চতুষ্টয় মন্ত্রণালয়কে যথাঃ আইন, শিক্ষা ও তথ্য, স্বরাষ্ট্র, এবং ধর্ম, এই দায়িত্ব গ্রহণ ও পালনে নিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে। জাতীয় চরিত্র বিধ্বংসী দেশী বিদেশী কোন অশ্লীল ও অপসংস্কৃতি, শিল্প সাহিত্য চর্চার নামে দেশের ভেতর চলতে দেয়া যাবে না। ধর্ষণ, হত্যা, হিরোইন সেবন ও নারী-শিশু পাচারের চেয়ে ও অপসংস্কৃতির নীল দংশন ও ছোবল ব্যাপক ও মারাত্মক; কারণ এতে জাতি ধ্বংস হয় সামগ্রিক ভাবে। এ দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশে নৈতিকতা বিপর্যয়কারী প্রচার, প্রকাশনা ও বিজ্ঞাপন-শিল্প গোটা মানব সমাজে যৌনাপরাধমূলক কর্মকাণ্ড মড়কের মতো প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত সহ-শিক্ষা, সহ-চাকুরী, অশ্লীল বিজ্ঞাপন, অশ্লীল ছায়াছবি, জন্ম নিয়ন্ত্রণের নোংরা ডায়ালগ, প্লেকার্ড এবং সিনে-পত্রিকায় যে ধরনের নারী-পুরুষের অবাধ ও অবৈধ মিলনের ইন্ধন যোগাচ্ছে, তা অচিরেই প্রতিরোধ না করলে পুরুষের পৌরুষ ও নারীর সতীত্ব ঘরে ঘরে বিপর্যস্ত হওয়ার সমূহ ঘটনাও এর আশংকা আরো বৃদ্ধি পাবে।

এটা শাশ্বত সত্য যে সুস্থ শিক্ষা পরিবেশ রচনার লক্ষ্যে বিশ্বের কোন জাতি বা ধর্ম গ্রন্থ 'শিক্ষাকে' সর্বসাধারণের জন্য এমনিভাবে বাধ্যতামূলক বা ফরয করা হয়নি যেমনটি করা হয়েছে আল-কুরআনে। আল-কুরআনের এই শিক্ষা শুধু ধর্মীয় নয় বরং ধর্মীয়, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক শিক্ষার বিষয়বস্তু ও উপকরণাদিতে সমৃদ্ধ। আর এ শিক্ষাকে জনপ্রিয় ও গণমুখী করার জন্যেই রসূলুল্লাহ তাগিদ দিয়ে বলেছেন ঃ ১. যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য ভ্রমণে বহির্গত হয়, আল্লাহ তাকে বেহেশতের যে কোন পথে বিচরণ করাবেন। ২. একসহস্র আবিদ হতে শয়তানের নিকট একজন তত্ত্বজ্ঞানী অধিক কঠোর'। ইদানিং এই বিশ্বনবীর–যাঁর শিক্ষা ও চরিত্র জাতিধর্ম নির্বিশেষে সার্বজনীন কল্যাণকর প্রমাণিত, প্রশংসিত ও কিয়ামত পর্যন্ত মানব সমাজের গবেষণা ও পথ প্রদর্শনের একমাত্র আলোকবর্তিকা, তাঁর জীবন-কথা ধর্মনিরপেক্ষতার কূট চাল ও তথ্য সন্ত্রাসের দাপটে প্রথম শ্রেণী থেকেই বাদ দেওয়ার প্রবণতা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম

www.pathagar.com

দেশ বাংলাদেশে শক্তিধর হয়ে উঠছে–যা চিহ্নিত করে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে। ইকবাল তাঁর Islam as a Moral and Political Force' প্রবন্ধে বলেছেন, "God is the birth of man" আর এই Birth right বা জন্মাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলে করীম (স) 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হিসেবে পৃথিবীতে এসেছিলেন– শুধু মুসলমান নয়; বরং গোটা মানব জাতি ও সৃষ্টিকূলের জন্যে। সুতরাং তাঁকে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি হতে বাদ দেওয়া মানবতা তথা বিশ্ব কল্যাণের শত্রুতা ছাড়া কি ভাবা যায়? রাসূলের জীবনী বা শিক্ষাকে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়া প্রকারান্তে মুসলমানদেরকে মুরতাদ বানানোর এবং বিশ্বমানব গোষ্ঠীকে ইসলামের কল্যাণময় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখার জঘন্যতম চক্রান্ত।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, হিন্দুস্তানের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুসলিম ঐতিহ্য ও শিক্ষার শুদ্ধি অভিযান আর আমাদের শিশু শ্রেণী হতে নবী জীবনী ও নবী শিক্ষা তথা ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারাপুষ্ট বিষয়বস্তু সংকোচন করা বা বাদ দেওয়ার প্রবণতায় বৈসাদৃশ্য নেই। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিন্দুস্তান তার জাতীয় আদর্শ রক্ষা প্রীতির জন্য হয়ত এরূপ উগ্র ও বিদ্বেষাত্মক পদক্ষেপ নিচ্ছে; কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ত অনুরূপ শুদ্ধি অভিযানে আসক্ত হতে পারে না। এ দক্ষ প্রবণতা সমূলে উৎপাটনের জন্য অনতিবিলম্বেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। নইলে এপার বাংলা আর ওপার বাংলার স্বাতনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির সীমান্তটুকু লয় পাওয়ার সাথে সাথে ভৌগলিক সীমারেখাটুকু লোপ পেয়ে একাকার হয়ে যাওয়ার দারুণ আশঙ্কা রয়েছে। আশংকা রয়েছে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংসের এক বীভৎস কূট-চালের আধিপত্য বিস্তারের।

বাংলাদেশ জাতীয় সেমিনার ১৯৭৬ : গৃহীত সুপারিশমালা ঃ

১৯৭৬ এর শিক্ষা সেমিনারে গৃহীত সুপারিশমালা অনুসরণ করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যথেষ্ট সুপরিবর্তন কার্যকরী করা হচ্ছে যেটির গুরুত্ব ও প্রয়োজন এখনো ফুরিয়ে যায়নি বিধায় নিম্নে এসব সুপারিশ উদ্ধৃত করা হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এবং দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বাংলাদেশের সেসময়কার শিক্ষার মান ও পরিবেশ মূল্যায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সনের ৪ঠা হতে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে জাতীয় শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

এই সেমিনারের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনশিক্ষা পরিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রশাসনিক দফতরের ডেলিগেটবৃন্দের সেমিনারে অংশগ্রহণ। সেমিনারে মোট তিনশ' ছিয়াশী জন শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক ডেলিগেট হিসাবে যোগদান করেন; মফস্বল থেকে আগত ডেলিগেটের সংখ্যা ছিল দু'শ ছত্রিশ জন। এছাড়া বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এবং স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে শিক্ষার মান ও পরিবেশ, এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে মোট ছয়টি প্রবন্ধ পাঠ এবং পঠিত প্রবন্ধের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সেমিনারের পঠিত প্রবন্ধ, প্রবন্ধের ওপর আলোচনা এবং প্যানেল আলোচনা ও সুপারিশসমূহে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমস্যাবলির সমাধানের পথ নির্দেশ রয়েছে যা পরবর্তী "শিক্ষা চিন্তা ও সংস্কার" পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছে বৈ কি।

এই সেমিনারে শিক্ষার পর্যায় অনুসারে সুপারিশ সমূহের সার-সংক্ষেপ নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দেশের টেকনোলজিক্যাল চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে প্রণয়ন করতে হবে। বর্তমান পাঠক্রম যুগোপযোগী নয়। অবিলম্বে সিলেবাসকে পুনর্বিন্যাস করে যুগোপযুগী ও বাস্তবধর্মী করা উচিত।

২. প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রমের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অসঙ্গতি রয়েছে। এই দুই পর্যায়ের পাঠক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৩. উচ্চ শিক্ষা, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা দেশের চাহিদা অনুযায়ী সীমিত হওয়া উচিত।

৪. (ক) গবেষণার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেক বিভাগে এমন একজন অধ্যাপক থাকবেন যিনি তরুণ শিক্ষকগণকে গবেষণার কাজে উৎসাহিত করতে পারেন।

(খ) গবেষকগণকে দেশের সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা করতে হবে। কোন শিক্ষক যেন গবেষণার কাজ অসমাপ্ত রেখে বিদেশে স্কলারশীপ বা ফেলোশীপ নিয়ে না যান সেদিকে নজর রাখতে হবে।

www.pathagar.com

(গ) রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফল জনসাধারণকে অবহিত করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। গবেষণার গুণগত মূল্যায়নের জন্য একটি বিশেষ কার্যক্রম প্রণয়ন করা দরকার। প্রয়োজনবোধে এই ব্যাপারে মঞ্জুরী কমিশনের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

(ঘ) মঞ্জুরী কমিশন বর্তমানে কোন শিক্ষককে ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা প্রকল্প দিচ্ছেন। এ ব্যবস্থা একটা সঠিক কার্যক্রমের মাধ্যমে হওয়া উচিত। এম. এস. সি. পর্যায়ের পাঠক্রমের শতকরা ষাট ভাগই গবেষণামূলক হওয়া উচিত। গবেষণার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার ও শিল্প সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলোতে বইয়ের অভাব দূর করার জন্য অর্থনৈতিক বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন করতে হবে।

৬. (ক) কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপন করা প্রয়োজন। আন্তঃ লাইব্রেরি পুস্তক আদান-প্রদান পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন।

(খ) দুর্লভ গ্রন্থ এবং বিভিন্ন বিষয়ে ষ্ট্যান্ডার্ড র্জানাল ও পত্র-পত্রিকা প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রাখা ব্যয়বহুল। সেজন্য প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় রেফারেন্স লাইব্রেরি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।

৭. (ক) বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রন্থ না থাকায় বাংলায় শিক্ষাদান অসুবিধাজনক। পর্যাপ্ত পরিমাণে বাংলায় বই লেখা উচিত। বাংলা একাডেমির পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ আরো দ্রুততর করা উচিত।

(খ) বাংলায় প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কেও নিতে হবে। এর জন্য বেতনসহ ছুটি দিয়ে বই লেখার কাজের দায়িত্ব শিক্ষকদের দিতে হবে।

(গ) ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষায় লেখা দরকারী বইয়ের বঙ্গানুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) বাংলায় পাঠ্যপুস্তকের দুষ্প্রাপ্যতা দূরীকরণার্থে একটি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অনুবাদ সংস্থার মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) বিদেশী প্রকাশনা সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় সস্তা পাঠ্য-পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

(চ) বিদেশ থেকে পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তক আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

www.pathagar.com

৮. (ক) ভাষা হিসেবে ইংরেজির মর্যাদা নির্ধারণের প্রয়োজন। স্নাতক পাস এবং অনার্স পর্যায়ে ইংরেজিকে অবশ্য পাঠ্য দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে রাখতে হবে।

(খ) প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোর্স পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু কার্যকর ও বিধিবদ্ধ কোর্স পদ্ধতি প্রবর্তন করার পূর্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, যাতে করে শিক্ষক ছাত্রের আনুপাতিক হার সুষম হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পাঠ্যপুস্তক, ল্যাবরেটরির সুযোগ-সুবিধা, লেকচার নোট বা দুষ্প্রাপ্য বই এর প্রয়োজনীয় অংশ সাইক্লোস্টাইলিং এবং ডুপলিকেটিং -এর ব্যবস্থা করতে হবে। কোর্স পদ্ধতিকে সফল করতে হলে শিক্ষাঙ্গণে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

১০. অনার্স কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের তিন বছর পড়াশুনা শেষ করার পর একবার সমস্ত পত্রে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা একজন ছাত্রের কিংবা ছাত্রীর মেধা নির্ণয়ের উপযুক্ত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

১১. কোর্স পদ্ধতি চালু না করা পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের (ইন্টারন্যাল এসেসমেন্টের) জন্য শতকরা ৪০ এবং ফাইনাল পরীক্ষার জন্য শতকরা ৬০ নম্বর রাখতে হবে। প্রকৃত পক্ষে ইন্টারন্যাল এসেসমেন্টের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার পূর্বে মাত্র কিছু দিন লেখাপড়া করে পরীক্ষা পাসের চেষ্টা না করে সারা বছর পড়াশুনায় মনোযোগী হয়। পিরিয়োডিক্যাল ইন্টারন্যাল এসেসমেন্টের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর সারা বছর পড়াশুনা করার চাপ বজায় রাখতে হবে।

১২. (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে হবে।

(খ) মেধা এবং যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এই পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপঃ

১. জাতীয় পর্যায়ে হতে পারে অর্থাৎ একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষার মান নির্ণয়ক সংস্থার মাধ্যমে হতে পারে। এপ্টিচ্যুড টেস্ট, অবজেকটিভ টেস্ট ইত্যাদি পন্থার সমন্বয়ে এ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। অথবা,

২. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজেদের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করবেন এবং ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া কাউকে ভর্তি করা হবে না।

৩. ভর্তির ব্যাপারে ছাত্রদের বিষয় নির্বাচন সম্পর্কে এপ্টিচ্যুড নির্ধারণের জন্য উপদেশ ও নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

www.pathagar.com

কলেজ

১. বেসরকারি কলেজের আর্থিক সমস্যা উন্নতমানের শিক্ষাদানের পক্ষে অন্তরায়। সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলোর মধ্যে আর্থিক বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বেসরকারি কলেজসমূহে পর্যাপ্ত সরকারি অনুদান দেওয়া অপরিহার্য।

২. কলেজসমূহে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ডিগ্রি পর্যায় পৃথকীকরণ আবশ্যক। ডিগ্রি কলেজে শুধু ডিগ্রি পর্যায়ের পড়াশুনা থাকবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নবম ও দশম শ্রেণী যুক্ত করা যেতে পারে। অনার্স কোর্স প্রবর্তিত কলেজসমূহে অনার্স ক্লাসে শিক্ষাদানরত শিক্ষকদিগকে পাস কোর্সের ক্লাস দেয়া চলবে না।

৩. উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের এবং ডিগ্রি পর্যায়ের পাঠক্রমের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং ডিগ্রি পর্যায়ের পাঠক্রমের মধ্যে পঠনীয় বিষয়ের যেন কোন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ক্রমান্বয়ে উন্নততর পর্যায়ে পঠনীয় বিষয় উন্নততর হতে হবে এবং তাতে নতুনত্ব থাকতে হবে।

৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য রিফ্রেসার্স কোর্স চালু করতে হবে।

৫. পাঠক্রমে এমন সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা জাতীয় চেতনার বিকাশ, মানসিক উৎকর্ষ সাধন, নৈতিক চরিত্র গঠন ও জীবিকা অর্জনে সাহায্য করে। জীবিকা অর্জনের জন্য কৃষি ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সকল গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইহা চালু করতে হবে। সকল গ্রুপেই উক্ত দুই বিষয় বাধ্যতামূলক পাঠক্রম হিসাবে থাকবে। শিক্ষাকে বাস্তবমুখী করতে হবে। জীবিকা অর্জনের সহায়তার জন্য হাতে কলমে কাজ করার বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কলে-কারখানায় ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭. শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হবে। তবে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজির প্রচলন রাখতে হবে।

৮. কলেজ পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির নীতিমালা নির্ধারণের জন্য একটি জাতীয় কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি গঠন করতে হবে। ডিগ্রি পর্যায়ে অবাধ ভর্তির বদলে মানগত ও গুণগত বিচারের মাধ্যমে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. দেশে বর্তমানে প্রায় ছয়শত কলেজ আছে। জনসংখ্যা ও প্রশাসনিক এলাকার ভিত্তিতে এই সংখ্যা কমিয়ে এনে বেসরকারি কলেজসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

www.pathagar.com

১০. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা নিজেরাই গ্রহণ করবে এবং মূল্যায়নের পর সার্টিফিকেট দিবে।

১১. শিক্ষার মান উন্নয়নের এবং বিদ্যার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাফল্য লাভের জন্য অনবরত মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাই এই পদ্ধতি চালু করতে হবে এবং সেজন্য কলেজগুলোর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করতে হবে।

১২. প্রত্যেক ছাত্রের জন্য প্রথম থেকে শুরু করে কলেজ শিক্ষার শেষ পর্যন্ত সাফল্য, চারিত্রিক গুণাবলি, ব্যক্তিগত গুণাবলি ইত্যাদি সম্বলিত একটি পূর্ণ বিবরণ কার্ড রাখতে হবে।

১৩. শরীর চর্চা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ইউ. ও. টি. সি, রোভার, স্কাউট, গার্লস-গাইড ইত্যাদি সকল কলেজে চালু করতে হবে এবং এর জন্য নম্বর বরাদ্দ করতে হবে।

১৪. শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যা সমাধান করতে হবে।

১৫. কলেজগুলোতে গ্রন্থাগার, ব্যায়ামাগার, মিলনায়তন ইত্যাদি ব্যবস্থা অনেক কম। সরকারি সাহায্য ব্যতীত এগুলোর ব্যবস্থা ও উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা সম্ভব নয়।

১৬. মেয়েদের জন্য সাধারণ শিক্ষার সাথে সংসার ধর্ম পালন সম্পর্কিত একটি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ স্কুল ও মাদ্রাসা

১. বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রসাসমূহে আর্থিক অনিশ্চয়তা শিক্ষার মান উন্নয়নের অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মধ্যকার আর্থিক সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য দূর করতে হবে।

২. শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার মান সম্পর্কযুক্ত। পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য পূর্ণ বেতন ও উপযুক্ত হারের প্রশিক্ষণ ভাতাসহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং নিবেদিত প্রাণ, লব্ধ প্রতিষ্ঠ আদর্শ শিক্ষককে উৎসাহিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. শিক্ষকগণের চাকুরীর স্থায়ীত্ব, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, টিচার্স বেনিফিট ইত্যাদির ব্যাপারে অন্যান্য পেশার সঙ্গে শিক্ষকতার এবং বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে যে বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য রয়েছে তা দূর করতে হবে।

৪. বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। শ্রেণীর সংখ্যা ও পাঠদানের বিষয় সংখ্যার উপর ভিত্তি করে শিক্ষক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।

www.pathagar.com

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সরকারি সাহায্যের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হতে হবে।

৬. মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর বিষয়, তার বুঝবার ও শিখবার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

৭. বর্তমান পাঠক্রম থেকে অল্প প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বাদ দেওয়া উচিত। যেমন পাঠক্রম থেকে সমাজ পাঠ বাদ দিতে হবে, এর পরিবর্তে নতুন করে ইতিহাস ও ভূগোলের পাঠক্রম তৈরি করতে হবে।

৮. প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষার উপর জোর দিতে হবে। প্রথম শ্রেণী থেকে বাংলা ও অংক এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি এবং বিজ্ঞান চালু করতে হবে।

৯. ধর্ম শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১০. (ক) পাঠক্রমকে বাস্তব জীবনের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে, যাতে করে মাধ্যমকি পর্যায়ের শেষ পরীক্ষা পাস করার পর ছাত্র-ছাত্রীগণ জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয়।

(খ) মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে কারিগরি ও কৃষি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১১. মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা পদ্ধতির উপর একটা ঐচ্ছিক পাঠক্রম থাকলে অনেকেই মাধ্যমিক পর্যায়ের পর প্রাইমারি শিক্ষকরূপে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে শিক্ষকতাকে বেছে নিতে পারে।

১২. মেয়েদের জন্য গার্হ্যস্থ বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১৩. মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ও নির্বাচনের পূর্ণ কর্তৃত্ব শুধু টেক্সট বুক বোর্ডের উপর থাকা উচিত নয়। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য একটি জাতীয় পাঠ্যপুস্তক পরিষদ গঠন করা যেতে পারে।

১৫. অনেক স্কুল ও মাদ্রাসার উপযুক্ত লাইব্রেরি, বই, বেঞ্চ, টেবিল, ব্লাক-বোর্ড ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ প্রয়োজন অনুসারে নেই। এর জন্য সরকারি আর্থিক সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

১৬. সস্তা নোট বই এবং অন্যান্য সাহায্য পুস্তক প্রকাশ বন্ধ করতে হবে।

১৭. ল্যাবরেটরি, সাজ-সরঞ্জামের সুবিধা না থাকলে কোন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার অনুমতি দেয়া উচিত নয়।

www.pathagar.com

১৮. বিভিন্ন টিচিং-এইডের ব্যবহার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকগণের ব্যবহারের জন্য টিচার্স ম্যানুয়েল তৈরি করতে হবে।

১৯. ছাত্র ভর্তি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রচার করবেন। প্রত্যেক স্কুলকে এই নীতিমালা পালন করতে হবে। ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য বেসরকারি স্কুলসমূহ জেলা শিক্ষা অফিসারের উদ্যোগে জেলা ভিত্তিক সাধারণ পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে পারে।

২০. ১৯৭৩ সালের স্কুল কমিটির রেগুলেশনের আশু সংস্কার প্রয়োজন।

২১. প্রতি মাসে প্রতি বিষয়ে পরীক্ষা নিতে হবে। অন্ততঃপক্ষে এক বছরে ছয়বার পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২২. মাসিক পরীক্ষার এবং বার্ষিক পরীক্ষার সম্মিলিত ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করতে হবে।

২৩. শিক্ষা বোর্ড বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় মডেল প্রশ্ন তৈরি করে বিদ্যালয়গুলোতে বিতরণ করবেন।

২৪. গ্রেস মার্কস (খয়রাতী নম্বর) নম্বর দেয়া বন্ধ করতে হবে।

২৫. পরীক্ষায় সর্বপ্রকার দুর্নীতির মূল্যোৎপাটন করতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা হ্রাস করে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর সুদৃঢ় ও সুষ্ঠু করতে হবে।

২৬. সহপাঠক্রম এমন হতে হবে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল মনের বিকাশ ঘটে।

২৭. শিক্ষকদের বাস সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৮. ছাত্র-শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজসাধ্য করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

১. প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক যুগোপযোগীভাবে ও শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় করে প্রস্তুত করতে হবে।

২. প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা এবং শিক্ষকতার জন্য নিয়ম-কানুন পুনর্বিন্যাস করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৩. মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন দিতে হবে।

৪. বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।

৫. মহকুমা ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার সমাপনী পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলন সম্ভব কিনা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

www.pathagar.com

৬. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যতগুলো শ্রেণী আছে কমপক্ষে ততজন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের উপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব

১. পরিবার হচ্ছে সমাজের প্রাথমিক শিক্ষালয়। এই কারণে পরিবারের পরিবেশ এমন হতে হবে যাতে একজন শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যৎ জীবনের দর্শন সম্বন্ধে একটা সুন্দর ও কল্যাণকর শিক্ষা পারিবারিক পরিবেশ হতে পারে। অভিভাবকের এই সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

২. তরুণ শিক্ষার্থীদের পরিচয় করে দিতে হবে তাদের সঠিক কৃষ্টির সঙ্গে। নিজেদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সঙ্গে সঠিক পরিচয় লাভ করতে পারলে তরুণ মনের অস্থিরতা ও বিভ্রান্তি দূরীভূত হবে। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত আপন কৃষ্টিকে পাঠক্রমের একটা বিষয় হিসাবে চালু করতে হবে।

৩. ধর্ম মানুষকে সামাজিক কলুষতা থেকে মুক্ত রাখার পথ নির্দেশ দেয়। তাই সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদিগকে অল্প বয়স থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে।

শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে সামাজিক ও ধর্মীয়মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা

১. প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে।

২. মাধ্যমিক স্তরে ধর্মবোধ ও নৈতিক চেতনাকে বিকশিত করতে পারে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সকল ধর্মের উচ্চ আদর্শ নীতি এবং মনুষত্ব বিকশিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক বিষয়গুলো একত্রিত করে একটি পাঠক্রম তৈরি করতে হবে।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছাত্র নির্দেশানার প্রয়োজনীয়তা

১. বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র নির্দেশনার অপরিসীম গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা কর্মসূচি থাকতে হবে।

২. নির্দেশনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে শিক্ষকদের উপর। কিন্তু প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তত একজন শিক্ষককে কাউন্সিলিং-এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। তিনি হবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কাউন্সিলর।

www.pathagar.com

৩. কাউন্সিলিং-এর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদিগকে কর্মসংস্থানের যাবতীয় তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪. প্রত্যেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন কাউন্সিলর থাকা উচিত। এছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকেও কাউন্সিলিং-এ প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

৫. ছাত্র নির্দেশনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসারের তত্ত্বাবধানে একটা নির্দেশনা সেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬. অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং এর জন্য অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের ভূমিকা

১. অভিভাবক-শিক্ষকদের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষকগণ যাতে পরিবেশ সৃষ্টিতে নিজেদের দায়িত্ব পালনে সুযোগ পান সেজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক সভা-সমিতি না করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকার এবং রাজনীতিবিদগণকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষকগণকে দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

২. শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।

৩. প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, অভিভাবক ও কর্তৃপক্ষের সম্মেলন মাঝে মাঝে আহ্বান করতে হবে।

[সূত্র ঃ বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা সেমিনার ১৯৭৬, প্রকাশ কাল জানুয়ারি, ১৯৭৮, সম্পাদনায় সৈয়দ বদরুদ্দীন ও অন্যান্য]

❑ [বাংলাদেশ জাতীয় সেমিনার -১৯৭৬ এর রিপোর্টটি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে একটা দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও এর উন্নয়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। আমাদের দেশের চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকদের মাঝে এই দৃষ্টি ও চেতনার বিশেষ সহায়ক হবে ভেবেই এই রিপোর্ট ছাপান হলো– গ্রন্থকার।]

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

১. মুহাম্মদ শামস -উল হক ঃ শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন।

২. John Mathi: Village Government in British India.

৩. Gulshan Roy: Our Educational Problems.

৪. UNESCO: Studies on Compulsory Education, 1954.

৫. ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনঃ History of Bengali Language and Literature.

৬. জওহারলাল নেহেরু ঃ Discovery of India.

৭. Francois: Travels in the Mughal Empire.

৮. Panikar: A Survey of Indian History.

৯. স্যার যদুনাথ সরকার ঃ India Through the Ages.

১০. Spear: Twilight of the Mughals.

১১. Rolinson: India.

১২. Sleeman: Rambles and Recollections.

১৩. এস. এম. ইকরাম ঃ পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।

১৪. ইশতিয়াক হোসেন কোরেশী ঃ The Administration of the Sultanate of Delhi.

১৫. উইলিয়াম হান্টার ঃ The Indian Mussalmans.

১৬. অরুণ ঘোষ ঃ শিক্ষার ভাবধারা পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস।

১৭. জেম্‌সকে. হায়দার ঃ India: Impression and Suggestion.

১৮. National Education Commission Report, 1959.

১৯. Mohammad Tajammul Hossain, Bangladesh, Victim of Balack Propaganda,Intrigue and Indian Hegemony, Ed. 1996.

২০. বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা সেমিনার-১৯৭৬, প্রকাশ কাল জানুয়ারী, ১৯৭৮।

২১. দৈনিক সংগ্রাম, জুলাই ৯, ২০০৪;

www.pathagar.com

৪র্থ অধ্যায় বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ঃ উন্মেষ ও বিকাশ

ব্রিটিশ যুগে মুসলিম শিক্ষা ঃ

পূর্বের অধ্যায়ে বাংলাদেশের শিক্ষা, ঐতিহ্য ও ইতিবৃত্ত সম্পর্কে পরিমিত আলোকপাত করা হয়েছে বিধায় বর্তমান অধ্যায়টিতে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়ের পুনরুল্লেখসহ এদেশে ইসলামী শিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশের আঙ্গিক-আলোচনা সীমিত রাখার প্রয়াস রয়েছে।

ক. ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ ও এর বিপর্যয়

বাংলাদেশে মুসলিম রাজত্বকাল প্রায় ছয়শত বছর (১১৯৭-১৭৯৭) বিরাজমান ছিল। এই সময়টিতে মুসলিম শাসক, দরবেশ ও ধর্ম প্রচারকগণ অসংখ্য মসজিদ, মকতব, ফোরকানিয়া, হিফজুল কুরআন, দারুল উলুম এবং জামেয়া প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন গোটা বাংলাদেশ ব্যাপী। এছাড়া সুফী-সাধকগণ খানকা, রিযাত এবং জাওযিয়া প্রতিষ্ঠা করে আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছেন আপন শিষ্যবর্গের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতাবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আরবি এবং ফারসি ভাষার মাধ্যমে তাঁরা এখানকার জনগণকে শিক্ষা দিয়েছেন আল-কুরআন, হাদীস, তফসীর, আকায়িদ, ফিক্‌হ, তাসাউফ প্রভৃতি বিষয়। মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর শাসনামল হতে আলীবর্দী খাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার বিপুল প্রসার ঘটে। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি, দান-অনুদান ও মুসলিম মনীষীদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তখনকার শাসকদের রাজ্য শাসনের অপরিহার্য দায়িত্বসমূহের অন্যতম কর্তব্য। ম্যাক মূলারের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে যে, ঐ সময়ে সমস্ত বাংলাদেশে প্রায় আশি হাজার স্থানীয় স্কুল ছিল। জনসংখ্যার নিরিখে এর হার হচ্ছে প্রতি ৪০০ জনের জন্যে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। (J. K. Haider: India Impression and Suggestions, Quoted by S. M. Jafar: Education In Muslim India. p. 150)

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার মূল বুনিয়াদের এভাবে পত্তন হয়। বেনিয়া ইংরেজ ছলে-বলে-কৌশলে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার পর মুসলমানদের অসি ও মসি পদানত এবং দুর্বল করার উদ্দেশ্যে প্রধানত দুটি পথ বেছে নিয়েছিলঃ

১. আর্থিক দিক থেকে মুসলমানদের পঙ্গু ও সর্বস্বান্ত করার জন্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের সূচনা

www.pathagar.com

২. শিক্ষা ও চাকুরি হতে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত ও বঞ্চিত করার জন্যে আরবি ও ফারসি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও ইসলামী শিক্ষার বিষয়বস্তুর পরিবর্তে ফিরিঙ্গি সভ্যতা ও ব্রাহ্মণ্যবাদের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিচালনা।

স্যার টমাস রো'র গ্রন্থে মুসলিম আমলে বাংলাদেশের স্থানীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের গৌরব এবং ব্রিটিশ কর্তৃক এসব প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের চিত্র সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অনুরূপ বর্ণনা উইলিয়াম এডামের রিপোর্টেও (১৮৩৫–১৮৩৮) দেখা যায়। সেসময়ে গৌড়, পাণ্ডুয়া, মহিসান, বাযা, সাতগাঁও, মুর্শিদাবাদ, রংপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা, সোনারগাঁয়ে যেসব মাদ্রাসা ছিল সেগুলোর ভগ্নাবশেষ আজও ব্রিটিশ শাসকদের মুসলিম শিক্ষা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতি বর্বরতার স্বাক্ষর হয়ে আছে।

পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আলিম সমাজ ও ধর্ম ভীরু জনগণের বিতৃষ্ণা ও বিরোধিতার কথা। ইংরেজি শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি তখনকার মুসলমানদের মধ্যে ঈমান ও আকীদার কি সর্বনাশই না করেছে,তা আমাদের বর্তমান সমাজের তথাকথিত মুসলিম শিক্ষিতদের ধর্ম ও ইসলামের প্রতি প্রচন্ড মূর্খতাও বৈরী আচরণ দেখে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ তৃতীয় মুসলিম দেশ বাংলাদেশে আজও ইসলামী শিক্ষা পুনর্জীবন ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র, বাক-বিতণ্ডা ও বিভ্রান্তি এর জ্বলন্ত প্রমাণ। লর্ড ম্যাকলের মন্তব্যটির সাক্ষাত প্রমাণ যেন এটি। তিনি এদেশের ব্রিটিশ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেনঃ "তারা (মুসলমান) হবে এমন এক শ্রেণীর, যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ।"

স্মর্তব্য, ১৭৭৫ সালের ১২ই আগস্ট দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে রাজস্ব আদায়ের ভার প্রদান আনুষ্ঠানিকভাবে মঞ্জুর করেন। ফলে ইংরেজরা হিন্দুদের সহায়তায় এদেশের রাজস্ব ও অর্থনীতির উপর প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের কথায়ঃ In consequence of this change, the Mohamedan families have lost those sources of private emoluments which could enable them to bestow much expense on the education of their children, and are deprived of the power which they formerly possessed of endowing on patronizing public seminars on learning."

— Report of Madrasah Education Committee. 1938 P. 56.

www.pathagar.com

খ. কলিকাতা মাদ্রাসা ঃ পটভূমি ও অবদান

বৃটিশ কুক্ষিগত ভারতে ইসলামী শিক্ষার পুনর্জাগরণ ও উন্মেষে কলিকাতা মাদরাসার পর্যালোচনা দর্পনে তদানিন্তন মুসলিম চিত্তের উৎকণ্ঠার প্রতিফলন অবলোকন পছন্দ।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার সৌভাগ্য রবি অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে সেসময়কার অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে কৃষ্টি তমদ্দুনের উপরও নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। রাজনৈতিক শক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ার সাথে সাথে তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানী হস্তগত করার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের ওয়াকফ্ সম্পত্তিসমূহ রাষ্ট্রায়াত্ত করা হয়। তদপুরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানরা প্রায় সর্বদিক দিয়েই হয়ে পড়ে সর্বশান্ত। রাষ্ট্রবিচার ও প্রশাসনে ফার্সী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু হওয়ায় ইংরেজি তথা ফিরিঙ্গি সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটায় প্রায় সর্বস্বহারা মুসলমানরা 'ফিরিংগি' সরকারের অধীনে লেখাপড়া ও চাকরি করার পরিবর্তে এর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

এমনি যখন মুসলমানদের জাগতিক, মানসিক ও আর্থিক পরিবেশ, ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম শিক্ষাবিদ লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের সাথে সাক্ষাৎ করে বৈরী ও বিক্ষুব্ধ মুসলমানদেরকে দেশ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে প্রশান্ত ও কল্যাণকর ভাবে বসবাস করার জন্য "আরবি, ফারসিও ইসলামী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের" আবেদন জানান। ফলশ্রুতিতে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে (১১৯৪ শাবান) কলকাতার থানা রোডের একটি ভাড়াটিয়া ভবনে মাদ্রাসার প্রাথমিক কাজ শুরু করা হয়। হেস্টিংস নিজে এর উদ্যোগী ছিলেন। তার এই উদ্যোগের অন্তনির্হিত উদ্দেশ্য ছিল যে, দখলকৃত তথা কলোনী ভারতকে ব্রিটিশ রাজের অনুগত রাখার ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবাচক সমর্থন আদায়। যাহোক সরকারি কাগজপত্রে প্রথম এটি Mohamedan College নামে অভিহিত হয়েছিল; কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে কলকাতা মাদ্রাসা (Calcutta Madrasa) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করায় অবশেষে ইহা কলকাতা মাদ্রাসা নামেই প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। উল্লেখ্য মাদ্রাসার নামে হিন্দু প্রধান এলাকায় একটি বিরাট ভূসম্পত্তি ক্রয় করে মাদ্রাসাটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ তখন বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে এখানকার মাদ্রাসাভবন ও জায়গা-সম্পত্তি বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে কলিকাতার ওয়েলেসলী স্ট্রীটের পাশে গোল

www.pathagar.com

তালাব এলাকায় নতুন করে মাদ্রাসাটি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছরে মাদরাসার নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ সমাধা করা হয়।

প্রশাসন

১৭৮১ হতে ১৮১৯ পর্যন্ত একটি পরিচালক পরিষদ ছিল। পরে ১৮১৯ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত ১ জন ইংরেজ সেক্রেটারি ও ১ জন মুসলিম সহকারী সেক্রেটারি এই পরিষদের দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত হন। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় প্রাচীবিদগণ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে বহাল ছিলেন এবং এর পূর্ণ দায়িত্ব তখন থেকে অধ্যক্ষের উপর অর্পিত হয়। মাদ্রাসার প্রথম ইউরোপীয় অধ্যক্ষ হচ্ছেন Sir William Nassar Less (১৮৫৭–৭০), শেষ ইউরোপীয় অধ্যক্ষ ছিলেন (৭ম অধ্যক্ষ) J.M. Bottomley (১৯২৩–২৫)। প্রথম ভারতীয় যিনি অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন তিনি হচ্ছেনঃ শামস-আল্ উলামা কামাল আলদীন আহমাদ (১৯২৭-১৯২৮)। এদেশীয় মাদ্রাসার প্রথম পরিচালক ও মুদারিস ছিলেন মাওলানা মাজ্‌দ।

মাদ্রাসা বোর্ড

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য ১৯২৮ সালে 'Board of Central Madrasa Examination Bengal' নামে একটি বোর্ড গঠন করা হয়। আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষা এই বোর্ডের অধীনে ছিল। পরে ঢাকায় আলীয়া মাদ্রাসা স্থানান্তরিত হওয়ার পর এই বোর্ডের নাম Madrasa Education Board রাখা হয়। যাহোক, পদাধিকার বলে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ রেজিস্ট্রার এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে বোর্ডকে মাদ্রাসা আলীয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র বোর্ড স্থাপন করা হয়। এই বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত (affiliated) মাদ্রাসাসমূহ একই পাঠ্য তালিকা অনুসরণ করে ও ইহাদের পরীক্ষা সমূহ ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

পাঠক্রম

জনাব আলদীন মোল্লা দারস্-ই-নিজামী পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করেন। সে-হিসাবে প্রধানত নিম্ন বিষয়সমূহ পাঠক্রমভুক্ত ছিলঃ

১. সারক ও নাহ্ও (ব্যাকরণ শাস্ত্র)
২. বালাগ (অলঙ্কার শাস্ত্র)
৩. আদাব (সাহিত্য — আরবি, ফার্সী, উর্দু)
৪. ফিক্‌হ

www.pathagar.com

৫. উসুল
৬. মানতিক
৭. হিকমা
৮. কালাম
৯. রিয়াদী (অঙ্ক শাস্ত্র)
১০. ইসলামের ইতিহাস
১১. ফারাইজ (উত্তরাধিকার আইন)
১২. তাফছির ও হাদীস্

আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি বিষয় চালু হয়ে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে তা পরিত্যক্ত হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে অ্যাংলো ফার্সী ডিপার্টমেন্ট চালু হয়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ইংরেজি শিক্ষা পাঠ্যভুক্ত করা হয়। ১৯০৮ সালে ৩ বছর মেয়াদী টাইটেল কোর্স চালু হয় ও এই কোর্সে পাসকৃত ছাত্রদেরকে 'ফখরে আল মুহাদ্দীসীন' ডিগ্রী দেয়া হয়। এরপর সংশোধন করে ২ বছর মেয়াদী কোর্স চালু করে 'মুমতাজুল' 'মুহাদ্দেসীন' ও অনুরূপ মেয়াদী কোর্স শেষে তাফসির, ফিকাহ্ ও আরবি সাহিত্য ও 'কামিল' কোর্স চালু করা হয়।

কলিকাতা মাদ্রাসার বিশেষ অবদান এই যে এই মাদ্রাসার খ্যাতিমান হেড মৌলবী যেমন প্রথিত যশা মৌলবী আবদুল রহীম সাফীপুরী থেকে দশম মৌলবী মুফতি সায়্যিদ মুহাম্মদ আযীম আল্ ইহ্সান বারাকাতী প্রমুখ ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন। তাঁদের অনেকেই শিক্ষকতার সাথে সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিবিযুক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন ঃ এঁরা সবাই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নির্ভীক ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাসাটি বন্ধ করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। ব্রিটিশদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়; কারণ মাদ্রাসার শিক্ষকগণ জনপ্রিয় ছিলেন এদের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, ত্যাগ ও চরিত্রের জন্যে। গণপ্রতিরোধে রক্ষা পাওয়া এই মাদ্রাসাই এই উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষার প্রথম মাইল ফলক।

মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিদ্বেষপূর্ণ অবিচার ও আচরণ প্রকৃতপক্ষে ভারত ও বিশেষভাবে বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের জন্য কোন ক্রমেই কল্যাণকর ছিল না। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে শাসক গোষ্ঠী ভাবলেন যে, এদেশেকে শাসন করার জন্যে মুসলমানদের সহযোগিতা ও আনুকূল্য একান্তভাবে প্রয়োজন। তাই আরবি এবং ফার্সী ভাষার উন্নয়ন ও মুসলিম আইন শিক্ষাদানের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে যোগ্য কর্মচারী, বিচারপতি

www.pathagar.com

ইত্যাদি পদে অধিষ্ঠিত করার জন্যই কলিকাতার বাজার স্ট্রীটে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওয়ারেন হেস্টিংস এ-মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ফলে ড. আইয়ুব আলীর কথায় ঃ

"The history of Madrasah Education in Bengal under British rule is bound up with the history of Calcutta Madrasah round which the system gradually grew up in Bengal".

[Dr. A. K. M. Ayyub Ali: History of Traditional Islamic Education in Bangladesh. P 34.]

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার মূল ইতিহাসের সূচনার সৃষ্টি ইহাই। হযরত মোয়্যাল্যা মাজদুদ্দিন হচ্ছেন কলিকাতা মাদ্রাসার প্রথম হেড্ মাওলানা। তিনি হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ও হযরত মোল্লা নিজামুদ্দিন শাহ্লাবী (রহ)-এর প্রণীত ইসলামী শিক্ষার পাঠক্রম কলিকাতা মাদ্রাসায় চালু করেন। হযরত নিজামুদ্দীনের নামানুসারে এই পাঠক্রম আজও 'দারসে নিযামী' হিসাবে বাংলাদেশের অনেক মাদ্রাসায় চালু রয়েছে। এ পাঠক্রমে ঈষৎ পরিবর্তনসহ নিম্ন বিষয়াদি শিক্ষা কোর্স হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১. আরবি ব্যাকরণ। ২. মানতিক বা তর্কশাস্ত্র। ৩. হিকমাত বা প্রকৃতি দর্শন। ৪. রিয়াদী ও হাইয়াত বা অংক ও জ্যোতিষশাস্ত্র। ৪. বালাগাত বা কাব্যালংকার। ৬. ফিক্হ বা ইসলামী আইন। ৭. উসূল আল-ফিক্হ বা ইসলামী বিচারের নীতিমালা। ৮. কালাম বা ধর্মশাস্ত্র। ৯. তফসীর বা আল-কুরআনের ব্যাখ্যা। ১০. হাদীস।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রচারের জন্যে আরও ৩টি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এ তিনটি মাদ্রাসা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে স্থাপিত হয়। এই সময়েই ইংরেজি শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

লক্ষণীয়, তদানীন্তন সময়ে সরকারি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোতে তখনও মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। এতে ব্রিটিশ সরকার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা ইংরেজি শিক্ষাকে মুসলমানদের নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় করার জন্যে স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে 'নৈতিক শিক্ষা' শীর্ষক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ শিক্ষার মূল ভিত্তি ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় 'Natural religion' বা স্বাভাবিক ধর্মের ভিত্তিতে। ১৮৮২ সালের Indian Education Commission-এ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া এ যুগে খ্রিস্টান

www.pathagar.com

মিশনারীগণ টেক্সট বুক হিসেবে বাইবেল গ্রন্থ স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলক করার জন্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবি জানায়। ব্রিটিশ সরকার এ দাবির অনুকূলে ভারত সরকারকে অনুরূপ পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেয়। এতে মুসলমানদের প্রতিনিধি নওয়াব আব্দুল লতিফ ব্রিটিশ সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার অসারতা তুলে ধরেন এবং মুসলমানসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ও যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে– তা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন। নওয়াব আবদুল লতিফের এহেন প্রতিবাদের যথার্থতা উপলব্ধি করে ব্রিটিশরাজ অবশেষে 'বাইবেল' শিক্ষাদানের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

এরপর ১৯০৫ সালের সূচিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ১৯১২ সালে বিফল হওয়ায় মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনে দারুন বিপর্যয় নেমে আসে। তবে এ আন্দোলন মুসলমানদের শিক্ষা জীবনে একটি সুফল বয়ে আনে। নির্যাতিত ও বিক্ষুব্ধ মুসলমানদেরকে তুষ্ট করার জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের তদানীন্তন সরকার মুসলমানদের শিক্ষা প্রসার কল্পে নিম্নোক্ত কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন :

১. নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে উর্দু শিক্ষার সন্নিবেশ
২. অনুদান প্রদানের সূচনা
৩. মুসলিম ছাত্রদের জন্যে বিশেষ বৃত্তিদান ও বিনা বেতনে অধ্যয়ন
৪. আবাসিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ
৫. শিক্ষামূলক চাকরিতে অধিকতর মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ।

গ. মসজিদভিত্তিক ফোরকানিয়া ও মকতব

এ প্রসঙ্গে মসজিদভিত্তিক ফোরকানিয়া ও মকতব সম্পর্কে কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষার মূল বুনিয়াদ হচ্ছে মকতব ও মসজিদ। এখানে মুসলমান শিশুরা ইসলামের হাতেখড়ি নেয়। আল-কুরআন তিলাওয়াতে ইসলামের ধর্মীয় বিধি-বিধান ও প্রাথমিক হিসাব জ্ঞান এসব প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হতো। এসব প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত ও বেসরকারি ভাবে পরিচালিত হতো। স্থানীয় ভাবে পরিচালিত হতো ব্যক্তিবর্গের আর্থিক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায়। এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যাই পরবর্তীকালে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করার জন্যে ভর্তি হতো। অন্য কথায় মকতব ও ফোরকানিয়াগুলোকে ভিত্তি করে কোথাও কোথাও এসব প্রতিষ্ঠানের আলোকে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্ম হয়। আজও বাংলাদেশে অনূন্য প্রায় ১০০,০০০ হাজার অনুরূপ মকতব-ফোরকানিয়া আপন ভঙ্গি ও গতিতে অসংখ্য কিশোর-

www.pathagar.com

কিশোরীকে দীনি ইলম দিয়ে যাচ্ছে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বর্তমানে ইসলামী শিক্ষার চেতনা ও উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে এদেশের মুসলমানরা মূলত আমরা এসব ঐতিহ্যবাহী মকতব ফোরকানিয়াগুলোর নিকট একান্তভাবে ঋণী।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ সরকারের নিকট হতে মকতবসমূহ কোন সাহায্য বা অনুকম্পা পায়নি। এসব প্রতিষ্ঠানকে সরকারি সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে হান্টার এডুকেশন কমিটি (১৮৮২) নিম্নশর্ত জুড়ে দিয়েছিল : "In other words all the indgeneonus whether high or low, be recognised and encouraged, if they serve any purpose of secular education whatsoever."

ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের উপর ফিরিঙ্গি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব ছিল না বললেই চলে। স্বাধীনভাবে আপন গতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ইসলামের যেশিক্ষা সংরক্ষণ করেছিলেন তা ছিল তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার কু-প্রভাব মুক্ত, আর এরই ফলে সম্প্রতি 'ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার' বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার হাতেখড়ি নিতে পেরেছে অনেক ধর্মভীরু আধুনিক ও প্রবীণ মুসলমান। নিম্নের পরিসংখ্যান থেকে আঁচ করা যায় যে ব্রিটিশ আমলে এসব মকতব ফোরকানিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান ছেলেমেয়েদের কি ব্যাপক খেদমতই না করেছে।

ছাত্র সংখ্যা

সন	মক্তব	অন্যান্য প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট
১৮৯১-৯২	৭০,৩৬০	২৩,২৮০	৯৩,৬৪০
১৮৯৬-৯৭	৫৯,৭৯০	১৯,৬৭৫	৭৯,৪৬৫
১৯০১-০২	৫৩০৯৯	২১,৭৩৬	৭৪,৮৩৫

[সূত্র : [Dr. A. K.M. Ayub Ali: History of Traditional Islamic Education, Ed. 1983, P.78]

ঘ. মাদ্রাসায় আধুনিক শিক্ষার অনুপ্রবেশ

বেনিয়া ইংরেজ প্রথম মকতব-ফোরকানিয়াগুলোর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু কালক্রমে যখন তারা টের পেল যে এসব মকতব ফোরকানিয়া মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বৈরীভাব সৃষ্টি করছে এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিদ্রোহী করে তুলছে; তখন তারা মুসলমানদেরকে বাগে আনার জন্যে ফন্দি আঁটতে শুরু করল। এরই প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ আমরা দেখতে পাই ওয়েরেন হেস্টিংসের ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা তথা প্রথম Mohamedan College-এর জন্ম। এ মাদ্রাসায় ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'দারসে

www.pathagar.com

নিজামী'র পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি চালু থাকে। পরে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে এই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি হতে ১. হাদীস ২. তাফসীর এবং ৩. উসূল আল-ফিক্‌হ বিষয়গুলোকে আবশ্যকীয় পাঠ্য হতে বাদ দিয়ে দিলে ফলে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অবশেষে নিম্নরূপ নেয়ঃ

১. প্রাকৃতিক দর্শন ২. ধর্মশাস্ত্র (Theology) ৩. আইন ৪. জ্যোতিষশাস্ত্র ৫. জ্যামিতি ৬. পাটিগণিত ৭. তর্কশাস্ত্র ৮. কাব্যালঙ্কার ৯. ব্যাকরণ।

এসব বিষয় পাঠ বা অধ্যয়নের কাল ছিল ৭ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। ফার্সী ভাষাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোর্ট কাছারী হতে বিদায় দিয়ে তদস্থলে ইংরেজি ভাষা চাপানোর ফলে একদিকে মুসলমানরা যেরূপ চাকুরী-বাকুরীচ্যুত হয়ে গেল, অমনি অন্যদিকে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতিপুষ্ট ফার্সী ভাষা চর্চায় বঞ্চিত হয়ে তারা ইসলামী জ্ঞানানুশীলন ও এর বাস্তব প্রয়োগে সমূহ বিপত্তির সম্মুখীন হল। এই যখন মুসলমানদের অবস্থা, তখন হিন্দুরা ইংরেজি ভাষা ও সভ্যতার অনুকূলে গা-ভাসিয়ে দিয়ে ব্রিটিশের অধীনে চাকরি-বাকরি, ব্যবসা বাণিজ্যে বিপুল প্রসার ও প্রতিপত্তি অর্জনে প্রায় অদ্বিতীয় হয়ে উঠল। কলিকাতা মাদ্রাসার মুসলমানদের ভবিষ্যৎ অবস্থা দাঁড়াল নিম্নরূপ ঃ

Under the circumstances the Madrasah graduates were reduced to the necessity of either becoming religious hovers, living mainly on the charity of others or becoming imams and muazzins attached to some mosques on starvation wages. [—Report of the Calcutta University Commission, 1917, 19 Vol, P. 173.]

মুসলমানদের এ নাজুক অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হলেন তদানীন্তন মুসলিম বিদগ্ধজন। এদের প্রচেষ্টায় বিশেষ করে উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ এবং বাংলাদেশের নওয়াব আব্দুল লতিফ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদেরকে আগ্রহশীল করার প্রয়াস চালান মনপ্রাণ দিয়ে। ফলে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ঃ

১. আরবি ২. ইংরেজি ৩. অ্যাংলো এরাবিক বিষয়ের ৩টি ডিপার্টমেন্ট কলিকাতা মাদ্রাসার শিক্ষা কোর্সে সংযুক্ত করা হয়। কিন্তু এ পদক্ষেপটিও ছিল অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহাম্মদের কথায় 'half hearted measure' বিশেষ। কারণ এ মাদ্রাসাটিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাভুক্ত না করায় সামাজিক ও বৈষয়িক মর্যাদার দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তুলনায় মাদ্রাসার

www.pathagar.com

ছাত্ররা ছিল অপাংক্তেয়। কলিকাতা মাদ্রাসাও পরবর্তীতে যেসব মাদ্রাসা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেসব মাদ্রাসার চিত্র ছিল মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির ভাষায় ঃ "Thus was organized round the Calcutta Madrasah...... a powerful system of Madrasah education, without modifi-cations to suit the requirements of this world and without connection with the fountain head of Islamic light and culture to serve the needs of the next world, unable to produce men fit to take part in the various activities of the public life of the country."

[— Replies to the Questionnaire drawn up by the Moslem Education Advisory Committee, 1931, part II, P. 588.]

এমনিভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করায় এর বিষময় ফলের পরিণাম হিসেবে 'ইসলামের সর্বাঙ্গীন' রূপ সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে দুটো ভ্রান্তি সৃষ্টি করে ঃ

১. ইসলাম নিছক ধর্ম, এতে রাজনীতির স্থান নেই।

২. ইসলাম একটি সর্বাঙ্গীন ধর্ম বা Complete code of so-colled religiousl ife.

অন্য কথায় খ্রিস্টান জগতের Church এবং Crown-এর মতো দুটি পৃথক সত্তার অনুপ্রবেশ এভাবে ঘটেছে সার্বজনীন সর্বাঙ্গীন জীবন ব্যবস্থা ইসলামের শিক্ষা ও দর্শনে।

ঙ. ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক লার্নিং

এই প্রসঙ্গে মাওলা বক্স কমিটির অবদানটুকুও লক্ষণীয়। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্যে তদানীন্তন বাংলার সরকার ১৯৩৮ সালে জনাব মাওলা বক্সের নেতৃত্বে গঠিত মাদ্রসা কমিটিকে (১৯৩৮-৪১) প্রয়োজনীয় সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেন। এ কমিটির সুপারিশমালার মধ্যে ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক লার্নিং প্রতিষ্ঠাকরণের প্রস্তাবটি অন্যতম। ইসলামী ইন্টারমিডিয়েট কলেজসহ নতুন ও পুরাতন মাদ্রাসার শিক্ষার বিষয়সমূহের সাথে আধুনিক বিষয়সমূহের সমন্বয়ে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমরানলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির দরুন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটিসহ ব্রিটিশ সরকারের যাবতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে

www.pathagar.com

ডঃ আইয়ুব আলীর কথায় ঃ 'If these institutions মাদ্রাসাগুলো could not cater to all the requirements of a modern society, they indeed prepared the ground for a great Islamic renaissance, resurgence of a powerful nation and emergence of an independent and sovereign Muslim state in the part of this world.

[—Dr. A. K.M. Ayyub Ali: History of Traditional Islamic Education in Bangladesh, Ed. May, 1983, P. 155.]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

ক. পটভূমি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ইতিহাস সাক্ষী, উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রবর্তনের পর শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমানরাই অগ্রসর ছিলেন। শুধু শিক্ষা-দীক্ষায়ই নয়, "প্রাচীন ও মধ্যযুগে পূর্ববঙ্গের খ্যাতি ছিল কুটির শিল্প ও কৃষি প্রধান অঞ্চল হিসেবে। এই অঞ্চলের মসলিন আর মসলার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। সেই সঙ্গে খ্যাতি ছিল এই অঞ্চলের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার। বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও ছিল শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। দ্বাদশ শতকের বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের অতীশ দীপঙ্কর সুবর্ণ দ্বীপ (শ্রীলংকা), নেপাল, তিব্বত, চীন দেশে শিক্ষার আলো বিতরণ করে কিংবদন্তী হয়ে আছেন। আর চর্তুদশ শতকে হযরত আবু তাইয়ামা (রহঃ) সোনারগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।" আইন-ই-আকবরীর বিবরণ অনুযায়ী সম্রাট আকবর এই মর্মে আইন প্রবর্তন করেছিলেন যে, "প্রত্যেক বালকের পক্ষে নীতি জ্ঞান, অঙ্ক, কৃষি, পরিমাপ বিদ্যা, শরীর তত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গার্হস্থ বিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন ও ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করা উচিত।" মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ক অগ্রসর ভূমিকা সম্পর্কে জেনারেল শ্লীম্যান নামক জনৈক ইংরেজ সাহেবের মন্তব্যটিও উল্লেখ্য "ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার যেরূপ ব্যাপক প্রসার হয়েছে, পৃথিবীর খুব কম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সেরূপ হয়েছে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুড়ি টাকা মাহিনার চাকরি করে, সে তার পুত্রের জন্য সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের সমান শিক্ষার ব্যবস্থা করে। আমাদের দেশের যুবকগণ ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি ও যে সকল বিষয়ে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষা করে, সেগুলো তারা আরবি ও ফারসি ভাষায় আয়ত্ত করে। অক্সফোর্ড থেকে যুবকগণ অদ্য যে জ্ঞান নিয়ে আসে, মুসলিম যুবকগণ সাত বছরে সেই জ্ঞান আহরণ করে মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিধান করে। সে অনর্গল সক্রেটিস,

www.pathagar.com

এরিস্টটল, প্লেটো, হিপোক্রেটিস ও ইবনে সিনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে। যখন দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ব্যতীত বাইরের কোন বিষয় নিয়ে আমাদেরকে কোন পদস্থ ও শিক্ষিত মুসলমানের সাথে আলোচনা করতে হয় তখন আমাদের শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় ব্যক্তিগণও নিজেদের জ্ঞানের অপ্রতুলতা উপলব্ধি করে।"

খ. বৃটিশ শাসকদের শিক্ষানীতি ও মুসলিম শিক্ষানীতি ঃ মুসলিম মনীষীদের প্রতিক্রিয়া

১৭৫৭ সালে ইংরেজরা যেহেতু মুসলমানদের হাত থেকেই ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলো তাই প্রথম থেকেই তারা মুসলমানদের শত্রু গণ্য করতে থাকে এবং মুসলমানরাও প্রত্যক্ষ ইংরেজ বিরোধিতার মধ্যে দীর্ঘ একশ' বছর লিপ্ত থাকে। সিত্তানার যুদ্ধ, শহীদ ব্রেলভীর সশস্ত্র প্রতিরোধ, শহীদ তিতুমীরের প্রতিরোধ সংগ্রাম, কৃষক বিদ্রোহ, ফকীর বিদ্রোহ ইত্যাদি কারণে মুসলমানরা কোন সময়ই ইংরেজদের বিশ্বাসভাজন হতে পারেনি। ফলে শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি ইত্যাদিতে তারা ক্রমশই পিছিয়ে পড়তে থাকেন।

যাহোক, লর্ড মেকলে ১৮৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে ইন্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক ও রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী উইলিয়াম অ্যাডামকে বাংলাদেশের শিক্ষা সম্পর্কে একটি সরেজমিন অনুসন্ধান চালানোর পর রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেন এবং একই সাথে কলিকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠ্যসূচি তুলে দিয়ে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার কথাও ঘোষণা করেন। এদিকে ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত এই তিন বছরে সরেজমিনে অনুসন্ধানের পর উইলিয়াম অ্যাডাম যে রিপোর্ট প্রদান করেন তাতে তিনি মন্তব্য করেন, "বাংলা বিদ্যালয়সমূহে সংস্কৃত উদ্ভূত বাংলা শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রায় শিক্ষকই হিন্দু ছিলেন। ছাত্রদেরকে প্রতিদিন সকালে হাঁটু গেড়ে নত মস্তকে সরস্বতী বন্দনা আবৃত্তি করতে হতো। তারা শুভঙ্করের গণিতের নিয়মগুলো সমস্বরে আবৃত্তি করে শিক্ষা করতো। পত্র-লিখন, মনসা-মঙ্গল প্রভৃতি তাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল।" শিক্ষানীতির জন্যে মেকলের কাছে জনশিক্ষা কমিটির সভাপতি হিসেবে নতুন শিক্ষানীতির প্রস্তাবের জন্য বড়লাটের দফতর থেকে চাপ সৃষ্টি করতে থাকলে তিনি ১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর প্রস্তাব পেস করেন এবং এ প্রস্তাব অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক একই সালের ৭ মার্চ সরকারের নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণানুযায়ী পরবর্তীতে (১৮৩৭ সালের ১ এপ্রিল) কয়েকশ' বছরব্যাপী প্রচলিত রাষ্ট্রভাষা ফার্সীর পরিবর্তন করে ইংরেজিকে 'রাজভাষা' করা হয়। এতে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম জনসমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

মুসলিম সমাজ কয়েকশ' বছরব্যাপী যে ভাষা নীতিতে শিক্ষা অর্জন করে আসছিলো, হঠাৎ এ পরিবর্তন একমাত্র তাদের স্বার্থের উপরই চরম আঘাত হানে। শিক্ষাক্ষেত্রে তারা পেছনে পড়েন। ফলে চাকরি-বাকরিসহ সমাজের সকল স্তরে তারা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হন। একজন লেখক এই প্রতিক্রিয়ার স্বরূপটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেনঃ ১. মুসলমানদের আহত গর্ব ও আত্মসম্মানবোধ; ২. ধর্ম থেকে বিচ্যুতির আশংকা; ৩. অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা; ৪. লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ; ৫. পাঠক্রমে ধর্মীয় শিক্ষার অনুপস্থিতি; ৬. পাঠক্রমে আরবি-ফারসির অনুপস্থিতি; ৭. পাঠক্রমে অনৈসলামি ও ইসলাম বিরোধী বিষয়ের প্রাধান্য এবং ৮. মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করার ব্যাপারে সরকারের অনীহা। এ প্রসঙ্গে নওয়াব আবদুল লতিফ, নওশের আলী খাঁ ইউসুফজী এবং 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত শেখ আবদুর রহিমের বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য।

নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৬৮ সালের ৩০ জানুয়ারি কলিকাতার টাউন হলে 'বেঙ্গল সাইন্স এসোসিয়েশন'- এর এক সভায় প্রদত্ত ভাষণে বলেন, "পুরানো হিন্দু কলেজ এবং মেডিকেল কলেজ যা অর্জন করেছে এবং আমার দেশবাসী হিন্দুদের মাঝে প্রতিষ্ঠান দুটোর জনপ্রিয়তা প্রশংসনীয়, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এই কলেজ দুটো শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ যাঁরা বিত্তশালী এবং অভিজাত, যাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এককভাবে দখল করেছেন। অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যক হিন্দুর মাঝে কলেজ দুটোর নাম অথবা গুরুত্ব নেই বললেই চলে। কিন্তু সমস্ত শ্রেণীর মুসলমানরা মাদ্রাসাকে তাঁদের নিজস্ব জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা যা চেয়েছেন, যেভাবে চেয়েছেন, মাদ্রাসা তাঁদের তাই দিয়েছে। তাঁদের ধর্মশাস্ত্র—যা হচ্ছে ইসলামের মহান ভিত্তি, সেখান থেকে প্রচারিত হচ্ছে।"

নওশের আলী খাঁ ইউসুফজী তাঁর 'বঙ্গীয় মুসলমান' গ্রন্থে (১৮৯০ সালে প্রকাশিত) আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ সম্পর্কে বলেন, "পাঁচশ বছরের পরাধীনতা হিন্দু জাতিকে পরকীয় ভাষা শিক্ষা করতে অভ্যস্ত করে তুলেছিল। মুসলমান রাজত্বের সময় হিন্দুগণ আরবি-ফারসি শিক্ষা করতে অভ্যস্ত থাকায় অনায়াসে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজি বুলি গ্রহণ আরম্ভ করলেন।"

১৩০৬ সালের ৮ পৌষ সংখ্যা 'মিহির ও সুধাকর'-এ প্রকাশিত "আমাদের নিম্ন শিক্ষার সংস্কার" শীর্ষক এক নিবন্ধে শেখ আবদুর রহিম লিখেন ঃ "যে স্থলে

www.pathagar.com

হিন্দুদেরকে বাঙলা ও ইংরেজি এ দু'টো মাত্র ভাষা শিক্ষা করার প্রয়োজন সে স্থলে বঙ্গীয় মুসলমানদেরকে পাঁচটি ভাষা শিক্ষা না করলে চলতে পারে না। ধর্মভাষা আরবি, তৎসহ ফার্সী ও উর্দূ আর রাজভাষা ইংরেজী তৎসহ মাতৃভাষা বাঙলা।"

"কাজেই মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু বালকদের সাথে সমভাবে অগ্রসর হতে পারে না"- বলেই তারা পশ্চাতে পড়ে থাকে। অপরদিকে, প্রতিবেশী সমাজ ক্রমশই তাদের ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠতে থাকে। এমতাবস্থায়, উনিশ শতকের শেষের দিকে ও বঙ্গভঙ্গের আগে ভাগে সচেতন বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিজেদের পশ্চাৎপদ অবস্থা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠতে দেখা যায়।

উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী এবং বাঙলা অঞ্চলের নওয়াব আবদুল লতিফ, স্যার সলিমুল্লাহ, ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, নওশের আলী খাঁ ইউসুফজী প্রমুখ প্রাজ্ঞ ও অগ্রসর ব্যক্তিরা মুসলমানদের জন্য ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সুপারিশ করেন এবং অগ্রসর চিন্তা-বিবেচনায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তন একমাত্র ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব। ইংরেজি শিক্ষা আন্দোলনের এ সকল অগ্রদূত, বিশেষত নওয়াব আবদুল লতিফ ইংরেজের তোষণ নীতিতে লিপ্ত বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপরীতে নিজেদেরকে পৃথক সত্তায় প্রকাশিত করার বাসনায় এ আন্দোলনের সূচনা করেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনুপ্রাণিত ও সচেতন করার লক্ষ্যে নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৩৫ সালে ফার্সী ভাষায়-"ইংরেজি ভাষায় ইউরোপীয় জ্ঞান- বিজ্ঞান শিক্ষার উপায়" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আহবান করেন। এই প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক বাঙালি-মুসলিম যুবক সাড়া প্রদান করায় ১৮৬৩ সালে তিনি 'মহামেডান লিটারারী সোসাইটি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ছিল ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম সংগঠন। এ সংগঠনের প্রভাবে পরবর্তীতে 'অনুবাদ সমিতি', 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন', 'মহামেডান সুহৃদ সংঘ', 'মুসলিম ডিবেটিং সোসাইটি', 'সোসাইটি ফর দি মিউচ্যাল ইম্প্রুভমেন্ট অব ইয়ংম্যান' প্রভৃতি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। নওয়াব আবদুল লতিফ মহসীন ফাণ্ডের টাকায় যাতে মুসলিম ছাত্ররা উপকৃত হন তার দাবি জানান এবং এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে ১৮৭৩ সালের ২৯ জুলাই সরকার এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

গ. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে হিন্দু মানসিকতা

এদিকে বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের আরও অনেক সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৮৬৭ সালে বাংলার গভর্নর স্যার উইলিয়াম এবং ১৮৮৭ সালে স্যার জন ক্যাম্পেবল বাংলার মতো বিশাল প্রদেশের শাসন পরিচালনার অসুবিধার কথা ব্যক্ত করে গভর্নর জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ১৮৯২ ও ১৮৯৬ সালে পৃথকভাবে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সুপারিশও পেশ করা হয়। সুপারিশে পূর্ববাংলা ও আসামের জেলাগুলোকে নিয়ে পৃথক প্রদেশ গঠনের কথা বলা হয়। ১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার পর এই বিষয়টি তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিষয়টির তথ্যানুসন্ধানের পর ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর প্রথমে তা জাসাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাথে সাথে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা একে স্বাগত জানান। কিন্তু এতে বাঙলার হিন্দু সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়, "বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে সরকার বাঙালি জাতিকে দুর্বল করে দিতে চায়।" বেঙলি পত্রিকা লিখে, "বঙ্গভঙ্গের দ্বারা বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করে শাসন করার হীন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।" কবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও এর বিরোধিতায় কবিতা লেখেন এবং রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম শ্লোগানে হিন্দু যুবকরা উন্মত্ত হয়ে ওঠে এবং এ বিরোধিতা এক পর্যায়ে তথাকথিত সশস্ত্র স্বদেশী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। তৎকালীন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবটি স্বাগত জানান এবং ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড কার্জনের ঢাকা সফরকালে তাঁর সংগে দীর্ঘ মত বিনিময়ও করেন। ফলে"পূর্ববঙ্গের মুসলমান ও দরিদ্র কৃষক সমাজ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে নতুন প্রদেশ গঠন ও ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ায়। কিন্তু শিগগরিই সে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। কলকাতা-কেন্দ্রিক বাবু-বণিক সম্প্রদায় ও একশ্রেণীর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি বঙ্গভঙ্গের প্রবল বিরোধিতা করে।" মাওলানা আবুল কালাম আজাদের ভাষায় ঃ

In those days (1905-06) revolutionary groups were recruited exclusively from the Hindu middle class. In fact all revolutionary groups were then anti-Muslim."

সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা, হিন্দু জনমতের তীব্রতা ও কূটনৈতিক চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার নতিস্বীকার করে এবং ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরীর ভারত আগমন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সম্রাট বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। আর. সি. মজুমদার তাঁর 'হিস্টরি

www.pathagar.com

অব ফ্রিডম মুভমেন্ট' গ্রন্থে একে 'রাজার বরদান' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।" অপরদিকে, "পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা আবার হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় এবং সেই সংগে হয় বিক্ষুব্ধ।"

ইতোমধ্যে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের শেষে ৩০ ডিসেম্বর নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে সর্বভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং ঐ সম্মেলনেই মুসলিম নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম এ অঞ্চলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করে এ মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে "আলীগড় থেকে শিক্ষিত পূর্ববাংলার মুসলমান যুব নেতৃবৃন্দ ঢাকায় আলীগড়ের চেয়েও শ্রেষ্ঠ একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবেন।"

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের শেষে ৩০ ডিসেম্বর নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ সম্মেলনেই মুসলিম নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম এ অঞ্চলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করে।

দু'দিন পর ৩১ জানুয়ারি লর্ড হার্ডিঞ্জ নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্, শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারেও মিলিত হন। সাক্ষাৎকারকালে নেতৃবৃন্দ তাঁর কাছে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট দাবি পেশ করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ নীতিগতভাবে এ দাবির সাথে একমত হন এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে এক সরকারি ইশতেহার প্রকাশিত হয়। ফলে মুসলিম বিদ্বেষী-হিন্দুসম্প্রদায়ের জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার মন-মানসিকতার কুটিল আচরণ অনবগুণ্ঠিত হয়ে পড়ে।

ঘ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবে হিন্দু সমাজের বিরোধিতা

ইশতেহার প্রকাশের সাথে সাথে কলকাতার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অযথা ফেটে পড়েন। ১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি স্যার রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে কলকাতার কয়েকজন বিখ্যাত হিন্দু নেতা লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে এই বলে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন যে, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোনই প্রয়োজন নেই। এ অঞ্চলের জনসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোন উপকার পাবেন না। কারণ, তাদরে অধিকাংশই দরিদ্র কৃষক। তাছাড়াও এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাহিত্যিক-

www.pathagar.com

সাংবাদিক -রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী মহল এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন এবং এ সকল সভায় এই বলে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেন যে, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাভাষা বিভক্ত হয়ে পড়বে, বাংলাসাহিত্য হবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে।'

কলকাতার বিডন স্কোয়ারে আয়োজিত এ ধরণের এক প্রতিবাদ সভায় সুরেন্দ্রনাথ বলেন, "ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা সাহিত্য বিভক্ত হবে, আর সাহিত্য এক না হলে একতার আশা করা যায় না; এরূপ ব্যবস্থার ফলে বাঙালী জাতির অবস্থা পূর্বেকার বঙ্গবিভাগ অপেক্ষা বেশি শোচনীয় ও ক্ষতিকর হবে; এতে বাঙালি জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে।" একই সভায় বিপিন চন্দ্র পাল বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অশিক্ষিত ও কৃষকবহুল পূর্ববঙ্গের শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপত থাকতে হবে; পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা, নীতি ও মেধার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে না।'

এ সকল বাদ-প্রতিবাদ তথা প্রতিবাদ সভার প্রস্তাবাবলি ভারত সরকার, ভারত সচিব ও প্রাদেশিক সরকারের নিকট প্রেরণ করে তারা সরকারকেও প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সরকার বঙ্গভঙ্গ রদজনিত ক্ষতিপূরণ হিসেবে এবং পূর্ব বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষোভ ও উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যে সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং ১৯১২ সালের ৪ এপ্রিল তারিখে চূড়ান্তভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

ঙ. নাথন কমিটি

প্রাদেশিক সরকার ১৯১২ সালের ২৭ এপ্রিল রিচার্ড নাথনকে সভাপতি করে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করেন। সভাপতি রিচার্ড নাথন ছাড়াও কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে ডি.এস. ফ্রেজার এবং সদস্য হিসেবে যথাক্রমে জি. ডব্লিউ. কার্টলার, ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব সিরাজুল ইসলাম, আনন্দ চন্দ্র রায়, মোহাম্মদ আলী, এইচ, আর, জেম্‌স, ডব্লিউ. এ. জে. আর্চবোল্ড, সতীশ চন্দ্র আচার্য, ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায়, সি. ডব্লিউ. পিকে ও শামসুল উলামা আবু নছর মোহাম্মদ ওয়াহেদকে নিয়োগ করা হয়। নাথন কমিটি যথাসময়ে চব্বিশ অধ্যায়ে বিস্তৃত এক রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের খুঁটিনাটি সর্বদিক সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে কমিটি প্রস্তাব করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিকভাবে ইসলামী শিক্ষা, কলা, বিজ্ঞান, আইন, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগ খোলা হোক। রিপোর্টে আরও সুপারিশ করা হয় যে,

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জনশিক্ষা পরিচালক স্বয়ং এর সরকারি পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটি তাদের রিপোর্টে প্রথম বছরের জন্য ১২ লাখ ৯৮ হাজার ৯শ' ১৬ টাকা ব্যয়-বরাদ্দেরও সুপারিশ করেন।

কমিটির সদস্য সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী ও আবু নছর মোহাম্মদ ওয়াহেদ রিপোর্টে মুসলিম ছাত্রদের জন্য প্রস্তাবিত বৃত্তি অপর্যাপ্ত বলে উল্লেখ করে মুসলমান ছাত্রদের বিনা বেতনে অধ্যয়ন ও বৃত্তির সুযোগ বৃদ্ধি করার সুপারিশ করেন। অন্যদিকে, কমিটির অন্য সদস্য রাসবিহারী ঘোষ তাদের এ সুপারিশের সাথে দ্বিমত পোষণ করে এর বিরোধিতা করেন।

এদিকে ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধের অজুহাতে সরকার এ প্রস্তাব স্থগিত ঘোষণা করেন। বিশ্বযুদ্ধ শেষেও সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণে তেমন কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে পূর্ববাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ফলে তাঁরা এ ব্যাপারে ক্রমাগত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। সরকারের পক্ষ থেকে এ প্রসঙ্গে ব্যয় বাহুল্যের অজুহাত খাড়া করে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি ব্যয়বহুল প্রকল্প অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

এই ব্যাপারে শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক ১৯১৬ সালের ৩ এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় আইন পরিষদে যে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন, তা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি তাঁর ভাষণে প্রশ্ন উত্থাপন করেন "যখন ব্যয় বহুলতার অজুহাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, তখন কি করে নতুন প্রদেশ বিহার এবং উড়িষ্যার পাটনায় নতুন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হতে পারলো? সেটা কি ব্যয়বহুল নয়?" এরপরও সরকারের মনোভাবের কোন পরিবর্তন না দেখে পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের পরামর্শ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে বিষয়টি পুনরায় পরিষদে উত্থাপন করে বলেন, 'অনতিবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হোক।'

মুসলিম নেতৃবৃন্দের ক্রমাগত চাপের মুখে অবশেষে ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য মাইকেল্ সেডলারকে সভাপতি করে যে কমিশন গঠন করেন; সরকার তার উপরই প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও গঠনতন্ত্র প্রণয়নের অতিরিক্ত

www.pathagar.com

দায়িত্ব অর্পণ করেন, এবং ১৯১৭ সালের ২৬ নভেম্বর তারিখে সরকারের পক্ষ থেকে এই বলে আশ্বাসও দেয়া হয় যে, কমিশনের (সেডলার কমিশন) সুপারিশ পাওয়ার পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হবে।

চ. সেডলার কমিশনের সুপারিশ

সরকার কর্তৃক সেডলার কমিশন গঠন ও কমিশনের আশ্বাস প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে আবারও হিন্দু সমাজের তরফ থেকে প্রতিবাদ উত্থিত হতে থাকে। তারা এ সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে 'প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'কে বক্কা বিশ্ববিদ্যালয় বলে ব্যঙ্গ করতে থাকেন। তারা এই বলে আরও যুক্তি উত্থাপন করেন যে, "এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে মুসলিম ও ইসলামী বিষয়াবলি প্রাধান্য লাভ করবে।" এই প্রসংগে তারা এ অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, 'ঢাকায় একান্তই যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে সেটাকে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করা হোক।'

এমতাবস্থায় সেডলার কমিশন একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে জনমত আহবান করেন। এ জনমত জরিপের উত্তরে নওয়াব আবদুল লতিফের পুত্র এম. আবদুল আলী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, "The jurisdiction of Dhaka University should be extended as much as possible". তিনি আরও বলেন, 'এ ধরনের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এতদ্দেশীয় দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণের জন্য কোনক্রমেই উপযুক্ত হতে পারে না।' তিনি তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, 'আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় বিলাসবহুল ও ব্যয়বহুল হতে বাধ্য। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থেকে যাবে।' তিনি তাঁর মতামতে এ-ও ব্যক্ত করেন যে, 'আমার মতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে এফিলিয়েটিং এবং পূর্ববাংলা ও আসামের কলেজসমূহ এর অধিভুক্ত থাকবে।'

ছ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

জনমত জরিপের পর সেডলার কমিশন সরকারের কাছে একই সাথে আবাসিক ও অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে বলা হয়, 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে চাপ কমানোর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আবশ্যক।'

কমিশনের এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ১৯১৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল উত্থাপন করা হয়। ১৯২০ সালে ব্যবস্থাপক সভায় বিলটি অনুমোদন লাভ করে। ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ তা

www.pathagar.com

গভর্নর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্যার ফিলিপ জে. হার্টগ-কে প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত করে স্বল্পকালের জন্য গঠিত পূর্ববাংলা-আসাম প্রাদেশিক সরকারের পরিত্যক্ত দালানসমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ করা হয়।

প্রাদেশিক সরকারের এ সকল পরিত্যক্ত দালানসমূহের মধ্যে ছিল পুরানো সচিবালয়, ঢাকা কলেজ ভবন, গভর্ণমেন্ট হাউজ, প্রভৃতি। কিন্তু এ সকল পরিত্যক্ত দালান একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অপ্রতুল হবে এই বিবেচনায় ইতিপূর্বেই ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পর্যাপ্ত জমি দান করে যান। তারপরও ধনবাড়ীর নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর জমিদারীর একাংশ রেহান দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নগদ অর্থ সংগ্রহ করেন।

এভাবে ১৯২১ সালের ১ জুলাই তারিখে ৮শ'৭৭ জন ছাত্র, ৬০ জন শিক্ষক, ৩টি অনুষদ ও ১২টি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শুভ যাত্রা আরম্ভ হয়।

জ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ প্রশাসনিক কাঠামো

১৯২০ সালে অনুমোদিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট' অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সাংগঠনিক রূপরেখা প্রণয়ন করা হয় তা ছিল ব্রিটেনের প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুরূপ। সাংগঠনিক রূপরেখায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিচালনা ব্যবস্থাকে কোর্ট প্রশাসনিক পরিষদ, শিক্ষা বিষয়ক পরিষদ ও অনুষদসমূহ -এই কয়টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়। পদাধিকার বলে আগত ও মনোনীত সদস্যদের সমন্বয়ে আইন প্রণয়নকারী সংস্থা 'কোর্ট' গঠিত হয়। ১৯২১ সালে ১৫৮ জন সদস্য সমন্বয়ে 'কোর্ট' (বা সিনেট) গঠন করা হয়। এর মধ্যে ৪০ জন সদস্য ছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঃ সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব খাজা মোহাম্মদ ইউছুফ জান, নওয়াব খাজা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, নওয়াবজাদা খাজা মোহাম্মদ আফজল, শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ। ১৯২২ সালের ১৭ আগস্ট তারিখে কোর্টের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় পুরনো গভর্ণমেন্ট হাউজে। এ সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ'র অবদান স্মরণ করে বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংস্থা প্রশাসনিক পরিষদ ভাইস চ্যান্সেলর, কোষাধ্যক্ষ, বিভাগীয় কমিশনার, হলসমূহের প্রভোস্ট ও একজন ওয়ার্ডেনকে নিয়ে গঠিত হয়। 'শিক্ষা বিষয়ক পরিষদ'–এর উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত

www.pathagar.com

যাবতীয় বিষয় বর্তানো হয়। ভাইস চ্যান্সেলর অনুষদসমূহের ডীন, গ্রন্থাগারিক, বিভাগীয় প্রধানগণ ও হলসমূহের প্রভোস্টগণ এ পরিষদের অন্তর্ভূক্ত হন। বিভাগীয় প্রধানদের মধ্য থেকে একজন করে অনুষদসমূহের ডীন মনোনীত করে 'অনুষদসমূহ' গঠিত হয়। তাছাড়াও সরকারকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে একটি উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করা হয়। এই কমিটিতে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন ঃ নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদা ও নওয়াবজাদা খাজা মোহাম্মদ আফজল। একই সংগে খান বাহাদুর নাজির উদ্দীন আহমদকে প্রথম রেজিস্ট্রার নিযুক্ত করা হয়। ১৯৬১ সালে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স' জারী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হতো। সূচনাপর্বের ৩টি অনুষদের অধীনে ইসলামী শিক্ষা ও আরবি, বাংলা ও সংস্কৃত, ইংরেজি, দর্শন, ইতিহাস, বাণিজ্য, অর্থনীতি ও রাস্ট্রবিজ্ঞান, উর্দু ও ফার্সী, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, গণিত এবং আইন–এই ১২ টি বিষয় নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। অধিকাংশ বিভাগের ক্লাসই বর্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভবনে নেওয়া হতো।

ঝ. ছাত্র-শিক্ষক ও আবাসিক হল সমাচার

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিভার বিকাশ ও তাদের সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলি সমাধানকল্পে ১৯২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে 'ঢাকা ইউনিভারসিটি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন' গঠিত হয়। প্রত্যেক হল থেকে ৩ জন করে ছাত্র প্রতিনিধি, ১ জন করে শিক্ষক প্রতিনিধি ও ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ১ জন শিক্ষক সমন্বয়ে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন গঠিত হতো।

১৯২৯ সালে ছাত্রদের আবাসিক সমস্যার সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম হল'। ১৯৩২ সালে ইন্দোসারসিনিক স্থাপত্য রীতিতে স্বতন্ত্র দ্বিতল ভবন নির্মিত হলে এ হলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল।'

১৯৪০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান বিভাগ, সংস্কৃত থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ– এই তিনটি নতুন বিভাগ চালু করা হয়। একই বছরে নির্মাণ করা হয় 'ফজলুল হক মুসলিম হল'।

১৯৪৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও কৃষি—এই ৩টি নতুন অনুষদ চালু করে অনুষদের সংখ্যা ৬টিতে উন্নীত করা হয়। একই বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ। এভাবে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট

www.pathagar.com

উপমহাদেশের মুসলমানদের পৃথক জাতিসত্তা নির্মাণের দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অগ্রগতি সাধিত হয় এবং ১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত নব জাগৃতিক দেশের এই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত যুবসমাজ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

১৯৪৫ সালে মাত্র ৩ জন ছাত্রী নিয়ে 'চামেরি হাউজ' -এ যে ছাত্রী হোস্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ১৯৪৭ সালে 'উইমেন্স হোস্টেল' নামকরণ করে তা সম্প্রসারিত করা হয় এবং ১৯৫৬ সালে মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রনেত্রী বেগম রোকেয়ার নামে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুর দিকে প্রথম দুই শিক্ষাবর্ষে কোন ছাত্রী ভর্তি হয়নি। ১৯২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথম ৪ জন ছাত্রী ভর্তি হন। এঁরা ছিলেন লীলা রায়, পতিকা রায়, অরুবালা সেনগুপ্ত ও শান্তিলতা নাগ। এঁরা ৪ জনই বাংলা ও সংস্কৃতি বিভাগে এম, এ ক্লাসে ভর্তি হন।

প্রথম মুসলিম ছাত্রী ফজিলাতুন্নেসা ভর্তি হন ১৯২৫ সালে। তাঁর বিষয় ছিল গণিত। ১৯৩৮ সালে বাংলা এম, এ ক্লাসে ভর্তি হন দ্বিতীয় মুসলিম ছাত্রী খোদেজা খাতুন। তৃতীয় মুসলিম ছাত্রী আজিজুন্নেসা ভর্তি হন ১৯৪০-৪১ শিক্ষাবর্ষে বাংলা বিভাগে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মহিলা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন রুণা গুপ্ত। ১৯৩৫ সালে ইতিহাস বিভাগের জুনিয়র লেকচারার হিসেবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

বর্তমান কলাভবন নির্মিত হয় ১৯৬৫ সালে। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৬২ সালে।

গত ৭৭ বছর যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি বেড়েছে, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২০ হাজারেরও উপরে। শিক্ষক প্রায় হাজার দেড়েক। আবাসিক হল ১৩টি, আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস ১টি, বিভাগ ৪০টি, ইন্সটিটিউট ৭টি। ক্যাম্পাসের আয়তন আড়াই শতাধিক একর। ৫ লাখেরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির পুস্তকের সংখ্যা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এর অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ছিল দেড় শতাধিক।

এভাবে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ আমলের দীর্ঘ ৭৭ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি শিক্ষা সম্প্রসারণ, সাহিত্য-সংস্কৃতি উজ্জীবন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করে জাতীয় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে। 'প্রাচ্যের

www.pathagar.com

অক্সফোর্ড' হিসেবে একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বজোড়া যে খ্যাতি অর্জন করেছিলো আজ সর্বাংশে তা অক্ষুণ্ন আছে কি না, সেটি প্রশ্নসাপেক্ষ হলেও; দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস যে আমাদের জাতীয় ইতিহাসেরই হৃদপিন্ডাংশ সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

[দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য সম্পাদক জনাব সাজ্জাদ হোসাইন খান সম্পাদিত ত্রৈমাসিক "কলম" জনাব এ প্রকাশিত মুকুল চৌধুরী এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক প্রবন্ধের উদ্ধৃতির সৌজন্যে]

ঞ. বঙ্গীয় মুসলমানদের শিক্ষা পুনর্গঠনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

গোটা বাংলাদেশে বঙ্গীয় মুসলমানদের শিক্ষার পুনর্গঠন আন্দোলনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ও ক্রমবিকাশের ধারাও বিশেষ ভাবে বিবেচনার দাবি রাখে।

স্মর্তব্য, ১৯১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে পরিকল্পনা গৃহীত হয়ে ১৯২১ এর ১ জুলাই এর প্রকৃত শিক্ষাক্রম শুরু হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল কারণ তিনটি ঃ

১. শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রবল আগ্রহ
২. আবাসিক ব্যবস্থাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ রচনার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগ
৩. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধিষ্ণু ছাত্রদের হ্রাসকরণ এবং পূর্ব বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্তকরণ।

তাছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় এ বিশ্ববিদ্যালয়টি হিন্দুদের প্রায় একচেটিয়া সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। তাদের অনুগ্রহ ও কৃপার নিয়ন্ত্রণে সীমিত ছিল মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা লাভের ভবিষ্যত। ফলে কলিকাতা বিশ্বদ্যিালয় ও এর আওতাধীন কলেজগুলোতে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। তদানীন্তন ডি.পি আই ডব্লিউ. ডব্লিউ. হর্নেলের ১৯১৩ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে এ চিত্রটির সাক্ষাত পাওয়া যায়। এ রিপোর্টে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে বলা হয় ঃ

১. আরবি ও ফার্সীভাষায় শিক্ষাদানের উপায়-উপকরণের অতি অপ্রতুলতা
২. কলেজ-ভর্তির ক্ষেত্রে হয়রানি ও কঠোরতা
৩. আবাসিক ব্যবস্থা না থাকা
৪. মুসলিম ধর্ম ও ঐতিহ্য বিরোধী পাঠ্যসূচি
৫. উত্তরপত্রে ছাত্র/ছাত্রীদের নাম লিখন এবং
৬. সংস্কৃত বহুল বাংলার ব্যবহার

www.pathagar.com

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে,

ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত তদানীন্তন হিন্দু মহারথীদের কলিজায় শেলের মত বেঁধে। এরা পত্র-পত্রিকা ও বাক বিতণ্ডার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানায়। এদের মুখপত্র হিসেবে ডঃ রাম বিহারী ঘোষ ভাইসরয়কে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে ঃ

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরোক্ষ অর্থ হচ্ছে "An internal partition of Bengal."
২. এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিরর্থক; কারণ পূর্ব বঙ্গে বিপুল সংখ্যক মুসলমান কৃষক বিধায় এ প্রতিষ্ঠান তাদের কোন উপকারে আসছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটিকে সে সময়কার হিন্দু সুধীজন ঘৃণ্য ভরে আখ্যায়িত করেছিলেন 'বক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' পদবাচ্য বিভূষণেও। এদের চাপ ও প্রতাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবয়ব ও প্রকৃতিটি নিম্নরূপ পরিগ্রহ করেছিল ঃ

The constitution of Dhaka University is so predominantly Hindu that the Muslims find it difficult, nay impossible to hold their own against the Hindus. Cases have occured where with equal qualifications, a Hindu candidate has been choosen in preference to a Muslim.

[Muslim Education Advisory Committee. P. 368.]

ট. স্যার ফিলিপ হার্টসের অবদান

এতদসত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালক্রমে মুসলিম ছাত্রদের সুপ্ত ইসলামী প্রেরণা ও উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত ও প্রতিষ্ঠা করার প্রধান অনুপ্রেরণার আধার।

পূর্বেই বলা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ১৯২১ সালের পহেলা জুলাই। এর একমাস পর অর্থাৎ আগস্টে ৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এর শিক্ষাক্রম চালু হয়। তখন স্যার ফিলিপ হার্টগ ছিলেন এর প্রথম ভাইস চ্যান্সেলার। তিনি ১৯২০ সালে স্ত্রী ও দুসন্তান নিয়ে ভারতে আসেন। এসেই ঢাকা কলেজকে সংযুক্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত করেন। তখন ঢাকা হল, মুসলিম হল ও জগন্নাথ হল ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস। ঢাকার বর্তমান মেডিকেল কলেজের একতলায় ক্লাস শুরু হয়। এর দোতলায় আবাসিক হিসেবে ছিল মুসলিম হলের ছাত্ররা। এই সময়টিতে যখন অসহযোগ আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করে তখন মিঃ হার্টগ এই সংকট কালে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্যটি রাখেন তা একদিকে যেরূপ তাঁর শিক্ষানুরাগী হৃদয়ের পরিচয় পরিস্ফুট করে; অপর দিকে ইংরেজ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের ভাগ্যোন্নয়নে শিক্ষান্নোতির প্রতি তাঁর আন্তরিক আর্তির পরম উৎকর্ষতা–ও উন্মোচিত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন ঃ

www.pathagar.com

"I won't advise you to do anything against your own conscience. If you really think that you can help your county and its political ideals better by leaving the college and university being idle than by counting your studies, you should do so. **But dont put your conscience in the keeping of others.**

—আমি আপনাদেরকে আপনাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার উপদেশ দিচ্ছিনা। যদি আপনারা সত্যিই এটা মনে করেন যে লেখাপড়ায় দিন না কাটিয়ে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে আপনাদের দেশের অধিকতর মঙ্গল করতে পারবেন এবং এর রাজনৈতিক আদর্শকে উন্নততর করতে পারবেন, তাহলে আপনাদের তা-ই করা উচিত। কিন্তু নিজেদের বিবেককে অন্যের নিকট বন্ধক রাখবেন না।

হার্টগের এই বক্তব্য ব্রিটিশ রাজনীতিমুক্ত, স্বদেশী রাজনীতি থেকেও পরিমুক্ত। তৎসঙ্গে ছাত্রদের নিকট তাঁর এই অভিব্যক্তি কতইনা মধুর এবং পবিত্রতা বিধৃত। এই দৃষ্টিতে আমাদের এই অতীত ঐতিহ্য কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে! আরো লক্ষণীয়, আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯২১ এর আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন লর্ড লোনাডসে। এই সময় থেকেই ভাইস চ্যান্সেলর হার্টগ ছাত্র- শিক্ষকদের মধ্যে অনাবিল মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার উৎসাহ যোগান। তিনি প্রথম ১৮০০ গ্রন্থ ও পরে তা ৪০ হাজারে বৃদ্ধি করে পাঠাগারের মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকের সুহৃদ-বন্ধন রচনা করেন। এই বন্ধন আরো সুদৃঢ় ও সহজাত করার জন্য তিনি বলেন,

"I think it is equally essential for the Indian educated communities that they should cultivate their own vernaculars and a knowledge of their own history, art and civilisation to a far greater extent than they have done hitherto.

[Dhaka university 70 years Ago, The Bangladesh Observer, July 1, 1991 দ্রষ্টব্য]

–আমি মনে করি, ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এটি সমভাবে অত্যাবশক যে তাদের উচিত নিজেদের মাতৃভাষা চর্চা করা এবং এপর্যন্ত তারা যেটুকু করেছে তার চেয়েও বেশি তাদের স্বীয় ইতিহাস, শিল্পকলা এবং সভ্যতার সুদূর প্রসার ঘটানোটা।

তিনি ছাত্রদের লেখাপড়া সার্থকভাবে ফলপ্রসূ করার জন্যে

১. ছাত্রদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

www.pathagar.com

২. টিউটরিয়্যাল পদ্ধতি চালু করেন।

৩. অসময়ে তাঁর বাসা-বারান্দায় কোন ছাত্র গেলে তার সাথে সাক্ষাত দানে কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"A university degree should be regarded as a passport to practical life. But passports lose their validity after a certain period and need renewal এবং এই renewal প্রয়োজন achievement বা কৃতিত্ব অর্জনের জন্যে। দেশ-সমাজ ও জনগণের কল্যাণে এই কৃতিত্ব অর্জিত হয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এই দৃষ্টিতে বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাটিফিকেটধারী' ছাত্র সমাজের অধিকাংশকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী খাটিয়ে গণ-বিচ্ছিন্ন আরাম-আয়েসী জীবন যাপনে বুঁদ হতে দেখা যায়। Art for art and luxury's sake বিশিষ্ট পদ ও ক্ষমতা বাগিয়ে রাখতে তারা থাকেন প্রায়শ ব্যাপৃত। তাদের এই নিবিড় শান্তি, সমৃদ্ধি ও সম্ভোগ যাতে বিনষ্ট না হয় সেদিকটুকুর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে তারা সৌজন্যমূলক সংযোগ রাখেন দেশের বিপুল দারিদ্র প্রপীড়িত জনগণের সাথে। এর মূল কারণ; পুনরুল্লেখিত ড. ফারুকীর কথায় বলতে হয়, "বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নামে আমাদেরকে যে শিক্ষা বর্তমানে দেয়া হচ্ছে তা "আমেরিকানাইজড" অর্থাৎ Pragmatic শিক্ষা-সভ্যতা ও দর্শন। ফলে আমরা আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে তথাকথিত বিজ্ঞ জনশক্তি, বিপুল শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগে আমাদেরকে আমাদেরই দেশে বিদেশী বানানো হচ্ছে "স্বদেশের অমঙ্গল করে বিদেশীদের মঙ্গল ও গুণকীর্তণ করতে।"

ঠ. স্বায়ত্তশাসন ঃ বিশ্লেষণ ও পরিণতি প্রসঙ্গ

এই অংশটুকুর অবতারণার সৃষ্টির মূল প্রেরণা। "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধ ও পত্রিকা" সমূহে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনাবলি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্য ও বাস্তবচিত্র পরিবেশনে এই প্রকৃতির পত্রিকার বিশ্বস্ততা অবজ্ঞেয় নয়। এই ধারনায় এই প্রচেষ্টা। প্রথমেই শ্রদ্ধেয় রঙ্গলাল সেনের "বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ব শাসন ও প্রতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি" শীর্ষক প্রবন্ধটি। এতে দেখা যায় তিনি "বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির" উৎসকে উপস্থাপন করেছেন সমাজতান্ত্রিক দর্শন ও আঙ্গিকে। তাঁর মতে "মানব সভ্যতার প্রথম শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে দাস প্রথার পরিমণ্ডলে প্রাচীন গ্রিক ও রোমে আনুষ্ঠানিক ভাবে উচ্চ শিক্ষার পত্তন ঘটে।" এ প্রসংগে তিনি সক্রেটিস, প্লেটোদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত দেন। এরপর মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয় গুলো

www.pathagar.com

ছিল "মূলত" যাজকের কর্তৃত্বাধীন। তখন পাঠ্যসূচি ছিল প্রধানত ধর্ম-ভিত্তিক। পরে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ও ধনতত্ত্বের প্রসার ঘটলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধর্মযাজকদের কর্তৃত্ব থেকে ধর্ম-নিরপেক্ষবাদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এবং সেসময়েই"আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়।" University এর মৌলিক অর্থ Community বা সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী। এই অর্থে কম্যুনিটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে Universal Community বুঝানো হয়েছে। ঠিক এরই আদলে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জনাব রঙ্গলাল সেনের কথায় "সর্ব প্রকার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।" প্রশ্ন হচ্ছে ১. "সংকীর্ণতা" বলতে এর Denotoation এবং Conotation কি? ২. 'মুক্ত' বলতে এর পরিসীমা-ই বা কি? ৩. এ দুটি প্রশ্নের সার্বিক উত্তর দাতা কে বা কারা? ৪. উত্তর দাতা হিসাবে তার গ্রহণযোগ্যতা, কল্যাণকারিতা ও দোষ-মুক্তি তথা নিখুঁততা কে নির্ধারণ করবে, অথবা স্বাভাবিক ভাবেই কি তা নির্ধারিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, বা যাবে?

বস্তুত এসব প্রশ্নের সর্বগ্রাহ্য উত্তর দেয়ার ক্ষমতা মরণশীল মানুষের নেই। কারণ সে প্রকৃতিগত ভাবেই রোগ-শোক, মিথ্যা, ভুল, বিস্মৃতি, আবেগ-ভাবাবেগ, তন্দ্রা-নিদ্রার এবং সবশেষে আমোঘ মৃত্যুর শিকার। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় যদিও বিশ্বজনীন চিন্তা ও দর্শনের সৃষ্টি ও লালন বুঝায়, এর উদ্ভাবক মানুষ খুঁতবিশিষ্ট হওয়ায় "বিশ্ববিদ্যালয়ের" সার্বজনীনতার দাবি বা আকাঙক্ষা Natural বা স্বাভাবিক নয়; বরং এটা খুঁত বিশিষ্ট আকাঙক্ষা, স্বপ্ন ও বাক্য-বিলাসিতার শৈল্পিক চর্চা হিসাবে মনোহর হতে পারে মাত্র। তাই দেখা যায় বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস করা ও পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা সার্বজনীন এক 'ইজম' এর উদ্ভাবক, পূজারী ও প্রবক্তা না হয়ে বিভিন্ন 'ইজম', তাও আবার কখনো Contradic-tory, কখনো বা Contrary,এর জন্ম দিচ্ছে, এবং এরই পরিণামে গোটা বিশ্বে উচ্চ শিক্ষিতজনেরাই আদর্শিক দ্বন্দ্বের ময়দান রচনা করে যাচ্ছে, যা কখনো কখনো সসস্ত্র সংঘর্ষে রূপ নিয়ে লুণ্ঠন, হত্যাযজ্ঞ, অশ্লীলতা, ধর্ষণ ইত্যাদির হিংস্র তরঙ্গমালা রচনা করতে বিবেকের দংশন বোধ করছে না। সমাজতন্ত্র বনাম ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্র–ইত্যাদি ধারণা ও দর্শনের জননী বিশ্ববিদ্যালয়ই এবং এর নানা ইজম পড়ানোর জন্যে তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিত রয়েছেন যাদের অনেকেই প্রকৃতিগতভাবে স্বীয় রক্তে, মাটিতে, লেখাপড়ায় প্রতিপলিত হয়েও সার্বজনীনতার চরিত্র প্রদর্শন করতে অক্ষম ও অপারগ। কারণ ড. ফারুকের মন্তব্যানুসরণে বলতে হয়ঃ University education is the education deduced and framed by some ones

www.pathagar.com

to teach us their art, attitude and culture in the guise of teaching University Education. That means a set of mental and intellectual slaves has been being imposed upon us in subtle teaching art and architecture.

ইতিহাসের দর্পনে দেখা যায়,– ধর্মযাজকদের নিয়ন্ত্রণে থেকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আনার জন্যে ১৮০৮ সালে নেপোলিয়ন এক নতুন সাংগঠনিক কাঠামো ঘোষণা করেন। ফলে ধর্ম প্রধান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ধর্ম-বিবর্জিত হয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ আকার ধারণ করে; এবং এর প্রভাব গোটা ইউরোপেও প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ধর্ম বিবর্জিত Universal curriuculum (?) তবুও Universal education হওয়ায় প্রকৃত অর্থে University এর বিকৃত ও বিকলাঙ্গ রূপ সৃষ্টি হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। ঠিক এমনি ভাবে ভারতেও William Bentink এর আদেশটি ঃ the promotion of (শুধু) English literature and science among the natives— মোটেই universal নয়, যদিও এ আদেশ সর্বোতভাবে নিন্দনীয় নয়, নান্দিক ও পুরোপুরি নয় এই অর্থে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়া তদানীন্তন ভারতের জন্য তা সামগ্রিকভাবে অকল্যাণকর ছিল না। এমনি ভাবে জনৈক ব্রিটিশ শিক্ষামন্ত্রীর "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণায় disinterested ক্ষেত্রে সরকার ব্যয় ভার বহন করতে রাজী নয়" বলে যে মন্তব্য করেছেন (S.R. Dongerkery, University Autonomy in India, p–7 দ্রষ্টব্য),

অথবা ম্যাকলের "রক্ত ও বর্ণে ভারতীয়, রুচি, চিন্তাধারা, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃদ্ধিতে ইংরেজ" বানানোর জন্য শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ণয়,

অথবা, সরকারের ভর্তুকি নিয়ে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহসহ autonomy বা স্বায়ত্ত শাসন বিশ্ববিদ্যালয় ভোগ করবে সরকার—নিরপেক্ষ হয়ে; accountability এক্ষেত্রে থাকবেনা সরকারের কাছে,

অথবা, চ্যান্সেলর হবেন রাষ্ট্র প্রধান এবং তাঁর মনোনীত ব্যক্তিরা হবেন ভাইস চ্যান্সেলর, ক্যাশিয়ার, রেজিস্ট্রার, ইত্যাদি আর এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র ও সরকারের প্রভাবমুক্ত হয়ে সার্বজনীনতা ভোগ করবে–

ইত্যাদি চাকচিক্যময় বচন বা Luxury talk কপচিয়ে বিশ্ব-সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে "বিশ্ববিদ্যালয়কে" তোলে ধরা নিছক বাক্য ভূষণ-ই হবে, বাস্তবতায় তা মেনে নেয়া বা প্রতিষ্ঠা করার কসরত বাতুলতারই নামান্তর মাত্র। জনাব রঙ্গলাল সেন তার সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসনের বিরোধিতার জন্য যেসব কারণ দেখিয়ে

www.pathagar.com

ভদ্রোচিত তথা বঙ্কিম ভাবে তাঁকে (নওয়াব আলী চৌধুরীকে) উপস্থাপন করেছেন, এটাও একটি non-Universal speculation বলা যেতে পারে বৈকি! নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী জনাব সেনের জ্ঞান- প্রজ্ঞায় ঃ

১. তিনি **শিক্ষক** ছিলেন না।
২. তিনি ছিলেন ভারতের ব্রিটিশ শাসকবর্গের **অনুগ্রহপুষ্ট** বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীর অন্যতম প্রতিনিধি
৩. পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলিম সমাজের স্বার্থ নিয়ে বেশি চিন্থিত; সম্ভবত এসব কারণে তিনি (জনাব নওয়াব আলী চৌধুরী) স্বায়ত্বশাসনের বিরোধী ছিলেন। লক্ষণীয় "সম্ভবত" শব্দটি জনাব নওয়াব আলীর "বিরোধিতা"র প্রদর্শিত কারণগুলোর বাস্তবতা, গ্রাহ্যতা, স্বচ্ছতা, নির্মলতা, ইত্যাদির বিচার্যভিত্তি শুধু নড়বড়েই করেনি, বরং জনাব রঙ্গলালের বিরোধিতার বাস্তবতা, দৃঢ়তা ও যৌক্তিকতাকে "সম্ভবত" সংশয় বিযুক্ত করেছে সম্ভবত অর্থে। কারণ এ ধরণের মন্তব্যে সাম্প্রদায়িকতার ঘ্রাণ 'সম্ভবত' বিদ্যমান বলে প্রতিভাত হয়।

প্রসঙ্গ ঃ ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ঃ

এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ প্রণীত হয়। ১৯২০ সালের ঢাকা ইউনিভার্সিটি এক্টের সাথে কিছু সংযোজন ও পরিবর্তন হয়ে এটি প্রবর্তিত হয়েছে। জনাব শরীফ উল্লাহ ভুঁইয়া "১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধে এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেন এবং "পূর্ণ স্বাধীনতা" অর্থে এর বাস্তবতা বিচারের আলোকে পুনর্বিবেচনার জন্যে নিচে উদ্ধৃত করা হলোঃ

মূল অধ্যাদেশে বলা হয়েছে "বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্ষমতার উৎস, তা প্রণয়ণ করার এখতিয়ার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় সংসদের যার অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলেও তা হতে পারে।" এখানে দেখা যাচ্ছে জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিত্বকারীর বা রাষ্ট্রপতির অধীনস্ত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। ঠিক তেমনি ভাবে রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে যদিও সিনেটের নির্বাচিত ৩জনের প্যানেল থেকে যে কোন ১জনকে উপাচার্য নিয়োগ করেন, এরপরও

১. উপ উপাচার্য, ২. কোষাধ্যক্ষ, ৩. সিনেটে ৫জন শিক্ষাবিদ, ৪. সিন্ডিকেটে ৩জন, ৫. একাডেমিক কাউন্সিলে ২০ জন ৬. মনজুরী কমিশনের চেয়ারম্যান = সর্বমোট ৩১ জনকে তিনি মনোনীত করেন। এছাড়া অন্যান্য

www.pathagar.com

বিভাগঃ যেমন রেজিস্টার, পরীক্ষা, কলেজ পরিদর্শন, মেডিকেল, গ্রন্থাগার ইত্যাদি বিভাগের সিলেকশন বোর্ডেও তাঁর মনোনীত নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য থাকেন। সুতরাং এথেকে বুঝা যায় রাষ্ট্রের প্রাধান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কত ব্যাপক রয়েছে। তেমনিভাবে ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের একটি সংশোধনী বলে উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থকমিটি থেকে অব্যাহতি দেয়াটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা Full Freedom এর আরো অপূর্ণতা সৃষ্টি করেছে।

এই প্রসংগে লক্ষণীয় ১৯৭৫ এর জানুয়ারি মাসে একদলীয় শাসনামলে তদানীন্তন উপাচার্যকে সরকারের মর্জি অনুযায়ী এই মন্তব্য করতে হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ফ্রিডম এর নামে রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিপন্থী কার্যকলাপ সহ্য করা হবে না। এই হুঁশিয়ারী সদৃশ বক্তব্য কতটুকু বাস্তব সম্মত ও কল্যাণকর তা সম্যক হৃদয়গম না হলেও এই রূঢ় সত্যটুকু বলা বা চাওয়ার একটি নৈতিকতা অবশ্যই থাকতে হচ্ছে। নইলে "বিশ্ববিদ্যালয়" Frontierless জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে একটি জাতির সার্বভৌমত্ব- বিপন্ন করে দিতে পারে; সন্দেহ নেই। Colony countries যখন ১৪শতক থেকে ১৯শতক পর্যন্ত কায়েম ছিল এবং পরে Colonization- এর বিরুদ্ধে বিপ্লব বিদ্রূহ, যুদ্ধের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে উচ্ছেদ সাধন করা হয়েছিল-এই পরিবর্তনে University এর restricted ও unrestricted autonomy এর elastic ভূমিকা ছিল প্রচন্ড। বাংলাদেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে University এর restricted and unrestricted freedom এর অনুরূপ বিশ্লেষণ করলেই তা পরিস্কার হয়ে উঠে। ১৯৬২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম-ইত্যাদি ঘটনার বিশ্লেষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "autonomy" বলতে এর পূর্ণ প্রতিফলন ও প্রতিষ্ঠা হয়নি; এবং এমনটি না হওয়ার দরুন এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ থাকাটাই যে (অর্থাৎ elasticity in demand of full freedom) স্বাভাবিক, উক্ত আলোচনা থেকে এটি স্বাভাবিক ভাবে প্রতিভাত। ১৯৭৪ এর ড. কুদরতে এ খুদার কমিশনেও কিন্তু autonomy এর আহত রূপ রয়েছে। এতে বলা হয়, "উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ কর্তৃত্বের আওতায়" বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বাধীন ভাবে পরিচালিত হবে। লক্ষণীয়, "শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ কর্তৃত্বের আওতায়" শব্দগুচ্ছের সাধারণ/"সার্বিক নয়") "কর্তৃত্ব" ও এর "আওতায়" সীমা ও প্রকৃতি কি তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ এবং এই আওতায় থাকা আবস্থায় "পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন" ও "স্বাধীনভাবে পরিচালনা" কথাগুলোর অবস্থান উল্লেখে আদৌ ঋজুতা রয়েছে কিনা তা-ও বিবেচ্য বিষয় বৈকি।

www.pathagar.com

আরো মজার ব্যাপার, ১৯৭৬ সালে পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব জহিরুল হককে চেয়ারম্যান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন বিষয় তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির রিপোর্টে কতিপয় অন্যায় ও অনিয়মের চিত্র তুলে ধরা হয়। এতে উপাচর্য নিয়োগ বিধান, বিভাগীয় চেয়ারম্যান নির্বাচন পদ্ধতি, ইত্যাদির পরিবর্তনসহ "ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে নিরুৎসাহিত" করার সুপারিশ করা হলে এর আলোকে তদানিন্তন সামরিক সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ধারায় সংশোধনী অর্ডিন্যান্স জারি করে। ফলে জাহাঙ্গীর নগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দসহ অবশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকসমাজে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়; প্রতিবাদের ঝড় উত্থিত হয়। এরপর ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে আর একটি সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে আপন ইচ্ছানুযায়ী যে কেহকে চ্যান্সেলার পদে নিয়োগের ক্ষমতা দেয়া হয়। এতে তদানীন্তন সংসদ সদস্য ডঃ এম ও গনি এই সংশোধনিটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবে বলে মন্তব্য করলে-ও এর কোন পরিমার্জিত পরিবর্তন ত হয়নি; বরং প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান এর উল্টো মন্তব্য করে বলেন, উন্নয়নের জন্য শতকরা একশত ভাগ গ্রান্ট যেখানে দেয়া হচ্ছে সেখানে টাকার খরচের হিসাব চাইলে তা স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় বলে "সকালে শিক্ষকদের, সন্ধ্যায় ছাত্রদের মিছিল বের হয়।" এমনি ভাবে মঞ্জুরী কমিশনের অর্থ ব্যয় সরকারি নিরীক্ষণেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজ অসন্তোষ প্রকাশ করে; কারণ এটাও স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপের শামিল। ইত্যাদি বিবিধ কারণের সুযোগ নিয়ে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত শিক্ষা বর্ষগুলোতে ৩২১ দিন অর্থাৎ প্রায় ১১মাস সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সুযোগ পায়। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আবদুল মজিদ খান পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে এহেন হস্তক্ষেপে নাখোস হয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে সামরিক শাসনজারী ও সরকার প্রধান জনাব হুসাইন মোহম্মদ এরশাদের "বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন দাবিকে" বাংলাদেশের ভেতর আর একটি বাংলাদেশ সৃষ্টির মতো উপহাস(?) বিধৃত উক্তি সংশ্লিষ্ট সকলকেই বিক্ষুব্ধ করে। এরপর ১৯৮৪ সালে বিচারপতি এ.টি. এম মাসুদের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি রিভিউ কমিটি হয়। এই কমিটির রিপোর্ট কি ছিল তা আজও অজ্ঞাত রয়েছে। এবছরই সামরিক আইন কমিটির (এনাম কমিটি) '৭৩ অধ্যাদেশের কিছু মৌলিক পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রস্তাব পেশ করে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পুনর্বিবেচনা ও পুনর্বিন্যাসের কতিপয় পদক্ষেপ নেয়া হলে তা-ও প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়। এরপর ১৯৮৫ তে সরকার এক বছরের জন্য সরকারি অফিসে নিয়োগ বন্ধের আদেশ

www.pathagar.com

দেয়ার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়েও নিয়োগ বন্ধের নির্দেশ দেয়। এতদসঙ্গে অবসর গ্রহণের পর ৬৫ বছর পর্যন্ত শিক্ষকদের পুনঃনিয়োগের উপর বিধি নিষেধ আরোপসহ এই ক্ষমতা প্রয়োগের উপর বিধি নিষেধ আরোপের কর্তৃত্ব ও প্রয়োগের ক্ষমতা চ্যান্সেলারের উপর ন্যাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে ক্ষমতাসীন দলের জনৈক পার্লমেন্ট সদস্য সিনেট অধিবেশনে যোগদান করতে এসে কতিপয় ছাত্রের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে দেখা যায়। এঘটনাকে কেন্দ্র করে কতিপয় সংসদ সদস্যের বক্তব্য বিবৃতির মাধ্যমে অশোভনীয় উক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও প্রশাসনকে অসহিষ্ণু করে তোলে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে ও উত্তেজনা বিযুক্ত হয়ে পড়ে। তখন বাধ্য হয়ে সেসময়কার শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ '৭৩-এর অধ্যাদেশ সংশোধন করা হবে বলে শুধু মৌখিক আশ্বাস প্রদান করে পরিস্থিতি প্রশান্ত করার প্রয়াসী হন। এমনিভাবে বিশ্বদ্যিালয়ের স্বায়ত্তশাসন পূর্ণ বা নিরঙ্কুশ করার দাবি ও প্রচেষ্টা প্রায় প্রতিনিয়তই বাধার সম্মুখীন হতে থাকে। অন্যকথায় Absolute autonomy এর Absoluteness মানুষের পক্ষে ধারণ ও প্রয়োগ যে অবাস্তব ও অকার্যকরী তা ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি একটি অমোঘ সত্য হিসাবে বিরাজমান রয়েছে। সরকার বনাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এহেন Autonomy নিয়ে টানাটানির চিত্রটির 'দৃশ্য' এমনটিই ছিল।

সবশেষে আরো কয়েকটি বিষয় বিবেচ্য এই দৃষ্টিতে যে, যে বিশ্ববিদ্যালয় autonomy দাবি করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের autonomy আদায় ও তা বাস্তবায়িত করার চরিত্র ও নিষ্ঠা সংশ্লিষ্টদের কতটুকু আছে তাও বিশেষভাবে বিচার্য। এই দৃষ্টিতে জনাব এ. কে. মনোয়ার উদ্দীন আহমেদের "Dhaka University Order (DUO) 1973: Autonomy or Rule of Law? –জিজ্ঞাসিত নিবন্ধটির কতিপয় সংশ্লিষ্ট অংশ বিবেচ্য। বক্ষমান এই নিবন্ধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে নমুনা স্বরূপ পাঠদানের অবহেলা ও বিশৃংখলার যে চিত্রটি তুলে ধরেন তা নিচে উল্লেখ করা হল;

ক্যাম্পাস ভায়োলেন্স ও এর জের

১৯৬০ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Campus violence শুরু হয় এবং সত্তর ও আশি দশকে এর আরো অবনতি ঘটে। সসস্ত্র সংঘর্ষ, সেসনজট এবং ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি শিক্ষার পরিবেশকে চরমভাবে বিনষ্ট করে দেয়। অভিযোগ করা হয় ঃ

১. যথাযথ ভাবে ক্লাস হয় না।
২. কতিপয় শিক্ষক ১০ মিনিট পরে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেন এবং ঘণ্টা শেষ হওয়ার ১০ মিনিট পূর্বে শ্রেণী কক্ষ ত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

৩. চেয়ারম্যানকে পূর্বাহ্নে না জানিয়ে ও ছাত্রদেরকে নোটিস না দিয়ে কতিপয় শিক্ষক ক্লাস নিয়ে থাকেন।

৪. কোর্স ও টিউটরিয়াল পরীক্ষা যথাযথ ভাবে সুসংহত করা হয় না।

৫. কতিপয় শিক্ষক নিয়মিত কোর্স পাঠদান ও টিউটারিয়্যাল পরীক্ষা না-নিয়ে ৫ মিনিটের মৌখিক পরীক্ষা নেন।

৬. অনেক শিক্ষকেরই কক্ষে দিনভর তালা ঝুলতে দেখা যায়।

৭. পরীক্ষার ফলফল যথাসময়ে প্রকাশিত হয় না।

এরপর তিনি আরো কতিপয় গুরুতর অভিযোগের উল্লেখ করেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. কতিপয় শিক্ষক প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেন এবং অর্থের জন্যে তা ছাত্রদের কাছে বিক্রী করেন।

২. কতিপয় শিক্ষক কলেজ পরিদর্শনে ও পরীক্ষা পরিচালনার কাজে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনে অর্থ সংগ্রহ করেন।

৩. কলাকৌশল ও প্রভাব খাটিয়ে কতিপয় পরীক্ষায় আণ্ডার কোয়ালিফাইড শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বনে গেছেন।

৪. এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে যে স্বল্প যোগ্য শিক্ষকদেরকে অপেক্ষাকৃত যোগ্য শিক্ষকদের ডিঙিয়ে দ্রুত প্রমোশন দেয়া হয়েছে। (নিবন্ধমালা ১৯৮৭, পৃঃ ২৬৩)

জনাব আহমদের পরিবেশিত এসব অভিযোগ কত মারাত্মক ও লজ্জাস্কর তা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। তিনি দুঃখ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদিক দিয়েই নৈতিকতা ও নীতিবোধের ভিত্তিতে অবমূল্যায়ন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় "has become another sick industry, another public sector enterprise" তাঁর দৃষ্টিতে সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিকটি হচ্ছে তাঁর কথায়; "What is however, most worrying is that on many occasions the recommendations of the Selection Board after being considered and discussed in the Syndicate meeting are sent back to the Selection Board for review. It happens quite frequently that when a less qualified prerson is not recommended, the rejected person will use his political influence and make his party syndicate members get the selection reviewed."

[নিবন্ধমালা ' ৮৬ পৃষ্ঠা ২৮৩]

www.pathagar.com

এই উদ্ধৃতি ও এর পূর্বে অন্যান্য আলোচনা যা করা হয়েছে এসবগুলোর সমষ্টিগত ফল মোটামোটি এইরূপ দাঁড়ায়ঃ

১. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উচ্চ পীঠস্থান হিসাবে এর গৌরব ও চরিত্র হারাতে বসেছে।

২. দুর্নীতিবাজ অযোগ্য শিক্ষক ও তাদের লেজুড় ছাত্ররাজনীতিবাজের প্রশ্নপত্র ফাঁস, অযোগ্য শিক্ষক ও অযোগ্য ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা পাওয়া এবং সসস্ত্র সংঘর্ষসহ Syndicate কে বাগে রাখার সংস্কৃতি চালু হয়েছে।

৩. পড়াশুনাদানে অযোগ্যতা, অবহেলা, ফাঁকি প্রদান ও পরীক্ষার দায়িত্বপালনে উদাসীনতা ইত্যাদি মিলিয়ে দারিদ্র প্রপীড়িত দেশের কষ্টোপার্জিত কোটি কোটি টাকার ব্যয়ে পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন সুকুমার বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে ব্যর্থ হয়ে এর বিপরীত অপশক্তির জিম্মী হয়ে পড়েছে।

এহেন অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নৈতিক দুর্বলতা, প্রশাসনিক কাপুরুষতা ও প্রশাসনের —ব্যক্তিত্বের ভয়ঙ্কর দশার প্রমাণই প্রতিফলিত হচ্ছে। সুতরাং এই অবস্থায় অন্তত পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য যে পর্যন্ত সৎ, নির্ভীক ও যোগ্য শিক্ষিত ও অভিজনের হাতে না যাচ্ছে সেই পর্যন্ত পছন্দ হোক বা না হোক, রাষ্ট্রীয় তথা সরকারি তত্ত্বাবধান মন্দের ভালো হিসেবে অননুপেক্ষনীয়। Autonomy যদি দুষ্টের লালন ও শিষ্টের আত্মসমর্পনের সুযোগ এনে দেয় তাহলে প্রয়োজনবোধে দেশ ও জাতির উচ্চ শিক্ষার মান-শানশওকত রক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে Regimentation ও প্রয়োজনে চেপে বসতে পারে।

একটি মন্তব্য ঃ একটি জিজ্ঞাসা

আরো উল্লেখ্য, বিগত ২৪শে আগষ্ট, ০৩ ইং তারিখে ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিলের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা মন্ত্রী ড. এম. ওসমান ফারুকসহ সহকারি অনান্য কর্মকর্তাদের “Foreign Qualification in Bangladesh” শীর্ষক বিষয়ের উপর উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে অবাঞ্চিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে ঃ

১. শিক্ষা কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না।

২. শিক্ষার কোন পরিধি নেই।

৩. বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশনভুক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের কোন আপত্তি নেই।
বিপরীতে শিক্ষামন্ত্রী ও সরকারের এ প্রসংগে বক্তব্য হচ্ছে এই যে,

www.pathagar.com

১. সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ৯২ লংঘন করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা যাবে না ; কারণ মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা সরকারের আবশ্যিক কর্তব্য।
২. ব্যবসায়িক দৃষ্টি ভঙ্গীতে পরিচালিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ট্যাক্স দিতে হবে।
৩. বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় সার্টিফিকেট দিচ্ছে সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অধিকার সরকারের রয়েছে।

• * তবে সেবামূলক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর ট্যাক্স ধরা হবে না এবং কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া বা কালো তালিকাভুক্ত করার ইচ্ছে সরকারের নেই। [দৈঃ ইত্তেফাক ২৫/৮/০৩ পৃঃ ১০-১৯ দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে দুটো কথার উপর, তা হলো ঃ

১. শিক্ষা কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না এবং

২. শিক্ষার কোন পরিধি নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় যদিও "মুক্ত চিন্তা ও দর্শন" চর্চা, গবেষণা ও বিকাশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈতিক, মানবিক ও পেশাগত দায়িত্ব হচ্ছে স্বীয় দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, আদর্শ, সর্বোপরি সার্বভৌমত্বের উৎকর্ষ সাধন ও এর হেফাজতে নিশ্চিত বিধান করে মুক্ত চিন্তা-দর্শনের গবেষণা করা। এই দৃষ্টিতে স্বাভাবিক ও ন্যায়সংগত ভাবেই জাতীয় স্বার্থে স্বভাবজাত নিয়ন্ত্রণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে বর্তিয়ে যায়। এর ব্যত্যয় হলে, অথবা যাতে এরূপ ব্যত্যয় না ঘটে সেজন্যে গণ-নির্বাচিত সরকারকেই দায়বদ্ধ থাকতে হয় দেশবাসী ও রাষ্ট্রের নিকট। এ ধরনের দায়বদ্ধতা সংরক্ষণ ও প্রতিপালনে যাতে রাজনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য লাভ না-করে, তা দেখার ও এর প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সরকার অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরই নৈতিক দায়িত্ব অনঢ়ও। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে এহেন চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রশাসনিক চৌকস ক্ষমতার অধিকারী হওয়া অপরিহার্য, কারণ প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ন্যায়পর প্রতিবিধানে এর বিকল্প নেই। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞান-গবেষণা ও নতুন চিন্তাধারার শক্তি ও প্রবাহ-ই সৃষ্টি করে না বরং এসবের উৎস ও বিকাশের জনক এবং প্রতিপালক, দেশের সরকার ও জনগণের অভিভাবকত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতার একমাত্র সর্বোচ্চ প্রভাবশালী কর্তৃত্বের অনুপম পরাকাষ্ঠাও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ইতিহাস ও কৃতিত্বের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় কবি আল মাহ্‌মুদের কথায় "ডাকাতের গ্রাম" হয়ে পড়েছে। নৃশংস হত্যা-ধর্ষণ, গুম, শিক্ষক নির্যাতন, থিসিস চুরি করে ডক্টরেট ডিগ্রী ধারী হওয়া, জাল মার্কশীট ও সার্টিফিকেটে শিক্ষিত সাজা ইত্যাদি অসভ্যামি, বর্বরতা ও জুয়োচ্চরীর কলঙ্ক তিলক প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কপালেই শোভা(!) পাচ্ছে এখন। অবাক লাগে এসব

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের অনেকেই এদেশের জলবায়ু সেবনে, এদেশের জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে লালিত-পলিত ও শিক্ষিত (?) হয়ে বিদেশীদের চর হিসাবে দেশ ও জাতির প্রতি ভয়ঙ্কর হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের এহেন পরিণতির জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ন্ত্রিত পাঠক্রম, রাজনীতির লেজুর ভিত্তিক ছাত্র-রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতায় কতিপয় শিক্ষকের Liberty এর নামে স্বার্থসেবী license ভোগ, মুক্ত চিন্তার নামে ভিনদেশীও স্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনার নির্লজ্জ চর্চা-ই যে প্রধানত দায়ী, তা ব্যখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

উদাহরণ স্বরূপ জনৈক সচেতন দেশপ্রেমিক পণ্ডিত প্রবরের কথায় ঃ

The Univesrity of Dhaka, the oldest and the premier seat of higher learning, based at the capital city, is virtually controlled almost in every aspect by the Indian lobbyists within the country. Many of the post 1971 generation of students have succumbed to their sinster influence and turned irrelevant towards their relegion---- these studentleaders like their predecessors in 1970–71 sircastically known as the four khalifas have amassed considerable wealth by dishonest means. ফলে "The stark political reality is that, these student leaders, converted as they are to secularism, work only to further India's hegemonistic and cultural design in Bangladesh. They have no concern for the values and cultural aspirations of the common people------".

[Mohammad Tajammul Hussain, Bangladesh, Victim of Black Propasanda, Intrigue and Indian Hegemony, Ed, 1986, P = 5–6]

এই উদ্ধৃতিটিই যথেষ্ট যে প্রাচ্যের গৌরব অক্সফোর্ড–'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' ত্যাগী দেশ প্রেমিক তৈরি নয়; বরং দেশের সার্বভৌমত্বের ধ্বংসাত্মক চরিত্র সৃষ্টিতে পারঙ্গমতা অর্জন করছে সূক্ষ্মভাবে, এবং তা ঘটছে তথাকথিত দালাল শিক্ষক অনিয়ন্ত্রিত প্রশাসন, এবং অবিবেচনামূলক পাঠক্রম ও অনিয়ন্ত্রিত পাঠ পরিধির উদারতার জন্যে ই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঃ শিক্ষকতা কালচার

ইদানিং-প্রকাশিত রিপোর্টটিও এ প্রসঙ্গে বিচার্য্য। এতে বলা হয় অধিকসংখ্যক শিক্ষকের অনুপস্থিতির কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। মোট অনুমোদিত পদের দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষক দিয়ে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। বর্তমানে ৪৪৬টি পদে শিক্ষক অনুপস্থিত রয়েছেন। এছাড়া তিন শতাধিক শিক্ষক নিয়ম বহির্ভূতভাবে কনসালটেন্সি বা পার্ট টাইম চাকরিতে নিযুক্ত রয়েছেন। ফলে শিক্ষার মান ও শিক্ষা কার্যক্রম গুরুতর বিঘ্নিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

দৈনিক ইত্তেফাকের জুলাই ৬, ২০০৪ এ প্রকাশিত রিপোর্টে প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ১ হাজার ৫০৬টি পদের মধ্যে বর্তমানে ১ হাজার ৬০ জন শিক্ষক রয়েছেন। অধ্যাপক পদে ৫৯৬ জন শিক্ষকের মধ্যে বর্তমানে ৫১৬ জন, সহযোগী অধ্যাপক পদে ২৭৯ জন শিক্ষকের মধ্যে বর্তমানে ২১৪ জন, সহকারি অধ্যাপক পদে ৩৬৫ জনের মধ্যে ২৫১ জন এবং প্রভাষক পদে ২৬৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৪২ জন কর্মরত রয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভাষ্য মতে, বর্তমানে ২৫৩ জন শিক্ষক ছুটি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থান করছেন। এদের মধ্যে ১৭৬ জন পড়াশুনার জন্য বিদেশে, ৬২ জন ছুটি নিয়ে দেশে ও বিদেশে চাকরিতে এবং ১৫ জন অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থান করছেন। দু'মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান না করলে সিন্ডিকেট অননুমোদিত ১৫ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগে বর্তমানে ১৯৩টি শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। এরমধ্যে অধ্যাপক পদে ৩০টি, সহযোগী অধ্যাপক পদে ৩৯টি, সহকারী অধ্যাপক পদে ৫১টি এবং প্রভাষক পদে ৭৩টি নির্বাচিত পদের বাইরেও একটি বৃহৎ সংখ্যক খন্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে অনুমোদিত খন্ডকালীন শিক্ষকের অনেক পদও খালি রয়েছে। সূত্রমতে, ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে ৪ বছরের সমন্বিত কোর্স চালু করার পর থেকে শিক্ষক সংকট ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

শিক্ষকদের কনসালটেন্সির ব্যাপারে সুরাহা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বার বার উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্যর্থ হয়েছেন। সিনেট ও সিন্ডিকেট বৈঠকে অনেক সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় না দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানে ও কনসালটেন্সিতে শিক্ষকরা তাদের মেধা ও শ্রম ব্যয় করছেন বলে প্রশ্ন তুলেছেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট বৈঠকেও শিক্ষকদের কনসালটেন্সির ব্যাপারে আলোচনা হয়। কিন্তু শিক্ষকদের কনসালটেন্সি একইভাবে অব্যাহতই রয়েছে। নিয়মানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক বাইরে কনসালটেন্সি করতে চাইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে এবং আয়ের ১০ ভাগ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কোষাগারে জমা দিতে হবে। কনসালটেন্সি নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত বহুসংখ্যক উদ্যোগ নিয়েছেন। উদ্যোগ গ্রহণের সংখ্যা ১৫-এর অধিক হবে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। ১৯৯৮ সালে জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০টি বিভাগ ও ইনিস্টিটিউট থেকে কনসালটেন্সি বন্ধে সুনির্দিষ্ট সুপারিশও আহ্বান করা হয়। বিভিন্ন বিভাগ ও ইনিস্টিটিউট থেকে এ ব্যাপারে ১৯ দফা সুপরিশ পাঠানো হয়। সুপারিশের পরও কনসালটেন্সি বন্ধ হয়নি।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদ, সমাজ কল্যাণ এবং ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরাই কনসালটেন্সির সাথে বেশি জড়িত। এদের বেশিরভাগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, এনজিও ব্যবসা, বাণিজ্য সংস্থায় কো-অর্ডিনেটর, ডিরেক্টর, উপদেষ্টা কিংবা দেশী-বিদেশী সংস্থায় কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন। অভিযোগ রয়েছে, যে সকল শিক্ষক কনসালটেন্সির সাথে জড়িত তারা নিয়মিত ক্লাস নেন না। শিক্ষকদের এ পার্টটাইম চাকরির কারণে পাঠদান সমস্যা ছাড়াও পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। কোন কোন বিভাগে পরীক্ষার ফলাফলের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে এবং অনুমতি না নিয়েও শিক্ষকরা বাইরে বৈধ সংস্থার সাথে বৈধ সম্পর্ক রাখতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে আর্থিক লাভের বিষয়টি জড়িত থাকতে পারবে না। অর্থিক বিষয় জড়িত থাকলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে আয়ের ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় কোষাগারে জমা দিতে হবে। কিন্তু কনসালটেন্সির সাথে জড়িত প্রায় সকল শিক্ষকই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি না নিয়ে এবং উপার্জিত অর্থের ১০ ভাগ জমা না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কনসালটেন্সিতে নিয়োজিত তিন শতাধিক শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১২ জন অনুমতি নিয়েছেন। বিধি অনুযায়ী একজন অধ্যাপক সপ্তাহে ১০টি, সহযোগী অধ্যাপকের ১৪টি, সহকারী অধ্যাপকের এবং প্রভাষকের ১৬টি ক্লাস নেয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষক তা নেন না। বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষকদের ক্লাস ফাঁকি দেয়ার অভিযোগের কথা নিয়মিত শোনা যায়।

শিক্ষকদের কনসালটেন্সির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ সিনেটের (২০০৪) বার্ষিক অধিবেশনে তার অভিভাষণে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকমত ক্লাস নিয়ে বা পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেও অন্য কাজ করা সম্ভব। দেশ ও জাতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরের বাইরের শিক্ষকদের অংশগ্রহণ থামিয়ে দেয়া সমীচীন হবে কিনা তা লক্ষ্য করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আমাদের যত সংশ্লিষ্টতাই থাকুক না কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান, পরীক্ষা গ্রহণ এবং জ্ঞানচর্চার মূল দায়িত্বের কথা ভুলে থাকার কোন অবকাশ নেই। তাঁর এই বক্তব্য প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতা প্রদর্শনে নমনীয় হওয়ায় শিক্ষকতা সংস্কৃতির কোন সুপরিবর্তন হয়নি। সার-সংক্ষেপ---- এটিই-ই-হচ্ছে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের -এর চিত্র!

www.pathagar.com

ঢাকা ভার্সিটির জমি সমাচার ঃ

সম্প্রতি জানা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেকেরও বেশি জমি বেহাত হয়ে গেছে। ১৯২১ সালে ৬৪০ একর জমি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু হলেও এ পর্যন্ত ৩৮০ একর জমি হাতছাড়া। কর্তৃপক্ষের অবহেলা, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা এবং সরকারি অধিগ্রহণের কারণে বেদখল হয়েছে এ জমি।

প্রতিষ্ঠার সময় ১২টি বিভাগে ৮৭৭ জন ছাত্র এবং ৬০ জন শিক্ষক নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু হয়। ৮৩ বছর পর বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ১৪শ'র অধিক, ছাত্রছাত্রী প্রায় ৩৫ হাজার, বিভাগ ৪৯টি, ইনস্টিটিউট ৯টি, ব্যুরো ও গবেষণা কেন্দ্র ২৬টি এবং আবাসিক হল ১৭টি। গত ৮৩ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪০ গুণ এবং শিক্ষকের সংখ্যা ২৩ গুণ বেড়েছে। কিন্তু কমে গেছে জমির পরিমাণ। সরকারের হুকুম দখল করা ৫৭ একরসহ ১২০ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয় ৬৭ বছরেও ফেরত পায়নি।

জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন মূল ভবনের দুই-তৃতীয়াংশ রিকুইজিশন করে সামরিক হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। যুদ্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো ভবনটিই হাতছাড়া হয়ে যায়। বর্তমানে সেখানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। দেশভাগের পর সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত প্রশাসনিক ভবন দখল করে সেখানে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করে। ফজলুল হক হলের দক্ষিণে খেলার মাঠও নিয়ে নেয়া হয় রেলওয়ে সম্প্রসারণের জন্য। স্বাধীনতার পরও দফায় দফায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেহাত হয়েছে। গ্রিন রোড এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ বিঘা জমির ১২ বিঘাই এখন বস্তি যেখানে ভিক্ষুক থেকে শুরু করে দেহপসারিনি বাস করছে নির্বিঘ্নে। বর্তমান মিন্টো রোড এবং হেয়ার রোডের বাংলাগুলো ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে, যেগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কোয়ার্টার হিসাবে বসবাস করতেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর জমি সংকট আরো প্রকট হয়ে দেখা দেয়। বিশেষ করে প্রাদেশিক রাজধানীর সরকারি অফিস-আদালত স্থাপনের জায়গার সংকট সৃষ্টি হয়। এ জন্য তখন সেক্রেটারিয়েট স্থাপনের জন্য নেয়া হয় ইডেন কলেজের ভবনগুলো, হাইকোর্টের জন্য গভর্নর হাউজ এবং প্রাদেশিক আইন সভার জন্য জগন্নাথ হলের কেন্দ্রীয় ভবন। জগন্নাথ হাউস সরকার জবরদখল করে নেয়ায় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন স্থানান্তরিত হয় জগন্নাথ হলের দক্ষিণ ভবনে (বর্তমান দক্ষিণ বাড়ী)। তখনই (১৯৪৭ সালে) ঢাকায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় ভবন (তৎকালীন কলা ভবন, বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ) পুরোপুরি হাতছাড়া হয়ে যায়। বর্তমান বুয়েট, আলিয়া মাদ্রাসা, বদরুন্নেসা কলেজের জন্যও আরও কিছু জমি

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাড়তে হয়। এছাড়া শিক্ষাভবনের পূর্বদিকের জমিটিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল, যা সরকার দখল করে নেয়। এভাবে সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭ একর জমি বিভিন্ন সময়ে সরকারি দখলে চলে যায়।

স্বাধীনতার পর সাবেক ভিসি এমাজউদ্দিন আহমেদ প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলকৃত জমি ফেরত পাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি প্রেরিত পত্রে সরকারের দখল রাখা ৫৭ একর এবং বিচারপতি ফজলে আকবর কমিশনের সুপরিশকৃত ৬৩ একর জমিসহ মোট ২১০ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়ার দাবি জানান। তিনি যে সব জমি দাবি করেন এর মধ্যে রয়েছে, নীলক্ষেতে অবস্থিত বর্তমান ধানমন্ডি থানার ২ একর ৬৮ শতাংশের খাস জমিটি, কার্জন হলের পূর্বদিকে ওসমানী উদ্যান ও ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন বাদে রেলওয়ের পতিত ২৪ একর ৩৯ শতাংশ জমি, আনন্দবাজারের ৭ একর ২৩ শতাংশ জমি এবং কর্মজীবি হাসপাতালের পূর্বদিকের ৩ একর ১৯ শতাংশ জমি। বাকি জমি ১৯৬১ সালে টঙ্গিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের যে জায়গা নির্ধারিত হয়েছিল তা-ও তিনি দাবি করেন। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীও ১৯৯৭ ও ১৯৯৯ সালে মোট দু'বার বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখলকৃত জমি ফেরত দেয়ার জন্য সরকারকে চিঠি দিয়েছিলেন।

১৯৯২ সালের ১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে আণবিক শক্তি কমিশন অন্যত্র স্থানান্তর করে এর জমি ও ভবনাদি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হয়ে ২০০৩ সালে ডিসেম্বর মাসে আবারো ক্যাম্পাসে এসে তিনি একই প্রতিশ্রুতি দেন। এবং কার্জন হলের পূর্বপার্শ্বে রেলওয়ের দখল করা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে ছাত্রীদের জন্য ৫০০ সিটের একটি ছাত্রী হল নির্মাণের ঘোষণা দেন। কিছু জটিলতার কারণে হল নির্মাণের কাজে অগ্রগতি হয়নি; তবে সম্প্রতি হল নির্মাণের কাজ শুরু হচ্ছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশা ব্যক্ত করেছেন।

বেদখল কৃত জমির ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, 'বেদখল জমি আমরা ফিরে পাওয়ার জন্য সরকারের নিকট দাবি করে আসছি, তবে ফেরত পাবো কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই।' আণবিক শক্তি কমিশনের দখল করা জমির ব্যাপারে তিনি বলেন, সরকার এ জমিটি দ্রুত হস্তান্তর করবে বলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি সমস্যার আশু সমাধান হবে কর্তৃপক্ষের এটাই প্রত্যাশা।

----

www.pathagar.com

৬ষ্ঠ অধ্যায় পাকিস্তান আমলে শিক্ষা সংস্কার ও বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা

পাক-বাংলা আমলে শিক্ষা সংস্কার সমাচার ঃ

পাকিস্তান আমলে শিক্ষা সংস্কার

বাংলাদেশের শিক্ষা-চিত্র সম্যক উপলব্ধির জন্য ২০০৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চেহারা দর্শন শেষে পুনরায় সাবেক পাকিস্তান আমলের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে একটি স্মরণীয় দিন। এ দিনে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে রূপ নেয় দুটি রাজ্যে-ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন বা হিন্দুস্তান ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান। পাকিস্তান সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অঞ্চলগুলোকে সত্যিকার ও বাস্তব অর্থে মুসলমানদের জন্যে একটি আদর্শ ইসলামী প্রজাতন্ত্র বা আবাস ভূমি রচনা করা।

১. পূর্ব বাংলা শিক্ষা অর্ডিন্যান্স ঃ ১৯৪৭

নতুন দেশ প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষাক্ষেত্রে স্বকীয় আদর্শ ও স্বকীয়তা অর্জনের লক্ষ্যে তদানীন্তন পূর্ব বাংলা সরকার East Bengal Educational Oridance, 1947, জারী করেন। এ অর্ডিন্যান্সের বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাগপাশ হতে মুক্তি পেয়ে পূর্ববঙ্গের সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুমোদন, সংযুক্তিকরণ এবং নির্দেশদানের ক্ষমতা অর্জন করে। সাধারণ ও প্রকৌশলী ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, প্রবেশিকা প্রদানকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ উচ্চ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত অর্ডিন্যান্সের বলে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আওতাধীন হয়। তাছাড়া এ অর্ডিন্যান্সের বলে 'বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এণ্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন ঢাকা' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে অবলুপ্ত করে তদস্থলে 'ইস্ট বেঙ্গল সেকেণ্ডারি এডুকেশন বোর্ডটি' স্থাপন করা হয়।

অনুরূপভাবে ঢাকা মাদ্রাসাকে 'মাদ্রাসা-ই-আলিয়া' নামকরণে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে কলকাতা মাদ্রাসা হতে পূর্ব বঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষাকে পৃথক করে ফেলা হয়। অধিকন্তু মাওলানা আবুল কালাম আজাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা-ই আলিয়ায় কলকাতা মাদ্রাসার আরবি বিভাগটিও খোলা হয়। এ সময়েই

www.pathagar.com

'মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড' নামক একটি দপ্তর স্থাপনের মাধ্যমে আলিম, ফাজিল এবং কামিল পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার জেনারেল মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড হতে পৃথক করা হয়। তাছাড়া মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর সভাপতিত্বে (১৯৪৫-৫১) পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে 'ইস্ট বেঙ্গল এডুকেশনাল সিস্টেম রি-কন্সট্রাকশন' কমিটি পূর্ব বঙ্গের সরকারকে কতিপয় প্রস্তাব পেশ করে। তন্মধ্যে নতুন ও পুরাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত মাদ্রাসা শিক্ষাকে একীভূত করে একটিমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার সুপারিশটি ছিল অন্যতম।

উক্ত কমিটি আধুনিক শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় সংস্কার সহ গোটা দেশে একই রকম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্যে **'ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক লার্নিং'** প্রতিষ্ঠার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ কমিটির কোন সুপারিশই তদানীন্তন সরকার কার্যকরী করেন নি।

২. শিক্ষা সংস্কার কমিশন : ১৯৫৭

১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে 'এডুকেশনাল-রিফর্মস্ কমিশন, ইস্ট পাকিস্তান (১৯৫৭)' নামে একটি কমিশন গঠন করে। এ কমিশন সরকারের নিকটঃ

১. ৬ হতে ১৪ বছর বয়স্ক বালক-বালিকাদের সার্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা দান

২. প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ৬ বছর মেয়াদী মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর নির্ণয় ও তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রি প্রদানকারী কলেজ স্থাপন

৩. সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা সমন্বয় সাধন

৪. মাদ্রাসা শিক্ষকদেরকে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোতে প্রশিক্ষণ দান

৫. ওল্ড স্কীম মাদ্রাসায় ইংরেজি, বাংলা ও অঙ্ক কোর্স চালু করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের জন্য মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে অধ্যয়ন করার সুযোগ প্রদান

৬. মিসরের ইসলামী শিক্ষার অনুরূপ মাদ্রাসা আলিয়ায় শিক্ষাকোর্স চালু করণের সুপারিশ পেশ করা হয়।

উল্লেখ্য, একমাত্র মাদ্রাসা পদ্ধতির সংশোধন ব্যতীত তখন অন্য কোন সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

www.pathagar.com

৩. জাতীয় শিক্ষা কমিশন ঃ শরীফ কমিশন ১৯৫৮

পরে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'কমিশন অন ন্যাশনাল এডুকেশন' নামে অপর একটি কমিশন নিয়োজিত করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা সচিব জনাব এস. এম. শরীফ। জনাব শরীফ শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিম্নভাবে ঢেলে নতুন রূপ দেন ঃ

ক. প্রাথমিক (Primary) শিক্ষা স্তর ঃ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত
খ. অন্তরবর্তী (Middle) স্তর ঃ ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণী
গ. মাধ্যমিক (Secondary) শিক্ষা স্তর ঃ নবম-দশম শ্রেণী
ঘ. উচ্চ মাধ্যমিক (Higher Secondary)শিক্ষা স্তরঃ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী

কমিশন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীর (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী) দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিয়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর দায়িত্ব পালনের জন্যে এদের সুযোগ করে দেয়। শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতা, ঝোঁক প্রবণতার নিরিখে নবম শ্রেণী হতে 'কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরি, গার্হস্থ্য, অর্থনীতি, কৃষি ইত্যাদি বিভিন্নমুখী বিভাগ ও শিক্ষা কোর্স এ কমিশনের সুপারিশে চালু করা হয়।

ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে শরীফ কমিশনের দৃষ্টিকোণ

* প্রথম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা মুসলমানদের জন্যে অত্যাবশ্যক করে দেয়;
* নবম-দশম শ্রেণীতে এ শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয়ে অবমূল্যায়ন করে;
* ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্যে এ বিষয়কে একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে সন্নিবেশ করে।

ডিগ্রী পর্যন্ত অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে আল-কুরআন, হাদীস সহ ইসলামী আইন, মুসলিম দর্শন ও ইতিহাস অধ্যয়নকেও ইসলামিক স্টাডিজের পাঠ্যসূচিভুক্ত করা হয়। কমিশন 'ইসলামী জীবন ও মূল্যাবোধ'কে বাস্তবভাবে প্রতিফলিত করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক ইতিহাস পাঠ করার গুরুত্ব আরোপ করে। 'ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ' নামে একটি করে দুটি বিভাগ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করার সুপারিশও এ কমিশন করেছিল।

মোটামুটি 'শরীফ কমিশনের' সুপারিশসমূহের বেশ কয়টি সুপারিশ কার্যকর হতে দেখা যায়, যা অন্যান্য কমিশনের বেলায় তেমনটি ঘটেনি। তাছাড়া এ কমিশন, আর যাই-হোক, শিক্ষাকে ইসলামীকরণে অন্যান্য কমিশনের চেয়ে যথেষ্ট সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভূমিকার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে বৈকি।

www.pathagar.com

৪. ইসলামিক আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ঃ হোসেন কমিশন ১৯৬৩-৬৪

শরীফ কমিশনের পর 'ইলামিক আরবি ইউনিভার্সিটি কমিশন'-এর জন্ম হয় ১৯৬৩-৬৪ সালে। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে 'ইসলামিক লার্নিং এণ্ড রিসাচ ইউনির্ভাসিটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে কেন্দ্র করে পূর্বপাকিস্তান সরকার এই কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এস. এম. হোসেনকে এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়। 'হোসেন কমিশন' সরকারের নিকট নিম্ন সুপারিশসমূহ কার্যকরী করার আবেদন পেশ করে ঃ

১. মাদ্রাসার ইসলামী শিক্ষাকে অধিকতর সম্প্রসারিত করার জন্যে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দান
২. জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশকৃত পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরকে উপযুক্ত চাকরি বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ ও প্রয়োজনীয় নাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি দূরীকরণ
৩. 'ইসলামিয়াত' বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্যে ইসলামী জ্ঞানানুশীলনের সুবিধাদি সুনিশ্চিতকরণ
৪. বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত করার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

দুঃখের বিষয়, পূর্বের অধিকাংশ কমিশনের সুপারিশসমূহের মত এ কমিশনের সুপারিশগুলোও কার্যকরী করা হয়নি।

৫. নূর খানের নয়া শিক্ষানীতি ঃ ১৯৬৯

এস. এম. হোসেন কমিশন রিপোর্ট এমনিভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান সরকার 'নিউ এডুকেশন পলিসি' বা নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। এ নয়া শিক্ষানীতির প্রণেতা ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের ভারপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল এম. নূর খান।

জনাব নূর খানের শিক্ষা নীতিতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে যুগপৎ গণতন্ত্রমুখী ও বিভিন্ন ধারার প্রয়োজনীয়তার প্রতি পুনর্বার গুরুত্ব প্রদানসহ বিজ্ঞান ও প্রকৌশলগত শিক্ষায় উৎকর্ষ সাধনের উল্লেখ করা হয়। এ শিক্ষানীতি বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের ভারসাম্য সৃষ্টি করার জন্যে ৫০ঃ৫০ অনুপাত

www.pathagar.com

সৃষ্টি ও সংরক্ষণের জন্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দেয়া, ইত্যাদি নীতি নির্ধারণী 'নূর খান কমিশনে' তথাকথিত বস্তুবাদ সমৃদ্ধির চমৎকার দিকনিদর্শন রয়েছে বটে; তবে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের ইসলামী দৃষ্টিতে চরিত্র উন্মেষের কোন রূপরেখা ও শিক্ষানীতি এতে নেই অথবা দেয়া হয়নি। এহেন শিক্ষানীতির পরিণামে পাকিস্তান, বিশেষ করে পূর্বপাকিস্তান, পাকিস্তান আমলেই সেকুলার শিক্ষার পথে অগ্রসর হওয়ার কূট সমর্থন পেলো ইসলাম বিরোধীদের সমর্থন ও শক্তির পরিপোষকতায়। এহেন শিক্ষানীতির ভয়াবহ পরিণাম আঁচ করেই ইসলামী শিক্ষার সমর্থনকারীদের নির্ভীকও নিবেদিত নেতৃত্ব প্রদানকারী ভার্সিটির বিজ্ঞান বিভাগের আদর্শনিষ্ঠ ও মেধাবী ছাত্র আব্দুল মালেককে নৃশংসভাবে শাহাদত বরণ করতে হয়েছিল। অন্যকথায়, নূর খানের নয়া শিক্ষানীতি ইসলাম নিরপেক্ষ তথা প্রকারান্তরে ইসলাম বিরোধী হওয়ার কারণেই অদুর ভবিষ্যতে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান মূলত ধ্বংস হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

নূর খানের শিক্ষানীতির একটি প্রশংসনীয় দিকও ছিল। তা হচ্ছে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামিয়াতকে বাধ্যতামূলক করা এবং বিদেশী মিশনারি স্কুলগুলোকে জাতীয়করণের প্রস্তাবের মাধ্যমে সেকুলার শ্রেণীর প্রভাবও প্রতিপত্তির বলয় সংকুচিত করা। লক্ষণীয়, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাতে ইসলামীকরণের নীতি না থাকায় এ দুটো প্রশংসিত নীতি প্রকৃতপক্ষে 'সুগার কোটেড'পিল সদৃশ অনৈসলামিক শিক্ষার পথ রচনা বৈ অন্য কিছু অর্জিত হয়নি।

ভাগ্যের কী চমৎকার লীলা! এই 'নয়া শিক্ষানীতি' বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পাঁকে নিপতিত হয়ে বিকশিত হওয়ার পূর্বেই বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে এটাই প্রতীয়মান হয়ে উঠে যে, পাকিস্তান তথা পূর্ব-পাকিস্তান আমলের শিক্ষা কমিশনগুলোর যাবতীয় প্রচেষ্টাই যথাযথ বাস্তবায়নের সুযোগ পায়নি। বিশেষ করে শিক্ষার ইসলামী সংস্কার ও প্রচেষ্টার যাবতীয় সুপারিশ কাগজী রূপ ছাড়া বাস্তবের কোন ছোঁয়াই পায়নি। এরই ফলে প্রধানত 'ইসলামের বুলি নিয়ে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যাবোধকে জলাঞ্জলি দেওয়ার' অপবাদটি 'গোয়েবলীয়' কায়দায় আজও বাংলাদেশে চর্চিত হচ্ছে বিধায় ইসলামী শিক্ষার আন্দোলন এখন পর্যন্ত আমাদের সমাজে বাস্তবতাও সত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারেনি।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : আন্দোলন ও পরিণাম :

যাহোক,পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ' হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দু'বছরের মধ্যেই ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এ দেশের চিন্তাশীল মুসলিমদের মনে দানা বেঁধে উঠে।

পাকিস্তান যে কারণে বিনষ্ট হল ঠিক সে কারণটিই কিছুটা নতুন আঙ্গিক ও প্রসাধনীতে পুনরায় এ দেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। অর্থাৎ ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে যে পাকিস্তানের সৃষ্টি, ঠিক সেই ইসলামের প্রতি কৃতপ্রতারণার দৃষ্টান্তসমূহ উপস্থাপন করে জনমনকে উত্তেজিত ও সংগ্রামমুখর করে বাংলাদেশের জন্ম হলো। আবার 'ইসলামকে' পুতপবিত্র রাখার বাণী প্রচার করে এদেশের মুসলমানদেরকে ইসলাম নিরপেক্ষ রাখার দরদী সেজে ১৯৭৪ এর মে মাসে যে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পেশ করা হল তা 'ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনকে' অত্যাসন্ন করে তুলল এ দেশে; অবশ্যি তা ছিল তখন অন্তর রাজ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ। কারণ ইসলাম দরদীরা(?) তখন ইসলামের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্যে লাঠি-সোটা নিয়ে অতন্দ্র প্রহরীর মত ঠায় দাঁড়িয়ে। ফলে '৭৪-এ জন্ম নিল ডঃ কুদরত এ খুদার শিক্ষা কমিশন।

ক. ডঃ কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন১৯৭৪ : প্রকৃতি ও স্বরূপ

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের জন্ম মে, ১৯৭৪ সালে। পরিশিষ্ট সহ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২৭। আকৃতিতে ম্যাগাজিন সাইজ। ৮টি পরিশিষ্ট বাদে সর্বমোট ৩৬টি অধ্যায় রয়েছে এতে। শিরোনাম ১৪ পয়েন্টে, বিষয়-বস্তু ১২ পয়েন্টে ছাপা। অর্থাৎ অনেক-অনেক লেখা। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সারাংশ রয়েছে। ফলে বিষয়বস্তু ও আকারে বিশাল হলেও সারাংশ পাঠে রিপোর্টটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আঁচ করা অনেকটা স্বল্প আয়াস সাশ্রিত হয়েছে। তবে একটা জাতির শিক্ষ-সংস্কারের ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে এই রিপোর্টের আকৃতি ও বহর তেমন বিরাট নয়।

শিক্ষা কমিশনের গঠন ও প্রকৃতি

১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই-এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত এক প্রস্তাবের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। দীর্ঘ কালের পরাধীনতায় নিষ্পেষিত বাংলাদেশের সর্বাধিক ভাগ্যোন্নয়ণের লক্ষ্যে "আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে" বাংলাদেশের জনগণকে একটি শক্তিশালী জাতিতে রূপান্তরিত করার পথ নির্দেশ দানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এই কমিশনকে। ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই কমিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

www.pathagar.com

শিক্ষা-কমিশনের সভাপতি ডঃ মুহাম্মদ কুদরত-এ-খুদা-এর সভাপতিত্বে পুর্ণকালীন ৭ জন ও খণ্ডকালীন ১৬ জন; সর্বমোট ২৩ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশন ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রায় একমাস সেদেশে অবস্থান করে; ১৯৭৩ এর জানুয়ারি মাসটাতে। এ বছরেরই ৮ জুন এই কমিশন অর্ন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে সরকারের কাছে। শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও প্রস্তাবনাসহ এই রিপোর্ট প্রণয়নে প্রায় ৪০০ সদস্য নিয়ে গঠিত ৩০টি উপ-কমিটি ও বিশেষ কমিটির বিশেষ অবদান রয়েছে। সেই সময়কার শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর ভূমিকাও ছিল এতে ব্যাপক ও স্মরণীয়।

শিক্ষা পরিবেশ

স্বকীয় (?) বৈশিষ্ট্য নিয়ে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বেরুল যথারীতি। এতে বলা হলো------ "**নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ** সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য।" আরও একটু খোলাসা করা হল উক্ত উদ্দেশ্যকে নিম্নভাবে ঃ

'এ উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে' (পৃষ্ঠা ১)। লক্ষণীয়,

১. এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক যে মুসলমান, তা গোটা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের কোন পাতায়ই যথার্থ থাক দূরের কথা, সামান্যভাবেও এর পরিচয় ফুটে উঠেনি।

২. ১৯৭১ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখা-পড়াও পরীক্ষাদানে ছাত্র সমাজের যে চিত্র ফুঠে উঠে তা নকলবাজী ও এতদসংক্রান্ত দুর্নীতির মহোৎসব রূপে পত্র -পবিত্রকায় প্রকাশ পায়। এর কোন প্রকার মূল্যায়ণ করা হয়নি।

৩. শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের যে মধুর সম্পর্ক (!) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও পথ, মাঠ-ঘাটে প্রতিভাত তা রীতিমত শিক্ষকতা পেশার মর্যাদা পদানত হওয়ার মতো। অথচ এর প্রতিকার বিধান মূলক বক্তব্য রিপোর্টে আসেনি।

৪. সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শিল্পকলা চর্চা ও উৎকর্ষের নামে যে অশ্লীল রুচি ও অঙ্গভঙ্গির প্রদর্শনী ইত্যাদি ছড়িয়ে রয়েছে; তা অবলোকন করার পর আদর্শ শিক্ষক ও অভিবাবক সমাজ যে অস্থির এবং উদ্বিগ্ন; এর উপরও শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে কোন উল্লেখ না থাকায় সুধী মহল আরও নিরাশ হয়েছে চরমভাবে।

www.pathagar.com

চাররাষ্ট্রনীতি ঃ ধর্মনিরপেক্ষতা আর সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র আর জাতীয়তাবাদ-এর কোন একটিতেও 'মুসলমান' বলতে যে একটা জাতি বিশ্ব আলোড়নকারী সভ্যতা ও সংস্কৃতির জনক ছিল এর কোন স্বীকৃতি ত নাই-ই; বরং সে সম্পর্কে হাত সাফাই-এর প্রায় নিখুঁত নৈপুণ্যের পরিচয় হচ্ছে এ কমিশন রিপোর্ট। গণতন্ত্র অর্থ যদি সত্যি সত্যি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ও স্বীকৃতি বোঝায় তবে সে অর্থেও এই কমিশন বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের শিক্ষা ও ঐতিহ্যকে শিক্ষাঙ্গন থেকে বেমালুম গায়েব করেছে। চাণক্য-চালে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ৩৬ টি অধ্যায়ের সবকটি নয় বরং ৭/৮টি অধ্যায় নিয়েই আলোচনা সীমিত রাখার প্রয়াস রয়েছে এখানে। কারণ এ কয়েকটি অধ্যায়ের বিষয়-বস্তুর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকৃতির (essence and attitude) বিচার বিশ্লেষণেই রয়েছে গোটা শিক্ষা কমিশনের তথা জাতির মৌলিক শিক্ষা-প্রকৃতি ও স্বরূপের মূল চিত্রটি। এ ছাড়া পরিশিষ্ট 'ক'ও এতদসংগে বিবেচ্য। আর একটি বিষয় ও এখানে বিচার্য। তা হচ্ছে কারিকুলাম বা পাঠক্রম। 'চরিত্র' দৃষ্টে যেরূপ ব্যক্তি-মানুষের আসল পরিচয় ফুটে ওঠে, তেমনি কোন জাতির পরিচয় ফুঠে ওঠে এর 'কারিকুলামে'; কারণ প্রকৃত অর্থে Curriculum হচ্ছে "a systematic course of study of a nation; এবং এই Course বিনির্মিত হয় দেশ ও জাতির প্রধানত **ধর্ম, দর্শন** ও **ইতিহাসের** ভিত্তিতে। লক্ষণীয় ঃ "ইসলামে ধর্মের কোন আলাদা Entity বা অস্তিত্ব নেই; বরং গোটা মানব জাতির সব বিভাগকে নিয়ে ব্যক্তিগত থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত জীবন ও জগত, শুধু তা-ই নয়; পরজগতসহ সর্ববিধ জ্ঞানের আধারই হচ্ছে ইসলাম।"

কারিকুলাম সম্পর্কে এই কথাটুকু স্মরণ রেখে এবার শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলোর বিষয় সমূহের উপর দৃষ্টিপাত করা যাক। যেমন ঃ

অধ্যায় ঃ ১. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি শীর্ষক বিষয় বস্তুর কথা। এতে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে গোটা জাতির আশা আকাংখার ৪টি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির। যথা ঃ

ক. জাতীয়তাবাদ **খ.** সমাজতন্ত্রবাদ **গ.** গণতন্ত্র ও **ঘ.** ধর্মনিরপেক্ষতা যা রূপায়িত ও বিকশিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। দেশ প্রেম ও সুনাগরিকত্ব অর্জনের লক্ষ্যেই রাষ্ট্রের এই ৪টি মূলনীতি ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন। দেশ বলতে কমিশন বোঝাচ্ছে ঃ জাতির ঐতিহ্য গর্ববোধ ও জাতীয় সংহতি বোধের অভিব্যক্তি।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কমিশন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ও মাতৃভাষার ভিত্তিতে জাতীয় ও সামাজিক চেতনার বিকাশকে বুঝিয়েছে। বলা হয়েছে, গোষ্ঠী চেতনার উর্ধ্বে একটি নির্দিষ্টমান পর্যন্ত সকলের জন্য পাঠক্রমের ব্যবস্থা থাকবে।

লক্ষ্যণীয়ঃ জাতি, জাতীয়তা ও সামাজিক চেতনার কোন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা কমিশনের রিপোর্টে বিবৃত হয়নি। দ্বিতীয়ত, গোষ্ঠীও গোষ্ঠী চেতনার উর্ধ্বে একটি নির্দিষ্ট মান বলতে কি বুঝান হয়েছে তা-ও অজানা রয়েছে।

এমনিভাবে সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্যেও জোড় ওকালতি করা হয়েছে। ওকালতি করা হয়েছে এতদসংগে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার। প্রকৃত অর্থে মৌলিক ভাবে বিপরীতধর্মী ৪ আদর্শের সংমিশ্রণে বাংলাদেশের যে শিক্ষা ব্যবস্থার জন্ম হবে তাতে স্বকীয়তা ত থাকছেই না; বরং এটি শংকর জাত বিশিষ্ট কিম্ভূতকিমাকার আদর্শের জন্ম দেবে যা বিশ্বের কোথাও নেই। অর্থাৎ এটি হবে একটি Innovaton for annihilation of a nation to induct any foreign element at any label and target. বলা হয়েছে শিক্ষার্থীর কর্মে ও চিন্তায়, বাক্য ও আচরণে সৎচরিত্র, সততা, নির্লোভ ও পরোপকারী গুণ রচনা করা হবে। কোন স্বীকৃত ভিত্তিতে অথবা কোন অথরিটির নির্দেশে এমন গুণের যাচাই বাছাই হবে তা অনুক্ত রয়েছে। এই অধ্যায়ে দুটো Phrase-এর সাক্ষাত দু জায়গায় পাওয়া যায়– ১. **গণতান্ত্রিক সমাজ** এবং ২. **সমাজতান্ত্রিক সমাজ**। এই দুটো পরিভাষার সংমিশ্রণ কথায় এবং বাস্তবতায় কিভাবে সম্ভব হবে তার কোন প্রকার নির্দেশনা পর্যন্ত দেয়া হয়নি।

অধ্যায়ঃ ২ "এতে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন" সম্পর্কে অনেক গুণের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এসব গুণ যেমনঃ সত্যবাদিতা, সাধুতা, ন্যায়বোধ ইত্যাদি কিভাবে, কোন উৎস থেকে এসব গুণের জ্ঞান আহরণ ও এর বাস্তব অবয়ব প্রদান করা হবে সে সম্পর্কে কোন বক্তব্য নেই। বলা হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথাও। বিভক্ত ভঙ্গের একাংশ বাংলাদেশ নাম ধারণ করায় এদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলতে এদেশের কোন্ ঐতিহাসিক কাল থেকে চিন্তা-ধ্যান করে এর সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় করা হবে– তা অস্পষ্টতার ঘোর অমানিশায় আচ্ছন্ন।

অধ্যায় ১১-তে শতকরা ৯০ জন মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী স্বয়ংসম্পন্ন মাদ্রাসা শিক্ষাকে টোল শিক্ষায় খাটো করে রাখা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একক প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক রেখে পরবর্তী পর্যায়ে এই বিষয়টিকে নির্বাচনী তথা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় স্থান দেয়া হয়েছে। মাদ্রাসাশিক্ষা শিশু শ্রেণী হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও কল্যাণকর শিক্ষা ব্যবস্থা

www.pathagar.com

হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, অথচ ডঃ কুদরত-এ খুদা শিক্ষা কমিশন এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রমশ দুর্বল ও নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা নিয়েছে অতি সূক্ষ্ম পাণ্ডিত্যের প্রলেপে।

অধ্যায় ২৪-এ শিক্ষাদান ও প্রশাসনে নারীদেরকে পুরুষের সমান অধিকারের আবশ্যকতার কথা বলা হয়েছে। অথচ নারী ও পুরুষ মন মেজাজ ও শারিরীক গঠন ও কর্মক্ষমতায় প্রকৃতিগতভাবে অসম এবং এই অমোঘ অসমতার কল্যাণকর পরিবেশ সংরক্ষণের জন্যে পর্দার ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত প্রথা থাকা সত্ত্বেও এসম্পর্কে কোন কথাই বলা হয়নি। এই কমিশন প্রকারান্তরে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতি আমদানি করার পথ-রচনা করছে 'শিক্ষা' ব্যবস্থার মোড়কে।

অধ্যায় ২০-এর যৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। এতে সংগীত, নৃত্যকলা, অভিনয়-, -ভাস্কর্য ইত্যাদি নিয়ে ললিত কলা শিক্ষা দানের কথা রয়েছে। পর্ণোসংস্কৃতির উন্মেষ যাতে না–ঘটে সে দৃষ্টিতে পাঠক্রমের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন নির্দেশই এ অধ্যায়ে প্রদান করা হয়নি।

দ্বিতীয় ভাষা ঃ বিদেশীভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে সবিশেষ ভাবে, অথচ ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বাংলার দ্বিতীয় ভাষা 'আরবি'- হওয়াটা স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। যে কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিতে সোচ্চার সেই কমিশনের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে আরবী শিক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে। অন্ততপক্ষে ইংরেজির পাশাপাশি আররীর গুরুত্বটা স্থান পেলেও স্বস্তি পাওয়া যেত।

কমিশনের কতিপয় প্রশংসনীয় দিক

১. শিক্ষা কমিশন গোটা দেশব্যাপী সাধারণ পর্যায়ে ৮ম শ্রেণীপর্যন্ত একই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ করেছে।
২. শিক্ষকদের মর্যাদা ও পারিশ্রমিক সম্পর্কে যেসব পরামর্শ দিয়েছে তা আশাব্যঞ্জক।
৩. এমনিভাবে পরীক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়নে যেসব সুপারিশ করেছে তা-ও অনাপত্তিকর বলা চলে।

সবিশেষে লক্ষণীয় ঃ বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু, ঐতিহ্য ও দর্শনগত দিক যথাযথ বিবেচনা করে এই শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট তৈরি হয়নি। এই রিপোর্ট তৈরি হয়েছে ভারত ও রাশিয়াকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে। স্বদেশ-ভূমি ও স্বজাতির আদর্শ ও সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই রিপোর্ট তৈরির জন্য কোন চেষ্টা-সাধনা ব্যয় করা হয়নি। দ্বিতীয়ত,

www.pathagar.com

যাদেরকে দিয়ে এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে তাদের অনেকেই পাশ্চাত্য ও বিজাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ও পরিজ্ঞাত হওয়ায় তারা আপন দেশের আত্মিক রূপ-রস-গন্ধ এই রিপোর্টে বিকশিত করতে পারেন নি। অন্যকথায়, এই রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রদান দ্বারা এদেশের প্রজন্মকে ময়ূর পুচ্ছ কাকের রূপ দেয়ার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। পরিণামে এরা না কাক না ময়ূর কোনটিরই শ্রেণীযুক্ত না হয়ে পরিণামে মানসিক রাজ্য ও বাস্তব জীবনে সাংঘর্ষিক বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবে; সন্দেহ নেই। এই কমিশন গোটা জাতি কর্তৃক ঘৃণ্যভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ফলে এই প্রত্যাখ্যানকে সামাল দেয়ার জন্য জন্ম হয় ১৯৯৭-এ জাতীয় শিক্ষা প্রণয়ন কমিটির।

খ. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ঃ ১৯৯৭

সূচনা ঃ ১৯১ পৃষ্ঠা সম্বলিত অফসেট কাগজে মুদ্রিত "জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ঃ ১৯৯৭-এর রিপোর্টটি অধ্যাপক শামসুল হকের অভিভাকত্ব ও নেতৃত্বে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭-এর আত্ম প্রকাশ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত এই রিপোর্ট ডঃ কুদরত-এ খোদার কমিশনের বিবেচনাসহ **১৯৭৯ এর** অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি এবং ১৯৮৮ সালের মফিজুদ্দিন শিক্ষা কমিশনের বিষয়বস্তুর পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রণীত।

কমিটির লক্ষ্য ঃ "প্রসংগ কথা" শীর্ষকে কমিটি এর লক্ষ্য হিসাবে ব্যক্ত করেছে যে এ কমিটি "নিরক্ষরতা মুক্ত একটি শিক্ষিত, প্রগতিশীল, বিজ্ঞানমনস্ক দেশ প্রেমিক, নৈতিক, মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার অনুভূতিতে উজ্জীবিত হয়ে এ প্রতিবেদনটি প্রণয়ণ করেছে।

উল্লেখ্য, ড. কুদরত-এ-খুদা কমিশনের ৪টি রাষ্ট্রীয় মূলনীতিঃ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ইতিবাচক কোন স্পষ্ট মতামত বা মন্তব্য এ-রিপোর্টে করা হয়নি বটে; কিন্তু গোটা রিপোর্টটিতে জাতীয় শিক্ষানীতির উপস্থাপনা যে ভাবে করা হয়েছে এতে প্রকারান্তরে রাষ্ট্রের উক্ত ৪টি মুলনীতির "আঁচর" নেই বলা চলে না। দৃষ্টান্ত: ১৯৯৫-এ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির পরিবর্তন ডঃ কুদরত-এ-খুদার কমিশনের আলোকে করা হয়েছে। [অধ্যায় ২, পৃঃ ৩১ দ্রষ্টব্য]

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অধ্যায়-১ এর "সার সংক্ষেপ" শীর্ষকে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে ১৪টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে 'ধর্মীয়' (১নম্বর), 'জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ (৯ নম্বর), নারী-পুরুষ বৈষম্য (১২ নম্বর) পরিবেশ সচেতনতা (১৪ নম্বর)-এই ক'টি বিষয়ের প্রতি কমিটির দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে বিচার্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ

www.pathagar.com

ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রসংগ

সার সংক্ষেপের (পৃঃ ৯) ১নম্বরে 'ধর্মীয়' মূল্যবোধের উল্লেখ থাকায় স্বভাবতই প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি ধর্ম-শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বলে প্রতিভাত হয়। অধ্যায় ২ এর ১.৬ অনুচ্ছেদেও [পৃঃ ৩৯] ধর্মের উল্লেখ রয়েছে। অধ্যায় ৩ এর ৫.১ অনুচ্ছেদে পরিদৃষ্ট হয় "ইংরেজি ভাষার সাথে ধর্মকে প্রাথমিক স্তরে তৃতয়ি শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাবনা। অর্থাৎ 'সার-সংক্ষেপে অধ্যায় ১ নম্বর হিসাবে 'ধর্ম' এর প্রতি প্রদত্ত গুরুত্ব প্রকারান্তরে অবমূল্যায়িত হয়ে ১ম শ্রেণীর পরিবর্তে ভিনদেশী ভাষা ইংরেজি সমমর্যাদাভিষিক্ত হয়েছে তৃতীয় শ্রেণী থেকে। প্রাথমিক স্তরের প্রথম শ্রেণী থেকে শিশুরা 'দেশপ্রেম, নাগরিকতা বোধ ----- ন্যায় নিষ্ঠা" [২.৪ অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৪২] ইত্যাদি গুণাবলি অর্জনে সচেষ্ট হতে পারলেও 'ধর্ম', যা শিশুর পরিবারভিত্তিক ঐতিহ্য ও বিশ্বাসমণ্ডিত তথা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সহজাত-প্রকৃতি–শিক্ষাকে প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদান অসমীচীন ও অনাবশ্যক জ্ঞান করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ধর্ম-শিক্ষা মাদ্রাসা স্তরে ইবতেদায়ী হতে চালু রাখা হয়েছে। অধ্যায় –৭ এর [পৃঃ ৭৮] ভূমিকায় ধর্মীয় শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষাকে পৃথক রূপে না ভেবে বরং দুটিকে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক রূপে দেখা হয়েছে। অধ্যায় ৮-এ 'ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' শিরোনামের ভূমিকায় [পৃঃ ৮১] "ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয়েছে। একই অধ্যায়ের ২.১ অনুচ্ছেদে 'ইসলাম শিক্ষা' উপশিরোনামে মন্তব্য করা হয়েছে ঃ

'ইসলামী বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে হলে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ইসলাম শিক্ষা গ্রহণ এবং স্বীয় জীবনে তা বাস্তবায়ন অপরিহার্য। তাই ইসলাম শিক্ষাকে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। [পৃঃ ৮১]

ফলে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্ম-শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণীতে এবং মাদ্রাসায় "ইসলাম শিক্ষার" ক্ষেত্রে ইবতেদায়ী তথা ১ম শ্রেণীতে বাধ্যতামূলক করায় সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম-শিক্ষা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ধর্ম-শিক্ষা দানের ব্যাপারে কমিটির এহেন উদাসীন্য, অথবা অথর্বতা বা কূটচাল অনুনোপেক্ষণীয় যুগপত বাস্তবতা ও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ-থেকে।

www.pathagar.com

এ প্রসংগে প্রাথমিক স্তরে ধর্ম-শিক্ষা [পৃঃ ৪৩–৪৪] উপশিরোনামের অনুচ্ছেদটিও বিচার্য। এতে ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের (?) মতামত দেয়া হয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

১. ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার
২. ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিশুকে ধর্ম-শিক্ষা দেয়া যায়
৩. মানবিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের জন্যে আলাদা বিষয় হিসাবে ধর্ম-শিক্ষা রাখার প্রয়োজন নেই
৪. অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের নামে কুসংস্কার শিক্ষা দেয়া হয়
৫. মিসেস হেনা দাসের "ভিন্ন মত"–প্রচ্ছন্ন ভাবে ধর্ম শিক্ষা না রাখার পক্ষে ওকালতি বিশেষ।

এ থেকে বুঝা যায় জাতীয়-শিক্ষা প্রণয়ন কমিটি ধর্ম-শিক্ষা বিশেষ করে 'ইসলাম' নিয়ে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টির অপপ্রয়াস পেয়েছেন। ইসলাম তথাকাথিত ধর্ম নয়। ইহা সার্বজনীন সামাগ্রিক জীবন-বিধান; ব্যক্তি থেকে সমষ্টি, জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত। এ-কমিটি শ্বাশ্বত ও ইতিহাস সিদ্ধ এই সত্য ও বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেছে। অন্ধ ও নির্দয় ভাবে অষ্টম শ্রেণীতে ধর্ম শিক্ষা ঐচ্ছিক রাখার পরামর্শটি এর নিকৃষ্ট প্রমাণ।

জাতীয় ইতিহাস প্রসংগ

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এদেশের অধিবাসীরা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে মূর্ত হয়েছে ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর। এ-জাতির ইতিহাস-উপকরণ কি, এবং এসব উপকরণের সমন্বয়ে বাংলাদেশের মানবগোষ্ঠীও যে একটি জাতি সে সম্পর্কে এ-কমিটি আলোকপাত করতে অযোগ্যতা, ধূর্ততা অথবা কাপুরুষতার চরম পরিচয় দিয়েছে। ডঃ কুদরাত-এ-খুদা -এর কমিশন রিপোর্টের মুসাবিদা ও এর বরাত দিয়ে দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করেছেন (পৃঃ ৩৯–৪০]। ধর্ম-নিরপেক্ষতার সপক্ষে "মুক্তি যুদ্ধের চেতনা" বিধৃত রেখে মানবীয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন ইতিহাসের সনাতন দৃষ্টিকোণ ধরে তুলেছে এ-কমিটি।

ইতিহাস-সিদ্ধ চিত্রটি হচ্ছে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এ-দেশের ইতিহাস ইসলাম ও ইসলাম ভিত্তিক মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতিতে বিনির্মিত। এদেশের শিক্ষা-ভিত্তি তথা Core of education হবে 'কম্প্রিহেনসিভ' 'ইসলাম' যার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণে জাতীর গোটা শিক্ষানীতি ও ইতিহাস হবে সঠিক ভাবে পুনর্গঠিত ও পরিপুষ্ট।

www.pathagar.com

মাদরাসা শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি 'ধর্মীয়' শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব বিভ্রান্তি ও বিকৃতিকারক মনোভাব প্রকাশ করেছে তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসংগে উল্লেখ্য 'মাদ্রাসা শিক্ষা" শিরোনামে লিখিত অধ্যায়ঃ৭-এর কয়েকটি বাক্য অবশ্যই প্রশংসনীয়। উদাহরণস্বরূপ, ভূমিকার শেষ বাক্যটিতে কমিটি স্বীকার করেছে ঃ

মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা এবং জাগতিক শিক্ষাকে পৃথকরূপে না ভেবে বরং দুটিকে পরস্পরের পরিপূরক রূপে দেখা হয়। [পৃঃ ৭৮]

২.১ অনুচ্ছেদে "লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য" উপশিরোনামে লিখিত অনুচ্ছেদটির প্রথম বাক্যে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ের "সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নয়ন" সাধনের কথা বলা হয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যে "সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে বলে প্রকারান্তরে ধর্মীয় আচরণের সর্বজনীন ব্যপ্তির উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে।

মাদরাসা শিক্ষার দুটি দিক রয়েছে– একটি চিরন্তন (Perennial) অন্যটি অর্জিত (acquired) ও পরিবর্তনশীল। প্রকৃত পক্ষে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মাদরাসা শিক্ষার যাবতীয় পরিবর্তন আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের মূল শিক্ষানীতির ভিত্তিতে অপরিহার্য; কমিটি তা অবলোকন ও মূল্যোয়ন করতে সমর্থ হয়নি।

নারী শিক্ষা

নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য সরকার উপবৃত্তির ব্যবস্থা চালু করেছে। [পৃঃ ৪৮, শেষ অনুচ্ছেদ] এই উপবৃত্তি শুধু মেয়েদের মধ্যে সীমিত না রেখে দরিদ্র নিরক্ষর ছেলেদের জন্যও চালু করার সুপারিশ থাকা উচিত ছিল।

দ্বিতীয়ত, উপবৃত্তি প্রদানের যে বিধিমালা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপাশি করা উচিত। যেমনঃ উপবৃত্তি প্রাপ্ত মেয়েদের অবিবাহিত থাকার শর্তটি এবং তাদেরকে ব্যাংকিং সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য তাদের হাতে উপবৃত্তির টাকা প্রদান করে অর্থ প্রাপ্তির লোভে বিদ্যাশিক্ষার্জনের মানসিকতা সৃষ্টির দৃষ্টিভংগী পরিতাজ্য হওয়া উচিত।

তৃতীয়ত, "নারী শিক্ষা" অধ্যায় ১৭-এর ৬.২১ অনুচ্ছেদে (পৃঃ ১৩৪) মাধ্যমিক শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে একই পাঠ্যসূচি গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। নারী ও যৌন জ্ঞান (৬.২৫ অনুচ্ছেদ, পৃঃ ১৩৪) সম্পর্কে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এছাড়া

www.pathagar.com

বিদেশী সংস্থা **নাইরোবি ফরওয়ার্ড লুকিং স্ট্রাটেজি, বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর একশান,** ইত্যাদি নীতিতে নারী সমাজ উন্নয়নের ওকালতি করা হয়েছে। ইত্যাদি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বাংলাদেশের নারী শিক্ষান্নোয়নে ইসলামের কোন অবদানই যেন কমিটির সদস্যদের জানা নেই। অথচ ইতিহাস সাক্ষী,বাধ্যতামূলক শিক্ষাসহ নারীর শালীনতা মণ্ডিত স্বাধীনতা, এবং প্রগতি ও মর্যাদাভিত্তিক অধিকার প্রদানের ইসলামই একমাত্র কঠোর নির্দেশ দিয়েছে এবং তা প্রয়োগে নারী সমাজকে করেছে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও মর্যাদাভিষিক্ত। কমিটির এক্ষেত্রে বলতে গেলে গন্ড মূর্খতা ও অবিমৃষ্যকারিতা শুধু দুঃখজনকই নয় বরং এটি একটি চরম লজ্জাস্কর ব্যাপারও। যে পাশ্চাত্য জগত নারী উন্নয়নের নামে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে নারীকে ভোগের বাণিজ্যপণ্যে রূপান্তরিত করেছে, সেই জগতকে 'গুরু' হিসেবে গ্রহণের মানসিকতা ও প্রভাব থেকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই পরিমুক্ত রাখা অত্যাবশ্যক।

এ প্রসংগে গার্লর্স গাইড-এর প্রসংগটি ও বিবেচ্য। গার্লস গাইড-এর শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পরিবেশকে শালীনতামণ্ডিত ও চরিত্র-শোভনে নিয়ন্ত্রিত রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিবেশ সংরক্ষণও যে অবশ্য কর্তব্য তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

সবশেষে সহ-শিক্ষার বিষয়েও কমিটির একটি বিশেষ অধ্যায় থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ সহ-শিক্ষার বিষময় ফল যে কী; বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রতিক ঘটনাবলি বিশেষ করে র‍্যাগ ডে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভালেনটাইন-ডে ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ধর্ষণ-সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে তা আমাদের সামনে দোদীপ্যমান রয়েছে।

ললিত কলা

অধ্যায় ১৫-তে ললিত কলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলা হয়েছে (২,৫, ক, পৃঃ ১২৫) "সুন্দর ও অসুন্দরের তুলনা করে সৌন্দর্য বোধের ধারণা" প্রদানের কথা। সুন্দর ও অসুন্দরের বিশ্লেষণ যে "ধর্মীয় ও নৈতিকতার" ভিত্তিতে অবশ্যই বিচার্য ও গ্রহণীয়–এর উল্লেখ না থাকায় বর্তমানে প্রচলিত ললিত কলার নামে চরিত্র হননের যে নোংরা পরিবেশে সৃষ্টি হচ্ছে তা প্রতিরোধ ও উৎপাটন সম্ভব নয়। কমিটি এক্ষেত্রেও Pin-point করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে সংগীত ও নৃত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রেও তথাকথিত সংস্কৃতি চর্চার নামে পৌত্তলিকতা, শেরেকী ও যৌন অনাচার এর পথটুকু অবারিত ও বাঁধামুক্ত রয়েছে বললে অতুক্তি হবে না। সম্প্রতি অভিনয় নিয়ন্ত্রণ বাতিলের এহেন একটি পদক্ষেপ গ্রহণ এর একটি নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

www.pathagar.com

আইন শিক্ষা

অধ্যায় ১৬-তে আইন শিক্ষার ভূমিকায় দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রচলিত আইন শিক্ষার আশু সংস্কার সাধনের উপর জোর দেয়া হয়েছে (পৃঃ ১২৯)। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের "শরীয়াহ্" যে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আইন শাস্ত্র, এ-কমিটি তা স্বচ্ছ ভাবে উল্লেখ করতে গিয়ে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে, অথবা শঠতা করেছে অথবা পাশ কাটিয়ে গেছে। ইসলামের আইন তথা 'শরীয়ত' তাকওয়া বা আল্লাহ্-ভীতির উপর নিখুঁতভাবে প্রতিষ্ঠিত বিধায় এই আইন চালু থাকাকালীন খোলাফায়ে রাশেদার আমলে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম সংরক্ষণের যে সোনালি ইতিহাস রয়েছে তা সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই এখনো অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে 'শরীয়াহ্' কে আইন-পাঠক্রমে অন্তর্ভূক্ত না করায়।

একাদশ শ্রেণী থেকে যেরূপ ইসলামের ইতিহাস, ইসলামিয়াত ও ইসলামী সংস্কৃতির কোর্স মাস্টার্স পর্যন্ত চালু রয়েছে, তেমনি Islamic law বা ইসলামের আইন শাস্ত্র শীর্ষক পূর্ণ কোর্সও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকে চালু করা অপরিহার্য।

দ্বিতীয় ভাষা

এবার দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা প্রসংগ। ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের নিরিখে এই কমিটি ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ রেখেছে। (৫.৩ অনুচ্ছেদ, পৃ ঃ ৪৩) বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে 'আরবি' ভাষা শিক্ষাকে প্রতিবেদনে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের সুপারিশ না করাটা একটা চরম অবিচার হিসাবে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করা যায়। মাদ্রাসা শিক্ষায় বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম এবং প্রয়োজন বোধে আরবিও শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে উল্লেখ করে প্রতিবেদনটি আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি কিঞ্চিৎ মর্যাদার ভাব প্রদর্শন করেছে বৈকি! (সুপারিশ ৪. অনুচ্ছেদ, পৃঃ ১৪ দ্রষ্টব্য)

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় (উদাহরণ স্বরূপ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২.৩, পৃঃ ৪০) শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করার তাগিদ দেয়া হয়েছে প্রতিবেদনটির অনেক স্থানে। এ যুদ্ধের চেতনা বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে কখনো বা পরিকল্পিতভাবে দ্বান্দ্বিক তথা প্রতিহিংসাপরায়ণ আচার-আচরণ জীয়ে রাখা হচ্ছে যা' এখনও বিরাজমান থাকায় এর একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা তোলে ধরা একান্ত উচিত ছিল প্রতিবেদনটিতে। এই রূপরেখা না থাকায় ঘর ও বাহিরের শত্রুদের লালিত

www.pathagar.com

প্ররোচনায় মুক্তিযুদ্ধ চেতনার বাকবিতান্ডায় দেশ যে সদা গৃহ যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে সে কথা বলাই বাহুল্য। "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা" এর বুলি কপচিয়ে দেশের সার্বভৌম বিরোধী ও ইসলাম বিদ্বেষীরা ইসলাম-বিহীন এমনকি ইসলাম বিরোধী শিক্ষা প্রবর্তনের অপচেষ্টা যে চালিয়ে যাচ্ছে নিরন্তর তাও দেদীপ্যমান।

কমিটির ধন্যবাদর্হ বিষয় সমূহ

ক. ৫ম শ্রেণী শেষে বৃত্তি পরীক্ষা, অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা–এই দুটি স্তর প্রাথমিক স্তর হিসাবে নিরূপণ

খ. সরকারি কমিশনের অনুরূপ পৃথক শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন প্রতিষ্ঠা

গ. নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর নির্ণয় করণ ----- ইত্যাদি।

ঘ. শিক্ষার মাধ্যম বাংলা নির্ধারণ এবং কোচিং ও প্রাইভেট টিচিং সহ নোটবই, গাইড বই ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ

ঙ. মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সমমানের করন

চ. পাবলিক পরীক্ষায় আন্ত পরীক্ষা ২০%, বহি পরীক্ষা ৮০% (রচনামূলক ৩০%, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৩০% নৈব্যক্তিক ২০%) প্রস্তাবনা

ছ. শিক্ষক ছাত্র অনুপাত প্রাথমিক স্তরে ১ঃ ৩৫, মাধ্যমিক স্তরে ১ ঃ ৪০ বিবেচনা করন

জ. মেরিট বাদ দিয়ে গ্রেডে ফল প্রকাশ করণ

ঝ. শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মর্যাদা, সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি সহ শিক্ষক সমাজের উন্নয়ন পরামর্শ ইত্যাদি সুপারিশমালা অবশ্য ধন্যবাদার্হ।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সবশেষে স্মর্তব্য ঃ পরিকল্পিতভাবে একটি জাতির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সেই জাতির ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নিরিখে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এদৃষ্টিতে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি বাংলাদেশের ধর্ম-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের নিরিখে প্রতিফলিত হয়নি।

বাংলাদেশের শতকরা ৯০ জন মুসলমান। ইসলাম হচ্ছে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম। ইসলাম তথাকথিত ধর্ম নয় বিধায় ইসলাম হচ্ছে Complete code of life বা মানবজাতির সার্বিক জীবন-বিধান। ইসলামকে ভিত্তি করেই এদেশের ধর্ম এবং এর ভিত্তিতে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্ফূরণ এবং বিকাশ ঘটেছে

www.pathagar.com

এবং ঘটছে। জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি এই বাস্তব ঐতিহাসিক সত্যটি উপেক্ষা করে তথাকথিত ধর্মের ভূষণে ইসলামি শিক্ষাকে দ্বিতীয়-শ্রেণী পর্যন্ত সীমিত রেখেছে, এবং অষ্টম শ্রেণী থেকে এটাকে ঐচ্ছিক বিষয়-হিসাবে সন্নিবেশ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের প্রতি অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী আচরণের ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত রেখেছে।

দ্বিতীয়ত, অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত রাখার সুপারিশ করা সত্ত্বেও কমিটির সদস্যবর্গ মাদ্রাসা শিক্ষার এবতেদায়ীতে ধর্ম হিসাবে ইসলামকে আবশ্যিক রাখার পরামর্শ দিয়েছে বটে, সংগে সংগে সাধারণ শিক্ষার স্তরে এ বিষয়টি তৃতীয় শ্রেণীতে আবশ্যিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে ইসলাম শিক্ষায় বৈষম্য ও বৈরী দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির বীজ বপন করেছে।

প্রস্তাবিত সুপারিশ মালা

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নণ কমিটির প্রতিবেদনে যেসব দোষত্রুটি চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর অপনোদন ও ত্রুটিমুক্তি করণের জন্যে নিম্ন পদক্ষেপ সমূহ আপাতত প্রতিকার হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

১. জাতি হিসাবে বাংলাদেশের অধিবাসীদের সঠিক পরিচয় নির্ধারণ। এদেশের শতকরা ৯০ জন মুসলমান হওয়ায় বাংলাদেশের জাতীয়তা ইসলামের ভিত্তিতে নিরূপিত হতে হবে।

২. 'জাতির জন্য শিক্ষা' এ দৃষ্টিতে শিক্ষার সংজ্ঞা ও স্বরূপ আল কোরআন ও আল হাদীসের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করতে হবে।

৩. ইসলাম যাঁরা জানেন এবং মানেন তাঁদের দ্বারা শিক্ষার Theoretical Aspect রচনা করে Technocraft হিসাবে দক্ষও পারদর্শী শিক্ষাবিদদেরকে নিয়ে Curriculum, Syllabus এবং Textbook রচনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও আকিদায় পর্যালোচনা ও মূল্যায়ণ করে এর সংস্কার করতে হবে।

৫. সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ করে Perenmial Education ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত এক ও অভিন্ন হতে হবে। পরবর্তী শ্রেণী থেকে Acquired knowledge তথা Skilled, Specialized, Professional, Vocational ইত্যাদি Education এর শাখা প্রশাখা বা বিভিন্নতা চালু করতে হবে।

www.pathagar.com

অন্যকথায়, দেশ এক, জাতি এক এবং জাতীয় সত্ত্বা-ও এক এবং অভিন্ন হওয়ার লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষা, স্কুল শিক্ষা ইত্যাদির Syllabus এবং curriculum-গত ভেদাভেদ ও বৈষম্যের অন্তত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত অবসান ঘটাতে হবে।

সবশেষে সংখ্যালঘু ও বিদেশীদের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাদেরকে সেই পরিমাণ 'স্বাধীনতা' দিতে হবে যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর কোন বিকৃত বা ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলতে না পারে। NGO ও এহেন সমাজ সেবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ এবং খবরদারী নিশ্চিত ভাবে কার্যকরী রাখতে হবে। বলা বাহুল্য এই নিয়ন্ত্রণ দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য স্বাভাবিক ক্রমেই অত্যাবশ্যক।

স্মর্তব্য, গোটা দেশের জনসম্পদের ইসলাম ভিত্তিক জ্ঞানও চরিত্রের উন্মেষও পরিচর্যা এবং হেফাজতের পবিত্র দায়িত্ব সরকার তথা রাষ্ট্রের। এ দায়িত্ব পালনে সরকারকে বাধ্য করা বা সাহায্য করার জন্য গোটা জাতিকেও অতন্ত্র প্রহরীর ন্যায় সক্রিয় হতে হবে; নইলে "শিক্ষা সংস্কারের" নামে গোটা জাতির তামদ্দুনিক স্বকীয়তা বিপথগামী হয়ে ধীরে ধীরে লয় পেয়ে গোটা দেশটাই ম্যাকলের কথায় চিন্তা ও কর্মে ভিন দেশীয় গোলাম হয়ে পড়বে; সন্দেহ নেই।

গ. জাতীয় শিক্ষা কমিশন- ২০০৩

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ণ কমিটিঃ ১৯৯৭ এর উপর বিবিধ পর্যালোচনা ও সুপারিশকে ভিত্তি করে বর্তমান জোট সরকার শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে নতুন জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩ গঠন করেন।

এই শিক্ষা-কমিশন প্রাথমিক স্তর থেকে আমাদের দেশের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের শিক্ষা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে রিপোর্ট পেশ করছেন। বিশেষ করে জাতি হিসেবে এই কমিশন আমাদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা সংস্কারের দিক নির্দেশনা দেবেন বলে জাতি একান্তভাবে আশা পোষণ করছে। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, সরকারের এ উদ্যোগ যুগপৎ প্রশংসনীয় ও সময়োপযোগী হয়েছে। কারণ পাকিস্তান আমল হতে এ পর্যন্ত ডজন খানেক শিক্ষা-কমিশনের বহু সুপারিশ ও এসব সুপারিশ মালার আংশিক বাস্তবায়ন দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় ডঃ কুদরত-এ-খুদার "শিক্ষা-কমিশন" দেশবাসী প্রত্যক্ষ করে আশাহত হয়েছে চরমভাবে। এই কমিশন শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে যে ৪টি দর্শন ও আদর্শের ওকালতি করেছে তা শুধু 'কিম্ভুত' কিমাকার'ই নয়; বরং জাতির কর্ণধার হিসেবে আমাদের উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণী চিন্তার ক্ষেত্রে যে কী চরম অযোগ্যতা বা দ্বন্দ্বে ভুগছেন তা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। জাতির আদর্শ হিসেবে (১) জাতীয়তাবাদ, (২) সমাজতন্ত্র, (৩) গণতন্ত্র ও (৪) ধর্ম

www.pathagar.com

নিরপেক্ষতা বাদের ভিত্তিতে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার যে সুপারিশ জানানো হয়েছে এর একটিও অপরটির পরিপূরক বা সহায়ক নয়; এই ৪টি দর্শন পরস্পর পরস্পরের বিরোধী ও অনেক ক্ষেত্রে চরম সংঘর্ষমুখীও। বিশ্বের কোথাও এহেন বিপরীত ও সংঘর্ষমুখী ৪টি আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা তথা জাতীয় আদর্শের নজির নেই। তাই বিপুল সময় ও অর্থ ব্যয় করে 'কুদরত-এ-খুদা' শিক্ষা কমিশন যে সত্যটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা দেশের চিন্তা-নায়ক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের জাতীয় দৃষ্টিকোণ দেশ ও দেশপ্রেমের চিন্তা ও জ্ঞান-রাজ্যে তাদের দৈন্য ও দেউলিয়াপনার চরম ও লজ্জাস্কর একটি নজীর।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ও সম্মানিত। সুতরাং এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে কেন্দ্র করে এদেশের শিক্ষা, দর্শন ও শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার কি ধরণের হওয়া উচিত সে সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত নিম্নে করা হলো।

শিক্ষা মানুষের জন্যে। সুতরাং শিক্ষা জগতে মানুষের সংজ্ঞা ও পরিচয়ের পূণর্মূল্যায়ন হওয়া আত্যাবশ্যক। মানুষকে বর্তমান তথাকথিত সভ্য সমাজ Rational animal বলে আখ্যায়িত করেছে। অথচ মানুষের যে Morality বা নৈতিকতা বলতে অমূল্য সম্পদ রয়েছে; যার জন্যে মানুষ, পশু ও ইতর প্রাণী থেকে পৃথক হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, এর স্বীকৃতি 'ভিত্তি' হিসেবে বর্তমান শিক্ষায় নেই বললেই চলে। ফলে আধুনিক শিক্ষায় মানুষ যত শিক্ষিত হচ্ছে ততই সে তার animalily ও ratianolity এর কলা কৌশল অবলম্বন করে গোটা বিশ্বে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপপ্রায়স পাচ্ছে বেপরোয়াভাবে। 'প্লেন হাইজ্যাক থেকে শুরু করে শ্লীলতা হানি শেষে নারী হত্যা ও এসিড নিক্ষেপের আতংকে আজ নিরীহ মানুষ শংকিত। তাই শিক্ষার অঙ্গনে "মানুষের পরিচয়' "Moral Being" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। "Man is a rational animal" এর সংজ্ঞাটুকুকে Man is basically a moral being-এ পরিণত করে মানুষ ও মানবতার উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হওয়ার চেষ্টাই শিক্ষা-কমিশনের প্রথম কাজ হওয়া উচিত; শিক্ষার Core বা মূল হিসেবে এর প্রতিষ্ঠাও অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত ঃ বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য এই দেশের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠদের ইতিহাস, ধর্ম ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও স্ফূরণে নির্ণীত হওয়া যে অত্যাবশ্যক তা পূর্বে ও উল্লেখ করা হয়েছে। এই গণতান্ত্রিক ও বাস্তব সত্যটুকু অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে জাতি হিসেবে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সাথে বেঈমানী করা। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশের মানুষ মুসলমান হওয়ায় এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মের প্রাণকেন্দ্র

www.pathagar.com

'ইসলাম'। নিছক ধর্ম অর্থে নয়, বরং গোটা জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নার্থে ইসলাম-কে ভিত্তি করে এদেশের জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য স্থির করা অবশ্য কর্তব্য। এভাবে স্থিরকৃত জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষা-কমিশন বাংলাদেশের শিক্ষা-রিপোর্ট প্রণয়নে যোগ্যতা ও প্রশংসার স্বাক্ষর রাখছে–এটাই জাতি একান্তভাবে প্রত্যাশা করছে।

শিক্ষা মূলত আত্মিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবেদিত হওয়ার কথা। দেহের উপর আত্মার বিজয় তথা বস্তু জগতকে নৈতিকতা ও ধর্মীয় বোধে পরিচালিত করার ও উৎকর্ষ সাধনের শিক্ষাদানই হচ্ছে শিক্ষার প্রকৃত প্রাণ। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চরিত্রবান মানুষই সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর দুনিয়াতে রেখে যান। দেহ অপেক্ষা আত্মার উৎকর্ষ সাধনে বিশিষ্ট মহাপুরুষরাই যুগে যুগে জন্ম দিয়েছেন কল্যাণকর সভ্যতা ও সংস্কৃতির। সুতরাং শিক্ষাকে প্রধানত Job Oriented করার যে তীব্র প্রচেষ্টা অধুনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, অথবা বিজ্ঞান ভিত্তিক ও বৃত্তিমূলক করার যে প্রবণতা পরিদৃষ্ট হচ্ছে, এর সাথে আত্মার উৎকর্ষ সাধনের প্রশস্ত কর্মসূচি না থাকলে বিশ্বে আবির্ভাব ঘটবে হিটলার-মুসলিনীর মতো ডিক্টেটরদের। জন্ম নেবে 'মীরজাফর' ও 'ঘষেটি বেগম' চরিত্র অগুণিত। 'আনবিক' 'নাপাম-বোমা' থেকে শুরু করে 'হাতবোমা' নিক্ষেপের কাজে বর্তমানে অহরহ যারা নিয়োজিত রয়েছে, বলতে গেলে তারা অধিকাংশই বর্তমান শিক্ষার বিষ-ফল, সমাজ বৃক্ষের মাকাল-ফল সদৃশ "বুশ দ্যা জুনিয়র"। শিক্ষা-কমিশনের এ সত্যটুকু সতর্ক সংকেত হিসাবে উপলব্ধ হওয়া উচিত। দেহের সাথে আত্মার যেরূপ অবিভাজ্য অথচ ভারসাম্য-সম্পর্ক বিদ্যমান, তেমনি বর্তমান শিক্ষায় বস্তুতান্ত্রিকতার সাথে নৈতিকতা তথা ধর্মীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য সংমিশ্রণ যেন থাকে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। Man can not live by bread alone ঃ শুধু রুটি রোজগারের জন্যেই পৃথিবীতে মানুষের আগমন ঘটেনি। নৈতিক সত্তার ভিত্তি-ই-হচ্ছে তার জীবন ও সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি ও শান্তির উৎস। পুনশ্চ স্মর্তব্য বাংলাদেশ একটি জাতির স্বাতন্ত্র্য আবাসভূমি। অথচ এ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, এদেশে উক্ত স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি অপেক্ষা কুটিল বিভেদ সৃষ্টির জন্যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এক দেশ হিসেবে এদেশে মোটামুটিভাবে এখনো সেই তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে ঃ

১. বাংলা মাধ্যম সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
২. ইংরেজী-প্রিয় কিন্ডার গার্টেন ও বিদেশী ইংলিশ ও মিশনারি স্কুল।
৩. মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

www.pathagar.com

এই তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার বিষয় বস্তু, শিক্ষা পরিবেশ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি বহুলাংশে শুধু বৈসাদৃশ্যমূলকই নয়, বরং কোথাও কোথাও চরমভাবে সংঘর্ষমুখীও। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলেও শ্রুত হচ্ছে।

উক্ত আলোকের প্রেক্ষাপটে সদ্য গঠিত শিক্ষা নীতিপ্রণয়ন কমিটির নৈতিক ও জাতীয় দায়িত্ব হচ্ছে দেশব্যাপী জাতীয় আদর্শও লক্ষ্যের ভিত্তিতে এক ও অদ্বিতীয় ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এবং জাতীয় স্বার্থের খাতিরে বিদেশী মিশনারি স্কুলসমূহকে অবিলম্বে দৃঢ় ও সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা।

মানুষের জন্ম কেন? কে তার স্রষ্টা? দুনিয়াতে তার আগমন কি উদ্দেশ্যে ঘটেছে, স্রষ্টা ও দুনিয়ার অন্যান্য সৃষ্টির সাথে তার জীবন-সম্পর্ক কি ধরনের?— এই সব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে প্রদানের ভিত্তিতেই শিক্ষার দর্শন, বিষয়বস্তু, শিক্ষাদান, শিক্ষা-পরিবেশ ও শিক্ষা পদ্ধতি নিরূপিত হওয়া উচিত। অন্যকথায় সংক্ষেপেঃ

১. মানুষ হিসেবে আমাদের সংজ্ঞা ও পরিচয় কি
২. জাতি হিসেবে আমাদের সংজ্ঞা ও লক্ষ্য কি
৩. উক্ত দু'টো প্রশ্নের সঠিক উত্তর তথা বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষার মূলনীতি ও দর্শন কি
৪. এই নির্ণীত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে কি কি বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন এবং
৫. এই পদক্ষেপ গ্রহণে প্রতিকূল উপকরণ ও পরিবেশ কি কি কি ধরণের তা চিহ্নিতকরন।

এসব প্রশ্নের যথার্থ উত্তর অনুসন্ধান ও এর ভিত্তিতে বাস্তব পথ-নির্দেশ প্রদান করাটাই হবে শিক্ষানীতি প্রণয়ন-কমিটির সামগ্রিক দায়িত্ব। অতীতের শিক্ষা-কমিশনগুলোর দ্বারা সৃষ্ট অস্পষ্টতা, বিভ্রান্তি ও সত্য বিকৃতির যাতনা ও গ্লানি যেন জাতিকে আর বইতে না হয় এই কমিটি অন্তত এইটুকু খেদমত করবে, জাতির এটিই প্রত্যাশা।

এ প্রসংগে সেই বাক্যটি পুনঃস্মরণীয় ঃ "The destiny of a nation is being shaped in the class room"— শ্রেণী কক্ষেই জাতির ভাগ্য বিরচিত হয়। সুতরাং শিক্ষার ধরণ-ধারন ও প্রকৃতির গুরুত্ব জাতিগঠনে কত যে গভীর তা এই উক্তিতে প্রোজ্জ্বল।

www.pathagar.com

Education is for all সবার জন্যে শিক্ষা। অর্থাৎ দেশের প্রতিটি নাগরিকের প্রাকৃতিক আলো-হওয়া-পানি উপভোগ করার মত শিক্ষা গ্রহণের অবাধ অধিকার রয়েছে। কবি ইকবালের সেই কথায়, "Every man has the birth right to know God" আল্লাহ্র পরিচয় তথা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগত অধিকার এই অধিকারী সার্বজনীন প্রকৃতির সম্পদের মতো।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন– ২০০৩ ঃ গঠন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

২০০২ সালের ২১ অক্টোবর-এ অনুষ্ঠিত জোট মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৩ সালের ১৪ জানুয়ারীতে শ্রদ্ধেয় প্রফেসার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানকে প্রধান করে ২৪ সদস্য-বিশিষ্ট এই জাতীয় শিক্ষা কমিশন আত্মপ্রকাশ করে। এই কমিশন ১২টি উপকমিটির সাহায্যে ৩০টি-মৌলনীতিকে ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩ প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করে। জানুয়ারি ২০০৩ থেকে মার্চ ২০০৪ পর্যন্ত প্রায় ১৪ মাস কাল ব্যাপী চিন্তাভাবনা করে ৩৪২ পৃষ্ঠায়-এ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ভূমিকা, মৌখিক নীতিসমূহ, সার সংক্ষেপ এবং ৫টি পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত রয়েছে এ-রিপোর্টের সূচনা ও উপসংহার হিসেবে।

মূল রিপোর্টটি ৩টি পর্যায়ে বিন্যস্ত

১. **সাধারণ শিক্ষা ঃ** (ক) প্রাথমিক (খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং Genral Education (গ) উচ্চ শিক্ষা– সাধারণ শিক্ষা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত।

২. **পেশাগত শিক্ষা ঃ** (ক) কৃষি, (খ) প্রকৌশল ও চিকিৎসা শিক্ষা Professinal Education রয়েছে এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. **বিশেষায়িত শিক্ষা ঃ** (ক) মাদ্রাসা শিক্ষা , (খ) নারী সমাজকে Specialized Education. মূল ধারায় আনায়ন, (গ) তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা, (ঘ) শিক্ষায় দুরশিক্ষা পদ্ধতি, (ঙ) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষা-কে এর শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

পর্যালোচনা ঃ মাদ্রাসা শিক্ষাকে বিশেষায়িত শিক্ষা হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণটি যথার্থ হয়নি। কারণ মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়বস্তু ইসলামী শিক্ষার সার্বজনীন মৌলভিত্তি। মুসলমানদের মুসলমানত্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও চরিত্র গঠনে এই শিক্ষার সার্বজনীনতা 'বিশেষায়িত শিক্ষা' হিসাবে গণ্য করায় এর কালজয়ী মর্যাদাও সার্বজনীনতা চরমভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে ; আবশ্যিক নয় বরং ঐচ্ছিক গণ্য করায় এর গুরুত্ব আরো চরমভাবে হ্রাসকৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

মৌলিক নীতি প্রসঙ্গ ঃ

রিপোর্টটি ৩০টি মৌলনীতি ভিত্তি করে বিনির্মিত। প্রথম নীতিতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে "সমগ্র জনগোষ্ঠীকে স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পদে পরিণত করা।" এই সম্পদ এর ব্যাখ্যা অপরিহার্য কারণ জাতি হিসাবে বাংলাদেশী জনসম্পদের স্বকীয় প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ শিক্ষানীতিতে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে ব্যক্ত না-থাকলে থোরবড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোর এর মতো এদেশের প্রজন্ম প্রতিনিয়ত ভিন দেশী জাতীয়তাবাদ ও আদর্শিক প্রশ্নে দুষ্টচক্রে নিপতিত হয়ে আরো দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে ভিনদেশী ষড়যন্ত্রের চরম শিকার হবে।

দশম নীতিতে একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও পূর্বের মতো "একমুখী"-এর স্বরূপ ও স্বচ্ছতা অবগুণ্ঠিত রয়েছে।

ঠিক তেমনিভাবে 'নৈতিক শিক্ষা' ও জাতীয় আদর্শ-' তথা' ইসলাম ভিত্তিক' শিক্ষাদানের উল্লেখ না থাকায় দেশজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বাস্তবতার আলোকে

'মৌলিক নীতিমালা' প্রণয়নের কোন দিক নির্দেশনা দিতে দারুনভাবে অপারগ হয়েছে এই কমিশন। মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন ও এর মাধ্যমে প্রত্যেক জাতির নৈতিক সত্ত্বা-ভিত্তিক সামগ্রিক বিকাশ সাধনের হাতিয়ারই হচ্ছে শিক্ষানীতি। সুতরাং এই দৃষ্টিতে "মৌলিক নীতিসমূহ"-এর উপর পুনর্বিবেচনা করে সুপারিশমালার প্রয়োজনীয় সংস্কার-সংশোধন ও বাস্তবায়নে ত্বরিত পদক্ষেপ একান্তভাবে কাম্য। কেননা, এসব অত্যাবশ্যক সংশোধন ব্যতীত এই শিক্ষা কমিশনের শিক্ষানীতি ও সুপারিশ কার্যকরী করা হলে তা দেশ ও জাতির সত্তা ও অস্তিত্বের বিকৃতি ও ধ্বংস সাধন করবে, জটিলতর করে তোলবে আগামী সংস্কার ও সংশোধনের চিন্তাভাবনা ও কর্মক্ষেত্রকে।

অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ

ক. প্রাথমিক শিক্ষা ঃ ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণসহ বিবিধ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রেজিস্ট্রেশনভুক্ত করাটা কমিশনের একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ, সন্দেহ নেই। তবে এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের বিষয় ও পদ্ধতি কঠোরভাবে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা অপরিহায, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের স্বার্থ সংরক্ষণ ও পরিপোষনের অমোঘ স্বার্থে। কারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর-ই হচ্ছে একটি জাতির স্বকীয় ও মর্যাদাসম্পন্ন প্রাণ-সত্ত্বার উন্মেষ ও বিকাশের লালনাগার। এই প্রসঙ্গে মকতব শিক্ষাসহ মাদ্রাসার এবতেদায়ী স্তর ও প্রাথমিক শিক্ষার স্তরের core curriculum অবশ্যই এক ও অভিন্ন হতে হবে ; অন্যথায় এদেশের কচি ও নির্মল প্রজন্ম প্রাথমিক শিক্ষা স্তরেই রাষ্ট্রীয়ভাবে অনৈক্যের শিকার হয়ে জাতির ঐক্য ও সংহতির ফাটল সৃষ্টিতে পারঙ্গম হয়ে উঠবে প্রকট ও সাবলীলভাবে।

www.pathagar.com

খ. আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষা ঃ শুধু ইংরেজি নয় বরং এর পাশাপাশি "সমমর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে" আরবী ভাষা শিক্ষাকে ও ৯ম এবং ১০ম শ্রেণী থেকে আবশ্যকীয় করা উচিত। উন্নত ও উন্নয়নশীল প্রায় দেশেই মাতৃভাষার সাথে দুটি বিদেশী ভাষা শিক্ষাদান অত্যাবশ্যকীয় রাখা হয়। তাদের মতে মাতৃভাষাসহ ৩টি ভাষা শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের উপর তেমন কোন চাপ সৃষ্টি হয় না। কারণ এই বয়সে (৮ + থেকে ২০ + পর্যন্ত) দুটি বিদেশী ভাষা শিক্ষার অনেক দিক থেকে technical এবং grammatical সাদৃশ্য রয়েছে যথেষ্ট। এই দৃষ্টিতে আমাদের দেশের মাদ্রাসা পড়ুয়ারা ইংরেজিকে 2nd foreign language এবং সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থীরা Arabic-কে 2nd language হিসাবে গ্রহণ করে অনায়াসেই এ দুটি ভাষা আয়ত্ব করতে পারে। দ্বিতীয়ত Arabic প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ মুসলিম পরিবারে চর্চিত হয় ; শুধু প্রয়োজন এর grammar এবং meaning টুকু রপ্ত করার Additional প্রচেষ্টা। ইত্যাদি দৃষ্টিতে এদুটো বিদেশী ভাষা-ই অপরিহার্য করা অসমিচীন বা অযৌক্তিক নয়।

গ. মাদরাসা শিক্ষা ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে "মাদরাসা শিক্ষা'-এর বিশেষায়িত শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত না করে সাধারণ শিক্ষায় অন্তভুক্ত করার জন্যে; তবে এজন্যে সুন্দর ও গতিশীল পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রম প্রণয়ন, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের বা বাংলাদেশ টেক্সটবুক সদৃশ **'মাদ্রাসা কারিকুলাম ও টেক্সটবুক বোর্ড** স্থাপন করা উচিত। এতে সাধারণ-শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত **ক.** প্রাথমিক শিক্ষা **খ.** মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা এবং গ. উচ্চ শিক্ষার যাবতীয় কার্যক্রমের সাথে মাদরাসা শিক্ষার অনুরূপ কার্যক্রমে সন্নিহতি তথা Correlation, Integration ও Fusion এর সুবিধা ও সংহতি বিরচিত হবে স্বাভাবিক গতি ও প্রকৃতিতে।

ঘ. নারীসমাজকে শিক্ষার মূল ধারায় আনায়ন 'মূল ধারায়' শব্দদ্বয়টির অন্তর্গত বিষয়বস্তুর স্বচ্ছ ও ঋজু বিশ্লেষণ একান্তভাবে প্রয়োজন। "পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজাল" থেকে মুক্ত করে ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্র- এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মর্যাদা সহকারে নারী সমাজের জন্যে কর্ম ও সেবার দ্বার উম্মুক্ত করার ক্ষেত্রে যেন নৈতিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ সংরক্ষিত থাকে, নারী-পুরুষের প্রকৃতিজাত দৈহিক-মানসিক বুদ্ধিবৃত্তিক ভিন্নতা ও সীমাবদ্ধতা ধ্বংস না হয়- এই দৃষ্টিতে "মূলধারা"-এর অবকাঠামো ও কর্ম-বিধি এবং পরিবেশ রচনা অত্যাবশ্যক। অন্যথায় তথাকথিত পাশ্চাত্যের উৎকট ও নির্লজ্জ যৌন সংস্কৃতিতে ডুবন্ত নারী সমাজের মতো আমাদের ললনা সাম্প্রদায়ও বলে বসবে : "I prefer car to a

www.pathagar.com

child"— আমি সংসার অপেক্ষা ভোগ পছন্দ করি। সম্ভোগ নয়, ত্যাগের মাধ্যমে নারীপুরুষের যৌথ জ্ঞান-চরিত্র ও প্রচেষ্টায় পুতপবিত্র সংসার ও প্রগতি নিশ্চিতের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে যেন বিচ্যুতি না-ঘটে,তা অবশ্য অবশ্যই খবরদারী করতে হবে সচেতন প্রহরী মতো : "We like to protect pure blood in our familyties for our posterity to attain all-round progress'— কারণ character is lost the nation is lost." চরিত্র গেল ত জাতিও উচ্ছন্নে গেল। এই দুশ্চিন্তায় যেন আমরা ধ্বংস হচ্ছি।

জাতির শিক্ষা ব্যবস্থাই হচ্ছে জাতির credentials বা পরিচয়পত্র। এই পরিচয় পত্রে "আমরা বাংলাদেশী, আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, দর্শন ও সাহিত্য"গণতান্ত্রিক দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিচারও মূল্যায়নে মুসলিম তথা "ইসলামিক",এবং এটির প্রতিফলন একান্ত আবশ্যক। নইলে পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের মতো জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন লাঞ্ছিত ও অপাংক্তেয় থাকবে বংশপরম্পরায় প্রলয়কাল পর্যন্ত।

৩৪২ পৃষ্ঠার এই বিশাল 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-২০০৩' গ্রন্থটি মনযোগসহকারে নিরীক্ষণ করলে এটা স্বচ্ছভাবে প্রতিভাত হয় যে এটি প্রণয়নে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন ও মৌলিক অবদান অপেক্ষা অতীতের যাবতীয় শিক্ষা কমিটি ও কমিশন রিপোর্টের ছাপ ও ছোবল রয়েছে যথেষ্ট ও বহুল পরিমানে। রিপোর্টের সূচনাতেই "মৌলনীতিমালা" প্রণয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ অংশে জাতীয় মৌলিক আদর্শ ও পরিচিতির অভিব্যক্তি ঘটেনি প্রত্যাশিতভাবে। প্রতিভাত হয় এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদানের ঘাটতি ছিল। সার্থকতা তখনই সম্ভব হবে যখন দেশও জনগণ তথা দশের সাথে আন্তারকিতা বজায় রেখে শিক্ষা-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ চিন্তাবিদ ও কুশলীগণ একাজে নিয়োগ পাবেন-তখনই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের সঠিক আনন ফুটে উঠবে।

ঙ. কিন্ডারগার্টেন সমাচার ঃ উল্লেখ্য কিন্ডারগার্টেন এদেশের শিক্ষাব্যবস্থারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সূত্র থেকে বাংলাদেশের কিন্ডারগার্টেন ও সমপর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর যে চিত্রটি পাওয়া যায় এর কতিপয় দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গের বিচার্য। এদেশের কিন্ডারগার্টেনগুলোর চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ

১. English medium elementary school, KG School.
২. Both English and Bengali medium KG Schools.
৩. Bengali medium KG School.
৪. Madrasa attached/administred KG School.
৫. Islamic Kindrgartens

www.pathagar.com

- বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রায় ৩% কিন্ডারগার্টেনে পড়াশুনা করছে। এদের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ।
- কে.জি. ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৯ হাজার
- এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। এদের মধ্যে ৮০% শিক্ষকই অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং এদের ৭০% এর কে. জি. শিক্ষা সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।
- **টুইশন ফি বা ছাত্র-বেতন ঃ** এক্ষেত্রে কোন নিয়ম বা নীতিমালা নেই। মাসিক টুইশন ফি ৫০০/- টাকা থেকে ৩০০০/- টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্কের রয়েছে।
- **শিক্ষক নিয়োগ ও বেতনক্রম ঃ** ছাত্রদের টুইশন ফি এর মতো শিক্ষকদের মাসিক বেতনের ও কোন নিয়ম-কানুন বা বেতনক্রমের স্বচ্ছ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। শিক্ষক নিয়োগের ও কোন বিধিমালা চালু নেই।

চ. পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি ঃ ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে কিন্ডারগার্টেনগুলোর কোন নির্দিষ্ট পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি ছিলনা। নব্বই-এর দশকে Association গঠনের মাধ্যমে এইক্ষেত্রে Uniformity আনার চেষ্টা চালানো হয় বটে তবে ইংরেজি মাধ্যম, বাংলা মাধ্যম ও ইসলাম-ভিত্তিক তথা আদর্শিক দৃষ্টিকোন থেকে পার্থক্য থাকায় সামগ্রিকভাবে কিন্ডারগার্টেন-জগতে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির পূর্ণ শৃংখলা ও uniformity অর্জন সম্ভব হয়নি। ফলে পাঁচমেশালী পাঠক্রম-**সরকারি সিলেবাস, বিদেশী ইংলিশ স্কুলের সিলেবাস, মনগড়া সিলেবাস**-এই তিন ধরনের সিলেবাসের মিশ্রণে অধিকাংশ কেজি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। আভিজাত্য বা স্ট্যান্ডার্ড প্রদর্শনের জন্য দামী বিদেশী ইংরেজি বইপত্র বিশেষ করে ভারত ও ইংল্যান্ডের টেক্সট বই মেধা যাচাই নির্বিচারে ও রেপরোয়াভাবে পাঠ্য করা হচ্ছে প্রায় স্কুলগুলোতেই। বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে এগুলোর-স্বতস্ফূর্ত ইতিবাচক সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

ছ. কিন্ডারগার্টেনের মান বিবেচনা ঃ এসম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের মন্তব্যটি লক্ষ্যণীয়।

"Though the concept of KG schools grows out of noble intentions, there are not many schools that have been able to achieve this level of credibility. The reasons are that the management and teachers of these KG schools seldom get

www.pathagar.com

necessary training, and mangagement generally establishes these schools with profit making intention." — অর্থাৎ টাকা রোজগারের জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের অনেক মালিক শিক্ষার মান' ধ্বংস করে দিচ্ছেন। প্রকাশিত ২০০৩ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেও অনুরূপ মন্তব্য রয়েছে। কমিশনের মতে সরকারী কোন নিয়ন্ত্রণ নেই বলে এই দশা ঘটছে। ইংরেজির উপর অহেতুক চাপ সৃষ্টি ও বিদেশী আদর্শের চাকচিক্য ও মোহ এসব প্রতিষ্ঠানকে অবনতিশীল করছে বলে কমিশন মন্তব্য করেছে।

বাদশা ফয়সল ইনস্টিটিউট ঃ প্রথম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের প্রথম কিন্ডারগার্টেন হচ্ছে বাদশাহ্ ফয়সল ইনষ্টিটিউট।

বিগত কতপিয় শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষানীতির ব্যর্থতা ও কুটিলতায় যখন গোটা দেশের শিক্ষা ভুবনে নৈরাজ্য সৃষ্টি হলো তখন বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে আবির্ভূত হলো বাদশাহ্ ফয়সল ইনষ্টিডিট। এর জন্ম-পটভূমি সংক্ষেপে এইঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্য দর্শনে ধর্মভীরু মুসলমানদের হৃদয়-রাজ্যে সূচিত হলো নবচিন্তা-অনুধ্যানের ফল্গুধারা। ১৯৭৫ সনের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষানুরাগী মরহুম আব্দুল খালেক সাহেব তাঁর কতিপয় আত্মীয়-স্বজন ও সুধীশ্রেণীর বন্ধু-বান্ধবদেরকে নিয়ে একটি বৈঠক ডাকেন। এ বৈঠকের বিশেষ অভিমত ছিল এই যে, (তদানীন্তন সময়ে) গোটা বাংলাদেশে যে ধরনেরে শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ বিরাজমান তাতে কোন চিন্তাশীল শিক্ষক-অভিভাবকই এর সমর্থনও দর্শনে আর কালক্ষেপণ করতে পারেন না। অতএব নিদেনপক্ষে নিজেদের ছেলেমেয়েদেরকে দিয়ে হলেও একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে চালু করা দরকার। এ ধরণের চিন্তায় যখন এঁরা পীড়িত, ঠিক সে সময়েই সৌদি আরবের বাদশাহ্ ফয়সল শাহাদাত বরণ করেন। এ মহান ইসলামী ব্যক্তিত্বের আকস্মিক শাহাদাত জনাব আব্দুল খালেক সাহেব ও তাঁর সহচরদের মধ্যে অধিকতর নবতর আদর্শিক উদ্দীপনা ও চেতনার সঞ্চার করে। এই চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নভেম্বর ১৯৭৪ সালে 'বাদশাহ্ ফয়সল ইনস্টিটিউট' নামে সর্বপ্রথম একটি ইসলামী কিন্ডারগার্টেন রাজধানী ঢাকার বুকে মুহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজে বিল্ডিং -এ মর্ণিং স্কুল হিসেবে, মাসিক দু'হাজার টাকা ভাড়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

www.pathagar.com

ক. বাদশাহ্ ফয়সল ইনস্টিটিউটের উৎস আদর্শ কিণ্ডারগার্টেন ঃ

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে তদানীন্তন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যে ইসলামী জোশ ও চেতানার সৃষ্টি হয় তা জাগরূক রাখার প্রয়াসস্বরূপ পরবর্তী বছর ১৯৬৬ সালে রাজধানী ঢাকার নাখালপাড়ায় 'আদর্শ কিণ্ডারগার্টেন' নামে একটি শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধসূচনার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ইসলামী চেতনা-বিধৃত শিক্ষাদানে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সবাই ঢাকার অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষায় ১ম হতে ১০ম স্থান অধিকার করে অনায়াসেই ভর্তি হতে পারত। 'আদর্শ কিণ্ডারগার্টেনের' ছাত্রছাত্রী পরিচয়টুকুই অনেক সময় ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টিকরে দিয়েছিল। 'বাদশা ফয়সল ইনস্টিটিউটের' কর্তৃপক্ষ এই 'কিন্ডারগার্টেনের' অনুরূপ দ্বিতীয় সংস্করণ হিসেবে ফয়সল ইনস্টিটিউট গড়ার সিদ্ধান্ত নেন। এটি গড়ার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য ও স্বীয় বাসস্থান দান করেছিলেন নাখালপাড়ার জনাব মাহবুবুর রহমান গোরহা। পরামর্শ ও সাহায্য সহযোগিতায় ছিলেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সর্বজনাব মরহুম মাওলানা আব্দুর রহীম, ডাঃ মাহবুবুর রহমান ও আব্দুল খালেক। শিক্ষকতায় নিবেদিত শ্রম ও সাধনায় রত ছিলেন ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে শাহাদাত প্রাপ্ত কাজী জহীর উদ্দীন ও শামসুজ্জামান। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে ছিল তখন এই গ্রন্থের নগণ্য লেখক স্বয়ং। অন্য কথায় বাদশা ফয়সল ইনস্টিটিউটের পরম প্রেরণার উৎস ছিল সেদিনের ঐ ক্ষুদে আদর্শ কিণ্ডারগার্টেনটি-ই।

বাদশা ফয়সল ইনস্টিটিউট ১৯৭৪-এর নভেম্বর মাসে কাগজ-কলমে এবং ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বাস্তব রূপলাভ করে। ইনস্টিটিউটের সূচনাতেই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি হিসেবে জনাব ফারুকুল ইসলাম, সভাপতি হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব মরহুম আলহাজ্ব এ. কে. এম বাকের, সহ-সভাপতি হিসেবে ইনস্টিটিউটের স্বপ্নদ্রষ্টা মরহুম আব্দুল খালেক ও বাংলাদেশ টি.এন্ড.টি-এর তদানীন্তন সেক্রেটারী জনাব মরহুম লোকমান হোসেন। এছাড়া বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনের সদস্য ডাক্তার সামসুদ্দৌলা (বর্তমানে লণ্ডনে আছেন), ডাক্তার মোহাম্মদ ইদ্রীস (বর্তমানে সৌদী আরবে চাকরিরত) ও প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে এই গ্রন্থের নাচীজ লেখক।

বাদশা ফয়সল ইনস্টিটিউটই ছিল সেসময়কার সেক্যুলার বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও

www.pathagar.com

শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচিকে ভিত্তি করে সম্প্রতি শুধু ঢাকা শহরেই তখন প্রায় ৩০/৩২ টি ইসলামী কিণ্ডারগার্টেনের জন্ম হয়। (১৯৭৬–৭৯ পর্যন্ত) বর্তমানে এ সংখ্যা ৫০০ এর মতো।

বাদশা ফয়সল ইনস্টিটিউট শুধু প্রথম ইসলামী কিণ্ডারগার্টেনই নয়; বরং ইহা প্রথম আবাসিক কিন্ডারগার্টেনও। এ প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি কলেজে উন্নীত হয়েছে। জনাব এ. কে. এম, ফরিদ উদ্দিন খান ক্রমানুসারে চতুর্থ অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ পেয়ে এক দশকের অধিকাল যাবৎ সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ঢাকা বিভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসাবেও তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন। ১৯৯৫ সালে এই স্কুলটি-ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুনাম অর্জন করে একই বছরে।

আরবি ইসলামিয়াত চালুকরণঃ এই ইনষ্টিটিউটে ইসলামী কিন্ডারগার্টেনের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার জন্যে শিশু বা নার্সারি শ্রেণী হতে বাংলা, অঙ্ক এবং ইংরেজিসহ আরবি এবং ইসলামিয়াতকে বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। অধুনা দেখা যাচ্ছে যে, দেশের ইসলামিক সেন্টিমেন্টের ক্রমবর্ধমান ধারা দেখে অনৈসলামী কিণ্ডারগার্টেনগুলোতে ছাত্রসংখ্যা বাড়ানোর জন্যে বিশেষ করে ইংলিশ মিডিয়াম বা ইংলিশ চালচলনে অনুরক্ত দেশী-বিদেশী কিন্ডারগার্টেনগুলাতেও আরবি এবং ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। 'মার্গারেট' ফ্লাওয়ারস', 'জুয়েলস', 'সানরাইজ' ইত্যাদি নামকরণ বিশিষ্ট প্রায় কিন্ডারগার্টেনগুলোতেই এখন ধর্মীয় শিক্ষাকে যদিও (পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম নয়) শিশু শ্রেণী হতে বাধ্যতামূলক করার কসরত চালাচ্ছে। কারণ এদেশে ইসলামের নামে প্রতারণা করা হলেও 'ইসলাম' বাদ দিয়ে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। "শো' হিসেবে হলেও এর অভিনয় অনস্বীকার্য।

খ. স্কুল অব ইসলামিক রিসার্চ এণ্ড এডুকেশন

বাংলাদেশের কিন্ডারগার্টেন সমূহে শিক্ষা-পদ্ধতি, পরীক্ষা, পুস্তক প্রণয়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে ঐক্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণে এই সংস্থাটি বাংলাদেশের প্রথম গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকার গুলশানে ।

দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী কিন্ডারগার্টেনসমূহকে একটি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল নীতিমালায় পরিচালনার প্রয়াসে সেসময়ে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় প্রতিষ্ঠান নিয়ে ঐক্য সৃষ্টির পদক্ষেপ নেয়া হয়। স্কুল অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড এডুকেশন সংস্থা। এ সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ঃ

১. প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও বিষয়বস্তুর উপর, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব ও বাংলাদেশের শিক্ষার উপর পর্যালোচনা ও সংস্কার করা

www.pathagar.com

২. ইসলামী শিক্ষাবিদ, চিন্তাশীল ও গবেষকদের মধ্যে চিন্তার উৎকর্ষ বিধান ও সমন্বয়ে সাহায্য করা

৩. শিক্ষাকে ইসলামীকরণে ও আর্থিক সাহায্য দান ও গবেষণায় সহযোগিতা করা

৪. শিক্ষার উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ, রচনাদি প্রকাশনার জন্যে তহবিল গঠন ও পত্রিকা ছাপানো।

স্কুল অব ইসলামিক রিসার্চ এণ্ড এডুকেশনের কৃতিত্ব

১. জার্নাল অব ইসলামিক রিসার্চ এণ্ড এডুকেশন নামে একটি মূল্যবান পত্রিকার দুটি সংখ্যা প্রকাশ করে।

২. এ প্রতিষ্ঠানের সরাসরি ও মাধ্যম প্রচেষ্টায় তিনটি স্বল্পকালীন আন্ত-সার্ভিস শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং একটি প্রাণবন্ত শিক্ষা কর্ম শিবিরের আয়োজন করা হয়। এ ধরণের প্রশিক্ষণের ঐতিহ্য সৃষ্টি করে।

এসব কর্মকাণ্ডে ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদগণ সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ, তথ্যবহুল বক্তৃতা প্রদান করেন। ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টির সহায়ক অনুশীলনী ক্লাস (Practice Teaching)-ও এতে নেয়া হয়। রাজধানী ও শহরতলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৭০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

৩. ১৯৮১ এবং ১৯৮২ সনের শিক্ষাবর্ষের জন্যে বাংলাদেশের সব কিন্ডারগার্টেনের জন্য একটি আদর্শ বুকলিস্ট প্রণয়নও চালু করা হয়।

৪. এ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ ও সহযোগিতায় 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন কো অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করেছিল এবং এই গ্রন্থের লেখক কর্তৃক প্রণীত 'ইসলামিক কিন্ডারগার্টেনঃ রূপরেখা ও বাস্তবায়ন' নামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেও চলতি ২০০৫ -এ এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৫. এ প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশিত ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত কতিপয় পাঠ্য-পুস্তক বিভিন্ন ইসলামী কিণ্ডারগার্টেনের বুকলিস্টে তালিকা ভুক্ত করে ইসলামী পাঠ্যপুস্তকের লেখক-লেখিকাদেরকে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে। অধুনা এ প্রতিষ্ঠানটি সনাতন প্রথাগত বিদ্বেষমূলক দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্যের কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

গ. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ও ইলামিক এডুকেশন সোসাইটি

এ দুটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টার যথাক্রমে জনাব প্রফেসর এ, কে, এম, নাজির আহম্মদ ও প্রিন্সিপ্যাল মোহাম্মদ আবদুর রব। এ দুটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রচলনের আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই দুটো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য নিম্নরূপ ঃ

১. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

২. গবেষণামূলক ইসলামী সাহিত্য রচনা

৩. নিয়মিত ইসলামী পত্রিকা

৪. ইসলামী পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন

৫. আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা

–ইত্যাদির মাধ্যমে গোটা বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা পরিবেশ রচনার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে।

ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে দেয়া হলো।

* সম্ভাব্য সকল উপায়ে জন সাধারণের মাঝে ইসলামী শিক্ষার প্রসার
* সাধারণ শিক্ষার উপর বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষার উপর গবেষণা
* শিশু-কিশোরদের জন্য উন্নততর শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকল্পে আদর্শ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
* সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, শিক্ষা সম্মেলন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করণ
* ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সহায়ক সাময়িকী, ম্যাগাজিন, বই-পুস্তক ইত্যাদি প্রণয়ন ও প্রকাশ, যেমন ঃ

১. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কুরআন, সুন্নাহর মূলনীতি ও ইসলামী মূল্যবোধ, ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোকে কারিকুলাম ও সিলেবাস তৈরি করা।

২. দেশ-বরেণ্য শিক্ষাবিদ, লেখক, সাহিত্যিকদের দ্বারা শিশু-কিশোরদের উপযোগী ইসলামী সাহিত্য, টেক্সট বুক ও রেফারেন্স বুক তৈরি এবং প্রকাশ করা। এই পর্যন্ত সোসাইটি ৮৯টি বই প্রকাশ করেছে।

* যোগ্য শিক্ষক তৈরি ও শিক্ষকদের মানোন্নয়ন এবং ছাত্রদের মাঝে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী তৈরির কলা-কৌশল শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে প্রতি বছর ইংরেজি, আরবি, সাধারণ বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা বাস্তবায়ন করা।

www.pathagar.com

* জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্য পুস্তক পর্যালোচনার জন্য রিসার্চস্কলার সহ দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদের নিয়োজিত করা।
* ইসলামী আদর্শ, চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধের আলোকে বাংলা, ইংরেজি, আরবি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক তৈরির জন্য শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, লেখক, ইসলামী চিন্তাবিদদের নিয়োজিত করা এবং তাদের রচিত বই সমূহ প্রকাশ করা।
* শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।
* শিক্ষাবিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভার আয়োজন করা।
* স্কুল ও মাদ্রাসার পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মেধা পরীক্ষার মাধ্যমে আই. ই. এস. স্টাইপেণ্ড চালু করা। ইত্যাদি।

উল্লেখ্য ঃ এ পর্যন্ত যা বলা হল–তা সবই বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এগুলোর মাধ্যমেই বাংলাদেশের জনজীবনে ইসলামী শিক্ষার মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় চেতনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। ইদানিং যুব সমাজের মধ্যে যেমন ইসলামী ছাত্র শিবির, ইসলামী যুব শক্তি, মুসলিম ছাত্র যুবলীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের মধ্যেও ইসলামী শিক্ষার দৃঢ় চেতনা জন্মলাভ করেছে। তাছাড়া শিক্ষার উপর পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ, ম্যাগাজিন, সাহিত্য প্রকাশ এবং প্রচারণায়ও এদের অবদান রয়েছে বিপুল।

ঘ. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সরকারি পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৫ সালে প্রবর্তিত অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের 'ইলামিক একাডেমি'কে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' নামে রূপান্তরিত করা হয়। এশিয়ার প্রখ্যাত মসজিদ বায়তুল মুকাররমও এর আওতাভুক্ত। জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করার উদ্দেশ্যে সরকার এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট রয়েছেন।

ইসলামী শিক্ষার পুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠাকল্পে ফাউণ্ডেশন যেসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে তন্মধ্যে ঃ

১. ইসলামী সেন্টার, একাডেমি ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
২. মসজিদ সহ উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সাহায্য দান;

www.pathagar.com

৩. দর্শন, বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা;

৪. ইসলামী বই-পুস্তক, সাহিত্য ও প্রবন্ধাদি প্রকাশনা;

৫. ইসলামী গবেষণা ও ইসলামিক স্টাডিজে অধ্যয়নরত গবেষক ও ছাত্রদেরকে বৃত্তি প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রত্যেক বিভাগ ও জেলা সদরে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করেছে। তাছাড়া ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য ও এর প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে ইমাম প্রশিক্ষণের কোর্সও ফাউণ্ডেশন চালু করেছে। ইসলামী সাহিত্যের বিকাশ ও প্রসারকল্পে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরি' নামে একটি মনোরম পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এ পাঠাগারটিকে জাতীয় ইসলামিক পাঠাগার হিসেবে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত সম্প্রতি বাস্তবায়িত হয়েছে।

চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ইসলামী গবেষকদের সাহায্যকল্পে কুড়িটি গ্রন্থে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের কাজও ফাউন্ডেশন সম্পন্ন করেছে। বিগত হিজরী১৪শত বর্ষের পূর্তি উৎসব উপলক্ষে ফাউণ্ডেশন কর্তৃক দুটি সংক্ষিপ্তকারে ইসলামী বিশ্বকোষ সহ প্রায় ২৫০টি ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রন্থজগতে এই বিপুল ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশনা জনমনে শুধু ইসলামী চেতনাই সৃষ্টি করেনি; বরং এর মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য সম্ভারের এক নতুন জগতও উন্মোচিত হয়েছে এদেশের সুধী বিদগ্ধ জনের চিন্তার দিগন্তে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এহেন বিপুল অবদানে যাঁর প্রচন্ড খাটুনি, শ্রম ও মেধার স্বাক্ষর রয়েছে, তিনি হচ্ছেন সেসময়কার ফাউণ্ডেশনের পরিচালক জনাব এ. জেড, এম. শামসুল আলম। জাতি এজন্য অবশ্যই তাঁর নিকট গভীরভাবে ঋণী।

সরকারি সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় ফাউণ্ডেশন 'ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির' ক্ষেত্রেও বিপুল প্রশংসনীয় অগ্রগতি সাধন করে যাচ্ছে। ১৯৮০ সনের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন' এর অনুপম প্রমাণ। এ সম্মেলনের একটি রিপোর্ট 'আধুনিক বিশ্বের ইসলামী শিক্ষা গতি ও প্রকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক, কৃতিত্ব। ইতোপূর্বেও ১৪০০ হিজরী বর্ষের উদযাপন উপলক্ষে এ প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য ইসলামী সাহিত্য, প্রবন্ধ, কবিতাও ছাপানো হয়েছে এবং জনসাধারণ যাতে এসব পুস্তক সুলভ মূল্য কিনতে পারে তার জন্যে বইয়ের দামও যথেষ্ট কম রাখা হয়েছে।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, ঢাকার বুকে মুসলিম বিশ্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র" স্থাপন বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের অনুকলে ফাউন্ডেশনের আর একটি বিরাট অবদান বিশেষ। যুগপৎ সরকার ও সুধী সমাজ যদি পুতপবিত্র ইসলামী শিক্ষার সার্থক রূপায়ণে একাগ্রতার পরিচয় প্রদর্শন করেন, তবে অচিরেই বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ইলামিক রূপ নিতে বাধ্য হবে এমনিভাবে যেমনটি আগামী দিনের সূর্য উঠাটি চিরন্তন সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

ঙ. মসজিদ সমাজ

সরকারি অনুদান ও পৃষ্ঠপোষকতায় অপর যে প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে এগিয়ে যাচ্ছিল তা হচ্ছে 'মসজিদ সমাজ'।

১৯৮১ সালের আগষ্ট মাস হতে মসজিদ সমাজের বাস্তব কার্যক্রম উন্মোচিত হতে চলছিল। এর ৮টি প্রকল্প চালু ছিল। এগুলো হচ্ছে ঃ

১. মসজিদ সমাজ শিক্ষা প্রকল্প;
২. ইসলামী পাঠাগার;
৩. পুস্তক বিতরণ;
৪. ইমাম ট্রেনিং;
৫. বেকার সমস্যা নিরসনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ;
৬. আমিলুস সালিহাত বা সমাজ কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ;
৭. বাংলাদেশ লিবিয়া ব্রাদার হুডের যৌথ সহযোগিতায় নিখরচায় চিকিৎসা দান;
৮. প্রকাশনার মাধ্যমে প্রচার;
৯. সেমিনার-সিম্পোজিয়াম।

ক্ষমতা ও অর্থ-স্বার্থের কুট-চালও দ্বন্দ্বে নিপতিত এই সংগঠনটি মূমূর্ষ অবস্থায় টিকে রয়েছে অদ্যাবধি।

চ. আদর্শ কিন্ডারগার্টেন সরণে ইসলামী কিণ্ডারগার্টেন ঃ জন্ম ও এর পটভূমি

শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামী বিপ্লব সাধনে ইসলামী কিন্ডার গার্টেনের অবদান নগণ্য নয়। শিক্ষার বুনিয়াদ প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা প্রাইমারি স্কুল। তাই শিক্ষা পদ্ধতিকে ইসলামীকরণের মূল কাজ প্রাথমিক শিক্ষাস্তর হতেই শুরু হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সম্প্রতি বেসরকারি ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইসলামী কিন্ডারগার্টেনের ব্যাপক জন্ম ও প্রসার ঘটে। স্মর্তব্য, ১৯৬৬ সালের ঢাকার নাখালপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত 'আদর্শ কিণ্ডারগার্টেন' ও এর অনুসরণে ১৯৭৪ সালে

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত রাজধানী ঢাকার 'বাদশা ফয়সল ইনস্টিটিউট-ই হচ্ছে ইসলামিক কিণ্ডারগার্টেন নামক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্মের উৎস।

স্মর্তব্য, কিন্ডারগার্টেনের জন্ম জার্মানীতে। জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রেডারিক ফ্রয়েব্‌ল এর উদ্ভাবক। 'কিন্ডারগার্টেন' শব্দটিও জার্মান। এর শাব্দিক তরজমা হচ্ছে শিশুবাগ। শিশুদের হৃদয়ে জাতীয় সচেতনতা, আধ্যাত্মিক ঐক্য ও বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্য ও লক্ষে ফ্রয়েব্‌ল এ পদ্ধতি রচনা করেন। কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে গৃহসদৃশ পরিবেশে শিশুদেরকে খেলা ও গানের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। মাদার প্লে, নার্সারী ছং ও গিফ্‌ট -এ তিনটি পদ্ধতি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রতিপালনীয়। ১৮৩২ সালে ফ্রয়েবল এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তাঁর নিজস্ব আবাসিক গৃহে।

কিন্ডারগার্টেনে "প্রকৃতি পাঠ"ও অন্তর্ভুক্ত। জীবনবোধ, আত্মমর্যাদা ও পারস্পরিক সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ঐক্য সৃষ্টির জন্যে ফ্রয়েব্‌ল এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। হিটলার ও তাঁর পূর্ববর্তী জার্মান নেতৃবর্গ এবং শিক্ষাবিদগণ কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির মাধ্যমে জার্মান শিশুদের মধ্যে গভীর দেশপ্রেম ও, সামরিক শৌর্যবীর্যের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। কথিত আছে যে, এ পদ্ধতির মাধ্যমেই ক্ষুদ্র জার্মানীরা বিশ্বের দুটি মহাযুদ্ধে দেশের জন্যে অনুপম আত্মত্যাগ ও সামরিক শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে সার্থকতা লাভ করেছিল। শ্রুতি আছে, খ্যাত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের শতকরা ৪০ জন কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। আর এরই জন্যে বর্তমান বিশ্বের বৃহৎ ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রগুলোতে কিণ্ডারগার্টেন একটি অত্যাবশ্যক প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি হিসেবে জনপ্রিয়তা ও স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বাংলাদেশের আতঙ্কের বিষয়, কিণ্ডারগার্টেন, টিউটোরিয়ালস, ইত্যাদি শিক্ষা প্রণালীর আবরনে বিদেশী বিশেষ করে খ্রিস্টান সম্প্রদায় ও কতিপয় এন. জি. ও. এদেশে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির অপতৎপরতা অবাধ গতিতে চালিয়ে যাচ্ছে। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল হতে খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা এ তৎপরতা চালিয়ে আসছে গোটা পাক-ভারত বাংলাদেশ ব্যাপী। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপুল সচ্ছলতা, নৈপুণ্য-সুযোগ-সুবিধা ও উন্নতমানের শিক্ষা পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়ে শুধু দীন দরিদ্র অমুসলিম জনগণই নয়; বরং তথাকথিত ধনাঢ্য এবং বিত্তশালী মুসলমানও তাদের সন্তানকে এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে সম্প্রতি পরম আত্মতৃপ্তি ও সামাজিক মর্যাদা উপভোগ করে আসছেন। খ্রিস্টানদের এহেন মিশনারী তৎপরতায় শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে জাতি ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্যে ভারত সরকার অন্যূন দু'দশক পূর্ব থেকে বিদেশী স্কুল-কলেজগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখছে।

www.pathagar.com

অনুরূপ শংকা বিবেচনা করে মুসলমান ছেলেমেয়েকে মিশনারী স্কুলে অধ্যয়ন করা থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ইসলামিক কিণ্ডারগার্টেনসমূহের প্রতিষ্ঠা হয়। এসব কিন্ডারগার্টেনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে ঃ

১. শিক্ষার বিষয়বস্তুকে ইসলামীকরণ
২. ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সর্বপ্রথম মুসলিম হিসেবে তাদের পরিচয়-জ্ঞান দান ও তদনুযায়ী প্রত্যয়শীল করা
৩. ছেলেমেয়েরা যাতে আর ধর্মনিরপেক্ষ এবং অনৈসলামিক ভাবধারায় মন মগজ ও রুচির বিকৃতি না ঘটায়, এই ক্ষেত্রে অভিভাবকরদেকে সজাগ ও কর্তব্যপরায়ণ করে তোলা এবং
৪. সর্বোপরি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার ও জনগণকে ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে নৈতিক দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ করা ।

ছ. কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন

শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার ও তদীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ইসলামীকরণের কাজে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্যে এসব কিণ্ডারগার্টেন সম্প্রতি 'এসোসিয়েশন' বা সংস্থা গঠন করে নানাবিধ শিক্ষাক্রমের কাজে এগিয়ে যাচ্ছে। এসব সংস্থা বা এসোসিয়েশনের লক্ষ্য হচ্ছে ঃ

১. প্রচলিত শিক্ষার বিষয়বস্তুকে ইসলামীকরণ ;
২. কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইসলামি দৃষ্টিতে শিক্ষা প্রবর্তনে প্রভাবিতকরণ;
৩. ইসলামি দৃষ্টিতে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে-এসব পুস্তক অন্তর্ভুক্তির প্রয়াস চালান;
৪. ইসলামি চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকদের মাধ্যমে আদর্শ ইসলামী বই পুস্তক রচনার জন্যে একটি সংস্থা বা গিল্ড প্রতিষ্ঠাকরণ।

উল্লেখ্য প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে এসব কিণ্ডারগার্টেন ক্রমবর্ধমান শিশু শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা মেটাতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনের স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে। তাদের এ ভূমিকা একদিকে যেমন অভিভাবকদের মাঝে সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যার আশু সমাধানে নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহ সৃষ্টিতে সার্থকতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে, অপরপক্ষে এর ঈর্ষান্বিত বিপক্ষের নিকট তা হয়ে উঠেছে অসহনীয় ও বিদ্বেষকারক। অবশ্য এ জন্যে বিপক্ষীয়দের দ্বারা ইসলামী কিন্ডার গার্টেনের প্রদর্শিত কিছু দোষ-ত্রুটি যে সত্যি নয়, তাও বলা চলে না।

www.pathagar.com

কারণ ভাল-মন্দ সব জিনিসেই মিশ্রিত থাকে। সে হিসেবে সম্প্রতি সব কিণ্ডারগার্টেনই প্রশংসনীয় অবদান রাখছে কথাটা যেমন সত্য নয়, তেমনি পাইকারীভাবে সব কিণ্ডারগার্টেনই মন্দ বলাটা অসমীচীন। গড়পড়তায় এটা স্বীকার্য যে বাংলাদেশে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী কিন্ডারগার্টেনসহ অধিকাংশ কিণ্ডারগার্টেনই প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা হ্রাসকরণ এবং মান ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নে যৎকিঞ্চিৎ হলেও সরকার তথা গোটা জাতির খেদমত করছে। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৮১ সালের গোড়ার দিকে যখন গোটা বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ মাসের পর মাস একটানা ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন গোটা দেশব্যাপী প্রদমিত প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ ও আমেজটুকু তিরোহিত হওয়া থেকে সগৌরবে বাঁচিয়ে রেখেছে এসব কিণ্ডারগার্টেন।

দ্বিতীয়ত, সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষাপরিবেশের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে ইসলামী কিণ্ডারগার্টেনগুলোই বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে এক নতুন চেতনা এবং ভাবনার ফল্গুধারা রচনা করে রেখেছে। সরকার যেখানে ক্রমবর্ধমান শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সংকট নিরসনে হিমসিম খাচ্ছেন, সেখানে এসব কিণ্ডারগার্টেনের প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে একটি বিরাট স্বস্তি বৈকি! উল্লেখ্য, ১৯৭১ সনের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতির প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, তখন ১,৭৫,০০০ জন শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও ১,৫০,০০০ হাজার অতিরিক্ত শিক্ষক প্রয়োজন ছিল। কারণ মোট শিশুসংখ্যা হচ্ছে ১,২৫,৭১০০০, তন্মধ্যে ৮২,২৭৯৫০ জন অধ্যয়নরত। (১৯৮৬ সালের হিসাব) ইসলামী ও সাধারন কিণ্ডারগার্টেন সমাধানে বিপুল অবদান রাখছে বৈ কি!

এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য, জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষ কাজ করে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলে, কলকারখানায় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। সে দৃষ্টিতে কেউ যদি নিজেই একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করে রুটি-রোজগারের পথ করে নেয়; এতে আপত্তি করাটা কতটুকু বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত তা তলিয়ে দেখা দরকার। এদেশের সন্তানকে আদর্শ ও সুষ্ঠু শিক্ষা দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক নিজেই শুধু সচ্ছল ও সুন্দর জীবন যাপনের সৌভাগ্য অর্জন করছেন না, বরং আরো দশজন বেকার শিক্ষিতকে এতে চাকরি দিয়ে তিনি বেকার সমস্যারও দাপট স্তিমিত করেছেন- এটি অবশ্যই একটি পরম সত্য ও সৌভাগ্যের কথা। বলতে গেলে এ দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ডে এখানো সরকারি স্কুলগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি স্কুল ও প্রাইভেট কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাদানে নিয়োজিত রয়েছে।

www.pathagar.com

স্মর্তব্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সালের শেষদিকে ইসলামিক ও অন্যান্য কিণ্ডারগার্টেনের আয়, ব্যয়, প্রশাসন, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও টিউশন ফী ইত্যাদি সম্পর্কে জরীপ চালানোর জন্যে সামরিক পর্যায়ে একটি শিক্ষা পরিদর্শন কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি 'বাংলাদেশ ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন' ও 'বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন' এর সাক্ষাতকার নেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই 'শিক্ষা পরিদর্শন কমিটির-জরিপ-এ রিপোর্ট অনুযায়ী কিন্ডারগার্টেন গুলোর প্রতি কোন সরকারের পক্ষ থেকে অদ্যাবধি বাস্তব ও কল্যাণকর কোন নির্দেশ বা পরামর্শ দান করা হয়নি। সে সময়ে কিন্ডারগার্টেনের এ দুটি এসোসিয়েশন শিক্ষা সুপারিশমালা সম্বলিত একটি সুচিন্তিত রিপোর্ট পেশ করেছিল পরিদর্শন কমিটি সমীপে। এর মধ্যে ঃ

১. প্রতিটি কিন্ডারগার্টেনকে ভাড়াটে বিল্ডিং বা নিজস্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত নির্বিশেষে রেজিস্ট্রেশনভুক্ত করণ;
২. গুণগত মানের মানদণ্ডে সরকারি সাহায্য, অনুদান ও পরিদর্শন ব্যবস্থা করণ।
৩. টির্চার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
৪. বিদেশী মিশনারিগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিজাতীয় শিক্ষা ও ভাবধারা প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫. কিণ্ডার গার্টেনের শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ প্রদান;
৬. সাধারণভাবে প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে করের আওতা মুক্ত রাখন;
৭. ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের যদি কর আদায়যোগ্য আয় হয় তাহলে সে আয় থেকে আয়কর ডি.পি.আই, কর্তৃক আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকরণ উল্লেখযোগ্য।

দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত এসব সুপারিশের যথাযথ কার্যকরী পদক্ষেপ না নেয়ায় কিণ্ডারগার্টেনগুলো যুগপৎ অভিভাবক ও জনসাধারণের দৃঢ় আস্থা ও নিশ্চয়তা লাভে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে বেসরকারিভাবে 'বাংলাদেশ ইসলামী কিণ্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন এসব কিণ্ডারগার্টেনের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠদান পদ্ধতিও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীসহ জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় পুনর্গঠনের প্রয়াসে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ চালিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। এসব প্রচেষ্টার সাথে সরকার ও তদীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ একান্তভাবে প্রয়োজন, কারণ জাতীয়ভাবে সব ধরণের কিন্ডারগার্টেনের স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা বর্তমানে শুধু আবশ্যকীয়ই নয়, বরং এদেশের জরাজীর্ণ প্রাথমিক শিক্ষাদান- সমস্যা ও শিক্ষার আদর্শিক সংস্কার সাধনে তা অত্যাবশ্যকীয়ও।

www.pathagar.com

জ. বাংলাদেশ ইসলামিক মহিলা মহাবিদ্যালয়

প্রাথমিক পর্যায় ছাড়াও কলেজ বা মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে বেসরকারিভাবে ইসলামী মুল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়াসে এই মহাবিদ্যালয়টি এদেশে প্রথম। এ কলেজটি ঢাকার ধানমণ্ডি রোডে অবস্থিত। ইহার স্থাপনকাল ১৯৮০ সাল। প্রথমে এ কলেজটির নাম ছিল 'ঢাকা ইসলামিক মহিলা মহাবিদ্যালয়। 'পরে সাবেক' প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান "ঢাকার" পরিবর্তে "বাংলাদেশ" শব্দটি ব্যবহার করার পরামর্শ দেন, যাতে ভবিষতে কলেজটির শাখা-প্রশাখা গোটা দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

কলেজটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য

১. প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ের সাথে ইসলামী দৃষ্টিকোণ রচনার জন্যে পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিসহ শিক্ষাদান।
২. ইউনিফর্ম বা পোশাকের মাধ্যমে ইসলামী চেতনাবোধ ও মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ।

এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে শুরুতে প্রত্যেক বিভাগে-বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য ইত্যাদির সাথে ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর অন্যতম অত্যাবশ্যক বিষয় হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, অনেক ছাত্রী ভাল আরবি ও ইসলামিয়াত না জানার দরুন ভয়ে প্রথম দিকে কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে বিরত থাকে। প্রতিকার হিসেবে বর্তমানে এই ভীতিপ্রদ(?) বিষয়টিকে আর বাধ্যতামূলক রাখা হয়নি।

এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষা বেগম মনোয়ারা হাদী। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত কলেজটি ভাড়াটে ভবনে হওয়ায় সরকার এটির অনুমোদন দেননি। ফলকথা এই যে, শিক্ষার ইসলামী রূপায়ণ ও বাস্তবায়নে বর্তমানে সরকারি প্রচেষ্টা অপেক্ষা বেসরকারী ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার তৎপরতা যে ঢের বেশি ও প্রশংসনীয়, তা এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ইসলামী শিক্ষার পরিবেশ রচনা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে মাদ্রাসার অবদান ঃ

ক. বেফাকুল মাদারিসিলি আরাবিয়া বাংলাদেশ ইতিবৃত্ত

আল্লাহ পাক দুনিয়ার বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি তৈরী করার জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স) কে প্রেরণ করেন। এ জাতি তৈরি করার জন্য সার্বজনীন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভাণ্ডার কুরআনে কারীম আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করেন। বিশ্ব নবী (স)-কুরআন ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ জাতি তৈরির নিমিত্ত মক্কা শরীফের দারে আরকামে ও হিজরাতের পরে মদীনার মসজিদে নববী তৎসংলগ্ন সোফফাতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, এটাই মুসলিম জাহানে মাদরাসা শিক্ষা নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

রাসূলে আকরাম (স) মক্কা শরীফের দারে আরকাম (রা), মদীনা শরীফের মসজিদে নববী ও এবং তৎসম্মুখস্থ ছোফফায় উলূমে নবুওয়্যাতের শিক্ষার ভিত রচনা করেছিলেন এবং তা কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কিরাম ও মুসলিম মনীষীবৃন্দ সে শিক্ষার লালন ও ক্রমবিকাশ দান এবং প্রসার ঘটিয়েছেন। সাথে গ্রথিত সেলসেলাওয়ার যে সব মাদরাসা বাংলাদেশে বিদ্যমান রয়েছে এবং ইলমে দ্বীনের তা'লীম, তাবলীগ ও হিফাযতের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে চলেছে, সেই সব মাদরাসাই দরসে নিজামী মাদরাসা, কওমী মাদরাসা, দেওবন্দী নেছাবের মাদরাসা প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত এটি মাদ্রাসার সংক্ষিপ্ত উৎস কাহিনী।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার দুঃখজনক ও মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থার নিরসনকল্পে কুরআনিক আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার লক্ষ্যে সেসময়কার কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও মনীষীবৃন্দ একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি গঠনের আন্দোলনে যারা অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বজনাব মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র), হযরত মাওলানা আতাহার আলী (র), হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল করীম, হযরত মাওলানা হাজী মুহাম্মদ ইউনুস (র), হযরত মাওলানা দ্বীন মুহাম্মদ খান, (র) হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (র), হযরত মাওলানা বজলুর রহমান (র) প্রমুখ অন্যতম।

এ কমিটির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৭৯ ঈসায়ী মাসের এপ্রিল মাসে ঢাকার শায়েস্তা খান হলে অনুষ্ঠিত তিন দিন ব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে একটি বোর্ড অস্তিত্ব লাভ করে। এটাই বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের একমাত্র কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড। বাংলাদেশস্থ তৎকালীন সৌদী রাষ্ট্রদূত জনাব ফুয়াদ আব্দুল হামীদ আল খতীব এবং লিবিয়া দূতাবাসের উচ্চপদস্থ জনৈক কূটনীতিবিদের প্রেরণা ও উদ্দীপনা-ও ছিল এই বোর্ড গঠনের প্রাণ শক্তি ও চেতনা।

উল্লেখ্য, প্রাক-ব্রিটিশ যুগে বাংলার এক চতুর্থাংশ সম্পত্তি মসজিদ মাদরাসার জন্য ওয়াকফ ছিল। এটা বাংলার গৌরব। বিশ্বের কোন দেশেরই এক চতুর্থাংশ ভূমির আয় শিক্ষা খাতে ব্যয় হয় না। এ কারণে বাংলার কোন মুসলমান দরিদ্র, মুর্খ ও নিরক্ষর ছিল না। ব্রিটিশ সরকার তথা ইষ্টি ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব বিভাগ হাতে নিয়েই মসজিদ মাদরাসার জন্য ওয়াকফকৃত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা হিন্দুদের জমিদারীতে দিয়ে দেয়। এতে বাংলার মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যায়। নিবু নিবু অবস্থায় মাত্র ২/৪ টা বেঁচে যায়। প্রায় এক শতাব্দীকাল যাবত বাংলা অজ্ঞতার অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে। এরপর ১৮৩৫ সালে এক ঘোষণা বলে মাদরাসা শিক্ষাকে একেবারে রহিত করে দেয়া

www.pathagar.com

হয়। অতঃপর ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিপ্লব ও ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আন্দোলনের পর মুমূর্ষ মাদ্রাসাগুলো নবশক্তি ও নবচেতনায় পুনরায় উজ্জীবিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ এই নবচেতনা ও উজ্জীবনের স্বর্ণ ফসল।

খ. বেফাকুলের পরিচালনা কমিটি

বেফাক পরিচালনার নিমিত্তে রয়েছে গঠনতন্ত্রে বর্ণিত তিনটি মজলিস।

- ❋ মজলিসে উমূমী। বেফাকভুক্ত মাদরাসাসমূহের মোহ্‌তামেমবৃন্দ পদাধিকার বলে এর সদস্য।
- ❋ মজলিসে শুরা। মজলিসে উমূমীর সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত ১০০ জন এবং সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ১১ জনসহ মোট ১১১ জন সদস্য।
- ❋ মজলিসে আমেলা। মজলিসে উমূমী কর্তৃক নির্বাচিত ১৫ জন কর্মকর্তাও ১৬ জন সদস্যসহ মোট একত্রিশ জন সদস্য। পদাধিকার বলে এ কর্মকর্তাগণই মজলিসে উমূমী এবং শুরার ও কর্মকর্তা হবেন। প্রতি তিন বছর অন্তর মজলিসে শুরা ও আমেলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া বেফাকের বিভাগীয় কার্যনির্বাহের জন্য রয়েছে আরো অনেকগুলো বিভাগীয় কমিটি ও সাব কমিটি।

গ. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১. (ক) বাংলাদেশের প্রচলিত কওমী মাদরাসাসমূহকে একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করা

(খ) দ্বীন ইসলামের হিফাযত, তা'লীম, তাবলীগ এবং এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহর নিমিত্ত পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির দ্বার সম্প্রসারণ করা

২. কওমী মাদরাসাসমূহকে জনগণের নিকট তাদের একনিষ্ঠ ধর্মীয় খেদমতগার হিসেবে পরিচিত করানো ও তাদের প্রিয় করে তোলা, দ্বীনী শিক্ষা লাভের প্রতি দেশবাসীকে উৎসাহিত করে তোলা

৩. কওমী মাদরাসাসমূহকে বর্তমান যুগের সর্বপ্রকার ফেৎনা-ফাসাদ ও বিরোধী শক্তিসমূহের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করা

৪. কওমী মাদরাসাসমূহের তা'লীম ও তারবিয়াতের মান উন্নত করা

৫. যোগ্য মুদাররিস সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করা

www.pathagar.com

৬. মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা

৭. কওমী মাদরাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত উলামায়ে কেরামকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা

৮. দ্বীনী আরবী শিক্ষার ক্ষেত্রে কওমী মাদরাসাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি সকল মহলের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করা

৯. কওমী মাদরাসাসমূহের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের পন্থা উদ্ভাবন ও সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা

১০. কওমী মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন কল্পে বেফাকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্তরের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা

১১. আরবি ভাষা এবং রাষ্ট্রীয় ও মাতৃভাষা বাংলার প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করা এবং এ জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ. কার্যক্রম ও কর্ম তৎপরতা

১. এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের ১১৪৬ টি মাদরাসা বেফাকে যোগদান করেছে। হিফয ৯৭টি, প্রাইমারি ৫৪০টি, দারসে নেজামী ৫০৭টি। তন্মধ্যে বালিকা মাদরাসা ৮টি, কিরাআতিয়া মাদরাসা ২টি।

২. কেন্দ্রীয় পরীক্ষা গ্রহণ ঃ বর্তমানে ৭টি স্তরের বালক ও পুরুষের এবং ৪টি স্তরের বালিকা ও মহিলাদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩. সনদ ও বৃত্তি দান ঃ প্রতিটি স্তরে উত্তীর্ণদেরকে সনদ দেয়া হয় এবং মেধা তালিকার ভিত্তিতে চারটি স্তরে বৃত্তি ও ৩টি স্তরে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অধিকন্তু আরো তিনটি স্তরের যথা– তাকমীল, হিফয ও ক্বিরাআত-এর ফারেগীনদেরকে বিশেষ পুরস্কার 'দস্তারে ফযীলত" প্রদান করা হয়।

ঙ. ভবিষ্যত পরিকল্পনা

১. মসজিদ কেন্দ্রিক আদর্শ মকতব প্রতিষ্ঠা এবং এর সাথে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত কওমী প্রাইমারি শিক্ষা চালু করা

২. মকতব শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দান, কেন্দ্রীয় পরীক্ষা গ্রহণ ও পুরস্কার প্রদান করা

৩. প্রতিটি গ্রামে একটি করে কওমী প্রাইমারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা

৪. প্রতিটি থানা সদরেও একটি করে কওমী প্রাইমারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা

৫. স্থানে স্থানে ইংলিশ মিডিয়াম কওমী প্রাইমারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা এছাড়া ঃ

www.pathagar.com

* সমাজ থেকে নিরক্ষরতা ও মুর্খতা দূরীকরণার্থে মসজিদ ও মাদরাসা কেন্দ্রিক বয়স্ক শিক্ষা চালু করা
* ইসলামী কিণ্ডারগার্টেন স্কুল চালু করা
* আল বেফাক কমপ্লেক্স-এর অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত করা, যেমন ঃ

(১) একটি জামে মসজিদ, (২) বেফাকের কেন্দ্রীয় দফতর, (৩) একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, (৫) একটি প্রেস ও পাবলিকেশন্স, (৬) একটি মারকাজী দারুল ইফতা, (৭) একটি জাতীয় গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, (৮) ইত্যাদি।

*** দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা হাটহাজারী**

তদানিন্তন ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশের এতদঞ্চলের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিকতা, তাহযীব-তামাদ্দুনের অবস্থা ছিল মুসলিম মিল্লাতের প্রতিকূলে। ঈমান, আমল, তাওহীদ, রিসালাত, শরীয়ত ও দ্বীন সম্পর্কে অধিকাংশের অজ্ঞতা ছিল সর্বজনবিদিত। মুসলিম মিল্লাতের বৃহদাংশ শিরক, বিদ্আত, কবর পূজা, বৃক্ষ পূজা ও ঈমানের পরিপন্থী কুসংস্কার, হানাহানি, রাহাজানী তথা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে ছিল নিমজ্জিত। মুসলমানদের অধঃপতনের এ চরম যুগসন্ধিক্ষণে পূর্ব বাংলার বন্দর নগরী চট্টগ্রাম জেলার কয়েকজন খ্যাতনামা উলামায়ে কিরাম হিন্দুস্তানের দারুল উলুম দেওবন্দ হতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁরা এদেশের মুসলমানদেরকে কুরআন-হাদীস ও দ্বীন-শরীয়তের সহীহ ইলম শিক্ষাদানের নিমিত্তে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দের অনুকরণে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তদানিন্তন নিখিল ভারতের সর্বজনমান্য আলিমে হক্কানী, যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ, হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (রাহঃ) এর সুযোগ্য শিষ্য, দারুল উলুম দেওবন্দের কৃতি ছাত্র, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদার প্রচার-প্রসার বাস্তবায়নের সংগ্রামী অগ্রনায়ক, আশেকে কুরআন হযরত আল্লামা আবদুল ওয়াহেদ (রাহঃ) বাংলাদেশে দেওবন্দী তরীকার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সুদূর প্রসারিত মেহনতের বদৌলতে এবং হযরত মাওলানা আবদুল হামীদ (রাহঃ) ও হযরত মাওলানা সূফী আযীযুর রহমান (রাহঃ) এর সক্রিয় সহযোগিতায় এবং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) এর নির্দেশে হযরত শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ (রাহঃ) ১৩১৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৭ ইংরেজি সালে চট্টগ্রাম জিলার হাটহাজারীতে ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র 'মাদ্রাসায়ে মুঈনুল ইসলাম' শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন।

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম হাটহাজারী থানা সদর হতে তিন কিলোমিটার দূরে চারিয়া গ্রামে অতঃপর হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ ছাহেব (রাহঃ) ও হযরত মাওলানা সূফী আযীযুর রহমান সাহেব (রাহৎ) এর পরামর্শক্রমে চারিয়া গ্রাম হতে স্থানান্তর করে হাটহাজারী বাজারের ফকির মসজিদের পার্শ্বস্থ মিঠাহাটায় আনুমানিক ১৩১৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৯ ইংরেজি সালের নবপর্যায়ে এই মাদ্রাসা স্থানান্তরিত করেন। অনিবার্য কারণ বশত উক্ত স্থান হতে মাদ্রাসা পুনঃ স্থানান্তর অত্যাবশ্যক হয়ে পাড়ায় কিছুদিনের জন্য হাটহাজারীর বাঁস স্ট্যাণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ঝাড়ুয়া দীঘির মসজিদের পার্শ্বে তিনি মাদ্রাসার তা'লীমের কাজ আঞ্জাম দেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানীতে কতিপয় বুযুর্গের পরামর্শের বরকতে স্থানীয় দ্বীনদার দানশীল ব্যক্তিত্ব মরহুম গোলবদন জমাদারের স্ত্রী পুত্রগণের বদান্যতায় মাদ্রাসার স্থায়ী গৃহনির্মাণের জন্য জায়গা প্রাপ্ত হলে ঐ স্থানে হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ (রাহঃ) ১৩১৯ হিজরী মোতাবেক ১৯০১ ইংরেজি সাথে সার্বিক মাদ্রাসা স্থাপনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আল্লাহর ফজলে, করমে ও স্থানীয় দ্বীনদরদী জনসাধারণের আর্থিক, শারীরিক, মানসিক ও সার্বিক সক্রিয় সাহায্য-সহায়তায় মাদ্রাসার জন্য প্রাপ্ত ভূমিতে ৬০ হাত লম্বা ছনের ছাউনী বাঁশের বেড়াযুক্ত একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়। মাদ্রাসা চালু করার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পন্ন হয়, তখন ১৩২১ হিজরীর মাহে মুহররম ১২৬৫ মাঘ, ১৩১০ বাংলা সালের ১ বৈশাখ মোতাবিক ১৯০৩ ইংরেজি সালের ১৪ এপ্রিল এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রম ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজকর্মের শুভ সূচনা হয় ঐ দিনই। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় বড় মৌলভী সাহেব (শায়খুল ইসলাম হযরত মাওঃ হাবীবুল্লাহ সাহেব) জামাতে দোয়াজদাহুম হতে জমাতে পঞ্জম পর্যন্ত ২৩ জন ছাত্রকে স্বহস্তে ছাত্র ভর্তি রেজিস্টারে নাম লিপিবদ্ধ করতঃ লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। প্রথম দিনই হাটহাজারীর থানার বিভিন্ন এলাকার ছাত্র ছাড়াও রাঙ্গুনীয়ার ১ জন ও বার্মার ১ জন ছাত্রকে ভর্তি করা হয়। পর্যায়ক্রমে প্রথম ৭ দিনেই ৫০ জন ছাত্র ভর্তি হয়। দেশবরণ্য বুযুর্গানে দ্বীনের হাতে গড়া সেদিনের জমাতে পঞ্জম পর্যন্ত মাদ্রাসা আজ 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম' নামে প্রতিষ্ঠিত, উপমহাদেশের অন্যতম ও বাংলাদেশের প্রাচীন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মর্যাদাভিষিক্ত।

www.pathagar.com

চ. দারুল উলূম হাটহাজারী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যাবলী

(১) ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ্ অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগ, তালীম, তাআলুম তথা মুজাহাদা ও জিহাদ ফী ছাবীলিল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা এবং এই উদ্দেশ্যে মর্দে মুজাহিদ তৈরি করা।

(২) এহ্ইয়ায়ে সুন্নাত ও ইমাতাতে বিদআত তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যাবতীয় সুন্নাতের প্রচার, প্রসার, স্বীয় জীবনে তার অনুশীলন এবং রাসূল (সাঃ)-এর আনীত আদর্শের মধ্যে অনুপ্রবেশকৃত সকল বিদআত ও রসুমাতকে (কুপ্রথা) মিটানো।

(৩) নিসবতে নববীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এবং তদানুযায়ী পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করা অর্থাৎ কুরআন হাদীস ও আকাঈদের বিষয়াবলির যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা এবং এ সম্পর্কীয় যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা দেয়া।

(৪) এমন একটি কাফেলা সৃষ্টি করা যাদের ক্ষুরধার লেখনী, জ্বালামীয় অগ্নিঝরা বক্তব্য ইসলামের সঠিক অনুভূতির পুনর্জাগরণে এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম আদর্শ তথা ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুন সর্বস্তরের মানুষের মাঝে সঠিক বাস্তবায়নে সক্ষম হয়ে ফলশ্রুতিতে বিশ্ব মানবতা খুঁজে পাবে হিদায়াতের সঠিক ও সহজতর পথ।

(৫) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা হানাফী মাযহাব, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রাহঃ) এর দৃষ্টিভঙ্গি, হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (রাহঃ) এর চিন্তাধারা, হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুয়ী (রাহঃ), কাসেম নানুতুভী (রাহ্ঃ) ও হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রাহ্ঃ) এর আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি ও উপদেশাবলী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদুল হাসান (রাহঃ) ও শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রাহ্ঃ) এর সংগ্রামী জীবন দর্শনকে সামনে রেখে তদনুসারে দারুল উলূম দেওবন্দের ন্যায় একটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা।

ছ. প্রশাসনিক বিভাগ

মজলিসে সূরা ঃ দারুল উলূম হাটহাজারীর উচ্চ পর্যায়ের একটি মজলিসে শূরা রয়েছে। এই মজলিসে শূরা সর্বপ্রকার পরামর্শের অধিকারী। এই মজলিস দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামা-মাশায়েখ ও প্রসিদ্ধ দ্বীনি মাদ্রাসাসমূহের মুহতামিমগণের/পরিচালকগণের সমন্বয়ে গঠিত।

www.pathagar.com

মজলিসে আমেলা ঃ মজলিসে শূরার অধীনে রয়েছে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি বা মজলিশে আমেলা। দারুল উলূম দেওবন্দের সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআন-সুন্নাহ অনুসৃত সংবিধানের পথ নির্দেশনায় উক্ত মজলিসে আমেলা পরিচালিত হয়ে থাকে।

মুহতামিম তত্ত্বধানে পরিচালনা বিভাগ ঃ দারুল উলূমের মহা-পরিচালক সাহেবকে 'মুহতামিম' শব্দে অভিহিত করা হয়। 'মুহতামিম' সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি মাদ্রাসার প্রত্যেক বিভাগের কার্যক্রম দায়িত্বশীলগণের সাথে পরামর্শক্রমে পরিচালনা করেন। সকল বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষকমন্ডলী, কর্মচারিবৃন্দ তাঁর নিকট জবাবদিহী করতে হয়। মুহতামিম সাহেব বিশেষ কোন জটিলতায় মজলিসে আমেলা বা মজলিসে শূরার পরামর্শ গ্রহণ করেন।

নাযেমে তালীমাত তত্ত্বাবধানে শিক্ষা বিভাগঃ শিক্ষা বিভাগীয় প্রধানকে নাজেমে তালীমাত বলা হয়। তিনি শিক্ষা বিষয়ক সকল কার্যক্রমের তদারকি করেন। বিশেষ প্রয়োজনে তিনি হযরত মুহতামিম সাহেবের শরণাপন্ন হন। এবং সর্বাবস্থায় হযরত মুহতামিম সাহেবের নিকট জবাবদিহী করতে বাধ্য থাকেন তিনি।

নাযেমে দারুল একামা তত্ত্বাবধানে 'মতবখ' বিভাগ ঃ ক্যান্টিন পরিচালককে নাজেমে মতবখ বলা হয়। হযরত মুহতামিম সাহেবের পরামর্শ মুতাবেক তিনি তাঁর কার্য পরিচালনা করেন। তিনি সর্বাবস্থায় হযরত মুহতামিম সাহেবের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন।

হিসাব বিভাগ তত্ত্বাবধান ঃ দারুল উলূমের সকল বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষিত হয় হিসাব বিভাগের মাধ্যমে। উক্ত বিভাগে একজন হিসাব রক্ষক ও দুইজন হিসাব অডিটর রয়েছেন। ১ জন খাজেন, ১ জন সহকারী খাজেনসহ ৩/৪ সদস্য বিশিষ্ট হিসাব তদারকী কমিটি গঠিত। এই বিভাগও সর্বাবস্থায় হযরত মুহতামিম সাহেবের নিকট জবাবদিহিতে বাধ্য।

জ. মাদ্রাসার আয়

দারুল উলূমের দুটি ফাণ্ড রয়েছে। (১) চাঁদা ফাণ্ড (২) ছদকা ফাণ্ড।

* ছদকা ফাণ্ডের আয়ের উৎস হচ্ছে মুসলমান দেশবাসীর পক্ষ থেকে যাকাৎ ছদকা, ফিৎরা, কাফ্ফারা মানত, কোরবানীর চামড়ার মূল্য, ইত্যাদি।
* চাঁদা ফাণ্ডের আয়ের উৎস হচ্ছে সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে দান, নফল ছদকা, ধান্য আয়, মুষ্টি চাউল, মাসিক, এককালীন, সভার চাঁদা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

* ছদকা ফাণ্ডের অর্থ গরীব ছাত্রদের খানা, ঔষধ ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হয়।
* চাঁদা ফাণ্ডের অর্থ শিক্ষকদের বেতন, মাদ্রাসা-মসজিদ বিল্ডিং, কিতাব খরিদ, মেহমান ইত্যাদি খাতে খরচ করা হয়।

ঝ. দারুল উলূমের নেসাবে তালীম

ইলমে নবুওয়াত অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, তাযকিয়াহ ইত্যকার সমুদয় ইসলামী জ্ঞানে যাতে শিক্ষার্থীরা পরিপক্কতা লাভ করতে পারে, বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এবং ইসলামী সমাজ পরিচালনা ও নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা যেন অর্জন করতে পারে সেভাবে উপযোগী করে নেসাবে তা'লীম বা পাঠ্যসূচী রচনা করা হয়েছে।

* বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

শিক্ষাদানে স্বাধীনতা ঃ সরকারি-বেসরকারি সকল প্রকার প্রভাব বলয় হতে মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে মুক্তচিন্তার মাধ্যমে স্বকীয় মর্যাদা রক্ষা করে শিক্ষাদানের মত গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে। আর এ'কারণেই কোন সময় এ প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তি বা সরকারের শর্তাধীন কোন সাহায্য গ্রহণে সম্মত হয়নি। একমাত্র দ্বীনদরদী সাধারণ মুসলিম জনতার ঐচ্ছিক দানে আল্লাহর উপর নির্ভর করে আজো স্বীয় গৌরব অক্ষুন্ন রেখে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

অবৈতনিক শিক্ষা ঃ ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষানুযায়ী দারুল উলূমের সর্বনিম্ন শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত কোন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কোন প্রকার টুইশন ফি বা বেতন গ্রহণ করা হয়না।

সাপ্তাহিক তারবিয়াতী জলসা ঃ কিতাবী ইলম শিক্ষাদানের পাশাপাশি আমল ও চরিত্র গঠনের প্রতি ছাত্রদেরকে উৎসাহ দান করা হয়। সপ্তাহের সোমবার নিয়মিত দরসী সময়কে সংকুচিত করে যোহরের নামাযের পর সমস্ত শিক্ষার্থীকে সম্মিলিতভাবে উস্তাদগণ বিশেষ ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে মানসিক চিন্তার বিকাশ ও চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনের তারগীব (প্রশিক্ষণ) দিয়ে থাকেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

আবাসিক ব্যবস্থা ঃ শিক্ষকগণ যাতে যথারীতি মুতালাআ (অধ্যয়ন) করতঃ শিক্ষা দান করতে পারেন এবং পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আদর্শ ও চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে ছাত্রদের তৈরি করতে সক্ষম হন; ছাত্রবৃন্দও যাতে চরিত্রবান ওস্তাদগণের সাহচর্য লাভ করে স্বীয় চরিত্র গঠনের ও লেখাপড়ার মান উন্নত করার সুযোগ পায়, এই নিমিত্তে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের জন্য রয়েছে সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

শিক্ষক ভাতা ঃ এখানে শিক্ষকগণ সকলেই দ্বীনের খিদমত ও তাবলীগ হিসেবে সমুদয় দায়িত্ব পালন করে থাকেন। **কোন শিক্ষকই দরস (পাঠ) দানকে চাকুরী বলে মনে করেন না। আর এটাই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ।** দারুল উলূমের সাধারণ তহবিল থেকে শিক্ষকদের সামান্য ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। জ্ঞানপিপাসু মহৎ হৃদয় উস্তাদবৃন্দ একমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ হতে প্রতিদানের আশায় আমরণ জ্ঞান বিতরণে নিয়োজিত থাকেন।

বেকারত্বের গ্লানি দুরীকরণঃ প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক ছাত্র এই প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে কর্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং কুদরতে খোদার বিস্ময়কর লীলায়, তাদের সম্মুখে বেকারত্বের কোন সমস্যাই নেই।

ইসলামী শিক্ষার অনুপম আদর্শে নিষ্ঠাবান তারা বিলাসিতা ও অলসতার মোহাবিষ্ট হয়ে নিজেদেরকে বেকার বানিয়ে সমাজের বোঝাহ হয় না। সরকারি কোন চাকরির প্রত্যাশায় সময় ও জীবনের অপচয় করেনা। সমাজের কোন না কোন খিদমতে তারা লেগে যায়। যদি কেউ দারুল উলূমের আদর্শ ত্যাগ করে ভিন্ন পথে পদচারণা করে, সে যেন নিজেই দারুল উলূমের মহান উদ্দেশ্য ও গণ্ডি বহির্ভূত হয়ে পড়ে।

নিঃস্ব দরিদ্র ইয়াতীমদের শিক্ষার আলো দান ঃ ইয়াতীম, দরিদ্র, নিঃস্ব, নও মুসলিম প্রভৃতি নিরীহ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিমিত্তে রয়েছে লালন-পালনের সুশৃংখল ব্যবস্থা, ফ্রি থাকা, খাওয়া-পরা, চিকিৎসা প্রভৃতির সুযোগ সুবিধা।

কওম ও মিল্লাতের খিদমত ঃ দারুল উলূম হাটহাজারী তার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে থেকে শুধু দ্বীন শিক্ষাদানের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে তা নয়, বরং কওম ও মিল্লাতের অপরাপর সেবাদানও এর অনন্য বৈশিষ্ট্য। প্রতিদিন এর দারুল ইফতা থেকে বিনা পারিশ্রমিকে জনসাধারণের অসংখ্য সমস্যার সমাধান দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়া শিরক-বিদআত-কুফর প্রভৃতির মুকাবিলা করে দেশও জাতিকে রক্ষা করা এবং জাতীয় সংকট কালে জান-মাল দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া, মুসলিম জনতার মধ্যে দ্বীনের জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়া এবং গুমরাহী দূর করা প্রভৃতি কওম ও মিল্লাতের সর্ব প্রকার সেবায় এ প্রতিষ্ঠানের অবদান অনন্য ও অনুপম।

সাহিত্য মজলিস ঃ দারুল উলূমের ছাত্রদের সাহিত্য পিপাসা সৃষ্টিও নিবারণে এবং তাদেরকে বাংলা ও আরবি সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাপ্তাহিক সাহিত্য মজলিস নামে বিভাগ রয়েছে। প্রত্যেক ক্লাসের ছাত্ররা ঐ ক্লাসের একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বৃহঃ/শুক্রবার রাত্রে নিয়মিত সাহিত্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে থাকে।

www.pathagar.com

লেখক ও ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি ঃ লেখক ও ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির জন্য দারুল উলূম হাটহাজারী যে বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৩৪ ইং সন থেকে ইসলাম প্রচার প্রকাশনা ও মাসিক মুঈনুল ইসলাম সাময়িকী বিবিধ বাধা ও প্রতিকূলতার আবর্তের মাঝেও এ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে এবং এরই মাধ্যমে অসংখ্য কবি, লেখক, প্রবন্ধকার, রচনাকার, ইত্যাদি ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাদান ঃ দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম অনন্য প্রতিষ্ঠান যেখানে ছাত্রগণ রাজনীতিমুক্ত পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভে ধন্য। উল্লেখ্য, প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের প্রয়োজনীয়তা সবাই অনুভব করে থাকেন বটে, কিন্তু এরূপ প্রয়োজনীয়তা উপভোগ থেকে প্রায় সবাই-ই বঞ্চিত।

পাঠক্রম ঃ হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আলিম সমাজ নবী গণের (আঃ) উত্তরাধিকারী। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কুরআন-হাদীসের যথাযথ জ্ঞান-লাভের মাধ্যমে নবীদের উত্তরাধিকারী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দারুল উলূম হাটহাজারীর প্রণীত পাঠ্য তালিকার উৎসমূল হচ্ছে কুরআন-হাদীস, সাহাব ও সালফে সালিহীনের অনুকরণীয় আমল। এরই দৃষ্টিভঙ্গিতে ১৬টি শিক্ষাবর্ষে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ শ্রেণীগত মান অনুসারে শিক্ষাদান করা হয়।

১. ইলমে তাওহীদ, ইলমে রিসালাত, ইলমে আখিরাত-এ তিনটি বিষয় সমষ্টিগতভাবে ইলমে আক্বাইদ নামে অভিহিত।
২. ইলমে তাফসীর ও ইলমে উসূলে হাদীস
৩. ইলমে হাদীস ও ইলমে উসূলে হাদীস
৪. ইলমে ফিকাহ ও ইলমে উসূলে ফিকাহ
৫. ইলমে মা'রিফাত বা তাসাউফ তত্ত্ব
৬. ইলমে ফারাইয বা উত্তরাধিকারী সম্পদ বন্টন বিদ্যা
৭. ইলমে ফাত্‌ওয়া
৮. ইলমে তাজবীদ
৯. ইলমে আদব/আরবী-ফারসি-উর্দূ বাংলা সাহিত্য
১০. ইলমে তারীখ/ইসলামী ইতিহাস
১১. ইলমে ইক্বতিসাদ/অর্থনীতি
১২. ইলমে হাইআত/ সৌরবিজ্ঞান

www.pathagar.com

১৩. ইলমে মানতিক/যুক্তিবিদ্যা
১৪. ইলমে বালাগাত/ভাষা অলংকার
১৫. ইলমে ফালসাফা/দর্শন
১৬. ইলমে আরূয/ ছন্দ শাস্ত্র
১৭. ইলমে নাহু/বাক্য গঠন বিধি
১৮. ইলমে সরফ/শব্দ প্রকরণ
১৯. বৈষয়িক বিদ্যা-বাংলা, অংক, ইংরেজি, ভূগোল, ইতিহাস, পৌর বিজ্ঞান প্রভৃতি।

আল্লামা আহমদ শফী (দাঃ বাঃ) এর ঐতিহাসিক স্বাগত ভাষণ.

দারুল উলূম মঈনুল ইসলামী হাটহাজারী-এর শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মাওলানা আহমদ শফী ছাহেবের প্রদত্ত ঐতিহ্যবাহী ভাষণটির প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। এ থেকে মাদ্রাসার প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্যবিধৃত পটভূমিসহ ইসলামী শিক্ষার মৌলিক ও শ্বাশত দিক নির্দেশক তথ্য উদ্ঘাটন ও পরিবেশনার শিষ্টাচার বিধৃত শৈল্পিক সৌন্দর্য পাঠককে সম্যক হৃদয়াঙ্গম করতে সাহায্য করবে অনবদ্য ভাবে।

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম,
নাহমাদুহূ ওয়ানুসল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম!

সম্মানিত উলামায়ে কিরাম, বুযুর্গনে দ্বীন, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সমবেত ফারেগীন দারুল উলুম হাটহাজারী ও আমার প্রিয় দ্বীন-দরদী দেশবাসী,

এশিয়ার অন্যতম, উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম, বাংলাদেশের সুপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ ইসলামী আরবি কওমী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী-এর শতবার্ষিকী দস্তারবন্দী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনে আমার বক্তব্য পেশ করার প্রারম্ভে আমি মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি দ্বীনের খিদমতে আমাদের সকলকে নিয়োজিত রেখেছেন, দ্বীনের হিফাযত ও প্রচার প্রসারে অধিকতর ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান হতে তাওফীক দিয়েছেন এবং এ মুবারক সম্মেলনের আয়োজন করার ও এতে শরীক হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

সাথে সাথে দেশ ও দেশের বাহিরে থেকে আগত সকল উলামায়ে কিরাম, বুযুর্গানে দ্বীনসহ উপস্থিত সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দুরদুরান্ত থেকে কষ্ট স্বীকার করে উম্মুল মাদারিসের এ সম্মেলনে হাজির হয়ে আপনারা যে মহানুভবতা, সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তজ্জন্য আমরা সকলে কৃতজ্ঞ।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ রহমত ও দেশবাসীর আর্থিক, শারিরীক, মানসিক, নৈতিক তথা সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা মহাসম্মেলনকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে, এজন্য সকলের প্রতি জানাচ্ছি প্রাণঢালা অভিনন্দন। মহান রাহমানুর রাহীম আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে যথাযথ বিনিময় দান করুন এবং এ সম্মেলনকে কবুল করুন।

তদানিন্তন ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশের এতদঞ্চলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিকতা, তাহযীব-তামাদ্দুনের অবস্থা ছিল মুসলিম মিল্লাতের প্রতিকূলে। উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ, তাদের সমাজ জীবনে গজিয়ে উঠা শিরক-বিদ্আতের মূলোৎপাটন ও বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচারের কষাঘাত থেকে মুসলিম মিল্লাতকে পুনুরুদ্ধারের জন্য ১৮৮৬ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বের দ্বিতীয় ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দ।

ঠিক একই কারণে ইসলামী তাহযীব ও শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, পরাধীনতার গ্লানীতে হতাশাগ্রস্ত, কুসংস্কার ও শিরক -বিদ্আতে নিমজ্জিত বাংলাদেশের মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষার নিমিত্ত পূর্ব বাংলার বন্দর নগরী চট্টগ্রাম জেলার কয়েকজন খ্যাতনামা উলামায়ে কিরাম এদেশের মুসলমানদের কুরআন-হাদীস ও ইসলামী শরীয়তের সহীহ্ ইল্ম শিক্ষাদান কল্পে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দের অনুকরণে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আল্লাহ্ তাআলার মেহেরবানীতে সবার প্রাণপ্রিয় "বড় মৌলভী সাহেব" নামে খ্যাত, বানীয়ে মাদ্রাসার হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ সাহেব (রাহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা আজ শতবর্ষে উপনীত হয়ে কওমী বিশ্ববিদ্যালয় তথা আলজামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম নামে পরিগণিত হয়েছে।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, এ খিদমত ও প্রচেষ্টার পাশাপাশি ইসলাম বিরোধী চক্রও মুসলিম মিল্লাতকে পর্যুদস্ত করতে হাজারো ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে। ফলে কাদিয়ানী ফিতনা, বাহাঈ ফিতনা, বিদেশী মেধা-সাহায্যপুষ্ট এনজিও ফিতনা, নাস্তিকতার ফিতনা, প্রগতির নামে স্বেচ্ছাচারিতার ফিতনা, বাতিল পীরপূজাসহ অগণিত ফিতনায় মুসলিম সমাজের একাংশ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।

এহেন নাজুক মূহূর্তে দারুল উলূমের বর্তমান আকাবিরীনে কিরাম আবনায়ে দারুল উলূমকে একত্রিত করে একই ধারায় আকাবিরীনদের অনুসৃত পথে ইস্তিকামাতের সাথে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এনজিও'সহ সকল বাতিল ও বাতিলপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসে এ মহাসম্মেলনের আয়োজন করেছেন।

www.pathagar.com

এ মহাপ্রয়াসকে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ১৪০০ হিজরী সনে তৎকালীন মুহতামিম পরম শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বী হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব সাহেব (রাহ্.) প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলার রহমতে আজ তা বাস্তবায়িত হচ্ছে দেখে মহাপরক্রমশালী আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

মাননীয় অতিথিবৃন্দ!

আল্লাহতাআলা পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন-"আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন, তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।"

কুরআন মাজীদের উক্ত আয়াত হতে বুঝা যায় যে, মানুষের হিদায়াতের জন্য ভাষাজ্ঞান ও পুঁথিগত বিদ্যাই যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট হলে নবী-রাসূল প্রেরণের আবশ্যকতা ছিল না বরং আসমান থেকে কিতাব নাযিল করে এবং "এ কিতাব মতে তোমরা ঈমান-আমল ঠিক করে নাও" ঘোষণা দিলেই হতো। কিন্তু এর পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা কিতাবের সাথে এমন এক রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি সকলের জন্য উত্তম আদর্শ। নবীর অবর্তমানে আলেমগণই তাঁর উত্তরাধিকারী। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সাহাবায়ে কিরাম যেরূপ জান-মাল ত্যাগ করে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালিয়েছেন, তদ্রুপ আমাদের উলামায়ে আকাবিরীন নবীর উত্তরসূরী হিসেবে উক্ত দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োজিত ছিলেন।

এতদুদ্দেশ্যেই আমাদের মুহতারাম মুরব্বীগণ দারুল উলূম হাটহাজারী'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিশুদ্ধরূপে কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও তৎকালীন মুরব্বীদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে গ্রাম-গঞ্জে, শহরে সর্বত্র পবিত্র কুরআন শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজ বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের যে চর্চা হচ্ছে, এটা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অবদান।

এতদঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর তাযকিয়ায়ে নফ্স বা আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে দারুল উলূম হাটহাজারীর মুরব্বীগণ অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেন। হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী (রাহ্)-এর খলীফা হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (রাহ্), ফক্বীহুল উম্মত হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রাহ্)-এর খলীফা হযরত মাওলানা জমীরুদ্দীন (রাহ্), শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রাহ)-এর খলীফা হযরত মাওলানা আবদুল

www.pathagar.com

ওয়াহ্হাব (রাহ্), হযরত মুফতীয়ে আযম (রাহ্)-এর খলীফা হযরত মাওলানা হামেদ সাহেব (রাহ্), হযরত মাওলানা জমীরুদ্দীন সাহেব (রাহ্)-এর খলীফা হযরত মাওলানা আবদুল কাইয়ুম (রাহ্) ও হযরত মাওলানা হাফেজুর রহমান সাহেব (মুদ্দাজিলুহুল আলী), হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রাহ্)-এর খলীফা হযরত মাওলানা মুফতী আহমাদুল হক সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহ্)-এর খলীফা হযরত মাওলানা আবদুল আযীয সাহে (দামাত ফুযুযুহুম) প্রমুখ পরবর্তী ও বর্তমান মনীষীগণের সিলসিলার মাধ্যমে তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধির অসাধারণ খিদমত সাধিত হয়ে আসছে। তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খলীফা ও মুরীদগণ এ উপমহাদেশের বিভিন্নস্থানে ইসলাহ ও তালক্বীনের খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন।

....

পূর্ণাঙ্গরূপে হাদীস শিক্ষার ব্যাপারে দারুল উলূম হাটহাজারীর অবদান অতুলনীয়। বাংলাদেশ, বার্মা, আসাম, কলকাতা অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিয়মিতভাবে সিহাহ্ সিত্তাহ্ তথা প্রামাণ্য ছয় হাদীস গ্রন্থসহ হাদীসের অপরাপর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি শিক্ষাদান তথা দাওরায়ে হাদীসের শিক্ষা ১৯০৮ ইংরেজি/১৩২৬ হিজরী সনে দারুল উলূম হাটহাজারীতেই প্রথম আরম্ভ করা হয়। আজ দারুল উলূম হাটহাজারীর অনুকরণে হাজার হাজার মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীসের দরস চালু রয়েছে।

দারুল উলূম হাটহাজারী প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দারুল উলূম দেওবন্দের বিপ্লবী আদর্শে দ্বীন ইসলামকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে। এর প্রতিষ্ঠাতাগণ তাই প্রথম থেকেই দ্বীন ইসলামকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। দারুল উলূম হাটহাজারীর বহু মুরুব্বী, শিক্ষক, ছাত্র, ফুযালা বিবিধ কার্যক্রমে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে গিয়ে কারা নির্যাতনসহ সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন।

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব পরিস্থিতি বিগত শতাব্দীর চেয়েও নাজুক বলে মনে হচ্ছে। মুসলিম বিশ্ব আজ সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের শিকার। ইসলাম বিরোধী সকল অপশক্তি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস করে দিতে সদা তৎপর। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের আজ যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার একমাত্র কারণ হলো পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়া। ইসলাম তথা পবিত্র কোরআন সুন্নাহর-আদর্শের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী যদি আমরা হতে পারি, তবে মুসলিম উম্মাহর সকল সমস্যারই সমাধান হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীতে মুসলমানরা বিশ্বশক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে পারবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলতে এবং শিক্ষা ও সেবার ক্ষেত্রে বৈদেশিক চক্রান্তমুক্ত করতে আমরা কি ভূমিকা রাখতে পারি সে ব্যাপারে আপনাদের খিদমতে প্রস্তাব আকারে কতিপয় বিষয় পেশ করছি। আশা করি প্রস্তাবনাগুলোকে পর্যালোচনা করে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে প্রয়াসী হবেন।

১. দ্বীনের সার্বিক ও পরিপূর্ণ রূপ তুলে ধরা

দ্বীন সম্পর্কে আজ অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। দ্বীনের সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ রূপকে জাতির সামনে সহজ ভাষায় পেশ খুবই জরুরি। বিশেষভাবে বাংলা ভাষাভাষী জনতার কাছে সহজ সরল বাংলা ভাষায় দ্বীনের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গরূপ ব্যাপকভাবে তুলে ধরা জরুরি। আমাদের আকাবির বুযুর্গগণ বাংলা ভাষা ছাড়াও আরবি, উর্দূ, ফারসি প্রভৃতি ভাষায় এ বিষয়ে বহু বই-পুস্তক লিখে গেছেন। এসবের বঙ্গানুবাদ সমাজের সম্মুখে তুলে ধরা যেতে পারে। ইংরেজি ভাষায়ও পর্যাপ্ত বইপুস্তক তৈরি করা আমাদের দরকার। বহু উপজাতিকে খ্রিস্টানরা ধর্মান্তর করছে। দেশের সীমান্ত এলাকার উপজাতিসহ অন্যান্য বহু মানুষকে ইতিমধ্যেই খ্রিস্টান বানিয়ে নিয়েছে। এটা জাতির জন্য ভবিষ্যতে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। তাই এখন থেকেই এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার। পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে ইসলামের প্রকৃত রূপ জনসমক্ষে তুলে ধরার লক্ষ্যে শিশু কিশোরদের দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে প্রত্যেক গ্রামে আদর্শ মক্তব প্রতিষ্ঠা ও মাতৃভাষাসহ দ্বীনি শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক।

২. তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রচার

তাওহীদে খালেস ও সুন্নাতে রাসূলের আলোকে আমাদের গোটা জীবন ব্যবস্থার পুনর্গঠন জরুরি। জীবনের প্রতিটি স্তর থেকে শিরক-বিদ্‌আত, শরীয়ত বিরোধী আচার-অনুষ্ঠান উৎখাত করা এবং সর্বস্তরে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাতে রাসূলের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা একান্ত অপরিহার্য। কেননা, দারুল উলূম হাটহাজারী ও তার অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঃ

(ক) আক্বীদায়ে তাওহীদে খালেস (খ) ইত্তিবায়ে সুন্নাত (গ) তাআল্লুক মাআল্লাহ (ঘ) ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ।

www.pathagar.com

৩. দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠা

নবুওয়াতের সোনালি যুগ থেকে মুসলিম মিল্লাত যতই দূরবর্তী হচ্ছে ততই জীবনযাত্রার প্রতিটি ধাপে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে; কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে এককভাবে সেগুলোর সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়া জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে মুসলিম মিল্লাতের দৈনন্দিন জীবনের নানা জটিল সমস্যার ইসলামী সমাধান প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতিটি থানায় 'দারুল ইফতা' কায়েম করা নিতান্ত প্রয়োজন।

৪. দ্বীনি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা

সর্বস্তরে দ্বীনি শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের সাথে সাথে আর্তমানবতার সেবা বা খিদমতে খালক এর ব্যাপারে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। বিদেশী মদদপুষ্ট এনজিও'রা আজ আমাদের অবহেলার সুযোগে দ্বীন ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব দুটিই বিপন্ন হবার আশঙ্কা রয়েছে।

সেহেতু প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের পরামর্শক্রমে দ্বীনি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করতঃ অসহায়-দরিদ্র, সামর্থহীনদের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

৫. দ্বীন দরদী শুভাকাঙ্খীদের সাহায্য-সহযোগিতা

সকল দ্বীনি প্রতিষ্ঠান তথা মাদ্রাসা, মক্তব, আঞ্জুমান ইত্যাদির উন্নতি, অগ্রগতি ও স্থায়িত্বের জন্য সকল মুসলমানের সার্বিক সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। ....

ভবিষ্যতে মাদ্রাসার সার্বিক কল্যাণে আপনারা পূর্বের চেয়ে অধিকতর সচেষ্ট হবেন, এই কামনা করি। ওয়াসসালাম!"

(হযরত মাওলানা) আহমদ শফি (সাহেব)
সভাপতি-শতবার্ষিকী মহাসম্মেলন পরিষদ
মুহ্তামিম-দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী।

[হাটহাজারী দারুল উলূম মাদ্রাসার প্রখ্যাত মুফতী হজরত মাওলানা জসীম উদ্দিন ছাহেব প্রণীত দুর্লভ ইতিহাসও তথ্য সমৃদ্ধ "দারুল উলূম হাট হাজারীর ইতিহাস" শীর্ষক অমূল্য গ্রন্থ হতে জামেয়ার ইতিহাস বিষয়ক প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধটি।]

www.pathagar.com

১. মাদরাসা শিক্ষার প্রসারে নিবেদিত কতিপয় সংগ্রামী মনীষীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নিকট অতীত ও বর্তমানে যে সমস্ত প্রথিতযশা আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ এই উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সমাজ কায়েমের লক্ষে সামাজিক ও একাডেমিক সংগ্রামী নেতৃত্ব দিয়েছেন বস্তুত এঁরা সকলেই দেওবন্দ মাদরাসার সন্তান। দেওবন্দ তথা কওমী মাদরাসা প্রসূত মনীষীদের তালিকা এত বিরাট ও এত বিস্তৃত যে, শুধু তাঁদের নামের তালিকা দিতে গেলেও প্রয়োজন কয়েক ভলিয়্যামের বিরাট এক গ্রন্থের। তাই এই ক্ষুদ্র পরিসরে শুধু কতিপয় অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল। মাদরাসা তথা ইসলামী শিক্ষার পত্তন ও স্ফুরণের ইতিহাস সম্যক উপলব্ধির জন্যে এসব মনীষীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠক চিত্তের নবতর হৃদস্পন্দন স্বরূপ।

২. শায়খুল হিন্দ্ ওয়াল আলম হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান (র)

ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদের স্বাপ্নিক ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রনায়ক এই সিংহপুরুষ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, মুসলিম বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ব্যতীত মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব নয়। প্রায় সমগ্র মুসলিমবিশ্ব তখন পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর হিংস্র কবলে নিপতিত। তিনি আরও বুঝেছিলেন, ব্রিটিশদের উদ্ধত্য ও অহাস্যকর মূল খুঁটিই হচ্ছে ভারতবর্ষ। এখান থেকে এরা পাততাড়ি গুটালেই সমস্ত মুসলিম বিশ্ব হতে এদের বাঁধন ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই তিনি এদেশে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যে সময় তিনি ভারতের স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, সেই সময় কংগ্রেস তথা অন্যান্য দল স্বায়ত্তশাসনেরও পর্যন্ত চিন্তা করতে পারে নি। বিখ্যাত রেশমী রুমাল আন্দোলনের ইনি ছিলেন প্রধান নেতা। কাবুলে যে প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছিল, এর পিছনে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বন্দী হয়ে দীর্ঘ ছয় বছর ভূমধ্যসাগরের নির্জন দ্বীপ মাল্টায় তিনি নির্বাসন–কারাবাস ভোগ করেন।

১৮৫১ খ্রিঃ দেওবন্দে তাঁর জন্ম। বিখ্যাত দেওবন্দ মাদরাসার তিনিই ছিলেন প্রথম ছাত্র। দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসিম নানুতাভীর নিকট হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। পরে এর শায়খুল হাদীস ও প্রধান অধ্যাপক হিসাবে আমৃত্যু কার্যরত ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই দেওবন্দ মাদরাসার নাম দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাবহুল সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবন-যাপন সত্ত্বেও তিনি আমৃত্যু দরসে হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। বহু মূল্যবান গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেছেন, মাল্টায় বন্দী জীবনকালে তিনি কুরআনে কারীমের একটি প্রামাণ্য অনুবাদ সমাধা করেন। ১৯২০ সালে এই বিদগ্ধ মনীষির ইন্তেকাল হয়।

www.pathagar.com

৩. হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র)

১৮৫২ সালে উত্তর প্রদেশের আম্বালায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে দেওবন্দ মাদরাসায়, পরে সাহারানপুর মুজাহিরুল উলূম মাদরাসায় শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা লাভের পর দীর্ঘদিন উক্ত মাদরাসার শায়খুল হাদীস ও প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯২৫ সালে মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানেই ১৯২৭ সালে ইন্তেকাল করেন।

বাতিলপন্থী বিশেষ করে, বেদআতীদের বিরুদ্ধে তাঁর কলম ছিল অত্যন্ত ক্ষুরধার। বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করে গিয়েছেন। প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন আবু দাউদ শরীফের শরাহ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত বজলুল মজহুদ তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধ বৃহৎ গ্রন্থ।

৪. হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)

ইসলামী শরীয়তের মূল প্রাণ সুলুক ও তাসাওউফ কিছু সংখ্যক ভণ্ড সুফীদের অযোগ্যতায় ইরানী ও বৈদিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। তখন নববী মশাল হাতে এগিয়ে এলেন দেওবন্দের এই কৃতি সন্তান। কুরআন ও হাদীসের মূলনীতির আলোকে তিনি এর সংস্কার সাধন করেন। তিনি ছিলেন অনন্য লেখনী শক্তির অধিকারী। বিভিন্ন বিষয়ে ছোট বড় সহস্রাধিক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তাফসীরে বয়ানুল কুরআন ও বেহেশতী জেওর তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পৃথিবীর বহু ভাষায় তদরচিত গ্রন্থ সমূহ অনুদিত হয়েছে। উপমহাদেশের লাখো মানুষ তাঁর প্রচেষ্টায় সত্য পথের সন্ধান পেয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম হযরত মাওলানা আতাহার আলী, হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, হযরত মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী, হযরত হাফেজ্জী হুযুর তাঁরই তরবিয়াত প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি দেওবন্দে ইয়াকুব নানুতাবী (র) এর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। দীর্ঘদিন কানপুর মাদরাসার প্রধান অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ১৮৬২ খ্রিঃ তাঁর জন্ম এবং ১৯৪৩ খ্রিঃ তাঁর ইন্তেকাল হয়।

৫. হাফেজুল হাদীস হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র)

কাদিয়ানীদের খতমে নবুয়্যত বিরোধী চক্রান্তকে প্রতিহত করার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ এই মনীষীর। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রজ্ঞা, সূক্ষ্মদর্শনও স্মরণশক্তির অধিকারী। তাঁর স্মরণশক্তি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল তৎকালে। একবার কোন গ্রন্থ দেখার বিশ বছর পরও কোন পৃষ্ঠায় কি আছে, বলে দিতে পারতেন তিনি। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অনন্য। প্রথম যুগের হাদীস বিশারদগণের জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর জ্ঞানের তুলনা করা হতো। হানাফী মাযহাবকে হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করার

www.pathagar.com

দুরূহ কাজ সমাধা করে গিয়েছেন তিনি। 'চলতা ফিরতা কুতুবখানা' বা বিচরণরত গ্রন্থাগার আখ্যায় তিনি পরিচিত ছিলেন তৎযুগে। তিনি ১৮৭৫ সালে কাশ্মীরের এক সম্ভ্রান্ত সাইয়্যেদ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত শায়খুল হিন্দ ছিলেন তাঁর হাদীসের উস্তাদ। ব্রিটিশ বিরোধী জেহাদী আন্দোলনের অংশ হিসাবে শায়খুল হিন্দ হেজাজ সফরকালে দেওবন্দ মাদরাসার শায়খুল হাদীস হিসাবে তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করে যান। হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। বুখারী শরীফ পাঠদান কালে তাঁর তত্ত্ববহুল বক্তৃতামালা 'ফয়জুল বারী' নামে চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৩ খ্রিঃ দেওবন্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৬. শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র)

উপমহাদেশের মুসলিম স্বাধিকার আন্দোলনের বীর মুজাহিদ এই অনন্য সাধারণ মনীষীর জন্ম ১৮৮৭ সালে। একাধারে মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, সু-বক্তা, লেখক ও রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। দেওবন্দ মাদরাসায় শিক্ষালাভের পর দীর্ঘদিন এর প্রিন্সিপাল হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। মুসলিম স্বাধিকার আন্দোলনে বস্তুত তার যোগদানের পর থেকেই পাকিস্তান আন্দোলন উপমহাদেশের মুসলিম জনতার আস্থা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। মুসলিম শরীফের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত আরবি গ্রন্থ **"ফতহুল মুলহিম"** তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন "পবিত্র কোরআন হচ্ছে পাকিস্তানের সংবিধান"। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানে এই মনিনীর ইন্তেকাল করেন।

৭. কুতুবে আলম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমাদ মাদানী (র)

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন আহ্‌মাদ মাদানী (র) ১৯শে শাওয়াল, ১২৯৬ হিঃ মোতাবেক ১৮৭৯ সালে উনাও জেলার অন্তর্গত বাংগার মৌ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হুসাইন আহম্মদ, তারীখী নাম (জন্ম-তারিখের প্রতি ইঙ্গিতবহ) চেরাগ মুহাম্মদ।

বাতিল বিরোধী সংগ্রামের অত্যাশ্চর্য চেতনা নিয়ে জন্মেছিলেন এই মনীষী। প্রিয়তম উস্তাদ শায়খুল হিন্দের অনুপ্রেরণায় ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। জীবনের একটা বিরাট অংশই তাঁর কেটেছে ব্রিটিশ বেনিয়াদের জিন্দানে। দীর্ঘদিন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি ছিলেন। সকল অর্থেই তিনি ছিলেন প্রথম যুগের মুসলিম মুজাহিদের জ্বলন্ত উদাহরণ। ভারত বিভক্তির পর ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন তিনিই।

www.pathagar.com

দেওবন্দ মাদরাসায় শিক্ষালাভ করার পর তেরো বছর মদীনার মসজিদে নববীতে শিক্ষাদান করেন। একত্রিশ বছরকাল দেওবন্দ মাদরাসার শায়খুল হাদীস ও প্রধান অধ্যাপক হিসেবে তিনি সমাসীন ছিলেন। এই উপমহাদেশ ছাড়াও তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান ও আরব দেশগুলোসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁর শত শত প্রথিতযশা ছাত্র ছড়িয়ে রয়েছে। সীমান্ত প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পি, এন, এ, প্রধান মাওলানা মুফতী মাহ্মুদ (র) তাঁর অন্যতম ছাত্র। তিনি ১৯৫৭ সালে দেওবন্দে ইন্তেকাল করেন।

৮. শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (র)

সাধক শিক্ষাবিদ এই মনীষী সাহারানপুর মাদরাসায় শিক্ষা লাভ করার পর প্রথমে এর অধ্যাপক, পরে দীর্ঘদিন শায়খুল হাদীস ও প্রধান অধ্যাপক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। পরে মদীনা শরীফে বসবাস করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ রয়েছে, তন্মধ্যে মুয়াত্তা ইমাম মালেকের বিস্তারিত ব্যখ্যাসহ আরবি গ্রন্থ 'আওজাজুল মাসালিক' অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তৎরচিত ফাজায়েলের সিরিজও খুবই জনপ্রিয়। বাংলা আরবিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই সিরিজের অনুবাদ হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধির অধিকারী প্রকৃত সংগ্রামী তাবলীগী জামায়াতের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সহযোগী ছিলেন।

৯. হযরত মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (র)

উপ-মহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ এই মনীষী কানপুর এবং সাহারানপুরে শিক্ষা লাভ করেন। '৪০–৪৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং '৪৯–৫০' সাল পর্যন্ত ঢাকা সরকারি আলীয়া মাদরাসার হেড মাওলানা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে 'ই লাউস্ সুনান' নামক গ্রন্থ তাঁর অন্যতম অবদান। এছাড়া আরো বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন।

১০. মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী (র)

দেওবন্দ মাদরাসায় শিক্ষালাভ করার পর দীর্ঘদিন তথায় মুফতী হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি করাচী চলে আসেন এবং দারুল উলুম নামে বৃহৎ একটি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইসলামী ফিকাহ্ ও আইনে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি বিরাজমান। বহু আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেছেন তিনি। আমৃত্যু পাকিস্তানের গ্রান্ড মুফতী হিসাবে খ্যাতি ছিল তাঁর হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে শতাধিক গ্রন্থ রচনা ছাড়াও বিখ্যাত তাফসীরে 'মা'রিফুল কুরআন','ফতওয়ায়ে দারুল উলুম' তাঁরই সম্পাদিত সুবৃহৎ গ্রন্থ। ১৯৭৬ সালে করাচীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

১১. হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদ (র)

পাকিস্তানের অন্যতম প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ মুফতী মাহমূদ সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী। দেওবন্দে শিক্ষা-লাভ করার পর বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। পরে পাকিস্তানের রাজনীতিতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। পাকিস্তান বিভক্তির পর সীমান্ত প্রদেশের মূখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১২. ইসলামি রাজনীতিবিদ হযরত মাওলানা আতাহার আলী (র)

বাতিলের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কণ্ঠ এই সাধক রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষালাভ করার পর দীর্ঘদিন হযরত থানভী (র)-এর সংসর্গে তাসাওউফ শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁর নির্দেশক্রমে জন্মভূমি বাংলাদেশে ইসলামকে দ্বীন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রেরণা নিয়ে ফিরে আসেন। কিশোরগঞ্জে দীর্ঘদিন নীরব তা'লীম ও ইরশাদের কাজে নিয়োজিত থাকার পর তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেন। রেফারেন্ডামের মাধ্যমে সিলেট জেলা সাবেক পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের অংশ হওয়ার পেছনে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁরই প্রচেষ্টায় তৎকালীন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের বিস্তৃত ভূমিকায় নেজামে ইসলাম পার্টি আত্মপ্রকাশ করে। দীর্ঘদিন তিনি এর সভাপতি পদে সমাসীন ছিলেন। '৫৪-এর নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে এই পার্টি যুক্তফ্রন্টের শক্তিশালী অঙ্গদল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরে এই দল তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাও কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে কায়েম করার প্রচেষ্টায় তাঁর অবদান ছিল অনন্য। দীর্ঘদিন তিনি প্রাদেশিক পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন।

এই বিদ্যোৎসাহী কর্মী-পুরুষ কিশোরগঞ্জে জামিয়া ইমদাদিয়া নামে আন্তর্জাতিক মানের একটি বিরাট দ্বীনী প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন— যা আজও স্বকীয়তায় সগৌরবে অম্লান।

মাওলানা আতাহার আলীর উদ্যম ও কর্ম প্রেরণা ছিল অসাধারণ। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি দ্বিনী খেদমত করে গিয়েছেন। শেষ পর্যায়ে মোমেনশাহী শহরে অবস্থিত দারুল উলূম মাদরাসাকে জামেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত করার ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে গিয়েছেন। ১৯৭৬ সালে এই সংগ্রামী-পুরুষ অনন্ত মাহবুবের সান্নিধ্যে প্রস্থান করেন।

www.pathagar.com

১৩. মুজাহিদে আজম হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)

বাংলাদেশের এই নির্ভীক সংগ্রামী পুরুষ ফরিদপুরের (বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার) এক ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত শহীদ সাইয়্যেদ আহমাদ (র)-এর ইংরেজ-বিরোধী জেহাদের পরবর্তী অধ্যায়ে অংশ নিয়েছিলেন। ইসলামকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার ঐকান্তিক প্রেরণায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালে তিনি হযরত থানবী (র) এর দরবারে উপস্থিত হন এবং তাঁরই প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে প্রথম মুজাহিরুল উলুম, পরে দারুল উলম দেওবন্দে শিক্ষা লাভ করেন।

মাওলানা শামসুল হক উপলব্ধি করেছিলেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে ইসলামের মূল সুরটি দেশের জনগণের সামনে তুলে না ধরা পর্যন্ত সার্বিক ইছলাহ্ সম্ভব নয়। তাই তিনি বেহেশতী জেওর-এর অনুবাদ সহ অর্দ্ধ শতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ মাতৃভাষায় রচনা ও অনুবাদ করেছেন। এই বিদ্যোৎসাহী কর্মীপুরুষ ঢাকা আশরাফুল উলুম মাদরাসা, লালবাগ মাদরাসা ও গোপালগঞ্জের গওহরডাঙ্গা খাদেমুল ইসলাম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। খাদেমুল ইসলাম নামে একটি ইসলাহী ও সেবা সংগঠনও কায়েম করেছেন তিনি। ১৩৮৮ হিঃ সনে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৪. ফখরে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা তাজুল ইসলাম (র)

বাংলার গৌরব এই মনীষী কৃতিত্বের সংগে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা লাভ করার পর জন্মভূমি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় চলে আসেন। জনাব ইউনুস সাহেবের সহযোগিতায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আজীবন তিনি এর দায়িত্বে ছিলেন। হকের ব্যাপারে তিনি আপোষহীন ছিলেন এবং বাংলাদেশে ইসলাম বিরোধী শক্তি, বিশেষ করে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সফল সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর প্রজ্ঞা ও উপস্থিত বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। কায়রোর এক ইসলামী সম্মেলনের অতি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে তিনি। আরবি সাহিত্যে তাঁর বুৎপত্তির প্রভা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেন।

ফখরে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আল্লামা তাজুল ইসলাম (র) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাছির নগর থানার ভুবন গ্রামে ১৩১৫ হিঃ মোতাবেক ১৮৯৬ ইঃ সালে জন্ম গ্রহন করেন। আব্বা মাওলানা আনোয়ার আলী (র)। সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ আলেমে হক ছিলেন। তখনকার সময় তৎকালীন পার্শ্ববর্তী এলাকা ছিল প্রধানত নিরক্ষর ও কৃষিজীবী অধ্যুষিত। ছোট বেলায় প্রায় আট-নয় বছর মাঠে গরু ছাগল চড়ানোর পর তাঁর পিতা তাকে নিকটবর্তী স্কুলে ভর্তি করেন। তিনি এত মেধাবী ছিলেন যে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর নয় মাসের মধ্যে ১ম শ্রেণী থেকে

www.pathagar.com

৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত সকল ক্লাসের প্রতিটি পাঠ্য বই মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার পর সেখানেও সেইরূপ বিস্ময়কর মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। ইসলামের খেদমত ও ইসলাম রক্ষার আন্দোলনেও ছিলেন অন্যতম। ১৯৬৭ সালের ৩ এপ্রিল, মোতাবেক ১৩৭৩ বাংলা ২০ চৈত্র ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এই মহামনীষী মর্দে মুজাহিদ ইন্তিকাল করেন।

১৫. মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ (র)

সুন্নাতে নববীর উপর ইস্পাত কঠিন দৃঢ় এই বুযুর্গ দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষা লাভ করার পর দীর্ঘদিন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী মাদরাসার শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ইসলামী ফিকাহ্ ও আইনে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল অতুলনীয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্বগ্রাম মেখলে একটি আদর্শ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং বিভিন্ন বিষয়ে বহু মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছেন।

১৬. অন্যান্য ব্যক্তিত্ব

হায়দারাবাদ উসমানিয়া ইউনির্ভাসিটির দ্বীনিয়াতের প্রাক্তন চেয়ারম্যান হযরত মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী, আলীগড় ইউনিভাসির্টির দ্বীনিয়াতের প্রধান মাওলানা সাইফুদ্দিন আহমদ, মাওলানা আকবর আলী, মাওলানা রুহুল উসমানী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিন্তাবিদ লেখক মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নৌরী, মাওলানা ইদ্রিস কান্দেহলভী, মাওলানা মুশাহিদ আলী, তাবলীগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র), এঁরা প্রত্যেকেই কওমী মাদরাসার যশস্বী প্রতিভা।

[উৎসঃ বেফাকুল মাদারিসিলি আরাবিয়া বাংলাদেশ পরিচিতি ১৯৯৭ ইং, সম্পাদনা ও প্রকাশনাঃ মহাসচিব মাওলানা আব্দুল জাব্বার জাহানাবাদী]

মুসলমান হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব, বিকাশ, ঐতিহ্য, ঈমানী শক্তিও মর্যাদা এ পর্যন্ত আমরা যেকুটু লাভ করেছি—এ সবই তাঁদের বিপ্লবী ও আত্মত্যাগী জীবনের বিনিময়ে সম্ভবপর হয়েছে। তাঁরা নিছক আলেম নন, বরং বাতেলের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ব্যক্তিত্বও ছিলেন বলে অনন্ত কাল পর্যন্ত তাঁদের এই অবদান চির প্রবাহমান ও অম্লান হয়ে থাকবে কালের ইতিহাসে।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

1. History of Traditional Islamic Education in Bangladesh: Dr. A.K.M. Ayyub Ali.
2. Social History of Muslam Bengal: Latifa Akand.
3. Muslim Education, Summer Issue, 1982—Editor Dr. Syed Ali Ashraf.
4. Islamic Times, August, 1913: Editor: Md. Mainul Islam
5. Introduction to Islamic Foundation (leaflet) Published by the Islamic Foundation Bangladesh.

৬. বার্ষিক রিপোর্ট, ৮২- মসজিদ সমাজ ঢাকা।

৭. কিণ্ডারগার্টেন সাময়িকী; ফেব্রুয়ারী, ৮৩, সম্পাদকঃ মুহাম্মদ আলমগীর।

৮. স্মরণিকা, ৮৩- ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ঢাকা।

৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা-৮৬।

১০. নিবন্ধমালা-৮৭।

১১. বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ পরিচিতি-১৯৯৭ ইং, সম্পাদনায় মাওলানা আবদুল জব্বার জাহানাবাদী।

১.২ দারুল উলুম হাট হাজারীর ইতিহাস, মাওলানা জসীম উদ্দিন

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী শিক্ষা ঃ আন্দোলন ও গতিপ্রকৃতি

আধুনিক শিক্ষার ব্যর্থতা ঃ

বর্তমান শিক্ষার বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পূর্ববর্তী 'আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা সঙ্কট ঃ কারণ ও প্রতিকার' শীর্ষক অধ্যায়ে। ঐ অধ্যায়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদদের অভিমতও তুলে ধরা হয়েছে প্রামাণ্য উদ্ধৃতি সহকারে। সামগ্রিকভাবে এতে যে রূপটি আমাদের নিকট ফুটে উঠে তা হচ্ছে এই ঃ

ক. আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত বস্তুতান্ত্রিক, উদরসর্বস্ব; ও ইন্দ্রীয় সম্ভোগ পরিচর্যাকারী;

খ. এ 'শিক্ষা বিজ্ঞানের' দৃষ্টিতে মানুষ হচ্ছে মৌলিক ভাবে অর্থনৈতিক জীব;

গ. এ শিক্ষায় মানব জীবনের নৈতিকতা, ধর্মীয় আবশ্যকতা, আধ্যাত্ম ও আত্মিক জীবন নিছক যুক্তি ও বিজ্ঞানের শানিত অস্ত্রে আহত ও মুমূর্ষু;

ঘ. জৈবিক চাহিদার প্রাধান্য প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গোটা বিশ্বে স্বার্থপরতা, জিঘাংসা ও চরিত্রহননের কর্মকান্ড প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়ে মানবতা আজ এক নারকীয় যাতনায় শৃংখলিত;

ঙ. সবশেষে আধুনিক শিক্ষার বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য নানা মুনির নানা দর্শন ও মতবাদে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে মানব জীবনের সার্বজনীন উদ্দেশ্য ও কল্যাণ নির্ধারণে অক্ষমতার নজীর হিসেবে বিদ্যমান।

আধুনিক শিক্ষা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে থাকা তো দূরের কথা বরং কোন জাতি বা ধর্ম বিশেষেও কল্যাণ আনতে পারেনি; বরং গোটা বিশ্বের জন্য তা আজ হয়ে উঠেছে একটি সামগ্রিক অভিশাপ। শুধু তা-ই নয়; বরং এ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে অনুপাতে নৈতিকতা বিবর্জিত কার্যকলাপ ব্যক্তিজীবন হতে শুরু করে জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক জীবনে চালিয়ে যাচ্ছে, পূর্বে অর্থাৎ যখন শিক্ষার হার অত্যন্ত নগণ্য ছিল তখন বরং সে পরিমাণ সুখ ও শান্তি ছিল গোটা বিশ্বলোকে। অন্যকথায়, তথাকথিত শিক্ষিতের হার যতই বাড়ছে ততই মানব জীবন ও সভ্যতা সঙ্কটাপন্ন ও বিধ্বংসীমুখী হয়ে উঠছে বীভৎষাকারে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন

আধুনিক শিক্ষার এ বীভৎষরূপ ও বিষময় প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করে মুসলিম বিশ্বের কতিপয় চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ ও প্রকাশক উদ্বিগ্ন হয়ে 'আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষার' রূপরেখা প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮২ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত তিনটি আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে পবিত্র মক্কায়, ১৯৭৮ সালে ইসলামাবাদ এবং ১৯৮০ সালে ঢাকায়—এ তিনটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সময় পর্যন্ত ৪৬টি মুসলিম রাষ্ট্র গোটা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব রাষ্ট্রের জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে আধুনিক শিক্ষা সম্বলিত 'মুসলিম শিক্ষা' ব্যবস্থা প্রণয়নের ধারাবাহিক ইতিহাস আজও সুসংহতভাবে প্রণীত হয়নি। ফলে ছিটেফোঁটাভাবে যা জানা যায় তা হচ্ছে এই ঃ

প্রথম আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন

সৌদি উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ১৯৭৪ সালে লন্ডনে অবস্থানকালে ঘোষণা করেছিলেন যে সৌদী সরকার তার দেশে আধুনিক শিক্ষার প্রসার করবেন। এতে লন্ডনের ইংরেজি পত্র-পত্রিকাসমূহ বিদ্রূপ করে মন্তব্য করেছিল যে, এ ঘোষণানুযায়ী আধুনিক শিক্ষার প্রসার সৌদী আরবে ঘটলে শিক্ষাক্ষেত্রে 'ইসলামী বৈশিষ্ট্যটুকু' আর রক্ষা করা যাবে না। বিদ্রূপাত্মক এ মন্তব্যটিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ বাদশাহ ফয়সলের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামী বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠেন। শাহ আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সচিবপ্রধান ডঃ আব্দুল্লাহ নাসিফ, ডঃ খোজা শেখ আহমদ সালাহ জুমজু ও ডঃ সৈয়দ আশরাফ সহ একটি সাংগঠনিক পরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যথাক্রমে শেখ আহমদ সালাহ জুমজু ও ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ নির্বাচিত হন। এই পরিষদই 'আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা' আন্দোলনের প্রথম জনক বা উৎস।

আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষাবিষয়ক নবগঠিত এ সাংগঠনিক পরিষদ ১৯৭৭ সালের ৩১শে মার্চ হতে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত ৯দিন ব্যাপী 'মুসলিম শিক্ষার' উপর প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সম্মেলনের স্থান ছিল বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যের বর্ধিষ্ণু পবিত্র পীঠস্থান আল-মক্কার কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়। গোটা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র হতে সর্বমোট ৩১৩ জন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত এতে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের অনেকেই আধুনিক শিক্ষার স্বরূপ ও ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তনের পথনির্দেশ সম্বলিত স্বরচিত সারগর্ভ প্রবন্ধাদি সম্মেলনে পাঠ করেন। তাঁদের প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও সম্মেলনের বিভিন্ন বৈঠকের আলোচ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে নিম্নোক্ত কতিপয় সুপারিশ গ্রহণ করা হয় ঃ

www.pathagar.com

ক. শিক্ষার প্রচলিত সংজ্ঞা পুনরায় এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে যাতে মানুষের আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিজনিত, চিন্তামূলক, ইন্দ্রিয় ও ভাষাজনিত ক্ষমতা সমূহের সুষম ভারসাম্যের উল্লেখ থাকে;

খ. জ্ঞানের দুটি ভাগ থাকবে—(ক) শাশ্বত জ্ঞান, (Perennial Knowledge) (খ) অর্জিত জ্ঞান (Acquired Knowledge);

গ. উক্ত বিভক্তির ভিত্তিতে ঐতিহ্যগত এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন পাঠক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে এ উভয়বিধ শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে ইসলামী পদ্ধতিতে সমন্বিত হতে পারে;

ঙ. উক্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য চিন্তা বা ধারণার উপর গবেষণা (Conceptual Research) সর্বক্ষেত্রে এমনভাবে পরিচালনার সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করতে হবে যাতে ধর্মনিরপেক্ষ বা বেদ্বীনী ভাবধারার স্থানে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে;

চ. উক্ত সর্ব-বিষয়ের জন্য একটি তদারক পরিষদ (Followup Committee) গঠন করা হবে;

ছ. সবশেষে এও উল্লেখ করা হয় যে বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনের মূল দপ্তর পবিত্র মক্কা শরীফে স্থাপন করা হবে।

[Journal of Islamic Research and Education May. 1981, Editor, Mohammad Alamgheer, Published by School of Islamic Research and Education, Gulshan, Dacca. দ্রষ্টব্য]

প্রথম বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন বিশেষ করে

১. মুসলমান হিসেবে 'আরবি ভাষা' শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ;

২. ইসলামী পরিবেশ রচনার জন্য শহর-নগর পরিকল্পনা ও পাশ্চাত্য শিল্পজনিত কর্মকাণ্ডে ইসলামী সংস্কৃতি ও রুচি ফুটিয়ে তোলার প্রতি দৃষ্টিপাত;

৩. শিক্ষক- প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির বিচার বিবেচনা;

৪. নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সহশিক্ষা পদ্ধতি বর্জন এবং নারী-প্রকৃতির সার্থক পরিস্ফূটনমূলক শিক্ষা পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা;

৫. যুব সমাজের মধ্যে ইসলামী চেতনা ও চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াসে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মসজিদ বা নামায-ঘর নির্মাণ, ইসলামী ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি রচনার উদ্দেশ্যে সৃজনশীল যুব সংগঠন কায়েম;

www.pathagar.com

৬. অমুসলিম দেশের সংখ্যালঘু মুসলিমের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ পদ্ধতির বাস্তবায়ন;

৭. খ্রিস্টান ও অন্য জাতিদের দ্বারা পরিচালিত মিশনারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে বেআআইনী ঘোষণাকরণ;

৮. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও মত বিনিময়ের জন্য আরবি ভাষা ও লেখা আন্তর্জাতিক মুসলিম ভাষা হিসেবে চালুকরণ;

৯. বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র হতে পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশনার মাধ্যমে ইসলামী চিন্তার ঐক্য ও প্রসার ঘটান;

১০. আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা গঠন;

১১. আন্তর্জাতিক ইসলামী কেন্দ্র স্থাপন;

১২. ইসলামী ও আরবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক 'ইসলামী ও আরবি প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠাকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

লক্ষণীয়, গোটা মুসলিম জাতির ঈমান, সম্পদ ও শক্তির একমাত্র অদ্বিতীয় দ্বীন ও দুনিয়ার শাশ্বত উৎস 'কাবা শরীফের' দেশ সৌদী আরবের বাদশাহ খালিদ ও তদীয় সরকারের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তায় 'প্রথম আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনটি' অনুষ্ঠিত হয়।

সুপারিশমালা ঃ

[১৯৯৭ সালে মক্কা মোকররমার কিং আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তবলির কিয়দংশ]

এই সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশমালার কিয়দয়শের বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

১. শিক্ষার উদ্দেশ্য

১.১ মানব ব্যক্তিত্বের সুষম বৃদ্ধি করাটাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তার দেহের চেতনা, অনুভূতি, বুদ্ধিবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা ও বিচারজ্ঞান সম্পন্ন আত্ম সচেতনতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এটা হওয়া উচিত। মানুষের সর্বদিক ঃ আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, কাল্পনিক, দৈহিক, বৈজ্ঞানিক, ভাষাগত দিক, কী ব্যক্তিগত, কী সামষ্টিক, সব কিছুর সুযোগ সরবরাহ করাটাই শিক্ষার দায়িত্ব। এসব দিকের কল্যাণ ও পরিপূর্ণতা অর্জনে উজ্জীবিত করাও এর কর্তব্য হিসাবে রয়েছে। মুসলিম শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছেঃ ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও সর্বোপরি মানবিক পর্যায়ে আল্লাহর নিক্‌ট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ উপলব্ধি করান।

www.pathagar.com

১.২ সম্মেলন সুপারিশ করছে যে, মুসলিম দেশগুলো যেন অবশ্যিক প্রয়োজনীয়তার তাগিদে আল্লাহর শারীয়া কার্যকরী করে এবং জনগণের জীবন প্রণালী ইসলামী নীতি ও মূল্যবোধের ছাঁচে গড়ে তোলে; কারণ তখনই তারা উপরোক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার বিন্যাসে সফলতা অর্জন করতে পারবে।

২. জ্ঞানের শ্রেণীকরণ ও পদ্ধতি

২.১ শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য 'জ্ঞান' নিম্ন দুভাগে বিন্যাস্ত করা যেতে পারে ঃ

ক. শাশ্বত জ্ঞান ঃ আল কুরআন ও হাদীসে উপস্থাপিত ঐশী জ্ঞানের ভিত্তিতে শ্বাশ্বতজ্ঞান এবং উভয়টির হৃদয়ঙ্গম করার পন্থা হিসাবে আরবি ভাষার উপর জোর দিয়ে ঐ সব গ্রন্থ হতে যা চয়ন করা যেতে পারে সেসব বিষয়াদি ।

খ. অর্জিত জ্ঞান ঃ সামাজিক, প্রাকৃতিক এবং ফলিত বিজ্ঞান যেগুলোর পরিমাণগত বিপুলবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে এবং এহেন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূল্যবোধের উৎস হিসাবে শারীয়াহর পরিসীমায় থেকে নানা সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যের প্রবৃদ্ধির অবকাশও রয়েছে।

২.২ মৌল জ্ঞান আহরণ করা হবে উভয় বিষয় থেকে। এতে প্রথমত বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে শারীয়াহর যা শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে; এবং শিক্ষার নিম্নতম পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নরত সমস্ত মুসলমানের উপর তা থাকবে বাধ্যতামূলক।

মৌল পাঠক্রমের প্রধান বিভাগ হিসাবে থাকবে বাধ্যতামূলক আরবি শিক্ষা। কারণ এই দুটো বিষয়ই একাকী ইসলামী সভ্যতা টিকিয়ে রাখতে ও মুসলিম উম্মাহর স্বকীয়তা সংরক্ষণ করতে সক্ষম।

৩. পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রদত্ত শাশ্বত-জ্ঞান প্রসংগ

৩.১ মুসলমানের ঈমান, নৈতিকতা, কর্তব্যবোধ, চিন্তা ও ধারণা গঠনের মৌলিক উপায় হচ্ছে পাক কোরআন অধ্যয়ন। বর্তমানে ছাত্ররা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পবিত্র কোরআনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মুখস্ত করে থাকে। ফলে যখন তারা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে পেশাগত কলেজসমূহ থেকে স্নাতক ডিগ্রী নিয়ে বের হয়ে আসে, তখন তারা নিজেদেরকে দেখতে পায়, তারা যথাযথ ভাবে পাক কালামের একটি সূরাও তেলাওয়াত করতে পারছে না, অথবা মুখস্ত করতে কিংবা পড়তেও সক্ষম হচ্ছে না। অতএব প্রাথমিক স্তর থেকে উপরের দিকে আল কোরআন তেলাওয়াত ও মুখস্তকরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। এতদ্‌সংগে পরবর্তী স্তরসমূহের ব্যাখ্যা ও বোধগম্যের জন্য ক্রমবর্ধমান চাপ রাখতে হবে;

www.pathagar.com

যাতে এই নিশ্চয়তা পাওয়া যায় যে, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষে যে কোন ছাত্র পাক কোরআনের কমপক্ষে কিছু অংশ মুখস্ত করেছে এবং এগুলোর সাধারণ অর্থও বুঝেছে। গোটা মুসলিম বিশ্বের বালক ও বালিকাদের জন্য একই রকমের আরো কোরআন শিক্ষা স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একই সময়ে সর্বস্তরে হাদীস পাঠও আয়ত্তকরণের উপর জোর দিতে হবে।

৩.২ ধর্মীয় পাঠক্রমও ধর্মীয় পুস্তকাদি কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে হবে এবং তা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন সৃষ্টি জগতে আল্লাহর নিদর্শন এবং তাঁর নবী মোহাম্মদ (স)-এর অলৌকিকতা সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠে, ইসলামের শত্রুদের অপবাদসমূহ প্রত্যাখ্যাত হয় এবং তরুণদের হৃদয় আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ভয় ও ভালবাসার জন্য উন্মুক্ত হয়।

৩.৩ আমাদের সমসাময়িক বাস্তব ও অভিজ্ঞ জীবনের সাথে ফিকাহ্ শাস্ত্রকে (ইসলামী বিচার শাস্ত্র) সম্পর্ক বিযুক্ত করা উচিত এবং জীবনের সমস্যা ও এর সমাধান বিশেষ করে ইসলামী সমাধানে এর কার্যকারিতা থাকা উচিত, কারণ মুসলিম সমাজে এর সামগ্রিক প্রয়োগ একান্ত অপরিহার্য।

৩.৪. আইন কোর্স বা এর পঠিতব্য বিষয়ের মৌল পাঠক্রম প্রণীত হবে শারীয়া ও এর সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ নিয়ে। প্রয়োজনে ধর্মনিরপেক্ষ আইন ও শারীয়া এর তুলনামূলক পাঠ্যপুস্তক থাকবে এতদ্‌সংগে। বিশেষজ্ঞদের প্যানেলের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ দক্ষতার প্রয়োগে জনগণের খেদমত এবং সম্প্রদায়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য শারীয়া-এর অত্যাবশ্যকীয় মহান ও সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করবেন এবং বর্তমান ধনতন্ত্র ও কম্যুনিস্ট সমাজের প্রতিষ্ঠিত আইন প্রয়োগের দোষক্রটিসমূহ পরিহার করবেন।

৩.৫. শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী সংস্কৃতি শিক্ষা দিতে হবে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও সামরিক একাডেমী এবং প্রত্যেক কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন ভাবে এ শিক্ষা প্রদান করতে হবে যা'তে ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক, আদর্শিক এবং ধর্মীয় সমস্যাবলির সমাধানসহ তাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার পর্যাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য উত্তর দেয়া যায়। ইসলামী সংস্কৃতির পাঠ ইসলামের মহত্ত্ব প্রদর্শন করবে, প্রদর্শন করবে এর সামগ্রিকতা, এর অনুপম মূল্যবোধ, নীতিমালা এবং সর্বকালের, সর্বস্থানের মানবগোষ্ঠীর উপর এর নিয়মপদ্ধতি ও অভিনন্দনযোগ্য প্রভাবও। ইসলামী সংস্কৃতির কোর্সে ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রের শান্ ও মর্যাদার পর্যালোচনা থাকবে এবং বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে মুসলিম জাতির মানবিক সম্পদ, রাজনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক সাফল্যের; যা'তাদেরকে

www.pathagar.com

মানবজাতির চিরন্তন সর্বোত্তম জাতি শিরোনামে ভূষিত করেছে। এটি অতীত ও বর্তমানের কি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক সর্বক্ষেত্রেই মানব রচিত আইনে-নির্যাতিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ইসলামের কল্যাণকর প্রভাবও ফুটিয়ে তুলবে; ধনতান্ত্রিক ও কম্যুনিস্ট আদর্শের আদলে বর্তমান সভ্যতার নীতি বিচ্যুতির বিপরীতে ইসলামের প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্ব আরোপ করবে।

৩.৬. সম্মেলন দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির উপর আরো গাবেষণা করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যাতে এগুলোকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে গবেষণার উপকারে লাগানো যায় ও ইসলামী শারীয়া-এর শিক্ষার্থীর মান উন্নত করা যায়। পাঠক্রম এবং আইন বিষয়ক উচ্চ শিক্ষার জন্য পরিকল্পনাও প্রণয়ন করতে হবে যাতে শারীয়াহ্ এর উৎস নিরূপণ এবং বিশ্বের বর্তমান যাবতীয় সমস্যার ইসলামী সমাধানের যোগ্য লোক তৈরি হয়।

৩.৭ **আরবির স্থান নির্ণয় শিক্ষা পদ্ধতি ঃ** আরব এবং ইসলামী বিশ্বের ছাত্রদের আরবি ভাষার মানের চরম দুর্বলতা অবলোকন করে সম্মেলন এই সুপারিশ করছে যে, আরবী ভাষার সমুদয় শাখাসহ এটিকে মুসলিম বিশ্বের সব দেশে আবশ্যিক করা হয়। সম্মেলন আরো সুপারিশ করছে যে, শিক্ষার সর্বপর্যায়ে আরবীর গুরুত্ব আরোপের জন্য; বিশেষভাবে আরব দেশে এজন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয় এবং এক্ষেত্রে গবেষণা ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা যথাযথ কাজে লাগানো হয়।

৪. পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিঃ অর্জিত জ্ঞান প্রসঙ্গ

৪.১ সাহিত্য ঃ সম্মেলন মুসলিম বিশ্বের পণ্ডিতবর্গকে অনুরোধ জানাচ্ছে যেন তারা ইসলামী চিন্তাধারার বহির্ভূত সাহিত্যের মূল্যায়ন ও বিচার-বিশ্লেষণের জন্য ইসলামের নীতিমালা ও মানের ভিত্তিতে একটি 'ইসলামিক স্কুল অব লিটারারী ক্রিটিসিজম' প্রতিষ্ঠা করেন।

৪.২ কলা ও কারু শিল্প ঃ সম্মেলন ইসলামী শিল্প ও কারু শিল্পের গবেষণা ও উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

৪.৩ সমাজ বিজ্ঞান ঃ পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানের স্থানে নবোদ্ভাবিত সমাজ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করতে হবে; যেসবের ধ্যান ধারণা শুধু ইসলামের বিপরীত নয় বরং কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে এর নীতিমালাও প্রণয়ন করা হবে। সম্মেলন এই সুপারিশও করছে যে, প্রতিশ্রুত মুসলিম পণ্ডিতদেরকে আর্থিক সাহায্য ও সুবিধা প্রদান করতে এবং তাদের মধ্যে যারা বিশেষ ব্যক্তিত্বের তাদেরকে উচ্চ গবেষণার জন্য নির্বাচিত করতে। বিশেষ গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট ও

www.pathagar.com

সোসাইটির দ্বারা ব্যক্তি পর্যায় এবং টিম বা দলভিত্তিক গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া এবং সমাজ বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী বিষয়ক গ্রন্থরাজি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজও শুরু করা উচিত বলে সম্মেলন অভিমত ব্যক্ত করে। সম্মেলন আরো মনে করে যে নিম্নের কাজসমূহও হাতে নেয়া উচিত ঃ

ক. সমাজবিজ্ঞানসমূহের তথ্য পঞ্জিকার সূচীপত্র প্রণয়ন

খ. তুলনামূলক অধ্যয়ন এবং

গ. সহজে ব্যবহারযোগ্য বিশ্বকোষ প্রণয়ণ

৪.৪. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়সমূহ ঃ সম্মেলনের দৃষ্টিতে মুসলিম বিশ্বের শিক্ষাক্রমে প্রত্যেক মুসলিম দেশের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব অর্জনে মুসলমানদের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে ওষুধ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ, রসায়ন এবং অংক শাস্ত্রে মুসলিম অবদানের তাৎপর্য এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত; যা গবেষণা পদ্ধতির অগ্রগামী নেতৃত্ব দিয়েছে, আবিষ্কার করেছে গবেষণার বিষয়বস্তু ও নীতিমালা; যেগুলোকে ভিত্তি করে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অধিকতর গবেষণা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইসলামের সোনালী দিনে বিজ্ঞানের উন্নতির কারণসমূহ ও পরবর্তীতে এর পতনের কারণ বিশদভাবে অনুসন্ধান করা উচিত। ছাত্রসম্প্রদায়কে ইসলামী বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে তাদের পূর্বপুরুষদের যে বৈজ্ঞানিক অনুপ্রেরণা ছিল তা পুনর্জীবিত করার জন্য অনুপ্রাণিত করা উচিত।

৪.৫. ফলিত বিজ্ঞান ঃ সম্মেলন সুপারিশ করছে, প্রাকৃতিক এবং ফলিত বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে ইসলামী প্রেরণায় এমনিভাবে পুনর্গঠিত করা যাতে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী তীব্রতর হয় ও তাদের ঈমানের সাথে এর সংযোগ স্থাপিত হয় এবং স্রষ্টার মহান শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর অলৌকিক সৃষ্টি-কৌশল অনুধাবনে তারা সক্ষম হয়। কারণ, পাক কোরআনে আল্লাহ বলেন, "কেবল তারাই আল্লাহকে ভয় করে যারা জানে"। একদিকে শারীয়া-বিজ্ঞান এবং অপরদিকে পদার্থ ও পদার্থ-নিরপেক্ষ বিজ্ঞানের মাঝে যে কৃত্রিম শূন্যতা রয়েছে তাও অবশ্যই অপসারিত করতে হবে।

ইসলামী পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে ঐ সব বিষয় পৃথক ভাবে আমাদের শিক্ষাদানের ব্যর্থতার পরিণামই হচ্ছে এহেন শূন্যতা। সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে, ঐসব বিজ্ঞান এবং পাঠ্যকৃত পুস্তকসমূহকে ঐ ধরনের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টি ভংগী থেকে পরিমুক্ত করার যা সরাসরি ইসলামী আকীদার সাথে সংঘর্ষশীল অথবা এর বিপরীতধর্মী। বিজ্ঞানভিত্তিক সত্য যেগুলো ইসলামী আকীদার বিরোধী নয় এবং বৈজ্ঞানিক অনুমিত সত্য ও তথ্য যা নিশ্চয়তা সহকারে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং ইসলামের বিপরীতধর্মীও হতে পারে, এই দু ধরনের মাঝে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা উচিত।

www.pathagar.com

অপরদিকে সম্মেলন পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত মহাবিশ্ব সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে আধুনিক বিজ্ঞান ও তত্ত্বভিত্তিক বিষয় থেকে পৃথক করার আহ্বান জানাচ্ছে এবং এতে সেসব বিষয় ব্যতিক্রম হিসাবে থাকবে যেগুলো বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বিষয়বস্তুর সাথে এগুলোর সংযোগ স্থাপন কোন কাজই নয়, বরং এটি চিন্তা ও আকীদায় বিভ্রান্তি রচনা করে; বিশেষ করে যখন অনুমিত সত্য ও তত্ত্ব মিথ্যা হিসাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্রগুলোকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এসব বিজ্ঞানের সত্য তথ্যসমূহ রেকর্ড করা, বিশ্বকোষে লিপিবদ্ধ করা যাতে প্রত্যেক স্তর ও প্রত্যেক প্রকারের স্কুল-পুস্তকের লেখকবৃন্দ এ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন এবং এর দৃষ্টান্ত দিতে পারেন। সম্মেলন সুপারিশ করছে প্রকৃত বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানের ছাত্রদের শারীয়াহ-বিজ্ঞান ও মানবিক বিষয় সম্পর্কেও কিছু জ্ঞান থাকা উচিত।

৫. শিক্ষা ও সমাজ ঃ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসঙ্গ

৫.১. গণপ্রচার কর্মসূচি ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুসংহত করা এবং এগুলোর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে ইসলামী নীতিতে গড়ে তোলার আদর্শ পদ্ধতি হচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধান প্রয়োগ। গণপ্রচার মাধ্যম হচ্ছে এর অতিগুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী হাতিয়ার যা বিদ্যালয়সমূহের কর্মকাণ্ডে সাহায্য প্রদান করতে পারে, যদি এসব বিদ্যালয় ইসলামী নীতিমালা পালনে সচেষ্ট থাকে। বিপরীতে যদি এসব প্রতিষ্ঠান ইসলাম বিরোধী নীতির অনুসারী হয় তবে এগুলোই যে আবার সমভাবে কার্যকরী হবে ইসলামী শিক্ষার চিহ্নসমূহ পর্যন্ত বিলীন করে দিতে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে ইসলামী দেশগুলোর প্রতি যাদের উপর তথ্য-প্রচার মাধ্যমের দায়িত্ব রয়েছে; তাদের উচিত ইসলামী প্রেরণার দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ন্ত্রিত সহজকৃত বৈজ্ঞানিক কর্মসূচি পরিবেশন করা, যা ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংযোগ স্থাপন করে এবং যা ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিজ্ঞানের ব্যবহার হয়ে থাকে। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্মাণের যথাসাধ্য তীব্র প্রচেষ্টা নিতে হবে। নীতিবিবর্জিত নাটক, চলচ্চিত্র, অশ্লীল ছবি ও আমোদ প্রমোদ যা নৈতিকতা বিধ্বংসী সংস্কৃতি হিসাবে বর্তমান সময়ের ছায়াছবি ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিরাট অংশ দখল করে রেখেছে, এর বিকল্প হিসাবে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রণয়নের জন্যও জোরদার প্রচেষ্টা নিতে হবে।

www.pathagar.com

৫.২. স্থাপত্য ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমিত পরিধির বাইরে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনা করা উচিত এবং আদর্শ ও মূল্যবোধের ক্ষতিকারক বিজাতীয় অপবিত্রতা থেকে সামাজিক পরিবেশ পরিশোধিত করা উচিত যাতে শিক্ষা ও সমাজ উভয়ের লক্ষ্য ও আচরণ অনুশীলনে কোন বিরোধ না থাকে। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য স্থাপত্য, নগর পরিকল্পনা এবং এজাতীয় ক্ষেত্রে ইসলামী পরিমণ্ডল বজায় রাখার জন্য যথোপযুক্ত যত্ন নেয়া উচিত; যাতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ করে পবিত্র মক্কা মোকাররমা, মদীনা মনওয়ারা এবং জেরুজালেমের পুতপবিত্র আবহাওয়া সুনিশ্চিত হয়। সম্মেলন এই বিশেষক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গবেষণা হাতে নেয়ার জন্য কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে আকুল আহ্বান জানাচ্ছে।

৬. শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষক নির্বাচন

৬.১. মুসলমান শিক্ষকদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যেন তারা ইসলামের প্রকৃত আকীদায় অনুপ্রাণিত হয় এবং তারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সত্তা হিসাবে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতির প্রতিনিধি হতে পারে, তাদের ছাত্রদের নিকট ইসলামের সম্ভাব্য উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

৬.২ শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগে লেখাপড়ার যোগ্যতাই শুধু ভিত্তি হওয়া উচিত নয়; বরং তাদের ঈমান এবং আচরণেরও পুরোপুরি হিসবে-নিকেশ করা উচিত।

৬.৩ সু-শিক্ষকের পড়াশুনা ও প্রস্তুতির জন্য শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়-গুলোকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও সুযোগ-সুবিধাদি দ্বারা সুসজ্জিত করার জন্য মনোযোগী হতে হবে।

৬.৪ ভাল এবং প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্রদেরকে এসব মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি করতে হবে এবং তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য বিজ্ঞান-উৎসাহ ভাতা ও পুরস্কার প্রদান করতে হবে। শিক্ষকদের চাহিদার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ অবশ্যই নিবদ্ধ রাখতে হবে। শিক্ষকদের বস্তুগত ও নৈতিক সুযোগ সুবিধা উপভোগের ব্যবস্থাও থাকা উচিত যা তাদেরকে শিক্ষকতা পেশায় লেগে থাকতে সাহায্য করবে।

৭. নারী শিক্ষা

৭.১ নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে সম্মেলনের অভিমত হচ্ছে এই যে, যেসব দেশে সহশিক্ষার ব্যবস্থাসহ নারীর কমনীয় স্বভাব ও তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ড নির্বিচারে পুরুষের প্রয়োজন ও চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে মৌলিক ভাবে প্রণীত সেসব পাঠক্রমে যেসব মহিলা শিক্ষিত হচ্ছে; সেসব দেশে তাদের

www.pathagar.com

সম্প্রদায় এহেন শিক্ষার পদ্ধতির আবহে দুঃখ যাতনা ভোগ করছে। সহ-শিক্ষার মন্দ পরিণতিসমূহ হচ্ছেঃ নৈতিক অধঃপতন, পরিবারিক জীবনে ভাঙ্গন, তরুণদের লালনপালনে অপর্যাপ্ততা, তাদের মধ্যে স্কুল পালানো অপরাধ প্রবণতা,এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতায় অসংলগ্নতা। তাই সম্মেলন নারী ও পুরুষের শিক্ষা আলাদা ভাবে প্রদানের জন্য সুপারিশ করছে।

৭.২ সম্মেলন সুপারিশ করছে, সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিরচিত নীতিমালার ভিত্তিতে নারী শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করার। এই ব্যবস্থার প্রতিটি স্তর হবে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এতে নারী চরিত্র ও স্বভাবপোযোগী কোর্স থাকবে। সমাজে মহিলা সেবা কর্মের চাহিদা পূরণ করবে, ইসলামের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত করবে, নারীসম্ভ্রমের সংরক্ষণ করবে, পারিবারিক বন্ধন ও নৈতিকতা জোরদার করবে, স্বাভাবিক ও আনুষ্ঠানিক বিশিষ্টতার প্রতি দৃষ্টি রাখবে এবং একই সংগে নারীসমাজে বৃহদাকারে শিক্ষা সম্প্রসারণ করবে। এর কারণ ইসলামে জ্ঞান অর্জনের দায়িত্ব নারী-পুরুষ উভয়ের উপরই সমভাবে ন্যাস্ত করা হয়েছে।

৮. যুবক সম্প্রদায়ের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

৮.১ প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে ইসলামের নীতি-আদর্শের প্রকৃত প্রয়োগ পুরোপুরি ভাবে অত্যাবশ্যক; সুতরাং মসজিদ—যেখানে সমবেতভাবে এবাদত বন্দেগী করা হয়, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা উচিত। ইসলামী আচরণ,—যা মিথ্যাকে নিন্দা করে, সততা, কল্যাণ, আত্মবিমুখতা, শৃংখলা এবং পরিচ্ছন্নতা শেখায়,-শিশুদের মাঝে উৎসাহিত করা আবশ্যক। ছাত্র-শিক্ষকদের দ্বারা কোন প্রকার অনৈসলামী চাল-চলন গৃহীত হলে তা সংগে সংগেই প্রত্যাখ্যাত ও প্রতিরোধ করতে হবে।

৮.২ বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে ইসলামী সমাজের চিন্তা-উদ্দেশ্যে যুব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম পর্যায়ের কর্মতৎপরতায় উৎসাহিত করা উচিত।

৯. সংখ্যালঘু মুসলমান

৯.১ অমুসলিম দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের অবস্থার বিশদ পর্যালোচনা-প্রতিবেদন তৈরি করা উচিত এবং সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিলুপ্তি ও মুসলিম বিশ্ব থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা উচিত।

সম্মেলন ফিলিস্তিন এবং বিদেশে বসবাসরত মুসলমানদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, যারা ইহুদী সম্প্রদায় ও তাদের মিত্রদের শিক্ষা গ্রহণ করছে। তাদের চরম দুরবস্থার প্রতি সম্মেলন সকল মুসলমানের মনোযোগ আকর্ষণ করে আকুল

www.pathagar.com

আহ্বান জানাচ্ছে, দখলকৃত অঞ্চলের মুসলিম ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য; বিশেষেভাবে সংকটাপন্ন অবস্থায় নিপতিত মুসলমানদের করুণ যে অবস্থা সদাবিদ্যমান,এর জন্য সম্মেলন সাহায্য ও সমর্থন যাচনা করছে গোটা মুসলিম বিশ্বের ।

৯.২ সংখ্যালঘু মুসলমানদের লেখাপড়ার জন্য সম্মেলন বিশেষ তহবিল প্রতিষ্ঠা করার উপর জোর দিচ্ছে, যে তহবিলে মুসলিম দেশসমূহ দান করবে সংখ্যালঘুদেরকে তাদের প্রবাস দেশে ইসলামিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করে লেখা পড়ার নিমিত্তে।

৯.৩ যেসব দেশে সংখ্যালঘু মুসলমান বসবাস করছে সেসব দেশের অবস্থা অনুযায়ী বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও যোগ্য শিক্ষকবৃন্দ পাঠাতে হবে যারা সংস্কৃতিগত পান্ডিত্য ও ঐতিহ্যের অধিকারী; তাদেরকে আরবি ভাষা ও ইসলামী সংস্কৃতি শিক্ষা দানের দায়িত্ব নিতে হবে। এসব দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে ইসলামী ভাবধারার ভিত্তিতে শিক্ষিত করার জন্য স্কুল ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকও প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ করতে হবে।

৯.৪ ইসলামী স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্ণ অধিকার লাভ করার জন্য মুসলিম দেশগুলোর উচিত সংখ্যালঘু মুসলমান ও তাদের প্রবাস দেশসমূহের মধ্যে মধ্যস্থতা করা এবং এসব দেশকে ইসলামিক কলেজ ও বিদ্যালয় থেকে যেসব ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে তার স্বীকৃতি দেয়ার জন্য প্রভাবিত করা অপরিহার্য।

৯.৫ আরব দেশগুলোতে বিশেষ করে আরবি ভাষা অজানা মুসলমানদেরকে আরবি শিক্ষা দানের জন্য মূল কেন্দ্র ও অপরাপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা ও উচিত।

৯.৬ অমুসলিম দেশের মুসলমানদের অবস্থার গবেষণা করাও প্রয়োজন কারণ তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক অবস্থাসমূহ শিক্ষানীতি গঠনের ক্ষেত্রে সর্বোপরি মুসলিম বিশ্বের নৈকট্য লাভে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সহায়ক হবে।

১০. মিশনারী তৎপরতা বন্ধকরণ

১০.১ সম্মেলন সুপারিশ করছে ইসলামী দেশসমূহের মুসলমানরা যেন তাদের দেশের বিদেশী ও মিশনারী বিদ্যালয়গুলোতে তাদের ছেলেমেয়েদেরকে ভর্তি করানো থেকে বিরত হন; কারণ এসব প্রতিষ্ঠান বা এদের অঙ্গ সংগঠন যত রকমের যত কিছুই প্রলোভন দেখাক না কেন; ছাত্রদের ঈমান ও ইসলাম এবং জাতি হিসাবে ইসলামের প্রতি আনুগত্য রচনার উপর তাদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব রয়েছে এবং ইসলামী সমাজের ভেতরে থেকে ইসলামের দুশমনদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলছে।

www.pathagar.com

১০.২ সম্মেলন আরো সুপারিশ করছে, মুসলিম বিশ্বে নতুন মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ করে দিতে এবং আহ্বান জানাচ্ছে বিদ্যমান মিশনারী স্কুলগুলো বন্ধ করে দিতে।

১১. আরবি হাতের লেখা

সম্মেলন জোর দিচ্ছে আরবি হস্তাক্ষর বহাল রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর, কারণ এই ভাষার প্রভাব মুসলিম দেশসমূহের ভাষা এবং লেখার উপর থাকা উচিত যাতে তারা পবিত্র কোরআনের ভাষা হতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে।

১২. সাময়িকী

সম্মেলন আরো সুপারিশ করছে বিশ্ববিদ্যলয় ও ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রসমূহকে সেসব সাময়িকী ও প্রবন্ধাবলি বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করার দায়িত্ব নিতে; যেগুলো আরবি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং আরবি পত্রপত্রিকায় অনুরূপ গাবেষণা প্রবন্ধ ছাপাতে যা বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৩. শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক বিশ্ব সংস্থা

সম্মেলন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের জন্য বিশ্ব সংস্থা স্থাপনের সুপারিশ করছে যার প্রধান দপ্তর মক্কা মোকাররামায় স্থাপিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সমন্বয় কার্যপরিচালনা ও ইসলামী শিক্ষা নীতির তদারকীর দায়িত্ব ন্যাস্ত থাকবে এই দপ্তরের উপর।

১৪. ইসলামী শিক্ষার জন্য বিশ্বকেন্দ্র

সম্মেলন সুপারিশ করছে কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে 'ওয়ার্ল্ড সেন্টার ফর ইসলামিক এডুকেশন এট্ মাক্কা আল মোকাররামা' শিরোনামে একটি বিশ্ব শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের। এই কেন্দ্র বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে ঐ ধরনের দক্ষ পণ্ডিতদেরকে বাছাই করে নেবে যারা প্রগাঢ়ভাবে ইসলামের আদর্শ ও সংস্কৃতিতে অভিজ্ঞ এবং সম্মেলনের সিদ্ধান্তাবলি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ভারও যাদের উপর ন্যাস্ত করা যাবে। এই কেন্দ্রের কাজ হবে নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত ঃ ইসলামের উৎস থেকে আহরিতব্য মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে সৌদি আরব রাজ্যে সূচনা হিসাবে যে পরীক্ষা চালানো হবে সেটাকে 'মডেল' করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যায়ে পরামর্শ দান ও চালু করার জন্য শিক্ষা উপকরণের বিশদ পাঠক্রম প্রণয়ন করা, কিন্ডারগার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বস্তরের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করা। এই উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা পাঠাগারও এতদ্‌সঙ্গে দলিল রেকর্ডাদি সংস্করণের কেন্দ্র স্থাপন করা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত ঃ কেন্দ্রের মধ্যে দলিলও রেকর্ডাদি অনুবাদ ব্যুরো থাকা উচিত যেটির প্রধান দায়িত্ব থাকবে পবিত্র কোরআনের স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল সহজবোধ্য অনুবাদ করা, যে অনুবাদ থাকবে প্রচলিত অনুবাদের দৃশ্যমান ভুলত্রুটি সহ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। অনুবাদ বুরোর এই দায়িত্বও নেয়া উচিত যে এটি ইসলাম সম্পর্কিত আরবি বইপুস্তকের অনুবাদ অ-আরবি ভাষায় অনুবাদ করবে। তাছাড়া বিদেশী ভাষায় ইসলামের উপর প্রয়োজনীয় বইপুস্তকও আরবিতে অনুবাদ হওয়া উচিত।

সম্মেলন সুপারিশ করছে, শিক্ষা-কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত হয়ে অনুবাদ ব্যুরোর উচিত বিদেশী ভাষাবিজ্ঞানের উপর বিশেষ করে এক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের রচনাবলির আরবিতে অনুবাদের কাজ ও এর প্রকাশনার দায়িত্ব নেয়া।

তৃতীয়ত ঃ শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি ও উপাত্ত বিনিময়ের জন্য ইসলামী শিক্ষার অঙ্গনে যেসব পণ্ডিতপ্রবর আছেন তাদের সহযোগিতা নেয়া, এবং মুসলিম রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয় সাধনের জন্য নীতি প্রণয়ন করা।

১৫. মুসলিম দেশগুলোতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ

১৫.১ সম্মেলন সুপারিশ করছে, যেসব মুসলিম দেশে প্রাকৃতিক তথা বস্তুগত সম্পদ ও অভিজ্ঞ মানব সম্পদ রয়েছে সেসব দেশের উচিত শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী গবেষণা নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোকে মডেল হিসাবে সাহায্য করা, বিশেষ করে যখন এসবদেশ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সমূহ কার্যকরী করার প্রচেষ্টা চালাবে।

১৫.২ যেহেতু ইসলামে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য এই বিবেচনায় যে, এটি তাকে তার স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে পরিচালিত করে, তার উপর এবাদত বন্দেগীর আনুষ্ঠানিকতা পালনে তাকে যোগ্য করে এবং তার কাজকর্ম ও আচরণে শারীয়াহ পালনে নিষ্ঠাবান করে তোলে। তাই সম্মেলন এই সুপারিশ করছে যে, সব মুসলিম দেশে সকল স্তরের শিক্ষাকে বিনা খরচে সুলভ করা এবং গোটা মুসলিম বিশ্বের নাগরিকদেরকে সম-সুযোগ প্রদান করা।

১৫.৩ সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে শিক্ষামন্ত্রীবর্গ ও তদারকী দলকে ইসলামী স্থাপত্যের আদলে শিক্ষাবিষয়ক সংস্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নির্মাণের, যা স্থানীয় পরিবেশ ও সাম্প্রতিক কালের চাহিদা পরিপূরণ করবে।

১৫.৪ অনুরোধ জানাচ্ছে মুসলিম বিশ্ব থেকে মেধা পাচার বন্ধ করার জন্য চেষ্টা নেয়া, এবং নানা ধরনের উৎসাহ ভাতা প্রদানের মাধ্যমে প্রবাসীদেরকে স্ব স্ব ইসলামী দেশে ফিরিয়ে আনা।

www.pathagar.com

১৫.৫ বিভিন্ন দেশে কাজ করার জন্য যারা বিশেষভাবে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাদেরকে সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

১৫.৬. সাগরপাড়ের দেশে লেখাপড়ার সুযোগ শুধু তাদেরকেই দেয়া উচিত যারা বিশেষজ্ঞ হতে চায়। কারণ এসব দেশে পাঠানো ছাত্রদেরকে তাদের ঈমান, নৈতিকতা, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের হুমকীর সম্মুখীন করা হয়। তাই সম্মেলন এই সুপারিশ করছে যে, যেসব ছাত্র সাগর পাড়ের দেশে যাচ্ছে তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দানে থাকা উচিত এবং শুধু পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষরতাই নয় বরং ধর্মীয় ও নৈতিকতার ভিত্তিতেও তাদেরকে নির্বাচন করা উচিত। তাছাড়া নিদেন পক্ষে প্রয়োজন না হলে সাগরপাড়ের বৃত্তি গ্রহণ বন্ধ করা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রকার দক্ষতা ও বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জনের ময়দান তৈরির জন্য কঠোর প্রচেষ্টাও নিতে হবে।

১৬. ইসলমিক ও আরবি বিদ্যালয়সমূহের বিশ্ব ইউনিয়ন প্রসঙ্গ

সম্মেলন এই অভিমত পোষণ করছে যে 'ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অব ইসলামিক এন্ড এরাবিক স্কুলস' প্রতিষ্ঠাকরণ একটি সুন্দর উদ্যোগ যা উৎসাহ পাওয়ার যোগ্য, এবং এই ইউনিয়নের প্রতি সাউদীআরব সরকারের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন প্রদানের জন্য সম্মেলন এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন লিপিবদ্ধ করেছে।

১৭. সামাজিক সুপারিশমালা

খসড়া কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষণ ও চূড়ান্ত করার পর তিন গ্রুপের সম্মতিতে গৃহীত সুপারিশমালা সম্মেলন কর্তৃক প্রচারিত হওয়ায় এবং সম্মেলনের উদ্দেশ্যের সাথে এর মিল রয়েছে শর্তে এটি সম্মেলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে।

১৮. কার্যবিবরণী ও প্রবন্ধাবলি

সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহের সবিশেষ মূল্যের এবং শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত মুসলিম পাণ্ডিত্যের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুধাবনের আংগিকে সম্মেলন এই সুপারিশ করছে যে, বাস্তবায়ন কমিটির তাৎক্ষণিক সম্মেলনের সম্পূর্ণ কার্যবিবরণী প্রকাশ করা উচিত, যাতে ইসলামী নীতিমালার উপর ভিত্তি করে শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ণে মুসলিম দেশসমূহ ও ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এথেকে উপকৃত হতে পারে। সম্মেলন সুপারিশ করছে যে, যেপর্যন্ত ইসলামিক শিক্ষা সেন্টার-এর বাস্তব প্রকাশ না ঘটছে, সে পর্যন্ত সাংগঠনিক কমিটিকে ফলোআপ বা তদারকী কমিটিতে রূপান্তরিত করে এর উপর সম্মেলনের সিদ্ধান্তবলি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া উচিত।

www.pathagar.com

১৯. ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সম্মেলন এর গভীর ও প্রাণস্পর্শী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে সাউদী রাষ্ট্রকে এই মহতি সম্মেলন আহ্বান করার জন্য, যা স্বকীয়তায় প্রথম সম্মেলন, যেখানে মৌলিক আলোচনার ভিত্তিতে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার দৃঢ় আত্ম-পরিতৃপ্ত ও ভিত গড়ে উঠছে। সম্মেলন আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছে কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই মহান উদ্যোগ গ্রহণ ও ইসলামী দাওয়াত বা তাবলীগ ও মুসলমানদের স্বার্থে এর খেদমতের জন্য।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন ঃ

'প্রথম আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন-এর' কার্যক্রম সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৮০ সালে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে প্রথম শিক্ষা সেমিনার— যা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন নামেও অভিহিত, অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১. কি শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং ২. কিভাবে শিক্ষা লাভ করা যায়- এ দুটি মূল প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে 'পাঠক্রম' তথা শিক্ষার লক্ষ্য বিশদভাবে নির্ধারণের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

সর্বজনাব এস. এস. হোসেইন ও এস. এ. আশরাফ কর্তৃক লিখিত Crisis In Muslim Education এবং এস, এ. আল আত্তাস সম্পাদিত Aims and Objectives of Islamic Education প্রকাশিত বই দুটির আলোকে ১. শাশ্বত জ্ঞান এবং ২. অর্জিত জ্ঞানের শাখা-প্রশাখাসমূহ নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে এর উপর আলোকপাত করা হলো।

১. শ্বাশ্বত জ্ঞান ঃ (Perennial Knowledge)

ক. শ্বাশত জ্ঞান হচ্ছে পাক কুরআন, সুন্নাহ ও এতদ্‌সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, দর্শন, সংস্কৃতি এবং ধর্ম সংক্রান্ত তুলনামূলক পাঠ ও গবেষণা ;

২. অর্জিত জ্ঞান ঃ (Acquired Knowledge)

ক. অর্জিত জ্ঞান হচ্ছে কল্পনামূলক (Imaginative) বিষয়দি অর্থাৎ শিল্পকলা;

খ. চিন্তামূলক (Intellectual) বিষয়াদি;

গ. প্রকৃতি বিজ্ঞান (Natural Sciences);

ঘ. ফলিত বিজ্ঞান (Applied Sciences);

ঙ. ব্যবহারিক বিষয়াদি (Practical)

এটাও আবশ্যকীয় করা হয়েছে যে, 'অর্জিত জ্ঞানের' প্রতিটি বিষয়কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একথার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষাবিদ এবং পারদর্শী পণ্ডিতবর্গকে উক্ত দুটি জ্ঞানের শাখায়

www.pathagar.com

সর্বতো ও স্বাভাবিকভাবে অন্বয় ও সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি রেখে পাঠক্রম রচনা করতে হবে। পাঠক্রম রচনার এ ধারা ও পরিসীমা প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণে মানসিক পরিবর্তন ও পরিবৃদ্ধির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট পরিবেশ রচনার সাফল্য অর্জনই হবে নতুন পাঠক্রম প্রণেতাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী বিষয়বস্তু সন্নিবেশ এবং অনৈসলামী বিষয়বস্তুকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাদান ছাড়াও 'প্রকৃতি পাঠের' মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, মহিমা, সৌন্দর্য ও শিল্পকলা শিক্ষা দেওয়ার প্রতিও এ সম্মেলন বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পেয়েছে।

মুসলমানের জন্য দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জগতের ইসলামী দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভারসাম্য শিক্ষা অর্জনের চরম সার্থকতা সম্পর্কে এ সম্মেলন প্রথম সম্মেলনের আলোকে নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছে ঃ

"The ultimate aim of Muslim Education lies in the realization of complete submission to Allah on the level of individual, community and humanity at large."

তৃতীয় আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন ঃ

এ সম্মেলনটির প্রকৃতি ও ধারা অংশগ্রহণকারীদের স্বরচিত প্রবন্ধ ও উপস্থিত বক্তৃতার বিষয়বস্তুর দ্বারা প্রধানত নিয়ন্ত্রিত এবং এর ভিত্তিতেই কতিপয় সুপারিশ গৃহীত হয়। সম্মেলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেওয়া হলোঃ

১৯৮০ সালের মার্চ ২২,২৩ ও ২৪ তারিখে এ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিদেশ হতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ১৭জন। আর স্বাগতিক দেশের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ১২ জন। বিদেশী শিক্ষাবিদদের মধ্যে কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট শ্রদ্ধেয় ডঃ আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ বিশেষ কারণবশত আসতে পারেন নি। তবে তাঁর পক্ষ থেকে ডঃ বাহাফাজুল্লাহ প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনের উদ্যোক্তা বাংলাদেশ সরকার। লক্ষণীয়, এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সেসময়কার মহামান্য প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথম 'ইনিশিয়েটিভ' নেন। এটা সত্যিই আল্লাহর একটি বিশেষ করুণা গোটা মুসলিম বিশ্বের প্রতি, বিশেষ করে, তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য। কেননা, ঢাকার বুকে এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন এটাই প্রথম। আরো সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, স্বয়ং মহামান্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই ছিলেন এর উদ্বোধক।

উদ্বোধনী ভাষণে মহামান্য প্রেসিডেন্ট সম্মেলন প্রসঙ্গে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেন ঃ

www.pathagar.com

"We have to set our own house to launch the campaign for transmitting the Islamic concept of education and culture among others."

মহামান্য প্রেসিডেন্টের এ উক্তিটুকুই হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রাণ'। মহামান্য প্রেসিডেন্টকে 'খোশ আমদেদ' জানতে গিয়ে তদীয় ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় শামসুল হুদা চৌধুরীও প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন সেদিন।

অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যয় ডঃ আবদুল্লাহ্ ওমর নাসিফের প্রেরিত বার্তায়ও ফুটে উঠে। তিনি কামনা করেন ঃ এ সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বমুসলিম সংহতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। তাঁর বার্তায় তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন, মুসলিম পণ্ডিতবর্গ শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণে নতুন উপায়-পন্থা সৃষ্টি করবেন। সম্মেলনের বিশেষ লক্ষণীয় দিক হচ্ছে, এতে বিদেশী শিক্ষাবিদদের কেহ-ই কোন লিখিত রচনা পাঠ করেন নি। অবশ্যি এ সম্পর্কে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তদানীন্তন মহাপরিচালক জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম সম্মেলনের শেষে ভোট-অব থ্যাংকস দিতে গিয়ে আসল কারণ তুলে ধরেন। অতি তড়িঘড়িতে ২০/২৫ দিনের সময়ের ব্যবধানে বিদেশী অতিথিদেরকে দাওয়াত দেওয়ায় তাঁদের কেহই নির্ধারিত বিষয়গুলোর উপর তেমন কোন প্রস্তুতি নিতে পারেন নি। যাক, তবুও বিদেশী মেহমানগণ 'এক্সটেম্পোর' বক্তৃতায় যা ফুটিয়ে তুলেছেন তা লিখিত প্রবন্ধের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। উদাহরণস্বরূপ দু'একজনের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

অধ্যাপক মুহাম্মদ কুতুবঃ তিনি পবিত্র মক্কা শরীফের কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীয়াহ বিভাগের খ্যাতমান অধ্যাপক।

Philoshophy of Educations বা শিক্ষা দর্শনের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান কালের শিক্ষা ও এর দর্শনের অনেক তথ্য ও উপকরণ সহজ এবং প্রাঞ্জল ইংরেজিতে তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছেঃ

১. আধুনিক দর্শন 'আল্লাহ' বা স্রষ্টাকে এই ধরনের সম্মান দিয়েছে যে, তিনি এত মহান, মহীয়ান-গরীয়ান যে মানুষের মত এত ক্ষুদ্র জীবের জীবন যাপনে তাঁকে টেনে-হেঁচড়ে লাভ নেই।

২. গ্রিক দর্শনের দেবী 'প্রমিথিয়াস' স্বর্গ হতে আগুন চুরি করে নিয়ে এসেছিলেন ধরায়; আর এ আগুনের আমদানিই হচ্ছে জ্ঞানের উৎস। অনুরূপভাবে অপর এক গ্রিক দেবী 'পেণ্ডোরার' (অবশ্যি এ নামটা তিনি উচ্চারণ করেন নি)

www.pathagar.com

বাক্সই বয়ে নিয়ে এসেছে ধরার বুকে দুঃখ, ব্যথা-বেদনা আর রোগ-শোক মানুষের জীবনে। গ্রিক পুরাণ কাহিনীর এসব দর্শন 'মানুষকে' শোক-দুঃখ এবং ব্যথা-যাতনার চিরন্তন শিকার হিসেবে চিত্রায়িত করার অপপ্রয়াস পেয়েছে। মানুষ প্রকৃতির করুণার পাত্র যেন; সে প্রতিনিয়ত দুঃখ ও পাপ মুক্তির সংগ্রামে ব্যস্ত।

৩. মধ্যযুগের চার্চ বা গীর্জা প্রশাসনেরও উল্লেখ করেন তিনি। তদানীন্তন সময়ের বিশপ-পুরোহিতবৃন্দ বিজ্ঞান ও যুক্তির অমর্যাদা করেছেন এবং মেধাশীল বিজ্ঞানী ও নব্য চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকে তারা নির্যাতন, এমনকি কখনো কখনো মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন এ আশংকায় যে, 'বিজ্ঞান ও যুক্তির' প্রভাবে বাইবেল এবং খ্রিস্টধর্ম ধ্বংস হবে। কিন্তু এর কারণ আরও তলিয়ে দেখলে এ সত্যটুকুই প্রকাশ পায় যে তদানীন্তন ইউরোপের নব্য ও উদীয়মান বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের সম্প্রসারিত ও কল্যাণকর আলো পেয়েছিলেন 'মুসলিম সভ্যতা' থেকে। ফলে বিশপদের ভয় হচ্ছিল যে, 'মুসলিম সভ্যতার' জ্ঞানার্জনে মুগ্ধ খ্রিস্টানরা হয়ত কালক্রমে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে। এ কারণেই অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিককে গীর্জা-কর্তৃপক্ষ মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। এ অত্যাচার উৎপীড়নের সর্বশেষ ফল দাঁড়াল রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছেদ— State is for Ceasar এবং Church is for Pope. উক্ত দর্শনসমূহের ফলে বর্তমান বিশ্ব জন্ম দিয়েছে আল্লাহ বিহীন সভ্যতা ও কৃষ্টি এবং বৈরাগ্য বিধৃত ধর্ম-সংস্কৃতি — তথা ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র ক্লীবজগৎ ধর্মরাজ্য।

উপসংহারে তিনি বলেন ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্ব-সৃষ্টি ও মানুষের জীবন অভিন্ন। পাক-কুরআনের ভাষায় মানুষের জীবন আল্লাহর গোলামিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ। 'ইন্নাসালাতি ওয়া নুসুকী ওয় মাহ ইয়্যা ইয়্যা মামাতী লিল্লাহে রাব্বীল আল আমীন", নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ত্যাগ-কুরবানী, আমার জীনব-মরণ একমাত্র বিশ্ব প্রতিপালকের জন্য (প্রতিজ্ঞাবদ্ধ)। আর এ জীবনদর্শন ও কর্তব্য প্রেরণাই মানুষকে লাগামহীন জীবন-যাপন ও কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত্ত রাখে; বিশেষ করে আখিরাতের ময়দানে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রত্যাশায়। মুসলমানদের তাই উচিত সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে পরিহার করা। আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকা আমাদেরকে বিভ্রান্তি ও ধ্বংসের গহবরে নিক্ষেপ করেছে এই বলে যে ঃ Europe could not progress if she did not give up religion and rites and so is taught to us— the Muslims of Modern Age.

প্রকৃতপক্ষে ইসলামই বিশ্বের বিশেষ করে মুসলিম জাতির একমাত্র মুক্তি ও উন্নয়নের পথ। কেননা স্রষ্টার-সৃষ্টি ও মানব জীবনের কর্মকাণ্ড এগুলোর কোনটিই অপরটি হতে নিরপেক্ষ নয়।

ডঃ ইসমাইল ফারুকী ঃ যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনি এসেছিলেন। তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল ঃ "Crises of Muslim Education because of Dicotomy of Traditional and Modern Systems and Means of solving it."

www.pathagar.com

তিনি 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে' আখ্যায়িত করেছেন পশ্চিমী সভ্যতার একটি 'উদ্ভাবন'– মুসলিম উম্মাকে বিভক্ত করার হাতিয়ার হিসেবে। এর লক্ষ্য দুটো ঃ ১. ইসলামী শিক্ষার অবমূল্যায়ন ও দুর্ণাম করা। ২. এ দর্শনের মাধ্যমে কিছু মুসলমানকে তালিম দিয়ে মুসলিম মিল্লাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি ও তা অব্যাহত রাখা।

এ দর্শন মুসলমানদের শক্তি ও শৌর্য বিনাশের নিমিত্তে রচিত; এ দর্শনের বুনিয়াদ যুক্তরাষ্ট্রের মত অনেক অমুসলিম দেশে প্রতিষ্ঠিত নেই। তথাকথিত Humanities বা 'মানবিক বিষয়' হিসেবে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদরা আমাদের দেশে যা শিখাচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে 'মানবিক বিষয় নয়' বরং তা পশ্চিমা সভ্যতার বিষয়বস্তু ও উপকরণ; যেগুলোর সাথে মুসলমানদের চিন্তা, কর্ম ও পরিবেশের সাদৃশ্য ও সম্পর্ক নেই; বরং তা আত্মঘাতীমূলক অনেক ক্ষেত্রে।

আমরা সবাই বর্তমানে আমেরিকায় বাস করছি, কারণ যেসব বই-পুস্তক 'সমাজ বিজ্ঞান- সমাজতন্ত্র' ইত্যাদি নামে পড়ান হচ্ছে তার সবগুলোই 'আমেরিকানাইজড'। চতুর পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদগণ আমাদেরকে বোকা বানিয়ে রেখেছে। জনাব ফারুকীর কথায় 'সার্বজনীনতা' শিক্ষা দেওয়ার নামে তারা আমাদেরকে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির তালিম দিচ্ছে। এরা আরও চাতুর্য দেখায়, ভোজবাজি খেলে এই বলে, Allah is the cause of Nature; Nature এর N বড় হলে এক অর্থ, স্রষ্টা n ছোট হলে প্রকৃতি, অন্য অর্থের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে। এসব দুশমন আমাদেরকে আল্লাহর অস্তিত্ব ও পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার অপপ্রয়াস পাচ্ছে। তিনি মুসলিম শিক্ষকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, শিক্ষকগণকে 'উসওয়াতুন হাসানা' হিসেবে ছাত্রদের নিকট প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। শুধু শ্রেণীকক্ষেই নয় বরং সর্বত্রই তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তৎপর থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলের ছেলেমেয়েরা শ্রেণীকক্ষ অপেক্ষা বাইরের জগতেই বেশি সময় কাটায় জ্ঞান ও চরিত্র অর্জনের জন্য। কারণ এতে শিক্ষার্থীরা বাস্তব তথা হাতে কলমে দীক্ষা নিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও দৃঢ় চরিত্র গঠনে সাফল্য অর্জন করেছে।

তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের শিক্ষা সমস্যা প্রসঙ্গে যে অভিমত প্রকাশ করেন তা হচ্ছে ঃ

১. অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকবৃন্দ সরকারি নিয়ন্ত্রণে।

২. বিপুল সংখ্যক ছাত্র হওয়ায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সুনিবিড় হতে পারছে না।

পরিশেষে তিনি মুসলিম শিক্ষকদের প্রতি এ আবেদন জানান যে, যে পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে চালু না হচ্ছে সে পর্যন্ত যেন শিক্ষকগণ

www.pathagar.com

প্রচলিত বই-পুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলামী দৃষ্টিকোণ রচনায় প্রয়াসী হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও স্মরণ করিয়ে দেন, ইসলাম শিক্ষা প্রসারের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে 'ওয়াকফ' পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'শিক্ষা ও শিক্ষককে' প্রতিনিয়ত সচল রাখার ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষকদেরকে শিক্ষাক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা' প্রদান করা। এ ধরনের বদান্যতা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন আদর্শে পরিলক্ষিত হয়নি বলে তিনি দৃঢ় মন্তব্য করেন।

যৌন শিক্ষা প্রসঙ্গ ঃ প্রশ্নোত্তর আসরে এই গ্রন্থকার 'যৌন শিক্ষা প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশ কি'— প্রশ্নটি উত্থাপন করলে এর উত্তরে জনাব ফারুকী যে মন্তব্য করেছিলেন, তা-ও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রশ্নটির উপস্থাপন-প্রকারটা ছিল এই রকমঃ বর্তমানে বাংলাদেশে যৌন শিক্ষা প্রদানের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য তথাকথিত সভ্য দেশগুলোর মত বাংলাদেশেও শিশু শ্রেণী হতে যৌন শিক্ষা প্রদানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা কাম্য।

উত্তরে জনাব ফারুকী বলেন, যৌন শিক্ষার কোন প্রয়োজন ছাত্র জীবনে নেই। বিবাহ জীবনের মাধ্যমেই —Through and after marriage এ জ্ঞান লাভ করতে হবে; "But not beforehand". এ প্রসঙ্গে তিনি আমেরিকায় 'যৌন শিক্ষা' প্রসারের কুফল তুলে ধরেন এবং বলেন যে, এর ফলে গোটা আমেরিকা নগ্নতাও অশ্লীলতাপূর্ণ ছায়াছবি, বই-পত্র, ম্যাগাজিন এবং প্রচারপত্রে ছেয়ে গেছে। তাছাড়া আমেরিকার কচি বয়সের শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স্ক অধিকাংশ নর-নারীই আজ যৌন রোগে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত। যৌন শিক্ষা সে দেশে 'Animality' বা পশুত্বের জন্ম ও প্রসার ঘটিয়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এর ফলে এক সময়ে যে আমেরিকাতে 'গর্ভপাত' বেআইনী ছিল আজ তা আইনসঙ্গত করার চিন্তায় আমেরিকানরা চিন্তাক্লিষ্ট। অতএব কোন মুসলিম দেশে অবারিত 'যৌন শিক্ষা' প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ কিছুতেই বিবেচ্য হতে পারে না।

ডঃ মুহাম্মদ সা'দ আল-রশীদ ঃ ২২ শে মার্চের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত 'Influence of Islam on the Culture of the Muslim World' বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে সৌদী আরবের ডঃ মুহাম্মদ সাদ আল-রশীদ বলেন, 'Pantheism' আরব জাতিকে প্রকৃতির দাস করে রেখেছিল। তাদের জীবন ও প্রশাসন ছিল 'গোষ্ঠী ইজম' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলিত। এই গোষ্ঠীবাদের ভিত্তি ছিল ধন-সম্পদ ও প্রকৃতি পূজা। কিন্তু তাদেরকে প্রকৃতির গোলামী ও গোষ্ঠীবাদ বা গোত্রবাদ থেকে মুক্তি দিয়েছিল ইসলাম 'সরকার' গঠনের ধারণা ও শিক্ষা দিয়ে। ফলে ইসলামের দৃষ্টিতে সরকার গঠনের মাধ্যমে আরব জাতিঃ

www.pathagar.com

১. শক্তি প্রয়োগে শাসিত হওয়ার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেল এবং
২. গুণগত মান (Quality) প্রতিষ্ঠা করল তাদের জীবনে নিষ্পেষণের প্রয়োগ ব্যতিরেকে।

উপসংহারে তিনি বলেন, ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা (ইসলাম) মুসলিম জাতির মধ্যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ধারণাকে নিরুৎসাহিত করে রেখেছে। তাঁর কথায়ঃ That (Islam) has made least racialism among the Muslims".

ডঃ মুহাম্মদ সা'দ আল্-রশীদের পরিচয়ঃ তিনি কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীয়াহ্ বিভাগের ডীন।

ডঃ জাকি বাদাওই ঃ ডঃ জাকি বাদাওই ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের ডিরেক্টর জেনারেল। তিনিও উক্ত ইসলামী সংস্কৃতি ও এর প্রভাবের উপর পঠিত প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে, ইসলামের এটাও একটি বিশেষ অবদান যে, ইহা ভাব এবং ভাষাগত দিক থেকে মুসলিম ঐক্য সংগঠনের সুদূর প্রভাব বিদ্যমান রেখেছ। এই ভাষা হচ্ছে 'আরবি',এর মাধ্যমে ইসলাম মুসলিম মিল্লাতকে একই ধরনের শিক্ষায় গ্রথিত ও সুসংহত করতে চায়; আর এ শিক্ষার পাঠক্রম হচ্ছে 'শারীয়াহ্'। শারীয়াহ্ শিক্ষার নির্দেশনাতেই মুসলমানগণ 'ইসলাম' সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও কর্মময় জীবন গড়ে তুলতে পারে।

ডঃ হাদী শরীফ ঃ ডঃ হাদী শরীফের বক্তব্যও এ প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য। তিনি বর্তমান বিশ্বের সভ্যতা ও সমাজের বিশ্লেষণাত্মক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'সমাজ ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের অভাব' মানব জাতিকে বিভক্ত করে রেখেছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আজ পর্যন্ত কোন শিক্ষাসূচি গ্রহণ করা হয়নি। এ সমস্যার সমাধান 'ওহীর জ্ঞান' (Revealed knowledge) ব্যতীত আদৌ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, একমাত্র জন-সম্পদ (Human resources) থেকে আহরিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা বিশ্ব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত না এর উৎস হিসেবে 'ওহীর জ্ঞানকে' গ্রহণ করা না হচ্ছে। কেননা 'ওহীর জ্ঞানই' প্রকৃতপক্ষে Integrated moral system of education দান করতে পারে। বর্তমান সভ্যতা এ শিক্ষার তীব্র প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে।

অর্থনীতি সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি আর একটি সমস্যার প্রধান কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। এটা 'মানুষ' অপেক্ষা 'সম্পদকে' অধিক গুরুত্ব দিয়ে 'মানবতাকে' হেয় করে তুলেছে। পাক কুরআনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে–'তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না'– তিনি বলেন যে, শুধু এ নীতিটুকু যদি

www.pathagar.com

আজ অর্থনীতির আদর্শ ও লক্ষ্য হিসেবে অনুসরণ করা যায় তবে এই সমস্যা জর্জরিত বিশ্ব 'শান্তি' নাগাল পাবে। পরিশেষে তিনি কৌতুক করে বলেনঃ "All ideologies thrive to establish a society without 'God'— but yet they are following semi-Gods। গডের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে গিয়ে বর্তমান বিশ্ব অনেক 'পাতিগডের' সৃষ্টি করেছে তাদের সৃষ্ট 'ইজমের' দ্বারা।

প্রশ্নোত্তর পর্ব ঃ প্রতিটি পঠিত প্রবন্ধের উপরই কম-বেশ প্রশ্নোত্তর হয়েছিল এ সম্মেলনে। এসব প্রশ্নোত্তরে যুগপৎ অংশগ্রহণকারী ও বাছাইকৃত দর্শকগণ কম-বেশি বক্তব্য রেখেছেন। এর মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী দু-চারটে প্রশ্নোত্তরের আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

১. ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব সংস্কৃতির উপর প্রশ্নমূলক বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, 'Culture' পোশাক, রং, ভাষা বা ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা নির্ণীত হয়; বিশেষ করে ইসলামের দৃষ্টিতে বরং এটা 'Belief ও Attitude' বা 'বিশ্বাস' ও 'দৃষ্টিভঙ্গি' বিশেষ। তাঁর এ ব্যাখ্যায় উপস্থিত সবাই মুগ্ধ হন।

২. জনৈক দর্শক অনুরূপভাবে বলেন যে, বিদেশী ও স্বদেশী অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে Scientist Teacher বা বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ না থাকাটা সম্মেলনের একটি অপূর্ণতা। কারণ বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে 'শিক্ষা ও সংস্কৃতির' সমস্যা ও সমাধানে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গি অত্যাবশ্যক। (এ প্রশ্নকর্তার নামটি আমার স্মরণে নেই বলে আমি দুঃখিত –গ্রন্থকার।)

৩. বিদেশী অংশগ্রহণকারীদের একজন সম্ভবত ড. ফারুকী ব্রসিয়ারে Foreign participants শিরোনামে (পৃ ঃ ১১) মুসলিম স্কলারদের তালিকার সমালোচনা করে বলেন, "We are Muslims, not foreigners, Bangladesh is our second homeland."

৪. ইসলাম ও ধর্ম শিক্ষার পার্থক্যের উপর এই গ্রন্থকারের একটি প্রশ্ন ছিল যে, এ দুটো শব্দ পাশাপাশি ব্যবহার করাটা বিভ্রান্তিকর। কারণ 'ধর্ম' বলতে ইসলাম থেকে আলাদা কিছু একটা বোঝায় না। তা নয় কি? এ প্রশ্নের উত্তরে ডঃ ফারুকীর বক্তব্য হচ্ছে, যে পর্যন্ত পুরোপুরি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কয়েম না হচ্ছে সেপর্যন্ত ধর্ম শিক্ষাকে (Religious Teaching) নবী-রাসূল, সাহাবা-কিরামদের জীবনী ও শরীয়তের কিছু অংশই আপাতত বুঝে নিতে হবে।

www.pathagar.com

সুপারিশ প্রসঙ্গ ঃ সম্মেলনের সমাপ্তি হয় কতিপয় সুপারিশ গ্রহণের মাধ্যমে। সুপারিশগুলোর প্রথমটি এবং অন্যগুলোর কিছু অংশ কাট-ছাট করা (censored) হয়। ফলে দীর্ঘ তিনদিন ব্যাপী যে শ্রম, অর্থ ও সময়ের বিনিময়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সংস্কৃতির সম্মেলনটির সমাপ্তি হলো—তা শেষ পর্যন্ত রূপ নিল বিকলাঙ্গ ও বিকৃতির অবয়বে।

কাঁচি-কাটা অংশগুলোর মধ্যে অন্যতম যে সুপারিশটি ছিল তা হচ্ছে, এই গ্রন্থকারের পেশকৃত 'অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিরোধী' কার্যকলাপ ও এতদসংক্রান্ত প্রকাশনা (press and publication) বিজ্ঞাপন শিল্পকে নিষিদ্ধ করা সম্পর্কিত।

কয়েকটি প্রস্তাব ঃ এই গ্রন্থাকারের দৃঢ়প্রত্যয়,খসড়া হিসেবে কয়েকটি প্রস্তাব এই সম্মেলনে পেশ করা হয়েছিল। এগুলো সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের নিকট আপাতত অপাংক্তেয় বিবেচিত হলেও ভবিষ্যতে এসব প্রস্তাব আর কিছু না-হোক অন্ততপক্ষে সামান্যতম হলেও নতুন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির উদ্রেক অবশ্যই করবে সুধী মহলে। প্রস্তাবগুলো হচ্ছেঃ

১. একটি 'প্যান-ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন অথবা 'কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়' কিংবা অনুরূপ কোন প্রভাবশালী বিশ্ববিদ্যালয়কে 'প্যান ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপান্তরিত করে এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের জন্য উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং নিয়ন্ত্রণের কাজ এখন থেকেই শুরু করা।

২. আপাতত কতিপয় বিষয়ের উপর কিছু বই পত্র (Textbooks and Reference Books) প্রণয়নের জন্য একটি Textbook Board প্রতিষ্ঠা করা, যাতে অচিরেই শিক্ষার উপকরণ ও বিষয়বস্তুতে খানিকটা সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। বিষয়গুলো উদাহরণস্বরূপ- অংক, বিজ্ঞান, আরবি, ইসলামের ইতিহাস, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস, ইত্যাদি যা বর্তমানের অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের সার্বজনীন বই-পুস্তকের মত সমাদৃত হবে বিষয়বস্তু পরিবেশনায়, বাঁধাইয়ে ও সুলভ মূল্যে। লক্ষণীয়, উক্ত ধরনের বই-পুস্তকের ভাষা বিভিন্ন হতে পারে তবে বিষয়বস্তু ও পরিবেশনার পদ্ধতিতে নয়।

৩. 'আরবি ভাষাকে' সমগ্র মুসলিম বিশ্বে (আরবভাষী দেশের কথাতো উঠেই না) দ্বিতীয় আবশ্যিক রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় ভাষা হিসেবে বাধ্যতামূলক করা। স্মর্তব্য, এ প্রসঙ্গে আরবি ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে ডঃ জাকিবাদাওই এক সারগর্ভ আলোচনা রেখেছিলেন সম্মেলনে।

www.pathagar.com

৪. একটি বিশ্ব মুসলিম আন্তর্জাতিক শিক্ষা গবেষণা স্থাপন ও প্রকাশনা তহবিল গঠন করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর 'শিক্ষা গবেষণা' ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানে শিক্ষার ইসলামীকরণের কাজ ত্বরান্বিত করা।

৫. শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। যদিও এ সম্পর্কে সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবে কিছুটা উল্লেখ রয়েছে তবু এর গুরুত্বটুকু পুনরায় উল্লেখ করা হচ্ছে এইজন্য যে, যে পর্যন্ত উক্ত ৪টি প্রস্তাব বা অন্যান্য শিক্ষা সম্পর্কিত গৃহীত প্রস্তাবাবলি পুরোপুরি কার্যকরী না হচ্ছে, সেপর্যন্ত বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি ও ইসলামী শিক্ষার পরিবেশ রচনায় একমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণই বিপুল খেদমত (Extensive as well as intensive) করতে পারবেন—শুধু দৃষ্টিকোণ রচনার মৌলিক ব্যাখ্যা দিয়ে হলেও।

মুসলিম বিশ্ব শিক্ষা আন্দোলনে ড. সৈয়দ আলী আশরাফের অবদান

এই প্রসঙ্গে ড. সৈয়দ আলী আশরাফের অবদান বিশেষ ভাবে অনুধাবনীয়। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ , যার প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক মুসলিমবিশ্ব শিক্ষা আন্দোলন মূর্ত হয়, সাহিত্য-বিশারদ ও সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে যতো না প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, এর চেয়ে তাঁর প্রতিভার অনন্য জ্যোতি ও প্রভার বিচ্ছুরণ ঘটেছে শিক্ষা-জগতে তাঁর আন্তর্জাতিক বিপ্লব রচনায়। আধুনিক ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচন্ড পরিবেশে শিক্ষিত হয়েও এই পরিবেশেরই বিরুদ্ধে ধর্ম-ভিত্তিক তথা ইসলামী শিক্ষায় আন্দোলনে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট রচনা করে গোটা মুসলিম বিশ্বে এর তরঙ্গ ছড়িয়ে দেয়ার মধ্যে তাঁর যে ধর্মাপরায়ণতা ও শিক্ষানুরাগের অনঢ় পরিচয় ফুটে ওঠে তা অদ্বিতীয় ও অনুপম। এই বিশ্বজনীন চেতনার আদি অগ্রনায়ক ও দিশারী ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ, এতে সন্দেহ নেই। অন্য কথায় ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের বিশ্বায়নে তাঁকে মুসলিম বিশ্বের পথিকৃৎ বলা যায় নির্দ্বিধায় ও সগৌরবে।

ডঃ আলী আশরাফের একান্ত সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য দু'বার হয়েছিল এই গ্রন্থকারের। প্রথমবার ১৯৮০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তদানীন্তন ঢাকার হোটেল ইন্টারকনে, যা বর্তমানে শেরাটন হোটেল হিসাবে রূপান্তরিত। সেদিন সকালে Journal of Islamic Research and Education সাময়িকীর সম্পাদক হিসেবে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সঙ্গে ছিলেন অধুনালুপ্ত School of

www.pathagar.com

Islamic Research and Education- এর চেয়ারম্যান ও বাদশাহ্ ফয়সল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জনাব ফারুকুল ইসলাম। এই সাক্ষাতকারটিতে ডঃ আশরাফের ইসলামী শিক্ষার প্রতি যে অনুপম অনুরাগ ও আকাঙ্খার পরিচয় ফুটে ওঠে তা মেঘ ভাঙ্গা পূর্ণশশীর মত সৌন্দর্যের ছটায় বিভামণ্ডিত। How Islamic Education Movement Started শীর্ষকের উপর আলোচনাচ্ছলে এ ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ও অবদান কি ছিল তা তিনি ঋজু ও প্রাঞ্জল ইংরেজিতে ব্যক্ত করেছিলেন সেদিন ভাব বিহ্বল হৃদয় জুড়ে। এই সাক্ষাতকারের সারসংক্ষেপ নিম্নে বিবৃত করা হলো। প্রশ্ন করা হয়েছিলঃ বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকা অবস্থায় ইসলামী শিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশ কিভাবে সত্যিকার অর্থে সম্ভব হতে পারে?

উত্তরে তিনি এক টুকরো ইতিহাস তুলে ধরলেন। বললেন ঃ ১৯৭৫ সালে লন্ডনে উচ্চশিক্ষার সৌদি মন্ত্রীবাহাদুর ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি গোটা সৌদি রাজ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রদান ও প্রসারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে ইংরেজি প্রচার মাধ্যমগুলো তীব্র বিদ্রূপ করে বলেছিল, এহেন পদক্ষেপ নেয়া হলে সৌদিরা 'ইসলামী শিক্ষা' এর প্রাণ ও স্বকীয়তা সংরক্ষণ করতে অপারগ হবে। ভবিষ্যতে ইলামিক শিক্ষা বলতে এর কোন নাম-নিশানাই আর থাকবে না। ডঃ আশরাফ পশ্চিমা জগতের এহেন বিদ্রূপাত্মক সংবাদ দর্শনে দারুনভাবে মর্মাহত হন।

"Than I wrote a letter to King Faisal giving some humble suggestions on: What steps are to be taken to maintain the Islamic character of education system."

তাঁর এই পত্র পেয়ে বাদশাহ্ ফয়সল তাঁকে কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান পদে বরণ করে নেন। পবিত্র মক্কার পরিসীমায় অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জনাব ডঃ আশরাফ যোগদান করার পর তাঁর সাথে সেসময়কার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারি জনাব ডঃ আবদুল্লাহ নাফিসের সাক্ষাত ঘটে। ডঃ নাফিস ডঃ আশরাফকে শিক্ষা বিভাগের ডীন জনাব ডঃ খোজা ও শিক্ষা বিভাগের প্রধান জনাব ডঃ আবদুল্লাহ জায়িদ এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এই পরিচয়ের সূত্র ধরে ইসলামী শিক্ষার আন্দোলন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দানা বেঁধে উঠে তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও শ্রমের বিনিময়ে। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বলয়ে মুসলিম দেশগুলোতে শিক্ষার ইসলামীকরণের রূপরেখা এবং এর বাস্তবায়নে কি করণীয় সে সম্পর্কে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি। ফলে কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম সদস্য, বাদশাহ্ ফয়সল মন্ত্রিসভার সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ আহমদ সালাহ জুমজুকে চেয়ারম্যান পদে মনোনীত করে একটি অর্গানাইজিং কমিটি গঠন করা হয়। বিশেষ অনুরোধক্রমে এর সেক্রেটারি

www.pathagar.com

পদ অলংকৃত করতে হয় স্বয়ং ডঃ আশরাফকে। এমনিভাবে ইসলামী শিক্ষার আন্দোলন সাংগঠনিক রূপ লাভ করার পর পবিত্র মক্কায় প্রথম বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ৩১ শে মার্চ হতে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত।

গোটা বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র হতে সর্বমোট ৩১৩ জন বিদগ্ধ মাওলানা, শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিতপ্রবর এতে অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের সবাই পশ্চিমা দেশগুলো থেকে আমদানিকৃত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা কর্তৃক সনাতন মূল্যবোধের বিকৃতি এবং বিভ্রাটের তীব্র সমালোচনায় একাত্মতা প্রকাশ করেন। এই সম্মেলনে যেসব প্রধান প্রধান বিষয় মূর্ত হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে ডঃ আশরাফ আলোকপাত করেন। বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

১. শিক্ষার পূণঃসজ্ঞায়ন। এতে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তি ও সমাজের আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক কল্পনা ও সংবেদনশীলতা (Sense Perceptual) এবং ভাষাগত সামর্থের ক্রম বিকাশে 'সত্য' সংরক্ষণই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য।

২. 'জ্ঞান'কে দু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ Perennnial বা শাশ্বত জ্ঞান এবং Acquired Knowledge বা লব্ধ জ্ঞান।

৩. জ্ঞানের এই শ্রেণীবিভক্তিকে কেন্দ্র করে নতুন পাঠক্রম প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং এভাবে সনাতন (Traditional) এবং আধুনিক (Modern) শিক্ষা পদ্ধতিকে পর্যায়ক্রমে একীভূত করে ইসলামী পদ্ধতিতে একটি রূপে সংহত করা হবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

৪. উক্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য Conceptual Research বা ধ্যানধারণার উপর গবেষণা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; যাতে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-ধারণাসমূহের জায়গায় ইসলামী চিন্তা ও ভাবধারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৫. উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী, বাস্তবায়ন ও তাদরকীর জন্য একটি Follow-up Committee গঠন করা হয়। এর চেয়ারম্যান হন জনাব শেখ আহমেদ সালাহ্ জামজু, ডঃ আবদুল্লাহ নসিফ হন ভাইস চেয়ারম্যান এবং ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফকে করা হয় সেক্রেটারি।

৬. এটাও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ইসলামী শিক্ষা বিশ্ব সম্মেলনের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হবে পবিত্র মক্কা মোকাররামায়।

এরপর জনাব ডঃ আশরাফ এ পর্যন্ত (অর্থাৎ ইন্টারভিউ নেয়ার দিন পর্যন্ত) শিক্ষা ক্ষেত্রে কি কি অগ্রগতি হয়েছে তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সৌদি বাদশাহ ও তার মন্ত্রণালয়কে কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে Education Centre স্থাপনের অনুরোধ জানালে প্রত্যুত্তরে বাদশাহ এই

www.pathagar.com

ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব OIC: আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থার পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের উপর ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দেন। বাদশাহর এই পরামর্শ OIC-কে যথাযথভাবে অবহিত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব স্বয়ং ডঃ আশরাফকে পালন করতে হয়। ইতোমধ্যে Flllow-up Committee-এর চেয়ারম্যান মুসলিম দেশগুলোকে স্ব-স্ব দেশে Education Research Center: শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের অনুরোধ জানান। পাকিস্তান হচ্ছে প্রথম দেশ যেটি এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এর কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত করে Education Research Centre প্রতিষ্ঠা করে। এরপর বাংলাদেশ আইনসম্মতভাবে 'Islamic Institute of Education and Research' স্থাপন করে ঢাকায়। পরবর্তী দেশটি হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া। সেখানকার প্রাইভেট এডুকেশন সেক্টর ইতোমধ্যে Islamic Education Center স্থাপন করে দুটো সম্মেলনও সমাপ্ত করে। জনাব ডঃ আশরাফ এরপর Follow up Committee-এর ৩টি আন্তর্জাতিক মুসলিম বিশ্ব সম্মেলনের পরিকল্পনার প্রসংগ উত্থাপন করেন। এই তিনটি সম্মেলন মুসলিম দেশগুলোর ৩টি দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে তিনি জানান। এই সম্মেলনগুলোর মাধ্যমে প্রথম আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের গৃহীত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। সুপারিশগুলো হচ্ছে ঃ

১. এক ও অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যে ইসলামী পাঠক্রম প্রণয়ন।
২. উক্ত পাঠক্রমের ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশমালা প্রস্তুতকরণ।
৩. শিক্ষাদান পদ্ধতির বিবর্তন, যাতে শিক্ষার সমুদয় বিষয় ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া যায়।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ঃ দ্বিতীয় মুসলিম আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন হিসাবে পরিচিত প্রথম সেমিনারটি ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয় ইসলামাবাদে।

তৃতীয় মুসলিম আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন হিসাবে পরিচিত দ্বিতীয় সেমিনারটি হচ্ছে ঢাকায়, ১৯৮১ সালে। ঢাকার IIER : Islamic Institute of Education and Research এবং কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, এই সম্মেলনে এ প্রবন্ধকার Guest observer হিসেবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। এ সম্মেলন সম্পর্কে তার প্রবন্ধাবলি সেই সময়কার দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন তার এই প্রবন্ধাবলিসহ অন্যান্য লেখাঃ 'ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐহিত্য ও প্রকৃতি' শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশিত করে, ১৯৮৬ সালে। বর্তমান গ্রন্থটি এরই সংবর্দ্ধিত রূপ।

www.pathagar.com

যাহোক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে ডঃ আশরাফ 'ফলো আপ কমিটি"-এর শিক্ষার উপর প্রকাশনা দায়িত্বটির কথা উল্লেখ করেন। এই প্রকাশনার সম্পাদনার দায়িত্বভার তাঁকে পালন করতে হচ্ছে। সাতটি গবেষণাধর্মী পাণ্ডুলিপির ৩টি ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৪টি আগামী বছর হতে যাচ্ছে বলে তিনি জানান।

এই ৭টি বইয়ের তালিকা নিম্নে দেয়া হল ঃ

১. Crisis in Muslim Education
–by Dr. S. S. Hussain & Dr. S.A. Ashraf
২. Aims and Objectives of Islamic Education
–সম্পাদনায় ঃ নকীবুল আত্তাস
৩. Curriculum of Education —ডঃ আফেন্দী, ডঃ বালুচ
৪. Social and Natural Sciences: Islamic Perspective
ডঃ ইসমাইল ফারুকী
৫. Education of Society In the Muslim World
ডঃ ওয়াসিউল্লাহ্ খান
৬. Philosophy, Language of Literature of Fine Arts
ডঃ সৈয়দ হোসাইন নাসের
৭. Muslim Education In the Modern World: A Critical Survey —by Dr. S. A. Ashraf.
[এটা ছিল ১৯৮০ সালের কথা, বর্তমান অর্থাৎ ২০০৫ সালের পূর্বেই উক্ত সমুদয় বই প্রকাশিত হয়েছে —গ্রন্থকার।]

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

এ প্রসঙ্গে ডঃ আশরাফ বলেন ঃ

১. প্রথম ও দ্বিতীয় সম্মেলনের সুপারিশমালার উপর ভিত্তি করে 'ফলো আপ কমিটি' বিভিন্ন দেশের মুসলিম পণ্ডিতদেরকে নিয়োগ করে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা চালিয়ে ইসলামী ভাবধারা রচনার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত ইসলামী বিষয়ে বিভিন্ন শাখার উপর লিখিত Textbook এদেরকে সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া ইসলামের উপর দ্বিমাসিক ও কোয়ার্টালী পত্রিকাও প্রকাশ করা হচ্ছে।
২. মুসলিম পণ্ডিত ও তাদের গ্রন্থাবলিকে কেন্দ্র কের "WHO'S WHO" ছাপানোর কাজও হাতে নেয়া হয়েছে।
৩. চতুর্থ মুসলিম বিশ্ব সম্মেলনের নামের পরিচিতিতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং

www.pathagar.com

৪. সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী তরুণ পণ্ডিতদেরকে নির্বাচিত করে তাদেরকে প্রবীণদের আওতাধীনে গবেষণা পরিচালনা করানোর জন্য Fellowship প্রবর্তনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে এসব তথ্য পরিবেশন করার পর বলেন, 'পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে' অনুরোধ জানান হয়েছে, তাঁরা যেন তাদের 'Islamic Research Centre' এর উপর এই দায়িত্ব প্রদান করেন; যেন এই Centre মুসলিম দেশসমূহের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেসব বই-পুস্তক পড়ানো হচ্ছে এর উপর গবেষণা চালিয়ে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন।

অনুরূপ মাধ্যমিক পর্যায়ের বইপুস্তকের উপরও গবেষণা পরিচালনার জন্য ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রকে অনুরোধ জানান হয়েছে বলে তিনি জানান।

মোটামুটি এই ছিল সেদিনকার সাক্ষাৎকারের বিষয়াদি যা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে ঃ

১. মুসলিম উম্মাহর শিক্ষা-দৈন্য ঘুচানোর জন্য তিনি আমৃত্যু কীভাবেই না জীবনপাত করে গেছেন।
২. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষাকে 'বুনিয়াদ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ কতই না বহুমুখী ছিল।
৩. ইসলামী শিক্ষার জীবন্ত মডেল হিসেবে তাঁর 'দারুল ইহসান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' ও কিন্ডারগার্টেন ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক বিকাশে তাঁর কী অনবদ্য স্বাক্ষরই না বহন করছে বর্তমানে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের ভুবনে।

উপসংহারে ডঃ আশরাফের একটি প্রাণস্পর্শী বক্তব্যের কথা। ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ ইসলামিক একাডেমী তথা দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সূচনালগ্নে আফসোস করে বলেছিলেন যা অনেকটা নিম্নরূপ ঃ

"আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রগতিতে পশ্চিমা দেশ, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ভীত ও শংকিত হয়ে পড়েছে এবং এই পরাশক্তি সৌদী সরকারকে এই খাতে অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে 'মুসলিম বিশ্ব শিক্ষা আন্দোলন' এখন বলতে গেলে ১৯৮৬ সাল থেকে স্থবির হয়ে পড়েছে; যার ফলে 'আমি ইসলামী একাডেমী' স্থাপন করে এই আন্দোলনকে ধরে রাখার চেষ্টা করছি।

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে "আপনারা সবাই আমাকে এই ষড়যন্ত্র ও সংকটকালে এই ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতাদানে বাধিত করবেন।" এলিফেন্ট রোডের এক বাসায় এ সমাবেশ হয়েছিল। তার সেদিনের ব্যথাতুর চেহারা আজও সমুজ্জ্বল। ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ আর বেঁচে নেই। তাঁর ইসলামী

www.pathagar.com

শিক্ষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও ক্রমবিকাশমানের দায়িত্ব পালন গোটা মুসলিম উম্মাহর সুধীজনদের আবশ্যকীয় কর্তব্য; এই সচেতনতা ও এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানানোর নিমিত্তেই এ প্রয়াস। মুসলিম দেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশের সরকারের উচিত ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফের কৃত গবেষণা ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন লক্ষ্যে একটি 'গবেষণা কেন্দ্র' সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে স্থাপন করা। উল্লেখ্য, পরিশিষ্ট অধ্যায়ে ড. আশরাফের শিক্ষানীতি সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। যা থেকে তাঁর শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের আরো স্পষ্টও সম্যক ধারনা হবে পাঠককুলের।

ড. সৈয়দ আলী আশরাফের শিক্ষানীতি

আমেরিকা থেকে "হাভার্ড রিপোর্ট" শীর্ষকে প্রকাশিত রিপোর্ট বা প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সালে আমেরিকাতে ক্যামব্রীজ, অক্সফোর্ড এবং হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট বারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট মিলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। তারা জ্ঞানকে তিন ভাগে ভাগ করেন।

১. Humanities (মানববিদ্যা) ২. Social Science (সমাজ বিজ্ঞান) ৩. Natural Science (প্রকৃতি বিষয়ক বিজ্ঞান)।

উক্ত রিপোর্টে ধর্মকে জ্ঞানের ভুবন থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। তবে এতে সুপারিশ করা হয়েছে যে, ধর্ম পড়ানো যেতে পারে পৃথক পৃথক বিভাগ খুলে। যথা ঃ বাইবেল, ইসলামিক স্টাডিজ, ইত্যাদি। কিন্তু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ (রহঃ) মানুষের তিনটি সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে জ্ঞানকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন।

১। মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক, এর উপর ভিত্তি করে যে জ্ঞান সেটি হলো Religious Science বা ধর্মবিজ্ঞান।
২। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, এর উপর ভিত্তি করে যে জ্ঞান, সেটি হলো Human Science বা মানবিক বিজ্ঞান।
৩। মানুষের সাথে সারা সৃষ্টির সম্পর্ক, এর উপর ভিত্তি করে যে জ্ঞান, সেটি হলো Natural Science বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

বর্তমানে আমেরিকাতে যে পদ্ধতি চালু রয়েছে, সেটি হলো কেহ কোন বিষয়ের উপর অনার্স করতে চাইলে, তাকে অনার্সের বিষয়ে ৫০% এবং বিবিধ বিষয়ে ৫০% পড়তে হবে। যেমন কেউ Humanities এর কোন সাবজেক্টে অনার্স করতে চাইলে তাকে Humanities এর বিষয়ে ৫০% এবং Social Science ও Natural Science সহ অন্যান্য বিষয়ে ৫০% পড়তে হবে। অনার্স বিষয়কে বলা হয় "Major" এবং বিবিধ বিষয়কে বলা হয় "Minor"।

www.pathagar.com

ড. আশরাফের দৃষ্টিতে সংস্কারমূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞানের তিনটি ভাগের উপর ভিত্তি করে তিনটি অনুষদ প্রয়োজন। যথাঃ ১. ধর্ম বিজ্ঞান অনুষদ ২. মানবিক বিজ্ঞান অনুষদ, ৩. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অনুষদ।

কোন ছাত্র ধর্মবিজ্ঞানে অনার্স করতে চাইলে তাকে ধর্মবিজ্ঞান বিষয়ে ৫০% এবং মানবিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসহ বিবিধ বিষয়ে ৫০% পড়তে হবে। এ জন্য তাঁর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম বিজ্ঞান অনুষদের 'ইসলামিক ষ্টাডিজ এন্ড দা'ওয়া' বিভাগের ছাত্রদের জন্য এমনভাবে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে যে, তারা উক্ত বিষয়ে "Major" করবে এবং মানবিক বিজ্ঞানের সাবজেক্ট হিসেবে বিজ্ঞান বিষয়ে "Minor" করবে।

তেমনিভাবে কেউ মানবিক বিজ্ঞান অনুষদের কোন বিষয়ে অনার্স করতে চাইলে তাকে উক্ত বিষয়ে ৫০% এবং ধর্মবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে ৫০% পড়তে হবে।

একই ভাবে কেউ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অনুষদের কোন বিষয়ে অনার্স করতে চাইলে, তাকে উক্ত বিষয়ে ৫০% এবং ধর্মবিজ্ঞান ও মানবিক বিজ্ঞান সহ অন্যান্য বিষয়ে ৫০% পড়তে হবে।

প্রতিটি বিষয়েই ধর্ম বিরোধী কোন মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করে ধর্ম ভিত্তিক নতুন গ্রন্থ প্রণয়নে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। এতে করে একজন শিক্ষার্থী যে কোন বিষয়েই অনার্স করুক না কেন, সে বিজ্ঞান পড়ার মাধ্যমে যুক্তি ভিত্তিক চিন্তা-চেতনার অধিকারী হবে। আর মানবিক বিজ্ঞান পড়ার মাধ্যমে অনুভূতির চর্চায় অভ্যস্থ হবে; এবং ধর্ম-বিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা চর্চায় অগ্রসর হবে। সব মিলিয়ে উক্ত শিক্ষার্থী একজন মানুষের মত মানুষ তথা আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে।

প্রান্তিক প্রত্যাশা ঃ রাজধানী ঢাকার বুকে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা ও উৎসাহ এবং সৌদী আরবের কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যৌথ শ্রমে 'তৃতীয় সম্মেলন' যে পথের দিশা দিয়েছে তা সত্যিই একবিংশ শতাব্দীর আদর্শিক বিভ্রান্ত মুসলিম মিল্লাতের হিদায়াত প্রদানের অম্লান আলোকবর্তিকা। এ সম্মেলনে মহামান্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও তদীয় শিক্ষামন্ত্রী ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন তাও মুসলিম বিশ্বের বিশেষ করে বাংলাদেশের 'শিক্ষা সংস্কৃতির' নীতি নির্ধারক হিসাবে অবিস্মৃত সাক্ষী হয়ে থাকবে। আংশগ্রহণকারীদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আগ্রহের যে পরাকাষ্ঠা এ সম্মেলনে প্রতিফলিত হয়েছে—তাও বাংলাদেশের জনমনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে বিপুল ভাবে! কবি নজরুলের আনুসরনে মুসলিম মিল্লাত আবার তাদের

www.pathagar.com

'হারানো সুলতানাত' ফিরে পাবে, 'ইসলামের পুনঃ হবে আবাদও, 'ভাঙ্গা কেল্লায়' উড়বে নিশান, এই প্রত্যয়ী আশা ও অনুপ্রেরণা দান করেছে এ কনফারেন্সটি। কবি ইকবালের উক্তি ঃIt was not the Muslims that saved Islam, rather it is Islam that saves Muslims always, এই ইতিহাস-সিদ্ধ মশহুর সত্য বাক্যটি স্মরণ করিয়ে দেয় এই কনফারেশনটি। এইটুকু স্মরণ করিয়ে দিয়েই প্র প্রসংগের উপসংহার টানা হলো।

ত্রয়ী সম্মেলনের ফলশ্রুতি ঃ

এটা দিবালোকের মতো সত্য যে মক্কা মোকাররমা, ইসলামাবাদ ও ঢাকায় অনুষ্ঠিত এ তিনটি সম্মেলনের মাধ্যমে গোটা মুসলিম বিশ্বে 'মুসলিম' তথা 'ইসলামী শিক্ষার' বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ঃ

১. জেদ্দায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (Organization of Islamic Conference). স্থাপন করা হয়েছে। এ সংস্থার সহায়তায় ঢাকা, ফেজ এবং ইসলামাবাদের মুসলিম পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

২. প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানকে ইসলামী শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করার অনুরোধ জানান হয়েছে। এ অনুরোধে প্রথম সাড়া দিয়ে পাকিস্তান তার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে উক্ত ধরনের একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় সম্প্রতি ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া ইন্দোনেশিয়াতেও বেসরকারিভাবে অনুরূপ একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

৩. নতুন পাঠক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

৪. শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়কে ইসলামী দৃষ্টিতে শিক্ষাদানে পারদর্শী করার জন্য 'শিক্ষা প্রণালী' প্রণয়ন করা হচ্ছে।

৫. শিক্ষা জগতে 'ইসলামী শিক্ষা বিপ্লব' ও এর ফল্গুধারা রচনার প্রয়াসে ইতোমধ্যে ৭টি দিক নির্দেশক ও গবেষণামূলক অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এ গ্রন্থসমূহ হচ্ছে ঃ

১. Crisis In Muslim Education: By Dr. S. S. Hossain

২. Aims and Objectives of Islamic Edeucation: Edited by Nakibul Attas

www.pathagar.com

৩. Curriculum and Education: by Dr. Affendi and Dr. Baluch
৪. Social and Natural Sciences: Islamic Perspective: by Dr. Ismail Faruqi
৫. Education and Society in the Muslim World: by Dr. Wasiullah Khan
৬. Philosophy, Language and Literature and Fine Arts: by Dr. Sayyed Hossain Nasser
৭. Muslim Education in the Modern World: A critical Suvey: By Dr. S. A. Ashraf

উক্ত ৩টি শিক্ষা সম্মেলনের প্রশংসনীয় কৃতিত্ব হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপেট শিক্ষার ইসলামীকরণের সুপারিশমালা, যেটি ভিত্তি করে মুসলিম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়নে যুগ যুগ ধরে গবেষণার কাজ চলিয়ে গোটা বিশ্বকে এই শিক্ষার কল্যাণে উপকৃত ও মোহিত করতে পারবে নিঃসন্দেহে। তাই শিক্ষার ইসলামীকরণ সংক্রান্ত মুসলিম বিশ্ব সম্মেলনের প্রস্তাবনাও সুপারিশমালা-ও এই ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধির সহায়ক হবে বিবেচনায় নিম্নে তা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হলোঃ

শিক্ষার ইসলামীকরণে মুসলিম বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনের অবদান

জ্ঞানের পুনঃ শ্রেণী বিভাগ [প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা]

"মুখবন্ধ"

একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রম প্রস্তুত করতে দুটি প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক। প্রথমত কি পড়ানো উচিত? দ্বিতীয়ত কি শিক্ষালাভ হতে পারে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমাদের নির্ধারিত পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করতে হয়। এবং আমরা কেবল তখনই উহা করতে সক্ষম হবো যখন আমরা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে সফল হবো।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কেবল শিশুদের মানসিক ক্ষমতার উন্নতি বিবেচনা করে দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও আবেগময় উপলব্ধির গভীরতা ও প্রসারতার মাত্রাকে বৃদ্ধি করতে হবে। তাদেরকে বিশ্লেষণ করতে, সংযোগ করতে, সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করতে, তাদেরকে অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। সর্বোপরি সত্যকে উপলব্ধি করার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে এবং বিশ্বাসে অধিকতর সৎ ও অনুরাগী হতে হবে তাদের।

www.pathagar.com

প্রথম বিশ্বসম্মেলনের সুপারিশে শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে 'বাদশাহ্ আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়' ইসলামিক শিক্ষার উপর দুটি পুস্তক প্রকাশ করে। প্রথম বইটি হচ্ছে —"মুসলিম শিক্ষার সংকট"। বইটি লেখেন সর্বজনাব এস, এস, হুসেন এবং এস. এ. আশরাফ। দ্বিতীয় বইটির নাম "ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য"। বইটি সম্পাদনা করেন এস. এন. আল-আত্তাস। 'দ্বিতীয়' বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে এই বিষয় গুলোকে একাধিক বার নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

মানুষের সার্বিক ব্যক্তিত্বের সমবিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই লক্ষ্য অর্জনে মানুষের চেতনা, বুদ্ধিমত্তা, বিচার, বুদ্ধি, অনুভবতা এবং শারীরিক ইন্দ্রিয় সমূহকে শিক্ষাদানের দ্বারা জাগ্রত করা যেতে পারে। সুতরাং শিক্ষা মানুষকে সর্ববিষয়ে আধ্যাত্মিকতায়, বুদ্ধিমত্তায়, কল্পনাশক্তিতে, শারীরিকভাবে, বৈজ্ঞানিকভাবে এবং ভাষাতত্ত্বে পূর্ণতা অর্জনে একক অথবা সমষ্টিগতভাবে সাহায্য করে এবং তাদেরকে সৎ ও পূর্ণতা অর্জনে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সর্বোপরি মুসলিম শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্তি সত্তাকে বা গোষ্ঠী অথবা সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।

নির্ধারিত পাঠক্রম প্রস্তুতকারকের উপরোল্লেখিত উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে এবং জ্ঞানের সকল শাখা এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে প্রত্যেকে সঠিক পথে পরিচালিত ধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে গড়ে উঠবেন, যিনি সর্বদা বলবেন যে, "হে আল্লাহ আমার প্রার্থনা, আমার কুরবানী, আমার জীবন-মৃত্যু সবই তোমার উদ্দেশ্যে। এই বিশ্বের ত্রাণকর্তা তুমি নিরাকার।"

সকল প্রাপ্ত জ্ঞানের উৎস, ঐশ্বরিক ও বুদ্ধিমত্তার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে জ্ঞানের পুনরায় শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। তদনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাসে এসবের "চিরন্তন" ও "অভিজ্ঞতালব্ধ" জ্ঞান নামকরণ করা হয়েছে।

শিক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ণে জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগের উপর নির্ভর করে দুটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন ঃ

(ক) চিরন্তন জ্ঞান, যা Perennial knowledge কুরআন এবং সুন্নাহ হতে অনুসৃত হয়েছে এবং যেগুলো এদের সাথে অনুরূপভাবে সম্পর্কযুক্ত।

(খ) অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান (Acquired knowledge) সহজে বোধগম্য এবং পরিমাণগত দিক দিয়ে গুণনের ন্যায় বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

প্রথমটি যা কুরআন এবং হাদিসে আছে তা প্রধানত গ্রহণ করা হয় ঐশ্বরিক চিন্তার সাহায্যার্থে। ইহা মানুষকে কল্পনা ও বিবেক সম্পন্ন অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করে। নির্দ্ধারিত পাঠক্রম এরূপে গঠন করতে হবে যাতে মানুষ বিবেচ্য অভিজ্ঞতা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহর নিকটবর্তী হয়।

এই শ্রেণী-বিভাগ যুক্তি ও মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে; প্রথমটি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে জ্ঞান দেয় এবং পরবর্তীটি "অভিজ্ঞতালব্ধ" যা মানুষের বিশ্বাস ও গুণাবলির দ্বারা পরিমার্জিত হয়।

শ্রেণী বিভাগ ঃ

যদিও সকল জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহতায়ালা, তবুও তিনি তা মানুষের মধ্যে বিতরণ করেছেন। কিছু জ্ঞান তিনি তাঁর প্রতিনিধি নবীগণ দ্বারা মানুষের মধ্যে উন্মোচন করেন এবং কিছু জ্ঞান তিনি মানুষের মধ্যে বিস্তার করেন যখন ব্যক্তি তার আত্মা ও মনের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। সুতরাং প্রথম প্রকার জ্ঞান সম্পূর্ণ খাঁটি এবং দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান পরীক্ষামূলকভাবে সত্য যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের সাথে তুলনা করে ইহার সত্যতা বিচার করতে হবে।

ইসলামের এই দু'ধরণের শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি চলে আসছে। ইবনে খালদুনের সময়ে এই পদ্ধতি "নাকিল" (প্রেরিত) এবং "একিলিয়া" (বুদ্ধিমত্তা) বিজ্ঞান নামে পরিচিত ছিল।

সম্প্রতি বুদ্ধির সাহায্যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্র ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং শিল্প বিজ্ঞানে চরম উন্নতি হওয়াতে মানুষের মধ্যে কৌশলগত দিক হতে জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটেছে। বিশ্বাস ও বুদ্ধি তথা "উন্মুক্ত" জ্ঞান ও "অভিজ্ঞতালব্ধ" জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এর ফল স্বরূপ একজন মানুষের সাথে আরেকজনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। কখনও বা একদল লোকের সাথে আর এক দলের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেধেছে, আবার কখনও বা একদল নিরপেক্ষ লোকের সাথে আর একদল নিরপেক্ষ লোকের বিবাদ বেধেছে। এই অবস্থায় বিশ্বাস ও বুদ্ধিমত্তার মধ্যে অখন্ডতা সৃষ্টি করে খলিফাতুল্লার প্রতি মানুষকে পূর্ণ বিকাশময় করা কেবল মাত্র তখনি সম্ভব। অর্জন সম্ভব যখন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় ইসলামিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করা হবে এবং এভাবে একটি ইসলামিক বিজ্ঞান দর্শন পরিস্ফুট হচ্ছে দেখা যাবে।

মুসলিম দেশগুলোতে বর্তমানে যে দুই প্রকার শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে সেগুলোর কোন প্রকার ক্ষতিসাধন না করে এগুলোর উন্নতি এবং অখন্ডতা রক্ষার্থে নির্ধারিত পাঠক্রমের অখন্ডতা বজায় রাখতে হবে।

www.pathagar.com

সম্মেলনে চিরন্তন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

প্রথম ভাগ

চিরন্তন জ্ঞান

(১) আল-কোরআন

(ক) তেলাওয়াত
মুখস্ত
ব্যাখ্যা

(খ) সুন্নাহ

(গ) নবীজি (তাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক) ও তাঁহার সঙ্গীগণ এবং তাহাদের অনুসারীদের সিরাহ, (যাহা ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে)।

(ঘ) তৌহিদ

(ঙ) উসুল-ই-ফিকাহ্ ও ফিকাহ্।

(চ) কোরআনী আরবি (ধ্বনি বিজ্ঞান, বাক্য গঠন, ভাষা বিষয়ে অর্থ প্রকাশ সম্বন্ধীয়)।

(২) সহায়ক বিষয়সমূহ ঃ
ইসলামিক দর্শন, তুলনামূলক ধর্ম, ইসলামি সংস্কৃতি।

দ্বিতীয় ভাগ

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ঃ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

(ক) **চিন্তনীয় কাল্পনিক (কলাবিদ্যা)ঃ** ইসলামিক কলাবিদ্যা ও স্থাপত্য শিল্প; ভাষা সমূহ ; সাহিত্য।

(খ) **বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানসমূহ ঃ** সমাজবিদ্যা (তত্ত্ববিষয়ক) ঃ দর্শন; শিক্ষা; অর্থনীতি; রাষ্ট্রবিজ্ঞান; ইতিহাস; ইসলামী সভ্যতা; (রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক জীবন, যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে ইসলামী জ্ঞানের পরিকল্পনা) ভূগোল, সমাজবিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব, (ভাষায় ইসলামী ভাবধারা) মনোবিজ্ঞান, কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত ইসলামী ভাবধারা যা প্রাচীন মুসলিম চিন্তাবিদ ও বড় বড় সুফিদের দ্বারা যেভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, নৃতত্ত্ব বিদ্যা (যে ভাবে কোরআন ও সুন্নাহ হতে এসব উদ্ধৃত করা যায়)।

(গ) **প্রকৃতিবিজ্ঞান সমূহ ঃ** (তত্ত্ব বিষয়ক) বিজ্ঞান; অঙ্ক; পরিসংখ্যান; পদার্থ; রসায়ন; জীববিজ্ঞান সমূহ; ঃ জ্যোতিঃ শাস্ত্র; মহাকাশবিজ্ঞান সমূহের দর্শন ইত্যাদি।

(ঘ) **ফলিতবিজ্ঞান সমূহ ঃ–** প্রকৌশল ও কারিগরীবিদ্যা (পূর্ত; বিষয়ক যান্ত্রিক ইত্যাদি), চিকিৎসা বিজ্ঞান (এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক; পশু চিকিৎসা, কৃষি ও বনবিজ্ঞান)।

www.pathagar.com

(ঙ) **ব্যবহারিক ঃ** বাণিজ্য, প্রশাসন বিজ্ঞান সমূহ (ব্যবসায়িক প্রশাসন, লোক প্রশাসন ইত্যাদি), পাঠাগার বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, যোগাযোগ বিজ্ঞান, গণসংযোগ ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সব শাখা ইসলামী চিন্তাধারার ভিত্তিতে পড়ান উচিত। ইসলামী চিন্তাধারা সমাজের সর্ব্বস্তরের শাখা সমূহে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

পাঠক্রমকে লাল চিহ্নে অঙ্কিতকরণ

বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের প্রধান কাজ উল্লেখিত দুই শ্রেণীবিভাগকে গ্রহণ করে প্রথম ভাগ (চিরন্তন জ্ঞান) ও দ্বিতীয় ভাগের (অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান) মধ্যে যাবতীয় সমন্বয় রক্ষা করে নির্ধারিত পাঠক্রমকে সজ্জিত করা। [এই পাঠক্রম গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ইতিপূর্বে দ্বিতীয় মুখবন্ধের প্রারম্ভে ব্যক্ত করা হয়েছে এই বলে যে, ছেলে মেয়েদের মানসিক উন্নতি করতে হবে।] বিস্তারিত গবেষণার মাধ্যমে বিশেষ পাঠক্রম গঠন মানলে মানসিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রকে তিনটি পর্যায়ে -বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ও উচ্চতর।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে প্রত্যেক পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্যকে ঠিক রেখে নিম্নলিখিতভাবে পাঠক্রম প্রস্তুত করা যেতে পারে।

ক. প্রাথমিক শিক্ষা

যেহেতু শিশুরা খুব সহজে যা দেখে, শোনে এবং অনুভব করে তা দ্রুত গ্রহণ ও অনুকরণ করতে পারে; সেহেতু তাদেরকে ইসলামী মূল বিষয়গুলো উদাহরণ ও অনুশীলন দ্বারা শিক্ষা দেয়া উচিত। তারা শিক্ষকদের নিকট স্বীয় পরিবেশ এবং পাঠ্যপুস্তক হতে ইসলামের সত্যতা শিক্ষা করবে এবং নিজেদের মুসলিম শিশু হিসেবে গড়ে তুলবে।

ছোট ছোট গ্রুপ করে দৃষ্টান্তের দ্বারা মুরব্বী ও শিক্ষকগণ এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করবেন যাতে ইসলামী আদর্শগুলো শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

এই পর্যায়ে বিভিন্ন বয়সের জন্য গ্রুপ করে শৃঙ্খলা বজায় রেখে শিক্ষার সুব্যবস্থা করা উচিত। যেমন ঃ

১। **পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ঃ**- কোরআন পাঠ, আবৃত্তি ও মুখস্ত এবং কিছু কিছু নির্দিষ্ট সূরা জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করে এগুলোর অর্থ বুঝাতে হবে। যারা প্রথম তিন বছরের মধ্যে সমস্ত কোরআন শরীফ মুখস্ত করার ক্ষমতা রাখে তারা ৮০% সময় মুখস্ত করার জন্য ব্যয় করবে। অবশিষ্ট ছাত্ররা ২০% ভাগ সময় জাতীয় ভাষা পড়তে, লিখতে আরবি এবং অঙ্কের ন্যায় মূল বিষয়গুলো

www.pathagar.com

শিক্ষা করতে ব্যয় করবে। যারা ছয় বছর ধরে মুখস্ত করতে চায় তারা একই সঙ্গে সকল বিষয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাবে। এরপর যারা থাকবে তারাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে লেখাপড়া চালাবে। সমস্ত কোরআন মুখস্ত করার জন্য সন্ধ্যাবেলায় বিশেষ ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। বাদবাকী ছাত্ররা অন্ততঃপক্ষে কোরআন শরীফের ত্রিশ পারা এবং কয়েকটি সূরা যেমন ইয়াছিন, শিখে ইত্যাদি মুখস্ত করবে।

২। **দীনিয়াত (তৌহিদ ও ফিকাসহ)** ঃ যাবতীয় প্রাথমিক নিয়ম কানুনগুলো ধাপে ধাপে পালনে ছাত্রদেরকে স্কুলে অভ্যাস্ত করাতে হবে।

৩। **ইতিহাস** ঃ ছাত্রদেরকে ইসলামের অতীত কাহিনী তথা আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মদ (তাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক) পর্যন্ত সকল নবীর জীবন কাহিনী শিক্ষা করতে হবে। কোরআন শরীফ, হাদিছ, সিরাতুন্নবী এবং মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস থেকে সূচিপত্র প্রস্তুত করতে হবে।

পাঠগুলোকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন অল্পবয়স্কদের নিকট ধারাবাহিকভাবে এই গুলো গল্পের ন্যায় শ্রুতিমধুর হয়। এই শিক্ষা পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হবে শিশুদেরকে ইসলামী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করা এবং পরোক্ষভাবে মানবজীবনে দ্বীন বা ধর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে উজ্জিবীত করা। ইতিহাস শিক্ষাকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলতে নিজ নিজ দেশের মুসলিম ইতিহাস সংমিশ্রিত করে পাঠ প্রস্তুত করতে হবে।

৪। **গল্প ও কবিতা** ঃ এমনভাবে এসব রচনা করতে হবে যেন শিশুদের মাঝে এই শিক্ষা প্রতিবেশী ও বন্ধুদের প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধ বৃদ্ধি করে। তাদের পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ উদ্বুদ্ধ করে। এটি ছাত্রদেরকে নবীদের প্রতি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি এবং ধর্মপরায়ণ নারী পুরুষদের শ্রদ্ধাবোধ উজ্জীবিত করবে। মানুষ ও আল্লাহর প্রতি নিজ নিজ কর্তব্যে সচেতন করবে। তাদের সত্য ও ন্যায়ের জন্য আত্মত্যাগ করতে শিক্ষা দেবে। এইসব গল্প প্রধানত নবীর সিরাত ও হাদিছ এবং প্রখ্যাত মুসলমানদের জীবনী থেকে নিতে হবে।

৫. **ভূগোল** ঃ ভূগোল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হবে, মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রস্থল মক্কা এবং মদীনার সাথে তাদের সম্পর্ক উপলব্ধি করা। তারা তাদের চারপাশে বহিরবিশ্ব ও ইহার লোকজন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। এভাবে এই শিক্ষা ছাত্রদের মানবজাতি ও উম্মার প্রতি প্রাথমিক একতাবদ্ধতায় উদ্বুদ্ধ হতে পরিচালিত করবে। তাদের ক্ষুদে জাতীয়তাবোধ ও ধর্মীয় সংকীর্ণতা হতে মুক্তি লাভে সাহায্য করবে। এ পর্যায়ে একজন ছাত্র তার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে মুসলিম বিশ্ব বলতে কি বুঝায় তা কিছুটা উপলব্ধি করতে শিখবে। এই বিশ্বের সাথে তার দেশের কি সম্পর্ক তা' সে উপলব্ধি করবে। প্রথমদিকে এই

www.pathagar.com

শিক্ষা ছবি অথবা ঔসুক্য বিধৃত কার্ডের (পাজেলস্) মাধ্যমে দিতে হবে। ক্রমান্বয়ে শিক্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে উপযুক্ত পুস্তক বা নির্দিষ্ট অধ্যায়ের উদ্ধৃতি সহ ছাত্রদের পড়তে দেবেন। উল্লেখ্য, শিশুদের জন্য মানচিত্র পাঠ একটি আনন্দদায়ক বিষয়। এই ধরনের পাঠপদ্ধতি তাদের কৌতুহল মিটায় এবং আত্মবিশ্বাসে উজ্জিবীত করে তোলে।

৬. অঙ্ক শাস্ত্র ঃ প্রথমত ক্রীড়া ও উৎসুক্যের মাধ্যমে অংক শাস্ত্র শিক্ষা দিতে হবে। অতঃপর সরাসরি অঙ্কের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। ইতোমধ্যে যে ছাত্র তার প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করবে, সে পাটিগণিতের সংখ্যা ছাড়াও বীজগণিতের সংকেত ও জ্যামিতি অঙ্কন করতে পারবে। এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রদেরকে আন্তরিকভাবে বস্ত-নিরপেক্ষ বিষয়গুলো সূত্র দ্বারা প্রকাশ করতে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা। হৃদয় বা মনের উৎকর্ষের জন্য এটি একটি অত্যন্ত ভাল শিক্ষা। এর দ্বারা স্থূলতা হতে বস্তনিরপেক্ষতায় বিচরণ করতে পারা যায়। নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষার্থীরা আদর্শবাদের দিকে অগ্রসর হতে পারে। এটি তাদের এই বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে এই স্পষ্ট ধারণা লাভে সাহায্য করে যে এই জগৎ সত্যিকার অর্থে আয়াতুল্লাহ বা আল্লার চিহ্ন স্বরূপ- অর্থাৎ বাস্তবতার প্রতীক।

৭. আরবিঃ আরব বিশ্বে আরবি মাতৃভাষা; কিন্তু বহিঃবিশ্বে আরবি ভাষাটি শিশুকাল হতে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেয়া উচিত। আরবদেশের বাহিরে বসবাসরত শিশুদের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিন্যাসিত পাঠ ফলিত ভাষাবিদদের সাহায্যে প্রস্তুত করতে হবে। এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে যে, ছয় বছরের মধ্যে শিশুরা শব্দ ও বাক্যগঠন প্রণালীর উপর যেন ভাল দখল অর্জন করতে পারে। এই উপায়ে তারা যেন প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর আরবি ভাষায় সহজে কোরান শরীফ পাঠ করতে পারে।

৮. প্রাকৃতিক বিদ্যা ও প্রাথমিক বিজ্ঞানঃ এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা যেন এই বিশ্বের সৌন্দর্য, রহস্য, ঔজ্জ্বল্য, সমৃদ্ধতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে। এবং যাতে তারা আল্লাহতায়ালার মহিমা ও প্রজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, বিজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাসহ প্রাথমিকভাবে বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে পারে।

খ. মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষার নির্ধাারিত পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং এর প্রয়োগে শক্তি যোগান। এই বয়সটা মানুষের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বয়স; কেননা এই সময়ে নানান প্রশ্ন ও সন্দেহ নিজ মনের মধ্যে সর্বদা বিরাজ করে। কিন্তু শিশুরা সহজে লোভে পড়ে এবং অর্ধ সত্য ও

www.pathagar.com

মিথ্যা ধারণাগুলো অনুভূতির আকারে 'ওয়াছওয়াছার' শিকার হয়। ইসলাম ও নবীর প্রতি (তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক) অধিকতর ভালবাসা সৃষ্টি করতে হলে আরও যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ইসলামকে বুঝতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলাম বিরুদ্ধ ভাবাপন্নদের প্রদর্শিত করতে হলে ইসলামকে অধিকতর বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বুঝতে হবে। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন বিষয়গুলোকে এমনভাবে সাজান হবে যে শিক্ষাদানের তথা-নির্ধারিত পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হবে ইসলামকে বর্ণনা করাও বুঝান। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে তা আরও ব্যাপকভাবে বুঝাতে হবে। কেননা মানসিকতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা সুদৃশ্য চিত্রাবলিও দেখতে চায়।

ছাত্রদের জ্ঞান ও গুণ, জ্ঞান ও কর্ম, জ্ঞান ও ক্ষমতা, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য, জ্ঞান ও সামাজিক পরিবেশ, জ্ঞান ও জাতীয় প্রগতি ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে মূল সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাদের আবেগময় প্রয়োজনীয়তাকে অধিকতর মার্জিত করতে হলে ইসলামী সাহিত্য ও ইসলামী কলা এবং স্থাপত্য বিদ্যার মাধ্যমে তাদেরকে উজ্জীবিত করতে হবে। তাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি করার জন্য অঙ্ক শাস্ত্র ও প্রকৃতি বিদ্যা পড়াতে হবে। তাদের যোগাযোগ করার জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হলে সাহিত্য ও সমাজপাঠ পাঠ্যভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
মাধ্যমিক পর্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আবশ্যকীয় পাঠ্য হিসাবে পড়াতে হবে।

১. কোরআন ঃ আবৃত্তি, মুখস্থ করণ ও ব্যাখ্যা করণ

হাদিস ঃ ছাত্রদের বয়স ও সামর্থ অনুযায়ী নির্বাচিত হাদিস সমূহের শিক্ষা দিতে হবে। সিরা ও ইসলামের ইতিহাস ঃ

ছাত্রদের মানসিক আবেগ-উদ্দীপনা ও বুদ্ধি উন্নয়নে এবং সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনে এগুলোর গুরুত্ব অপরিহার্য্য।

২. ফিকাহ্।

৩. আরবী, মাতৃভাষা/জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং একটি ইউরোপীয় ভাষা।

৪. অঙ্ক শাস্ত্র।

৫. প্রকৃতি বিজ্ঞান।

উপরের উল্লিখিত বিষয়গুলোসহ প্রথম তিন বছরের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পড়তে হবেঃ

www.pathagar.com

৬. ভূগোলঃ- নিজ দেশের বিশেষ উল্লেখসহ বিশ্বভূগোলের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় সমূহ অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে।

৭. ইতিহাস ও পৌরবিজ্ঞানঃ– ছাত্রদের ইসলামের ইতিহাসের এবং নিজ নিজ দেশের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মুসলমানদের অবদান বাধ্যতামূলভাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

উপরে উল্লেখিত বাধ্যতামূলক বিষয়াদি ছাড়াও মাধ্যমিক স্তরের শেষ তিন বছরের মধ্যে উপরে বর্ণিত ১নং গ্রুপের (চিরন্তন জ্ঞান) অথবা দ্বিতীয় গ্রুপের যেকোন শাখা হতে যে কোন দুটি অথবা এই দুই গ্রুপের প্রত্যেকটি হতে একটি বিষয় পাঠ করার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

গ. বিশ্ববিদ্যালয়

তৃতীয় অর্থাৎ চূড়ান্ত স্তরে নির্দিষ্ট পাঠক্রমের ভিত্তি নিম্নলিখিত তিনটি উদ্দেশ্য সহ বৃত্তিমূলক স্তরের (প্রাথমিক/মাধ্যমিক) উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে :

(ক) যাতে ছাত্রবৃন্দ সমস্ত জীবনব্যাপি ইসলামের সেবার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে এবং সেজন্য পাঠক্রমে ইসলাম ও মুসলিম সমাজ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধিমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(খ) শিক্ষা পরিচালকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রগণ কর্তৃক নির্বাচিত ১ম ও ২য় গ্রুপের যেকোন শাখায় ছাত্রদেরকে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দান করতে হবে।

(গ) জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সাধারণ বিষয়াদির মাধ্যমে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের জন্য নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এইগুলো বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সকল ছাত্রের জন্য সাধারণ ইসলামী শিক্ষার বিষয় হিসাবে গণ্য হবে। সাধারণ ইসলামী শিক্ষার বিষয়াদিগুলো নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত।

১. ১ম গ্রুপ হতে দুটি বিষয়ঃ একটি হবে আরবি ভাষা অন্যটি হবে ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা অথবা ইসলামী চিন্তা ও আদর্শের ইতিহাস।

২. সংগৃহীত জ্ঞান হতে দুটি বিষয় ঃ যার একটি হবে ইসলামী বিজ্ঞান ও শিক্ষা দর্শন এবং অন্যটি হইবে ইসলামী কলা, স্থাপত্য অথবা ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে প্রদত্ত নিম্নলিখিত যে কোন একটিঃ শিক্ষা, ইতিহাস, অর্থনীতি অথবা সমাজবিজ্ঞান।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান, শারীয়াহ্ ও শিক্ষা

এই সম্মেলনে অনুমোদনকৃত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠক্রম প্রণয়নকারী সংস্থা স্থাপন করতে হবে।

১. কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া ছাড়াও পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীদের ইসলামী দর্শন, বিজ্ঞান ও শিক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহে সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে বক্তৃতা, সেমিনার ও স্বল্পকালীন পাঠের আয়োজন করতে হবে।

২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশেষ ক্ষেত্রে কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলির সাথে শারীয়াহ্‌র বিস্তৃত লক্ষ্যসমূহ অথবা চিরন্তন জ্ঞানের সনাক্তকরণটিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠক্রমের উদ্দেশ্য প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সামাজিক ক্ষেত্রে শারীয়াহ্ কৌশলগত বিশেষজ্ঞ, পন্ডিত এবং সরকারের বিভিন্ন স্তরে পাঠক্রম প্রণয়ণকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে আলোচনা ও মতৈক্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের কাজ শুরু করতে হবে।

৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা পাঠক্রমগুলোকে ইসলামীকরণের প্রয়োজনে স্তর বিন্যাস বিশ্লেষণের মাধ্যম প্রণয়ন করতে হবে। এইগুলোর প্রথমটি হচ্ছে- চাহিদা, এরপর সুযোগ-সুবিধা এবং শেষে এই চাহিদা পূরণের পর পুনরায় সুন্দরভাবে বিন্যাস করা। এই চাহিদাগুলোকে "সংশ্লিষ্ট দেশের সূচনাতে জনগণ ও সবশেষে ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন পর্যায়ক্রমে গোড়া হতে মিটাতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে এইগুলো উপযুক্ত ও কৌশলগত অবদান রাখবে এবং সম্পদের ভ্রান্ত বিনিয়োগ ও মেধা অপচয়ের সম্ভাবনা রোধ করবে।

৪. পাঠক্রম কাঠামোকে কৌশলগত ও চিরন্তন শারীয়াহ্- এই দুভাগে বিভক্ত করা উচিত।

চিরন্তন বা শারীয়াহ্ অংশে (ক) চিরন্তন এবং অধীত জ্ঞানের বিষয় সমূহ মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে এবং ইসলামি মতাদর্শে, নৈতিকতায় ও মূল্যবোধের সাথে যার প্রধান অংশ বা পরিধি আন্ত-নিয়মানুবর্তিতা সংক্রান্ত বা সামাজিক কৌশলগত বিষয় সমূহের সাথে সংযুক্ত থাকিবে। পেশাগত জীবনে ইসলামী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদকে দক্ষ, কর্মক্ষম ও উন্নয়নমূখী করতে হলে এই ধরণের বিষয় সমূহকে তাদের কর্তৃত্বে সম্পূর্ণভাবে ন্যাস্ত রাখতে হবে।

www.pathagar.com

(খ) দক্ষ ও নিপুণ একজন প্রকৌশলী প্রস্তুতির প্রধান উপকরণ সমূহ এবং এগুলোর অন্তর্নিহিত পাঠ্যসূচীর কাঠামোগত সমতা বিধান করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) আন্তঃ নিয়মানুবর্তিতা সংক্রান্ত বিষয়গুলো ব্যতীত শারিয়ার জন্য প্রায় ২০% সময় বরাদ্দ করা উচিত।

৫. ছোট বড় উভয় দিক থেকে কাঠামোগত অংশসমূহ এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যেন ইসলামী আদর্শ, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ বিচার, কারিগরি অংশের বিষয়াদি এবং আন্তঃনিয়মানুবর্তিতামূলক বিষয়গুলোর সাথে এগুলোর পূর্ণভাবে সংযুক্তি হয়।

এই দৃষ্টিতে নিম্নলিখিত বিষয়ের শিক্ষা-গবেষণা ও প্রচারের জন্য বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্র স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

(ক) ইসলামী দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজপাঠ উন্নয়ন

(খ) প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানে ইসলামী নীতিমালা ও মূল্যবোধ সৃজন

৬. সম্মিলিত ইসলামী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিষয়বস্তুর সূচির তড়িৎ উন্নয়নের জন্য আদর্শ বা পরীক্ষামূলক প্রকল্প স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা উচিত।

৭. স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমনভাবে শিক্ষকগণ ইসলামী মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিদ্যায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন যাতে তারা ইসলামী তত্ত্ব প্রত্যয়ের সাথে ব্যাখ্যা করতে পারেন। তাদেরকে মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার কারণগুলো সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। এভাবে শিক্ষার তত্ত্ব ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কিত "শিক্ষার" উপর নির্দেশ প্রদানে তারা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবেন। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে মুখস্ত, ধারা বিবরণী অথবা নোট বই এবং আধুনিক সমতুল্য একক শিক্ষা এবং মূল্যায়ন ইত্যাদির বিষয়াদি জানার জন্য তাদেরকে মূল বই পড়তে হবে।

৮. সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধাগুলো যেখানে নেই এমন স্থানে ইসলামী মতাদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রসারের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিভিন্ন প্রকার কলা কৌশল অবলম্বন করা উচিৎ। এগুলোকে দৃঢ় ভিত্ বলা যেতে পারে।

(ক) বিদেশে এবং মুসলিম সংখ্যালঘু দেশ অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে পরিবর্তিত পাঠ্য সূচী প্রবর্তন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপঃ সমাজ বিজ্ঞানের পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষা এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ অনুষদ গুলোতে অনুরূপ সমাজ বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।

www.pathagar.com

(খ) প্রচলিত পাঠ্য বিষয়ে ইসলামী মতাদর্শ সংযোজন-পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপিত করা যেতে পারে, অথবা বর্তমান ধর্ম-নিরপেক্ষ পাঠক্রমে ইসলামী মতাদর্শের বিষয় হিসাবে সংযোজন করা যেতে পারে।

(গ) ভূতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের উৎপত্তির মূল উৎস হিসাবে কোরআন শরীফকে উপস্থাপিত করতে হবে।

(ঘ) উদাহরণ স্বরূপঃ উৎস পানির ইসলামে পানি সংক্রান্ত কোরআন সুন্নাহ আইনের মূলনীতির সঙ্গে প্রচলিত আইনের অন্যান্য শাখা ও সমস্যাবলির সম্পর্কে যুক্তি-তথ্য দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে।

(ঙ) সাহিত্যে একটি পাঠক্রম থাকবে যা শ্রেষ্ঠ ইসলামী বৈজ্ঞানিকদের গদ্য ও পদ্য রচনায় সমৃদ্ধ হবে এবং যা ইসলামী দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষার উৎস হবে।

✱. অন্যান্য সুপারিশমালা

১। এই সম্মেলন ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার উপরে আয়োজিত প্রথম বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশের প্রতি জোর সমর্থন জানাচ্ছে যেন প্রতিটি মুসলিম দেশে ইসলামী শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়, যার মাধ্যমে মুসলিম পণ্ডিত ও ইসলামী প্রতিষ্ঠান সমূহকে উজ্জিবীত করা যায় এবং যতদিন না 'ইসলামীবিশ্ব শিক্ষাকেন্দ্র' স্থাপিত হচ্ছে ততদিন সংশ্লিষ্ট কমিটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণে নিয়োজিত থাকবে।

২। যে সকল দেশ ডক্টরেট স্তরের পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা দানের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও গ্রহণে রাজী হবে, সে সকল দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য এই সম্মেলন সুপারিশ করছে। যেসকল বিষয়ে বিভিন্ন পি-এইচ-ডি ডিগ্রীধারীদের ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার ঐতিহ্য-অধ্যায়নে ইসলামী চিন্তাধারায় উৎসাহিত করবে; সেই সকল বিষয়ে তাদের (পি-এইচ-ডি-ডিগ্রীধারীদের) প্রশিক্ষণ প্রদান এই সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হবে। এই সব প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র, রূপরেখা ও কর্মসূচী বাদশাহ আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকী কমিটি, অথবা প্রস্তাবিত বিশ্ব ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের অধীনে বিভিন্ন কমিটির বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রণয়ন করা হবে।

www.pathagar.com

৩। এই সম্মেলন সুপারিশ করছে যে ঃ

(ক) বিশ্বের ঐসব মুসলিম পন্ডিত যারা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী ভাবধারায় গড়তে চায় তাদের উপর জরীপ করতে হবে এবং তাদের জন্ম বিবরণ, প্রকাশিত গ্রন্থাবলি ও বর্তমান গবেষণার বিষয় ইত্যাদি একটি রেজিষ্টারীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(খ) তদারকী কমিটি যেসমস্ত সংবাদ, বুলেটিন প্রকাশ করবেন তাতে তাদের কাজের অগ্রগতি, ফলাফল ও সমস্যাবলির উল্লেখ থাকবে।

(গ) এই সকল পণ্ডিতের উপর "কে ও কি"-(Who and What) শীর্ষক একটি বিবরণীও প্রস্তত করতে হবে।

৪। এই সম্মেলন সুপারিশ করছে যে অনুসরণকারী দেশগুলো যথাযথ অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে গবেষণার কর্মসূচী উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত করবে এবং এই কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম নিম্নলিখিত ভাবে বিন্যাস করা যেতে পারে ঃ

(ক) বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের কার্যপ্রণালীর একটি বিবরণী পত্র প্রস্তুত করবেন যাতে ভবিষ্যতে গবেষণামূলক কাজ তাদের সাহায্যে আসে।

(খ) গ্রুপের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত বিবরণী ইসলামী ও মুসলিম জাহান সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয়ে বিজ্ঞ পণ্ডিতদের দিতে হবে। ইসলামী সাহিত্যের যে অংশসমূহ প্রতিটি বিষয়ের যেকোন পদ্ধতি বা বিভাগের গবেষণায় সহায়ক সেগুলো সনাক্তকরণে পণ্ডিতবর্গের সাহায্য চাওয়া হবে। এই ভাবে সনাক্তকৃত উপাদানগুলো একত্রিত করে এমনভাবে শ্রেণী বিন্যাস করা হবে যাতে এগুলো ইসলামী সাহিত্যের প্রতিটি বিষয়ের পাঠে গবেষণা ও সংকলনের উৎস হিসাবে কাজ করবে।

(গ) ক ও খ-এর অধীন প্রকল্পগুলো পাশ্চাত্য ইসলামী ধারায় সংযোজিত হতে হবে যাতে মুসলিম গবেষকগণ সকল ক্ষেত্রে পশ্চিমা চিন্তাধারার মোকাবেলায়,এই খুব দ্রুত ব্যবহার করতে পারেন।

(ঘ) খ ও গ বিভাগের অধীনে প্রদত্ত বিষয়াদিতে উৎসাহী পণ্ডিতবর্গের মধ্যে বিতরণের জন্য বিবলিওগ্রাফী ব্যাপক পরীক্ষা, শ্রেণীবিন্যাস, সম্পাদনা করে প্রকাশ করা উচিত।

(ঙ) এর গ্রুপ খ ও গ কর্তৃক সনাক্ত অথবা সরবরাহকৃত 'নির্বাচিত ইসলামী ও পশ্চিমা শিক্ষার বাছাইকৃত অংশসমূহের ঐতিহ্যে'র -প্রতিটি বিষয় পড়ানোর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য চয়নিকা প্রকাশ করা উচিত।

www.pathagar.com

(চ) নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশ্লেষণাত্মক, ব্যাখ্যামূলক এবং জরিপকৃত সংকলনগুলোর প্রতিটি সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ দ্বারা লেখানো উচিতঃ

১. প্রতিটি ক্ষেত্রে মোট অর্জিত ফলাফলকে পদ্ধতিমূলকভাবে সংক্ষিপ্তকরণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক করণ।

২. ক গ্রুপে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী ইসলামী ও পাশ্চাত্যের প্রতিটি বিষয়ের সম্পদিত কার্যাবলিকে পর্যালোচনার দৃষ্টিতে বিচার ও মূল্যায়ণ করণ।

(ছ) সৃজনমূলক ও পদ্ধতিগত সংকলনগুলো যোগ্য ইসলামী পন্ডিতবর্গ দ্বারা সম্পাদনার ব্যবস্থা করে প্রতিটি পাঠের পদ্ধতি ও বিভাগের নির্দিষ্ট ইসলামী দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করা উচিত।

(জ) প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী অবস্থানের উপস্থাপনামূলক পাঠ্যপুস্তকসমূহ স্নাতক পূর্ব শ্রেণীর ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য প্রণীত হওয়া উচিত।

৫। বাদশাহ আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকী কমিটিকে উপরে উল্লেখিত ৪ নং (ক, খ, গ,ঘ) উদ্দেশ্যাবলী পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি বা কমিটি সমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য এই সম্মেলন সুপারিশ করছে ।

৬। এই সম্মেলন সুপারিশ করছে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের উপর যেন ৩ বৎসরের মধ্যে কম পক্ষে ১০ লক্ষ শব্দ বিশিষ্ট পাঠের সংকলন করবে।

(১) আইন বিজ্ঞান, (২) রাষ্ট্রতত্ত্ব, (৩) অর্থনীতি, (৪) সমাজ বিজ্ঞান, (৫) ইতিহাস বিজ্ঞান, (৬) তুলনামূলক ধর্ম, (৭) সাহিত্য সমালোচনা, (৮) অধিবিদ্যা, (৯) নীতিকথা মূলতত্ত্ব, (১০) বিজ্ঞান দর্শন (১১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিদ্যা।

৭। এই সম্মেলন সুপারিশ করছে যে পরবর্তী ৪ বছরের মধ্যে ৬ নং গ্রুপে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন মনোগ্রাফে- এ ৪ ক-এ বর্ণিত কমপক্ষে ১০টি সংকলন প্রকাশ করা হয়।

৮। এই সম্মেলন সুপারিশ করছে যে পরবর্তী ৫ বৎসরের মধ্যে ৬ নং–এ উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে একটি করে পাঠ্যপুস্তক ৪ বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য এই সুপারিশগুলো ১৯৮১ সালে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্বের পাঠক্রম পুস্তক উন্নয়ন মূলক সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়।

www.pathagar.com

৯। এই সম্মেলন সুপারিশ করছে যে, ইসলামী শিক্ষার উপর আয়োজিত প্রথম বিশ্ব সম্মেলনের "ফলোআপ" কমিটি যেন উপরে উল্লেখিত প্রকল্প সমূহ পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিতভাবে তহবিল সংগ্রহ করে।

প্রকল্প		প্রয়োজনীয় বাজেট
(১)	১০টি দেশে বা অঞ্চলে সমিতি উন্নয়ন	(মার্কিন ডলারে)
	ও রক্ষণাবেক্ষণ ১০ × ৫ বছর ×৫.০০	= ২,৫০,০০০ লক্ষ
(২)	তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংবাদ বুলেটিন প্রকাশনা	
	৪ ইসু × ৫ বছর × ৫.০০০	= ১,০০,০০০ "
৪-ক।	দশটি বিষয়ের জন্য প্রধান আদর্শ স্বরূপ নীল নকসা	
	সমূহের প্রণয়ন ও প্রকাশনা- ১০×৫.০০০	= ৫০,০০০ "
৪-খ।	১০টি বিষয়ের (ইসলামী ঐতিহ্যের)	
	বিবলোগ্রাফী প্রস্তত ও প্রকাশনা- ১০×৩০.০০০	= ৩,০০,০০০ "
৪-গ।	১০টি বিষয়ের (পশ্চিমা ঐতিহ্যের)	
	বিবলোগ্রাফী প্রস্তুত ও প্রকাশনা-১০×১০.০০০	= ১,০০,০০০ "
৪-ঙ।	প্রতিটি বিষয়ের ১০টি করে সংকলন	
	ও প্রচারণা)-১০×১০×.৪.০০	= ৪,০০,০০০ "
৪-চ।	প্রতিটি বিষয়ের ১০টি সংকলনের প্রস্তুতি	
	ও প্রচারনা- ১০×১০×৪০০০	= ৪,০০,০০০ "
৪-ছ।	১০টি বিষয়ের প্রতিটি (একটি করে প্রতিটি	
	মহাবিদ্যালয় পর্যায়ের) ৩টি পাঠ্য পুস্তকের	
	প্রস্তুতি ও প্রকাশনা- ৩×১০×১০০.০০০	= ৩০,০০,০০০ "
		মোট- ৫,৬০০,০০০ "
	বিবিধ, মুদ্রাস্ফিতি ইত্যাদি	১,৪০,০০০০
		সর্বমোট-৭.০০০.০০০
		(সত্তর লক্ষ ডলার)

www.pathagar.com

১০। যখন প্রচলিত দুধরনের ব্যবস্থা রহিত করে নতুন পাঠক্রম প্রবর্তন করা হবে তখন পর্যন্ত মাদ্রাসা দ্বারা সংরক্ষিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলোকে সংরক্ষণের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, এবং আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও স্কুলগুলোতে যেভাবে মুসলিম উম্মার বিশ্বাসের প্রকট অভাব ঘটছে তা যেন বৃদ্ধি না পায়; তাও লক্ষ্য রাখতে হবে।

১১। একমাত্র ইসলামী ভাবধারা ও মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা উচিত।

১২। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে Guidance বিভাগ থাকতে হবে। এই বিভাগ গভীর আত্মবিশ্বাস ও যোগ্যতা সম্পন্ন এমন ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে যিনি ছাত্রদের ব্যক্তিগত, শিক্ষাগত, মনস্তাত্বিক ও অন্যান্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান ও পরিচালনায় সাহায্য করতে পারেন।

১৩। এই সম্মেলন আমডুরম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক 'ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানে' দশজন বিশেষজ্ঞকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বিষয়ে কাজ করার আমন্ত্রণ জানানোকে স্বাগত জানাচ্ছে।

১৪। এই সম্মেলনের সফলতার জন্য বাদশাহ আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলোআপ কমিটির সভাপতি, প্রেসিডেন্ট শেখ আহমেদ জুমজুম, পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও ষ্টাফ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

১৫। এই সম্মেলন সুপারিশ করছে শিক্ষাকে ইসলামী করণের মাধ্যমে সকল মুসলমানের অন্তর হতে ধর্মনিরপেক্ষতার বীজকে উৎপাটিত করতে।

১৬। এই সম্মেলন সমগ্র মুসলিম সমাজকে ইসলামী শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে অংশ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করছে। কেননা শিক্ষা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয় বরং গৃহ ও সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ও এটি সম-পরিমানে গুরুত্বপূর্ণ।

১৭। তুরস্কে সংরক্ষিত ইসলামী পান্ডুলিপিগুলোর প্রতি মুসলিম পন্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আস্থা সৃষ্টি এবং পান্ডুলিপিসমূহের মাইক্রোফ্লিম তৈরি ও শ্রেণী ক্যাটালগ তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থ বরাদ্দের জন্যও এই সম্মেলন সুপারিশ করছে।

১৮। এই সম্মেলন মুসলিম বিশ্বের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয় সমন্বয়ে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুপারিশ করছে যাতে বিভিন্ন মুসলিম দেশের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক বিনিময়ের বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও মুসলিম শিক্ষার সমস্যাবলি আলোচিত হতে পারে।

www.pathagar.com

১৯। মুসলিম দেশসমূহের পাঠক্রম প্রণয়নকারী কমিটিসমূহকে সম্মেলনের সুপারিশসমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার এবং তাতে প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশাবলি পালনের জন্য এই সম্মেলন সুপারিশ করছে।

২০। এই সম্মেলন প্রতিটি মুসলিম দেশ ও মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে পরিসংখ্যান, বিবরণ ও ঐতিহাসিক তথ্যাদি সম্বলিত একটি পুস্তক অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রণয়ন করে মুসলিম বিশ্বের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে এই পুস্তকটি টেক্সট বই হিসাবে ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার জন্য সুপারিশ করছে।

(গত ৯০-এর দশকে মার্কিন সরকার বিশ্ব মুসলিম আন্তর্জাতিক শিক্ষার কার্যক্রম বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করে ও সংশ্লিষ্ট মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে এই কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য করার ফলে বর্তমানে উক্ত সিদ্ধান্তবলীয় কার্যক্রম রহিত হয়ে যায়।)

পাশ্চাত্য শিক্ষার বস্তুবাদীও ভোগবাদী প্রভাব ঃ

আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের মাধ্যমে মুসরিম বিশ্বের শিক্ষা-সংস্কারের কার্যক্রম রহিত হওয়ায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বস্তুবাদী ও ভোগবাদী প্রভাব মুসলিম সমাজকে এমন ভাবে প্রভাবিত ও প্রদমিত করে রাখছে যে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যুগপৎ সরকার ও সুধী সমাজকে ঐকান্তিকভাবে প্রচেষ্টা চালান ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন স্বাভাবিক বিকল্প পথ নেই। এ সভ্যতা মুসলমানদেরকে জীবন ও জগত সম্পর্কে যে আঙ্গিকে প্রত্যয়শীল করে তুলেছে তা হতে তাদের ঈমান ও আকীদা হেফাজত করতে হলে জীবনের ইসলামী রূপ ও বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমে তুলে ধরা অপরিহার্য। বর্তমান সভ্যতার প্রভাবে মানুষ তার জীবন ও সংসার সম্পর্কে কি ধরনের প্রত্যয় ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করছে, এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো। এসব দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যয়ই আজ আমাদের সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ ও শিক্ষার পূণর্জাগরণ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে রয়েছে। এসব অন্তরায়ের অপসারণ বা আশু সংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যতীত আমাদের শিক্ষা তথা গোটা সমাজকে ইসলামী রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা বালির বাঁধ নির্মাণ সদৃশ পণ্ডশ্রমকর্ম ব্যতীত আর কিছুই হবে না। যেমনঃ

১. সঞ্চয়ের পাশ্চাত্য মানসিকতা ঃ 'সঞ্চয়ের মানসিকতা' প্রসংগে কিছু বলার পূর্বে এর ভূমিকা হিসাবে এ. এফ. পি. পরিবেশিত (২৬/৮/০৩) সাংবাদটির প্রতি পাঠকুলের দৃষ্টি আকর্ষণ খুবই জোতসই হবে মনে করে নিম্নে তা পরিবেশন করা হলো ঃ

www.pathagar.com

লস এঞ্জেলস (যুক্তরাষ্ট্র) থেকে এএফপি ঃ পয়সা দিয়ে যে সুখ কেনা যায় না এই বহুল প্রচলিত ধারণার সত্যতা প্রমাণ করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার (ইউএসসি) গবেষকরা। 'এক্সপ্লেইনিং হ্যাপিনেস' শীর্ষক এই গবেষণায় দেখা যায়, "অধিকাংশ মানুষই যত ধনী হয়ে ওঠে তত সুখী হয় না।" গবেষণায় দেখা যায়, সুখী হওয়ার কোন নির্ধারিত মাত্রা নেই।

১৯৭৫ সাল থেকে প্রতিবছর দেড় হাজার লোকের উপর এই জরিপ চালানো হয়। জরিপের ডাটা বিশ্লেষণকারী ইউএসসি'র অর্থনীতিবিদ রিচার্ড ইস্টারলিন বলেন, অনেকের মধ্যেই এই মোহ কাজ করে যে, আমরা যত অর্থ উপার্জন করবো ততই সুখী হবো।' তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের পরিবার ও স্বাস্থ্যের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনে সমস্ত সম্পদ বিনিয়োগ করি। সমস্যা হচ্ছে উপার্জন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চাহিদাও যে বেড়ে যায় তা আমরা বুঝতে পারিনা।' গবেষণায় দেখা যায় প্রিয়জনের সঙ্গে সুখকর সময় কাটানো এবং সুস্বাস্থ্যের সেই গতানুগতিক পথ ধরেই আসে সুখ, ...। আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম, নীতি জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং নিজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরাই সুখী হন।

[–দৈনিক সংগ্রাম, ২৭/৮/০৩]

উল্লেখ্য, ধর্ম শাস্ত্রের 'অর্থ-দর্শন' অনেকেই অবজ্ঞা করে থাকেন, কিন্তু এই উদ্ধৃতিটুকুতে বিজ্ঞানও বাস্তবতার নিরিখে যা বলা হয়েছে তা গবেষণালব্ধ। এই কথা মনে রেখে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঞ্চয়ের মানসিকতা পর্যালোচনা করা অতীব প্রাসংগিক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই প্রেক্ষিতে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বস্তুবাদের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। জীবন সম্পর্কে এ সভ্যতা পরকালের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে।

Hornby-এর Advanced Dictionary অনুযায়ী ঃ Nothing exists except matter, অথবা tendency to value material things (wealth, material comforts) too much, spiritual and immaterial things too little or not at all"— এ দর্শন হতেই বস্তুবাদ বা বস্তুতান্ত্রিকতার জন্ম ও পরকালের অস্বীকৃতি ঘটেছে।

এ দর্শন আত্মা এবং আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করার পরিবেশ রচনা করেছে। রচনা করেছে Pragmatic interpretation of life and faith. ফলে এ সভ্যতার দর্শন রূপ নিয়েছে কবি খৈয়ামের পংক্তিতে ঃ

নগদ যা পাও; হাত পেতে নাও
বাকির খাতায় শূন্য থাক।

www.pathagar.com

এর সঞ্চয়ের মূল শ্লোগান নিয়েছে অনেকটা নিম্নরূপ ঃ আপনার এবং আপনার বংশধরদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য জীবন বীমা করুন, সঞ্চয় করুন, লটারী ধরুন, ইত্যাদি। এর পরোক্ষ অর্থ হচ্ছে দুটো ঃ

ক. আপনার এবং আপনার বংশধরদের নিরাপত্তার জন্য আপনাকেই একমাত্র ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যবস্থার একমাত্র উপায় হচ্ছে সঞ্চিত অর্থ বা জীবনবীমা। বিশ্বাসের জগতে আল্লাহ্ পাকের 'রাজ্জাক' গুণটির সমাধি রচনা করেছে এই দর্শন।

খ. এই ধারণা ও প্রত্যয় মনে বাসা বেঁধেছে যে, অর্থই হচ্ছে মানব জীবনের জীবিকা প্রাণ ও স্বচ্ছলতা, দীর্ঘায়ু ও নিরাপত্তার একমাত্র পন্থা। মার্কসীয়দের মতবাদ এটি, যা প্রচার করে বেড়ায় যে, ধর্ম হচ্ছে নেশা, আর অর্থ হচ্ছে তা থেকে মুক্তির উপায়।

২. **সুদভিত্তিক অর্থনীতি ঃ** এটিও সঞ্চয়ে উৎসাহ ও দান-খয়রাতে অনীহা সৃষ্টির একটি মোক্ষম অস্ত্র বিশেষ। আইয়্যামে জাহিলিয়াতের আরব এর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সুদ মানুষের মন হতে মায়া-মমতা তুলে নেয়; লগ্নীতে টাকা খাটিয়ে বিনাশ্রমে তাকে নির্দয় পুঁজিপতি হিসেবে গড়ে তোলে। দ্বিতীয়ত, সুদের হার নির্ধারিত থাকায় সুদ গ্রহীতাকে ঐ টাকা খাটানোর ক্ষেত্রে লোকসান হলে আসলসহ সুদ অথবা চক্রবৃদ্ধিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সুদ-আসল আদায় করতে গিয়ে খাত হয়ে সর্বশান্ত হতে হয়। কখনোবা সুদখোরের এ টাকা আদায়ের জন্য চুরি-ডাকাতি এমন কি হত্যাকাণ্ড বা আত্মহত্যায়ও খাতক পশ্চাদপদ হয় না। Master of myraid minds হিসেবে পরিচিত Shakespeare-এর Shylock চরিত্র এর একটি বীভৎস দৃষ্টান্ত।

এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় দিক এটি যে, বীমা বা ব্যাংকে সঞ্চয় এবং এর সুদ ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে তাদের অনুকূলেই সহায়তা করে যারা নিত্য-নৈমিত্তিক ও অন্যান্য আরাম প্রিয় খরচ মিটানোর পর উদ্বৃত্ত টাকার মালিক হয়। ফলে বিত্তহীন ও দারিদ্র-পীড়িত মানবকুলের শত্রু হিসেবে এ দুটি ব্যবস্থা শুধু শোষণই করছে না বরং ভাগ্যাহত বিপুল জনগোষ্ঠী মুষ্টিমেয় ধনাঢ্যের গোলামে পরিণতও হচ্ছে এর বদৌলতে।

৩. **জাঁকজমকপূর্ণ ভোগ-বিলাস ও জীবন ঃ** উক্ত দুটি কারণের প্রত্যক্ষ ফসল হচ্ছে এটি। মানুষ প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ-সম্পদের অধিকারী হওয়ার পরই ভোগ-বিলাসী হয়ে পড়ে। দান-খয়রাত নেই, হালাল পথে রুজীর কৃচ্ছ্র সাধনা নেই; বরং অবৈধ ও হারাম উপার্জনের মাধ্যমে যে অর্থ উপার্জিত হয়, সে অর্থ হালাল ও বৈধ পথে খরচের মন-মানসিকতা ও পথ না থাকায় একজন ধনাঢ্য

www.pathagar.com

ব্যক্তির পক্ষে অবৈধ ও অসামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডসহ ঘিঞ্জিগলিতে খরচ করা ছাড়া অন্য কোন পথ থাকবে কোত্থেকে? 'হাসিনা-সাকী', লটারী-জুয়া এবং অশ্লীল সংস্কৃতি ও নৃত্য শিল্পই হয়ে উঠে তাদের বিলাস জীবনের সঙ্গী তথা আনুষঙ্গিক পাথেয়। আর এসব নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি একদিকে যেরূপ সামাজিক অনাচার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে থাকে, অপরদিকে এরা তাদের এহেন রাজকীয় খরচের যোগান দেওয়ার জন্য দুর্নীতি ও নিপীড়নের রাজত্ব কায়েম করে গোটা সমাজে। Fine Arts ও Aestheitc Beauty ঃ 'রেশমিকলা আর ফিনফিনে সৌন্দর্য' এর নামে তারা গোটা সমাজে বইয়ে দেয় চরিত্রহীন কর্মকাণ্ড ও মনুষ্যত্ব অবমাননার সয়লাব।

৪. জনসংখ্যা রোধের প্রচার প্রক্রিয়া ও এর ভয়াবহ পরিণাম ঃ চার নম্বর কারণ এটা। অপ্রধান বলা চলে না এটাকে। উদাহরণস্বরূপ ঃ জনবহুল বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অর্থনীতিতে স্বচ্ছলতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য জনসংখ্যা নিরোধের খাতে রাজকীয় খরচ ও এর প্রচার প্রসারের ঢং একাধিক সন্তান বিশিষ্ট অভিভাককে শুধু নৈতিক ও আর্থিক শংকাগ্রস্তই করে তোলে নি, বরং সন্তান-সন্ততির প্রতি দায়িত্ব পালনে মানসিকভাবে বিরূপ ও বিক্ষুদ্ধও করে তুলছে তাকে অনেক ক্ষেত্রে। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারগুলোতে এজন্য অনেক সময় সন্তান হত্যা, স্ত্রী তালাক ও আত্মহত্যার প্রবণতা ও এহেন অপমৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে চরমভাবে। সঙ্গে সঙ্গে যৌন কাতুকুতু অসময়ে ও অসঙ্গতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে অসামাজিক অপরাধ ও নৈতিকতার অবনতিও বেপরোয়াভাবে ঘটছে ব্যাপকভাবে। এহেনভাবে সৃষ্ট যৌন ভোগ পিপাসা চরিতার্থ করার জন্য কত পরিবারই না এজন্য উচ্ছন্নে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এখাতে বিদেশী আর্থিক সাহায্যে ও প্ররোচনায় জন্মনিয়ন্ত্রণের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য অশ্লীল, সৌজন্যবিহীন ও লাগামহীন ছায়াছবি, বিজ্ঞাপন ও সবাক-প্রচার গোটা জাতির নৈতিক সত্ত্বা ও এর পরিবেশকে এমন 'ফাহেশা' করে তুলছে যে ধর্ষণ, এইডস ইত্যাদির আকৃতিতে বিধাতার গজব ব্যতীত এ থেকে পরিত্রাণের মুক্তি বা এর আর বিকল্প নেই।

একটি দুঃখজনক দিক

আর একটি দুঃখনজক দিকও বিবেচনার দাবি করছে চরমভাবে। তা হচ্ছে আলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য এবং ইসলামী রাজনৈতিক ও সমাজসেবী সংস্থাগুলোর মন-মানসিকতার প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি। আব্বাসীয় যুগের মুমূর্ষুলগ্নে আলিমগণের মধ্যে যেরূপ রাজকীয় ক্ষমতার পক্ষ-বিপক্ষ অবলম্বনের লড়াই বিদ্যমান ছিল, বর্তমানেও প্রায় অনুরূপ ফ্যাসাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে। দৃষ্টান্ত; 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' সম্পর্কে আলিমদের মতানৈক্য, ইসলামী রাজনীতির ক্ষেত্রে অনৈক্য ইত্যাদি আজ জনগণকে শুধু বিভ্রান্তই করছে না; বরং সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ও পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ফতোয়াবাজী সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তিরোহিত হতে যাচ্ছে উবে যাওয়া কর্পূরের মতো। কোন কোন সংস্থা যাদেরকে খেদমত এ-খালকের জন্য অর্থ দান করছে, এরা বিদেশী মুসলিম দাতাদের বিশ্বাসকে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের আখের গুচাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রমাণের অভাবে এসব অপরাধীরা থেকে যাচ্ছে নাগালের বাইরে সাধু হিসাবে এছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ থেকে স্বাভাবিক অপেক্ষা Project and Method ভিত্তিক সাহায্য প্রাপ্ত তহবিল খরচ ইহুদী ও মুশরেকদের কূট চক্রান্ত থেকে পরিমুক্ত রাখার দৃষ্টিতে অহেতুক নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে স্বদেশী ইসলামী দলগুলো আপন সমস্যার সমাধানে প্রবাসী চিন্তা ধারণায় প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। ফলে এসব স্বদেশী ইসলামী দলগুলো সহজভাবে জনকাতারে আপন হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হতে পারছে না আজও।

ওরা ফায়দা লুটছে

ফলে এহেন পরনির্ভরশীলতা, পারস্পরিক অনৈক্য, ঠকবাজী এবং বিভেদের ফায়দা লুটছে তথাকথিত এন. জি. ও. এবং অমুসলিম মিশনারী সংস্থাগুলো। এরা বিভ্রান্ত, নেশাগ্রস্ত, হতশাগ্রস্ত, চরিত্রহারা ও অর্থক্লিষ্ট মুসলমানদের মাঝে ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে যীশুর মানবতা ও সমাজ সেবার ভূষণ ও ভূমিকায়। ভাত-কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও জীবিকার পথ করে দিচ্ছে তারা হাসপাতাল, স্কুল, ফিডিং সেন্টার, সুদীঋণ এবং কারবার, কারিগরী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে। বাংলাদেশে উম্মতে মুহাম্মদীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীটি হয়ে পড়েছে অর্থনীতি ও জীবিকার দিক থেকে তাদের প্রতি আসক্ত ও নির্ভরশীল; আর ধনাঢ্য ও তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায় হয়ে উঠেছে তাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির 'মজনু'। শুধু গোটা বাংলাদেশী মুসলমানই নয় বরং গোটা মুসলিম বিশ্বই আজ পরগাছার মত ভিনদেশের মতবাদ ও আর্থিক সাহায্যে পরিপুষ্টি লাভ করে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধিতে প্রয়াসী স্বর্ণলতার মতো। স্বর্ণলতার মতই এরা চোখ ঠিকরান ও মনভুলানো চাকচিক্যে শুধু নিজেদেরই সর্বনাশ করছে না, বরং গোটা মিল্লাত পর্যন্ত তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি-বলয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে 'সঙ' সাজতে চলেছে। এই উভয় গ্রুপকে সংশোধনের দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত; অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় আলিম সম্প্রদায়ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিয়া-সুন্নী, ওহাবী, রাফেদানী, তবলীগী ইত্যাদি ফেরকায় আজ বহুধাবিভক্ত, স্বার্থ প্রভাবে প্রভাবিত বা দৈহিক নির্যাতন ও অর্থক্লিষ্টে বা কঠোর প্রশাসনে প্রদমিত।

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন ও দুনিয়া ঃ

দুনিয়াটা শুধু মুসলমান নয়, প্রকৃত পথে সবার জন্যই একটি পরীক্ষাগার। আদ্দুনিয়াউ মাযরাতুল আখিরা। অথচ পরীক্ষাগারকে অধিকাংশ মুসলমান আজ নমরূদ-কারুণের মত স্থায়ী বালাখানা বানানোর কসরত চালিয়ে যাচ্ছে প্রাণপণে। রাসূলুল্লাহ্ (স) এ প্রসঙ্গে দুনিয়ায় মুসলমানের জিন্দেগী কিরূপ হবে তা এক অনুপম উপমার সাহায্যে এরূপ বলেছেন ঃ

"দুনিয়াতে একজন মানুষের জন্য ততটুকু সম্পদই যথেষ্ট, যতটুকু একজন মুসাফিরের পাথেয় হিসেবে সঙ্গে থাকা দরকার।" (ইবনে মাজাহ্)

এহেন গুণ ও চরিত্রের পরিচয় যাতে ধ্বংস ও লয় না পায় সে জন্য রাসূলুল্লাহ (স) বিলাসিতা বা জাঁকজমক সম্পকর্কে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন এই বলেঃ

"প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়িঘর, আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদ মানুষের দুর্যোগের কারণ হয়ে থাকে।" (আবু দাউদ)

তিনি বিলাসিতাকে পয়গম্বরী শান-শওকতের পরিপন্থী বলে অপবাদ দিয়েছেন। পারস্য বিজয়ের পর মুসলমানরা যখন গনীমত (Booty) এনে হযরত উমর (রা)-এর সমীপে সগর্বে নিবেদন করলেন, তখন তিনি হু হু করে কেঁদে উঠলেন। বললেন ঃ এ বিলাস সামগ্রীতে আমি ভবিষ্যৎ মুসলমানদের অধঃপতন দেখছি। আজকের বিশ্বের ধনাঢ্য মুসলিম রাষ্ট্র ও ধনাঢ্য মুসলিমদের অধঃপতন খলীফ উমর (রা)-এর ভবিষ্যৎ বাণীর বর্তমান ফসল।

গরিব-মিসকীনদের মূল্য

সম্পদলিপ্সা ও বিলাসপ্রিয়তা ধনাঢ্য মুসলমানদেরকে গরিব-মিসকীনদের প্রতি উদাসীন ও মমত্ব বোধহীন করে তুলেছে চরমভাবে। অমুসলিম, বিশেষ করে খ্রিস্টান মিশনারীদের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের শনৈ শনৈ সংখ্যাবৃদ্ধিও বর্ধিষ্ণু প্রভাবের একটি চরম স্বাক্ষর। অথচ রাসূলে করীম (স) বলেন, "তোমরা যে জীবিকালাভ করছ তা এই গরিব জনগণেরই বদৌলতে এসে থাকে।" (মিশকাত)। তিনি আরও বলেন যে, এ গরিবরাই ধনবানদের আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। রাসূল (স) স্বীয় স্ত্রী বিবি আয়েশা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ "হে আয়েশা, মিসকীনদেরকে দরজা হতে বিমুখ করো না। শুকনা খেজুরের একটি টুকরা হলেও তাদের হাতে দিও। আয়েশা গরিবদের সাথে মহব্বত রেখ, তাদেরকে নিকটে টেনে নিও। আল্লাহ্ তাআলাও তোমাকে নিকটে টেনে নেবেন।" (তিরমিযী) ইসলামের দৃষ্টিতে কর্মক্ষম অথচ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিই মিসকীন।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (স) মিসকীনদের কাজকর্মে সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ করতেন না কখনও। 'না' বলে কখনও কোন সওয়ালকারীকে ফিরিয়ে দেননি। যদি কখনও দেওয়ার মত কিছু তাঁর কাছে না থাকত, তবে তিনি পরে কিছু একটা দেবেন বলে অঙ্গীকার করতেন। গরিব-মিসকীনদের সেবা করাই যে বিত্তবানদের মুক্তির পথ আজ তা যে অনুপাতে খ্রিস্টজগৎ 'বিশ্বাস' ও তদানুযায়ী আমল করছে, এদেশের অধিকাংশ বিত্তশালী মুসলমানরা সে অনুপাতে এর উল্টোটাই করছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

সৌজন্য প্রদর্শনের গুরুত্ব

Courtesy costs nothing – ভদ্রতা বা বিনম্রতায় কোন খরচ নেই। রাসূল পাক (স) আপন ধাত্রীমাতা বিবি হালিমাকে স্বীয় চাদর পেতে অভিবাদন জানিয়েছিলেন দাঁড়িয়ে। দুনিয়া ও আখিরাতের শ্রেষ্ঠতম মহামানব রাসূল এতে মর্যাদার অবমূল্যায়ন বা ক্ষুণ্নতা অথবা মানসিক পীড়ন তো অনুভব করেন-ই-নি; বরং এতে তিনি নিজকে গৌরবান্বিত বোধ করেছেন; স্বর্গীয় পুলক প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর পবিত্র আননে। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, 'আহছানু খালাকান্নাছ'- মানুষের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার কর। এই চারিত্রিক ঐশ্বর্যটুকু-ও আজ আমরা হারাতে বসেছি বস্তু পূজা এবং এর অহমিকা ও জুলুসে।

দানশীলতার অপরিহার্যতা

দানশীলতা মুসলমানদের একটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য। রাসূলে করীম (স)-এর জীবনে দেখা যায় এর কী অপরিসীম গুরুত্বই না ছিল। জনৈক ভদ্র মহিলা একবার রাসূলকে (স) একটি চাদর উপহার দিয়েছেন। এ চাদর দেখে জনৈক সাহাবা শুধু এইটুকু উক্তি করেছিলেন যে, "চাদরটি অতি সুন্দর।" রাসূলুল্লাহ (স) তা শোনা মাত্রই চাদরটি ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে দান করে দিলেন। অন্যান্য সাহাবী তাতে বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হলেন ঐ সাহাবীর প্রতি। তখন চাদরপ্রাপ্ত সাহাবী যে উত্তরটি দিয়েছিলেন তা-ও কত অনুপম! তিনি বললেন ঃ আমি সব জানি, তবুও বরকতের আশায় আমি এ কাজটি করেছি। আমার আকাঙ্ক্ষা আমাকে এ চাদর দিয়ে যেন কাফন দেওয়া হয়। দাতা ও গ্রহীতার এ সুন্দর দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বৈকি!

'হিলফুল ফুজুলের' একনিষ্ঠ সমর্থনকারী ও সক্রিয় ব্যক্তির হযরত মুহাম্মদ (স) 'নবী' হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই তাঁর শত্রু-মিত্র মহলে 'আল-আমীন' উপাধি পেয়েছিলেন সমাজসেবার মাধ্যমে। তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার, পরোপকারিতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানীই তাঁকে দূর্ধর্ষ, দুর্নীতিপরায়ন ও স্বীয় জীবন শত্রুদের হৃদয়-মন জয় করতে সাহায্য করেছিল। এমন নবীর আদর্শ 'ইসলাম' মানুষ গ্রহণ করেছে ঃ

www.pathagar.com

১. নিরাপত্তার জন্য ২. আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য ৩. জগতে উন্নত শিরে জীবন কাটানোর জন্য।

অন্য কথায় রাসূলে পাক (স) নবুওয়তের ভিত রচনা করেছিলেন প্রথম 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হিসেবে এবং পরে তিনি 'রাসূলুল্লাহ' হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেকে। আজ মুসলমান হিসেবে যদি আমরা নিজেদেরকে উন্নত ও সচ্ছল করতে চাই, তবে আমাদেরও সমাজসেবী, সমাজদরদী হিসাবে আসন রচনা করতে হবে জনমনে এবং এটাই হবে আমাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

এ ক্ষেত্রে ময়ূর পুচ্ছবিশিষ্ট কাকের মত বিদেশী আদর্শের প্রতি অনুরাগী না হয়ে ইসলামের মহান আদর্শ নীতিই হচ্ছে আমাদের মুক্তির একমাত্র নিশ্চিত ও নির্ধারিত পথ যা নতুন করে সবক নেওয়া দরকার। বিলাসিতা নয় ত্যাগ, বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে সম্পদ সঞ্চয় নয়, দানের মাধ্যমেই মানবতা তথা ইসলাম সমুজ্জ্বল।

ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে সৃষ্টির কল্যাণার্থে বৈষয়িক উন্নয়ন, ত্যাগ ও উপকারের অনুশীলনে হৃদয়-মনের উন্মেষ ও উৎকর্ষ সাধন। রূপকার্থে 'দেহের' উপর 'আত্মার' বিজয়, দেহের গোলামী নয়—এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা সহায়ক, সংবর্ধক ও পরিপোষক শিক্ষানীতি যে পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপায়িত না হবে, সে পর্যন্ত মানব সভ্যতার মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ নেই। সুধী ও শিক্ষাবিদদেরকে শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে এ মূল্যবোধ রচনার জন্য নৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া আসন্ন কর্তব্য হয়ে পড়েছে বৈকি।

শিক্ষার শৈল্পিক সত্তা ঃ

এ পর্যন্ত যেসব তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট, শিক্ষা মূলত মনন ধর্মী; শিক্ষা বা Education নিছক বিজ্ঞান নয়। এর শৈল্পিক বোধ ও অবিভ্যক্তি রয়েছে অসীম। এই বোধ ও অভিব্যক্তির স্বল্প চেতনার জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্জনে আগ্রহ বৃদ্ধি যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হয়। শিক্ষা অধুনা "Man-Maaking Art"-এর পরিবর্তে Money Making Maching-এ রূপ নিয়েছে।

গোটা বিশ্বজুড়ে অধুনা শিক্ষা পরিবেশের যে দৃশ্য আমাদের নয়ন-মুকুরে ভাস্বর হয়ে ওঠে, তাতে দেখা যায়; আমাদের শিক্ষা পরিবেশ আশ্রাপ্রদ হওয়ার চেয়ে হতাশা ও আশংকার জঞ্জালে পরিণত হয়েছে। এর মূল কারণ শিক্ষাদানে শিক্ষক সমাজের শৈল্পিক চেতনাবোধ ও উপযুক্ত পাঠক্রম সম্পর্কিত জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

www.pathagar.com

মানবজাতির জন্যই শিক্ষা এবং এর আবির্ভাব। কালের পরিক্রমায় এর প্রয়োজনীয়তাও অত্যাবশ্যকভাবে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহান স্রষ্টা মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর মতো ইন্দ্রিয় বৃত্তি দান করেছেন। ভালো-মন্দ জ্ঞানমিশ্রিত সংবেদনশীল হৃদয় শুধু মানুষকেই তিনি দান করেছেন। হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের বাহন হিসেবে ভাষা ও ভাবভঙ্গীর কল্যাণকর অভিব্যক্তি অন্য কোন প্রাণীর মাঝে নেই। ভাব প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গীমার এই শ্রেষ্ঠত্বই মানুষকে 'সেরা সৃষ্টি' হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার সুযোগ দান করেছে। 'শিক্ষা' বা Education এবং 'শিখন' বা Learning-ই হচ্ছে এই সুযোগ গ্রহণের একমাত্র স্বর্ণদ্বার।

ভূমিষ্ট হওয়ার পরক্ষণেই মানবশিশু কেঁদে ওঠে। হাত-পা ছুঁড়ে সে তার কান্না, ক্ষুধা বা অস্বস্তির অভিব্যক্তি ঘটায়। তার পূর্ণাঙ্গ অসহায়ত্ব বা absolute helplessness,এর অভিব্যক্তি বা যাতনা অন্যান্য প্রাণী শাবকের পরিদৃষ্ট হয় না। মহান স্রষ্টার অমোঘ বিধি অনুযায়ী মানুষ ও অন্য প্রাণীর এ বৈসাদৃশ্য চিরন্তন।

সুস্থ জীবন-বৃদ্ধি ও আমৃত্যু জীবন যাপনের জন্য তাকে নানাভাবে, নানা উপায়ে সাজিয়ে তুলতে হয়। এই সাজিয়ে তোলাটাই হচ্ছে 'শিক্ষা' বা Education-এর আদ্যপ্রান্ত কর্তব্য। সাজানো জীবন গড়ন ও গঠন—To help life grow in beauty in all respects — এইটি হচ্ছে শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য। অন্য কথায় to release the pupil's creative activity, শিক্ষার্থীর সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে মুক্ত করে দেয়াটা। Creative activity বলতে বুঝায় সেসব সৃষ্টি শৈলী যা জীবন ও সমাজ, তথা রাষ্ট্রের জন্য সুস্থতা, সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য রচনায় ইতিবাচক অবদান রাখে। শিক্ষার লক্ষ্য মানবশিশুকে স্বীয় প্রজাতি ও প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রতিবেশের সৌন্দর্য ও মূল্যবোধের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। এক্ষেত্রে তাকে রপ্ত করতে হবে—art of appreciating the people and environment in his own style and trait -স্রষ্টা প্রদত্ত স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও রচনাশৈলী অনুশীলনীর দ্বারা পরিবেশ ও মানুষের মূল্যবোধ হৃদয়ঙ্গম করার শিল্পকলা।

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি মানুষই প্রকৃতিগতভাবে আরাম ও সুখ চায়। এই চাওয়ার ক্ষেত্র আপেক্ষিক। এ কারণে তার ভাব প্রবণতা ও আগ্রহকে সংযত করার প্রয়াসেই 'শিক্ষা'-র শৈল্পিক বোধ সৃষ্টি। স্নেহাপ্লুত মায়ের হাসি, শাসনের ভূমিকায় বাবার রুদ্রমূর্তি, অসংযত প্রতিবেশীর ঝগড়া, প্রকৃতি প্রদত্ত বাগানের ফুল, কোকিলের সুমিষ্ট কুহুতান ইত্যাদি মানব শিশুর প্রত্যক্ষ পরিবেশ। অথবা নবজাতকের কান্না প্রশমিত করার জন্য 'মা' গুনগুনিয়ে 'সুর' ভাজেন, আলতোভাবে আত্মীয় স্বজনেরা তাকে দোলা দেন, বুকের দুধ, ফিডার খাওয়ানোর জন্য মা-বোনেরা সুমিষ্ট মোলায়েম সুর ধ্বনি তুলেন। 'নবজাতক' এসব

www.pathagar.com

কর্মকাণ্ডের প্রভাবে কান্না থামিয়ে দেয়, 'ফুট' করে নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে দেয় তার কিশলয় সদৃশ ওষ্ঠযুগলে। ক্ষাণিক পরে শূন্য উদর পূর্তি শেষে সে নির্মল নিদ্রায় ঢলে পড়ে। এতকিছু স্তর পেরিয়ে শিশুর ঘুম ও প্রশান্তির এই ছবির বিষয়বস্তু তথা প্রক্রিয়াই হচ্ছে শিক্ষার শিল্পগুণ। এটাই হচ্ছে শিক্ষার Art বা শিল্পের মৌল ভিত্তি। Art is life-এর জন্মকথা। পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচির প্রণয়ন, প্রকাশনা ও বিকাশ এমনি হতে হয়। শুধু সাহিত্যে নয়, সব বিষয়েই। শিশু-জীবন এমনিভাবে সুর-ধ্বনি লয়ে-গড়ে ওঠে। অনুরূপ শিল্প-সৌকর্যমণ্ডিত আচার-আচরণে পূর্ণ বয়সে শিশুকে পৌছানোর কার্যক্রমই হচ্ছে শিক্ষার পাঠক্রম।

হেরল্ড গ্রেগের কথায় শিক্ষা তথা বিদ্যালয়ের কাজ হচ্ছে ঃ ..... Schools should let art permeate the curriculum."

বিদ্যালয়ের উচিত গোটা পাঠক্রমে শিল্প সৌন্দর্যকে বিরাজমান হতে দেয়া। পাঠক্রমের বিষয়বস্তু এ দৃষ্টিতে হতে হবে নৈতিক ও মানবিক ভাব-অনুভূতির ভূষণে সুসজ্জিত।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতা শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তি সমৃদ্ধ করছে নির্বোধের ন্যায়। Education-art-কে তারা প্রায় হত্যা করে ফেলেছে। Reasoning, method, experiment, analysis, scrutiny, regimental uniformity, objectivity, ইত্যাদি বিজ্ঞান-ভিত্তিক তথা যান্ত্রিক পরিভাষা ও পরিমণ্ডলে শিক্ষার মানবীয় ও শৈল্পিক সত্তাকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে যে, আধুনিক শিক্ষিত লোকের মাঝে মানবীয় অপেক্ষা দানবীয় রূপ প্রতিনিয়ত প্রকটতর হয়ে উঠছে। হৃদয়ঙ্গম নয় বস্তু জ্ঞান এবং পেশীশক্তি, নম্রতা নয় হিংস্রতা, ত্যাগ নয় ভোগনির্ভরশীলতায় শিক্ষিত সমাজ অধুনা গোটা বিশ্বে শান্তি ও সুখ প্রবৃদ্ধির পরিবর্তে হত্যা ও জিঘাংসা, গরলতা ও কুটিলতার পরিচর্যা করে যাচ্ছে। শালীনতা অপেক্ষা লাম্পট্যের স্বীকৃতিদানে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রাণপাত করে যাচ্ছে। জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত বিশ্বের জনৈক প্রতাপশালী প্রেসিডেন্টের চরিত্র কেলেংকারী। তার লাম্পট্য প্রমাণিত হওয়ার পরও তাকে বিশ্ব নেতৃত্ব পদে সমাসীন রাখা হয়েছিল। এটি একটি নৈতিক শিল্পচেতনা রহিত ও ভোগবাদী জাতির Representative character; তথা আধুনিক শিক্ষার বিষময় ফলের সর্বনাশা কলংক তিলক।

মানুষের নানারূপ জীবন প্রণালীর সাথে প্রকৃতিনিচয়ের বিভিন্ন রূপ ও আকৃতি-প্রকৃতির চলমান প্রবাহে সুর ও ছন্দ, ছেদ ও লয়ের সম্যক উপলব্ধি ও দায়িত্বজ্ঞান দান করাটাই হচ্ছে বাস্তব ও মানবীয় শিক্ষা।

www.pathagar.com

"সদা সত্য বলিব","ফুলের মতো জীবন গড়িব," "ফুল আপনার জন্য ফোটে না", "ধর্মই জীবন", "মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বিজ্ঞ শত্রু অধিক নিরাপদ", ইত্যাদি পাঠ শুধু নীতি বাক্যই নয়, এগুলোই উচ্চ জীবন লাভের অবিকল্প সোপান। এ বাক্যগুলোর প্রত্যেকটিতেই 'Imagery' বা কল্পচিত্র রয়েছে, এর প্রত্যেকটিতেই রয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির তীব্র আঁচড়। এই Image বা bitter experience-এর উন্মোচন বা connotation সহ শিক্ষাদানই হচ্ছে শিক্ষার শৈল্পিক তথা নান্দনিক রূপ।

আমাদের আধুনিক শিক্ষায় এই শৈল্পিক প্রাণ ও পরশ নেই, নেই প্রকৃত শিক্ষার অভিব্যক্তি যা দৈহিক ও বস্তুতান্ত্রিক সত্তার সমৃদ্ধির প্রাণশক্তি, যার স্ফূরণ শৈল্পিক সত্তার অভিভাবকত্বে। ছোট একটা উদাহরণ ঃ কুমোর মাটির তৈজসপত্র রচনা করে এর উপর খোদিত করে দেয় চারু-সৌন্দর্য। কারণ এতে একদিকে যেরূপ তৈজসপত্র ব্যবহারের অভাব মিটে, অপর দিকে একইসাথে হৃদয়ের সৌন্দর্য মিটে। এহেন তৃপ্ত হৃদয়ের জীবন সহজে হিংস্র হয় না। শিক্ষার নান্দনিক ছোঁয়া এটাই। এতে ব্যবহারিক ও নান্দনিক প্রয়োজন মিটানোর উপাদান থাকতে হবে।

এ প্রসঙ্গে George Sampson-এর উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য। তিনি তাঁর 'Humane Education' শীর্ষক প্রবন্ধে মানুষের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন ঃ A humane education has no material end in view .... Humanism is a matter of life, not of a living. মানবীয় শিক্ষায় পার্থিব তথা বস্তুতান্ত্রিকতা চূড়ান্ত বা শেষ বিবেচ্য বিষয় নয়---- মানবিকতা হচ্ছে জীবন বিষয়ক, জীবিকা বিষয়ক নয়।" কারণ জীবিকা উপার্জনের জন্য মানবিক বোধ অত্যাবশ্যক নয়, কিন্তু জীবন-রচনায় মানবিক বোধ অত্যাবশ্যক। কারণ, শ্রীজীবন শিল্প-নির্ভর; সুস্থ বিকাশ ও শালীনতা মন্ডিত হওয়ার জন্য। এখানেই অশিক্ষিত অর্থোপার্জনকারীর সাথে শিক্ষিত জনের অর্থোপার্জনের রকম-প্রকৃতি বা মন-মেজাজের তফাৎ প্রতিভাত হয়। প্রথম জনের আয়, উপার্জন ও অর্থ বিনিয়োগ এবং ভোগে Crude temperament বা অপরিশীলিত মেজাজ প্রায়শ স্বভাবজাত ভাবে অভিব্যক্ত হয়, যা নান্দনিক না হওয়ার ফলে পরিবেশ-প্রতিবেশ প্রায়শ অস্বাস্থ্যকর ঠেকে। George Samposon উপসংহার এক্ষেত্রে নিম্নরূপ ঃ

"A human education is a possession in which rich and poor can be equal without disturbance to their national possession." ধন-সম্পদের ব্যবধান ধনী-গরিবের মধ্যে যা-ই থাকুক না কেন এই বৈষম্য মানবীয় শিক্ষার জন্য তাদের মধ্যে বাধা-বিপত্তি বা অসন্তোষ সৃষ্টি করে না। অর্থাৎ human's-এর humanism 'মানবিকতা'ই হচ্ছে মানুষের শিল্পসম্ভার। শিক্ষা এর সূতিকাগার।

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্বের মানুষ লাগামহীন ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য ভোগ পিপাসু হয়ে উঠছে। ফলে তারা শিক্ষাকে Art অপেক্ষা Commerce-এর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে উঠে পড়ে লেগেছে। Science, Technology এবং Job-oriented technique হিসেবে এরা শিক্ষাকে define, demonstrate এবং execute করার ফন্দি-ফিকিরে নিমগ্ন। ফলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৯৯ এর শেষ দশকের নবম শ্রেণীর নতুন বই English for Today-তে ঘটেছিল Non-Art এবং Non-Aesthetic পাঠ সন্নিবেশের বহুল সমাবেশ। A Million Dollar Secret, At the Doctor's, A Joke About A Building, ইত্যাদি যা এত নিরেট বস্তুসর্বস্ব যে এগুলোতে literature-এর সৌন্দর্য ও স্বাদকে দক্ষভাবে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল Communicative English শিখানোর Jargon-এ। এ ধরনের অতি উৎসাহ শিক্ষার্থীদের মন-মগজ Robot হওয়ার পথে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিল। "Grow more food to fight hunger, Have controlled parenthood to enjoy life and solvency, ক্ষুধাকে পরাভূত করার জন্য খাদ্য বেশি ফলাও, নিয়ন্ত্রিত বাবা-মায়ের মতবাদ ধর; কারণ এতে আর্থিক ভোগ ও দৈহিক স্বাদ বজায় থাকে। শিক্ষার এহেন লক্ষ্য নির্ধারণে আধুনিক শিক্ষিতেরা সম্প্রতি জঘন্য ও নিষ্ঠুরভাবে স্বার্থপর হয়ে পড়েছে। এদের মন-মগজ ও হৃদয়ে মায়ামমতা মিশ্রিত দুঃখ-কষ্টের প্রয়োজনীয়তা ও-এর bitter sweetness-এর অভিজ্ঞতা নেই। এরা অমাবস্যা ছাড়াই জ্যোৎস্না ভোগ করতে চায়। এর বিপরীত অবস্থা হলে এরা পালিয়ে বেড়ায়, অথবা আত্মহত্যাযজ্ঞ চালায়। এরা ভুলে যায় কাঁটা বিযুক্ত গোলাপ সদৃশ জীবনই সুন্দর, সুগন্ধময়ী ও কল্যাণকর। মহাপুরুষ ও মনীষীদের জীবন এরই অম্লান ও অক্ষয় দৃষ্টান্ত।

সবশেষে বাইবেলের একটি ঘটনা দিয়েই এ প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি। রাজা মনস্থ করলেন তিনি তাঁর জন্মদিনে নামকরা দু' কয়েদীর একজনকে আজাদী দান করবেন। পাত্র-মিত্র-সভাসদের পরামর্শ চাইলেন তিনি। তারা বলল, "জাঁহাপনা আপনার দু'জন নামকরা কয়েদীর একজন হচ্ছে বারাব্বাস (Brabbas); তাকে মুক্তি দিন। যদিও সে বদমায়েশ ও ডাকাত ছিল, তাকে আপনার মনস্কামনা পূরণে অনেক কাজে আসবে। অন্যদিকে অপরজন জেসাস (ঈসা আঃ)। সে অতি ভদ্র ও ধর্মপরায়ণ। তাকে মুক্তি দিলে তার দ্বারা ভালমন্দ নির্বিশেষে সমাজের (তদানীন্তন অধঃপতিত সমাজ) কোন কাজ হবে না।" তাদের যুক্তিতে প্রভাবান্বিত হয়ে রাজা বারাব্বাসকে মুক্তি দিলেন। আমাদের শৈল্পিক সৌন্দর্য রহিত আধুনিক শিক্ষা বারাব্বাস পয়দা করছে, জেসাসকে ঠেলে দিচ্ছে কারান্তরালে। ফলে শিক্ষার 'নান্দনিক প্রাণ ও সৌন্দর্য পাঠক্রম পাঠশালায় প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় আমাদের শিক্ষাঙ্গনে বারাব্বাসদের দাপট দুমড়িয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না এ সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে সংশ্লিষ্টদের ত্যাগী মন ও কর্মকাণ্ডে এর জবাব দিয়ে।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

১. Conference Book: Published by King Abdul Aziz University, Jedda, 1977

২. Curriculum and Education: Dr Affendi and Dr. Baluch

৩. Social and Natural Sciences: Islamic Perspective : Dr. Ismail Faroqui

৪. Education and Society In the Muslim World: Dr. Wasiullah Khan.

৫. Philosophy, Language and Literature and Fine Arts: Dr. S. H. Nasser

৬. Muslim Education In the Modern World, A Critical Survey: Dr. S. A. Ashraf

৭. Journal of Islamic Research and Education (May. 1981) : Editor: Mohammad Alamgheer

৮. দৈনিক সংগ্রাম –ঢাকা [৩০/৩/৮০ ও ৩১/৩/৮০ সংখ্যা]

www.pathagar.com

৭ম অধ্যায় কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় সমাচার

[এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে বিধায় এই অধ্যায়ে এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। লেখক]

১. ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ঃ ইতিবৃত্ত

[টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা-এর ইতিবৃত্তমূলক কোন গ্রন্থ এই কলেজ লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়নি। এটা সত্যি দারুণ দুঃখ ও বিস্ময়কর ব্যাপার। পরে কলেজ লাইব্রেরীর Book Sorter জনাব আবদুল হালিমের সহযোগিতায় কিছু ম্যাগাজিন সংগ্রহ করে এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্রন্থকার এ জন্য জনাব আবদুল হালিমের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পাঠককুলও এ জন্য অবশ্যই তাঁর নিকট অনুরূপ কৃতজ্ঞ হবেন বৈকি।]

ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৪ সালের উড-ডিসপ্যাচের মাধ্যমে। ডিসপ্যাচে এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক আশার কথা বলা হলেও তা কিন্তু যথাযথভাবে কার্যকর হয়নি, অন্ততঃ লর্ড কার্জনের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত। ১৮৯৮ সালে ভারতবর্ষের বড়লাট হয়ে এলেন George Nathaniel Curzon, Marquess of Kedleston. এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, George Nathaniel Curzon, became the Viceroyalty of India in 1898 which he described as the dream of his childhood, the fulfilled ambition of his manhood and his highest conception of duty to the State."

ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে ১৯০১ সালে তিনি সিমলাতে তদানীন্তন ভারতের প্রাদেশিক পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর এবং কতিপয় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি সম্মেলন করেন। দীর্ঘ পনের দিন ধরে এ সম্মেলন চলে। সম্মেলনে ভারতের শিক্ষা সংস্কারের জন্য ১৫০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরবর্তীতে লর্ড কার্জন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের শিক্ষা সংস্কারের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা আমাদের ইতিহাসে লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার নামে পরিচিত।

ভারতের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের গৃহীত নীতি ছিল ঃ

(১) Quantitative expansion side by side with imporovement in case of primary education and

www.pathagar.com

(২) Quantititive improvement of secondary education.

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। লর্ড কার্জন এ সত্যটি যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ১৯০৪ সালের "Resolution of Educational Policy" এর ৩৮ এবং ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন ঃ

38. If teaching in secondary schools is to be raised to a higher level– if the pupils are to be cared of their tendency to rely upon learning notes and textbooks by heart, if, in a word, European Knowledge is to be diffused by the methods proper to it, then it is most necessary that the teachers should themselves be trained in the art of teaching..... that an examination in the principles and practices of teaching should be instituted, success in which should hereafter be made a condition of permanent employment as a teacher in any secondary school..... .

৩৯ নং অনুচ্ছেদটিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার যে বর্ণনা দিয়েছে তা শিক্ষক-প্রশিক্ষণ-জগতের একটি অনান্য মাইলফলক, সন্দেহ নেই। নিম্নে এটা হুবহু উল্লেখ করা হলো।

39. The details of the measures taken with the object are already engaging the attention of the various Local Goverments. But the general principles upon which the Government of India desire to see the training institutions developed are these : An adequate staff of well trained members of the Indian Education Service is required and for this purpose it will be necessary to enlist more men of ability and experience in the work of higher training. The equipment of a Training College for Secondary teachers is at least as important as that of an Arts College, and the work calls for the exercise of abilities, as great as those required in any branch of the Educational Service. The period of training of students must be at least two years except in case of graduates, for whom one year's training may suffice. For the graduates the course of instruction will be chiefly directed towards imparting to them A knowledge of the principles which underlie the art of teaching and some degree of technical skill is the practice of the art. It should be a univerisity course,

www.pathagar.com

culminating in a university degree or diploma. The scheme of instruction should be determined by the authorities of the Training College and by the Education Department; and the exmnination at the close of it should be controlled by the same authorities. The training in the theory of teaching should be closely associated with its practice and for this purpose good practising schools should be attached to each college and should be under the control of the same authorities. The practising schools should be fully equiped with well-trained teachers, and the students should see examples of the best teaching, and should teach under capable supervision. It is desirable that the Training Colleges should be furnished with a good library and with a museum in which should be exhibited samples, models, illustrations or records of school work of the province. Every possible care should be taken to maintain a connection between the Training College and the school, so that the student on leaving the college and entering upon his career as a teacher may not neglect to practise the methods which he has been taught, and may not be prevented from doing so and forced to fall into line with the more mechnical methods of his untrained colleagues. The trained students whom the college has sent out should be occasionally brought together again, and the inspecting staff should co-operate with the Training College authorities in seeing that the influence of the College makes itself felt in the schools."

উল্লেখ্য, ১৯০৮ সালের পূর্বে বেঙ্গল প্রদেশে সেকেন্ডারী ইংলিশ স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না, তবে ভার্ণাকুলার স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য দু'ধরণের প্রতিষ্ঠান ছিল ঃ (১) Training Schools এবং (২) Guru Training Schools. সেকেন্ডারী ইংলিশ স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কাগজে কলমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ছিল, সরকারী স্কীম ছিল, কিন্তু বাস্তবে কোন প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের কোর্স চালু ছিল না।

১৯০৫ সালে বেঙ্গল প্রদেশ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বেঙ্গল এবং ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ও আসাম প্রদেশ। ১৯০৮ সালে তদানীন্তন বিভক্ত বেঙ্গলে সরকার প্রথম বারের মত কলকাতায় David Hare Training College এবং Patna Training College প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯০৯ সালে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ও আসাম প্রদেশের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় আজকের এই কলেজ, ঢাকা টিচার্স

www.pathagar.com

ট্রেনিং কলেজ। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এই কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটেড কলেজ ছিল এবং এখানে B.T. Degree এবং Licentiage in Teaching (LT) নামে দুটো কোর্সই চালু ছিল। কলেজের নিজস্ব ভবন ছিল এবং এর সাথে Practising high school ছিল। প্রথম বছরে এ কলেজের অধ্যাপকমন্ডলীর ২ জন এসেছিলেন Indian Education Service থেকে, ২ জন Provincial Service এবং ২ জন Sub-ordinate Service থেকে। কলেজে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৭ জন। এরমধ্যে ৬ জন বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ৬ জন শিক্ষকতার জন্য নির্বাচিত প্রার্থী এবং ২৫ জন সরকারী সেকেন্ডারী ইংলিশ স্কুলের শিক্ষক। প্রশিক্ষণার্থীরা সকলেই হোষ্টেলে থাকতেন। সরকারী স্কুলের শিক্ষকরা পূর্ণ বেতন পেতেন। B.T. কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীরা মাসিক ২০ টাকা এবং L.T. কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীরা মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি পেতেন। ১৯১১ সালে এই কলেজের বার্ষিক ব্যয় ছিল ৪৪,৫২৩ টাকা।

"Seventh Quinquennial Review of the progress of Education in India, 1912-1917" শীর্ষক রিপোর্টে এ কলেজের শিক্ষাক্রম প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"The Calcutta University Course is followed in the case both of graduates and of undergraduates. The degree of bachelor of teaching can be taken a year or more after the completion of an ordinary degree and includes the theory and practice of teaching in relation to mental and moral science, method and management, the history of educational ideas and an educational classic. A candidate must also have undergone a course of practical training for six months at a training school, or have served as a teacher for a year. In addition to written papers, a practical test in teaching forms a part of examination.

Mr. Hornell, the then D.P.I. of Bengal, remarked that "the aim of the higher course should be not only to secure that the B.T. is equipped as a competent class teacher, but also to secure that he understands the principles of teaching, the classification and discipline of school children, the organisation and purpose of games and other kinds of physical exercise, the control of a small office, and that he has sound conception of the purpose and organisation of educational machinery in a modern state."

"Calcutta University Commission, 1917-19 Report, Vol. XIII, Evidence and Documents. Statistics Relating to Colleges".

www.pathagar.com

এ কলেজের শিক্ষক, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাঁদের পাঠদানের বিষয়, ইত্যাদি সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা পরপৃষ্ঠায় উল্লেখ করে দেখান হলো।

টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা, ১৯১৭
শিক্ষক পরিচিতি

শিক্ষকের নাম	লৈটকধতথডর্টধযন্ত্র	ওলঠনণর্দ্র টনথর্দ
Mr. Evan F. Biss	L.C.P. (London)	On deputation
Mr. Herbent A. Stark	B.A. (Hons.) English 2 years training and 35 years experience including Observation of Training College work and School inspection in England.	School method and Organisation English Composition
Mr. M.P. West	B.A. (Oxon). Thrid Class Honours	English Classics on deputation
Babu Manoranjan Mitra	B.A.B. Course. Second Class. English Honours B.T. First in class I	Special Method Educational Classics and English classics
Babu Nagendra Nath Majumdar	M.A. in Mathematics. class III. B. T. Class I	Theory of Teaching.
Mr. Abdur Rahman Khan	M.A. in Pure Mathematics Class I.B.T. Class I	Mathematics Special Method English Classics
Babu Aswini Kumar Datta	M.Sc. in Chemistry Class II B.T.Class II	Geography Elementary Science
Babu Prasanna Kumar Deb	M.A. in History, class III B.T. Class I	History of Education History.
Babu Sarat Chandra Chatterjee	Passed School of Art. Calcutta	Drawing and Black board Work.
Babu Krishna Kishore Ganguly	F.A. Passed.	Drill and games

বিভক্ত বেঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি বেঙ্গলের পুনরেকত্রীকরণ দেখেছে, দেখেছে ব্রিটিশ শাসন, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারত বিভক্তি, দেখেছে পাকিস্তান, বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। শুধু বর্তমান বাংলাদেশে নয়; আসাম, বেঙ্গলসহ সমগ্র ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে এর অবদান চির অম্লান, চির ভাস্কর হয়ে আছে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও তা প্রবাহমান থাকবে।

www.pathagar.com

ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষদের স্বর্ণোজ্জ্বল কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক জনাব এস. এম. বজলুর রহমান লিখেনঃ "প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের বরেণ্য অধ্যক্ষদের জীবন-চরিত এ পর্যন্ত লিখিত হয়নি। সেরূপ এ কলেজের কোন ইতিহাসও লিখিত হয়নি। অথচ এ কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম। ভবিষ্যতে গবেষকগণ এ ব্যাপারে এগিয়ে এলে একটি মহৎ কাজ সাধিত হবে। সে উদ্দেশ্যে এখানে" অধ্যক্ষদের প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা হলো এই বিবেচনায় যে ভবিষ্যতের গবেষকদের এ সামান্য তথ্য কিছুটা কাজে আসলেও আসতে পারে।"

১. মি. ইভান ই. বিস. আই. ই. এস. (৭.১১. ১৯৯০– ২১. ৯. ১৯১৬) ঃ

কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁকে নতুন পথ কেটে চলতে হয়েছিল। এর জন্য উচ্চ উদ্ভাবনী–শক্তির প্রয়োজন ছিল। বিস সাহেবের মধ্যে তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাঁকে এ নিয়ে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছিল, গবেষণা করতে হয়েছিল, পদ্ধতির পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন করতে হয়েছিল। আরম্ভের কাজটি তিনি সুচারু রূপেই করতে পেরেছিলেন। আরম্ভটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুদূর-প্রসারী হয়েছিল বলেই কলেজটি অবশ্যম্ভাবী রূপে উচ্চ মর্যাদা লাভের একটি সুনিশ্চিত পথে দ্রুত এগিয়ে চলতে শুরু করেছিল। বিস সাহেবের কোন উচ্চ ডিগ্রি ছিল না; কিন্তু তিনি সব বিষয়ে সুপন্ডিত ছিলেন এবং একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। মি. বিস ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষা বিষয়ক বিল উথাপন করার জন্য সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ কলেজ থেকে বিদায় কালে তিনি বলেছিলেন, "This college should be the symbol of producing quality teachers."

২. মি. এইচ. ষ্টার্ক আই. ই. এস. (২৯. ৯. ১৯১৬–১৩. ১২. ১৯২০) ঃ

তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও উচ্চ নীতিপরায়ণ ব্যক্তি। এংলো–ইণ্ডিয়ান। যদিও তাঁর মধ্যে উদারতার অভাব ছিল, তবে নীতির প্রশ্নে কারো সাথে কোন দিন আপোস করেননি। কলেজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি কোন কিছু করতে নারাজ ছিলেন। অনেক সময় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর মত-বিরোধের সৃষ্টি হতো। তিনি বলতেন, 'I am Stark, I break but don't bend'. তাঁর সম্পর্কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত অধ্যক্ষ ডঃ মাইকেল ওয়েষ্ট মন্তব্য করেছেন, 'Mr Stark was a very able and high principled man'. তাঁর আমলে কলেজ উন্নতির পথে বহুধাপ এগিয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

৩. ডঃ মাইকেল ওয়েষ্ট, আই, ই, এস, এম, ডি, ফিল. (অক্সন)– (১৮. ১২. ১৯২০– ৩০. ৪. ১৯৩২)ঃ

ডঃ মাইকেল ওয়েস্ট ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের এক প্রবাদ পুরুষ। ইংরেজ এবং ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিসের লোক। তিনি এ কলেজে নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিলেন, সে যুগ ছিল কলেজের স্বর্ণ যুগ– 'ওয়েষ্টিয়ান যুগ'। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ রাজধানী কলকাতায় অবস্থিত হলেও ঢাকার মত একটি জেলা শহরের অখ্যাত-অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিত ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের নাম-ডাক সে সময়ে উপমহাদেশের সীমানা পেরিয়ে দূর-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। ডঃ মাইকেল ওয়েষ্ট ছিলেন একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ব্যাপারে তিনি পরিপক্ক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এক অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। এ কলেজের উন্নতমানের শিক্ষাদান পদ্ধতির কথা শুনে সুদূর মাদ্রাজ, মহীশুর, হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, দাক্ষিণাত্য, ইউ.পি., গুজরাট, আসাম প্রদেশ প্রভৃতি স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা ভিড় জমাতো। বস্তুতঃ তিনি এ কলেজের পাষাণ স্তুপে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন– শিলাকে করেছিলেন শৈলী। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণায় তিনি আপনাকে উৎসর্গীকৃত করে দিয়েছিলেন। তাঁর 'New Method Primer Language in Education', 'School Inspection and Teaching' প্রভৃতি শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক সুবিখ্যাত গ্রন্থ। যাঁদের মাতৃভাষা ইংরেজি নয় তাদের New Method পদ্ধতিতে ইংরেজি শিক্ষাদানের তিনি প্রবর্তক ছিলেন। পাঠদান কালে শিক্ষার্থী বেশি কথা বললে তিনি Supervision Note Book- এ লিখে দিতেন 'T.T.M'. অর্থাৎ Teacher Talks Much. এ মন্তব্য তাঁর; যাঁর মনটি ছিল অফুরন্ত দরদে ভরা। তাঁর মত একজন নীতিবান ও প্রায় সর্বদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ব্যক্তিকে এ কলেজ থেকে ইসলামিয়া কলেজে বদলি করা হয়। এর প্রতিবাদে তিনি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে বিলেত চলে যান। ডঃ মাইকেল ওয়েষ্ট এ কলেজের আত্মার আত্মীয়– এ কলেজের প্রাণ পুরুষ।

৪. বাবু গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য, বি.এ. বি.টি (১৪.৭. ১৯৩২–৬. ১২. ১৯৩৪)ঃ

অধ্যক্ষদের মধ্যে বাবু গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যাঁর বিলেতের ছাপ যুক্ত কোন ডিগ্রী, এমনকি এম.এ. ডিগ্রীও ছিল না। কিন্তু সর্ব বিষয়ে তাঁর ছিল গভীর জ্ঞান, অগাধ পাণ্ডিত্য ও ক্ষুরধার মনীষা। এ সবের সঙ্গে মিশেছিল তাঁর অনুকরণীয় কর্মদক্ষতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা। তিনি বিলেতের কোন ডিগ্রীধারী না হলেও চলনে-বলনে ছিলেন বিলেতি ভাবাপন্ন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর নৈষ্ঠিক কর্মতৎপরতা ও কর্মে ক্ষিপ্র গতিময়তার এতটুকু হ্রাস প্রাপ্তি ঘটেনি। তাঁর ছাত্র হওয়ার পূর্বে অনেকেই ভাবতেন বি.এ.বি.টি শুধু; নেই সাধারন শিক্ষা গত যোগ্যতা অথচ এ নিয়ে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মতো একটি

www.pathagar.com

ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা নিকেতনের অধ্যক্ষ তিনি কি ভাবে হতে পারলেন, বিশেষতঃ মাইকেল ওয়েষ্টের স্থলাভিষিক্ত হয়ে। কিন্তু প্রথম যে দিন তাঁর Principles of Education– এর ক্লাসটিতে ছাত্ররা তাঁর বক্তৃতা শুনলেন, সেদিন তাঁদের ভুল ভেঙে গেলো। "Teacher is born"– এ কথাটির তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। তিনি নবতর ভাব-ভাবনা ও গবেষণা দ্বারা শিক্ষাদান ব্যাপারে এ কলেজে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিলেন।

৫. রায় সাহেব মনোরঞ্জন মিত্র, বি.এ.বি.টি. ডিপ্-ইন-এড. (অক্সফোর্ড) (১০.১২.১৯৩৪–২৫.৫.১৯৩৬)ঃ

রায় সাহেব মনোরঞ্জন মিত্র এ কলেজে মাত্র এক বছর পাঁচ মাস অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এই স্বল্পকালীন সময়েই তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যান। শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল আকর্ষণীয়। তিনি শিক্ষক-শিক্ষণের গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য কিছু নতুন চরিত্রের বৈশিষ্ট ও ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করতেন। শ্রেণীকক্ষে পাঠাদান অনুশীলনের জন্য তিনি ছাত্রদের যে নম্বর দিতেন, তা কোন অধ্যাপকের ব্যক্তিগত খেয়াল বা পছন্দ-অপছন্দ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারতো না। সকলে মিলে আলোচনা করে তাঁদের সর্ব বিষয়ে মুল্যায়ন করা হতো ব্যক্তিগত হিসেবে, মানুষ হিসেবে এবং শিক্ষক হিসেবে। বি.টি. ডিগ্রী প্রাপ্তদের শুধু 'Bachelor of Teaching' হিসেবে গঠন না করে; কি করে 'Best Teacher' হিসেবে গঠন করা যায়, সেটাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে।

৬. খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান, এম. এ. বি. টি (ঢাকা) (১.৭.১৯৩৬– ৩১.৫.১৯৩৯)

খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান এ কলেজের প্রথম মুসলিম প্রতিভা-প্রদীপ্ত ছাত্র। দেশের শিক্ষাকাশের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তিনি। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমার জীবন'-এ উল্লেখ করেছেন, "আমি ছিলাম ওজনে ৪৬ সের এবং দেখিতেও কাহারও চোখে পড়িতাম না'। বেঁটে-খাটো এই ব্যক্তি ছিলেন তৃণাচ্ছাদিত শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বিশাল মহীরূহ। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন এক অসামান্য প্রতিভাধর মনীষী। তিনি নিতান্ত সহজ সরল জীবন-যাপন করতেন। স্যুট-টাই পরিধান করার জন্য বন্ধু-বান্ধবদের চাপ সৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি আজীবন শেরওয়ানী-পাজামা পরিধান করেছেন। তাঁর আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষকতা-জীবন ছিল জ্ঞান-সাধনা, জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান-বিতরণে উৎসর্গীকৃত। তখনকার দিনের অবহেলিত শিক্ষিত মুসলমানদের উপকারে আসার জন্য তিনি ছিলেন সদা উদ্‌গ্রীব। এ কলেজে তাঁর চাকরি জীবন শুরু হয় লেকাচারার হিসেবে। তখন বিস সাহেব ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি বিস সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র

www.pathagar.com

ছিলেন। সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন পরবর্তী কালের চারজন অধ্যক্ষ– ষ্টার্ক সাহেব, ডঃ ওয়েস্ট, রায় সাহেব মনোরঞ্জন মিত্র ও বাবু গুরুবন্ধু ভট্টাচার্যকে। এঁদের দ্বারা তিনি বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের নিকট থেকে অধ্যক্ষরূপে চলার পথ ও পাথেয় পেয়েছিলেন। মনোবিজ্ঞান ও ভূগোল ব্যতীত তিনি সকল পাঠ্য বিষয়ই পড়াতেন এবং প্রতি বিষয়ে তাঁর প্রস্তুতকৃত নোট পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে, অধ্যাপনার বিষয়ে পুস্তক লিখলে অধ্যাপনা সুশৃঙ্খল হয় এবং কোথায় কি ত্রুটি আছে, তা সহজেই ধরা পড়ে। তাঁর রচিত 'Rational Arithmatic' পুস্তক খানা স্যার আশুতোষ মুখার্জির অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিল। তাঁর 'Principles and Method of Teaching'-ও একখানা সুবিখ্যাত গ্রন্থ। এ ছাড়া তিনি বহু বিষয়ে স্কুল পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। তিনি শিক্ষা বিভাগের বহু উচ্চ প্রশাসনিক পদ অলঙ্কৃত করেন। শিক্ষাবিদ, শিক্ষাদার্শনিক ও শিক্ষা-প্রশাসক রূপে তিনি খ্যাতির শীর্ষ স্থানে অধিরোহন করেছিলেন। জ্ঞান-সাধানা, অগাধ পাণ্ডিত্য ও কর্মদক্ষতার জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'খান বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি এ কলেজের গভর্নিং বর্ডির সভাপতি রূপে আজীবন কাজ করে গেছেন।

৭. বাবু ক্ষেত্র পাল দাস ঘোষ, বি.এ. (অনার্স ক্যাল)ঃ এম. এ. (অক্সন). ডিপ.ইন. এড. (অক্সফোর্ড), বার-এট-ল. (২৬. ৭. ৩৯– ১০. ৭. ৪৪) ঃ

বাবু ক্ষেত্র পাল দাস ঘোষ 'কে. পি ঘোষ' নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য ও হীরকোজ্জ্বল মনীষা। তিনি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও মর্ডার্ন ইংলিশ বিষয় দু'টি পড়াতেন। 'মডার্ণ ইংলিশ' বিষয়টি তখন সকলের জন্য আবশ্যিক পাঠ্য ছিল। ইংরেজিতে ছিল তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্য। যদিও অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর সমগ্র কার্যকাল ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়টিতে; তথাপি তিনি কলেজের শিক্ষা-তরণীটিকে নির্বিঘ্নে কূলে ভিড়াতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একজন বিখ্যাত খেলোয়াড় হিসেবে সকল খেলাতেই তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল। অক্সফোর্ডে অবস্থানকালে তিনি 'অক্সফোর্ড একাদশের' একজন নামজাদা খেলোয়াড় ছিলেন। কলেজ টীমের সঙ্গে ক্রিকেট, হকি, বেডমিন্টন, ফুটবল, ভলিবল প্রভৃতি খেলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থেরও রচয়িতা। তন্মধ্যে 'আমাদের শিক্ষা', 'শিক্ষার সমস্যা', 'স্বাধীন বাংলায় ইংরেজি ভাষার স্থান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পরে তিনি এ কলেজ থেকে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে বদলি হয়ে যান।

www.pathagar.com

৮. বাবু ফকির দাস বানার্জী, এম.এ. এম. এড. (লিডস): ডিপ.ইন. এড. (লিডস) (১০.১.১৯৪৫-৪.৫.১৯৪৬)ঃ

বাবু ফকির দাস বানার্জী যখন ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তুঙ্গে। অবশেষে অকস্মাৎ যুদ্ধ থেমে যায়। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে পঞ্চাশের মন্বন্তর নেমে আসে। দেশ বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয়। তবু দেশে যুদ্ধের ভয়াবহতার অবসানে শান্তি ফিরে এলে তিনি নবোদ্যমে কাজ শুরু করেন এবং কলেজের বেশ উন্নতি বিধান করেন। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এবং English Phonetics বিষয় দু'টি পড়াতেন তিনি । তাঁর বাচন ভঙ্গির একটি চমৎকারিত্ব ছিল; তিনি ধীর গতিতে অথচ স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও সতর্কতার সঙ্গে পড়াতেন যা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তড়িৎ-শক্তির মতো তাৎক্ষণিক ভাবে সঞ্চারিত হয়ে যেতো। প্রশিক্ষণার্থীদের তিনি উপদেশ দিতেন, 'যদি তোমাদের ক্লাশকে ঝিমানো অবস্থায় দেখতে পাও, তবে বুঝবে, আমি যা পড়াচ্ছি তা থেকে পরবর্তী পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হবে, তা হলেই দেখতে পাবে, এটা ম্যাজিকের মতো কাজ করছে।' একবার কলেজের নিচের তলাস্থিত আরমানীটোলা হাই স্কুল হঠাৎ ছুটি হয়ে গেলে দারুণ হৈ-চৈ করে ছাত্ররা বেরিয়ে পড়লো। তিনি দু'মিনিট বক্তৃতা স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন। শিক্ষার্থীরা মনে করলেন, স্যার খুব রেগে গেছেন; কিন্তু পরক্ষণেই মন্তব্য করলেন, "I like this hilarity in children. This indicates our boys are not lifeless." কথাটি কতই না মূল্যবান: সময় ও সুযোগ মতো ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণ চাঞ্চল্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে দিতে হবে।

৯. বাবু সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, এম.এস. সি. বি.টি. (ক্যাল) (১৮.৮.১৯৪৬-১৪.৮.১৯৪৭)ঃ

বাবু সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী এ কলেজে অধ্যক্ষের পদে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিভক্ত হয়ে যায় এবং তিনি পশ্চিম বঙ্গে চলে যান। তিনি তাঁর স্বল্পস্থায়ী কার্যকালেও কলেজের উন্নতির জন্য বেশ কিছু কার্যকরী প্রয়াস চালিয়েছিলেন, যার ফলে এ কলেজের কার্যধারায় কোন ছেদ পড়তে পারেনি।

১০. জনাব আবদুর রাজ্জাক আখুনজী, এম.এ. বি. এল. এম. এড (লিড্স). ডিপ.ইন. এড. (লিড্স). (১৭.৮.১৯৪৭-১.২.১৯৪৯)ঃ

ভারত বিভাগের পর এই কলেজে এক মহা দুর্দিন নেমে আসে। কলেজের সকল প্রখ্যাত হিন্দু অধ্যাপক কলেজ ছেড়ে চলে যান। তাঁদের শূন্য পদে অনভিজ্ঞ অধ্যাপকদের নিযুক্ত করতে হয়। ফলে কলেজের সুনাম অক্ষুন্ন রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কলেজের প্রখ্যাত সিনিয়র অধ্যাপক জনাব মুহম্মদ ওসমান গনিকেও এই সময় করাচী ডেকে পাঠানো হয় শিক্ষা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারীর পদে যোগদানের জন্য। এই সময় জনাব আবদুর রাজ্জাক আখুনজী কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন এবং শক্ত হাতে কলেজের হাল ধরেন। তিনি কলেজের ঐতিহ্য ও

www.pathagar.com

সুখ্যাতি পুনরুদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ধীরে ধীরে সফলতা অর্জিত হতে থাকে। কিন্তু এই সময় নিতান্ত অনভিপ্রেত ভাবে তাঁকে স্কুল ইন্সপেক্টর হিসেবে রাজশাহী বদলি করা হলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন জনাব আবদুর রাজ্জাক।

১১. জনাব মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক, এম.এ.; বি.টি. (ঢাকা) ডিপ.ই. এড (এডিনবরা) ১.২১৯৪৯-১৩.৩.১৯৫১) ঃ

জনাব মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক এই কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং কলেজের অধ্যাপক রূপে দীর্ঘ দিন কার্যরত ছিলেন। তিনি এই কলেজের সকল কার্যের প্রত্যক্ষদর্শী এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর উৎসাহে কলেজের নবীন-প্রবীণ অধ্যাপকগণ দলবদ্ধভাবে 'টীম-স্পিরিট' নিয়ে অবিশ্রান্ত ভাবে কাজ করতে থাকেন এবং কলেজের হৃত গৌরব বহুলাংশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। তাঁর কর্মোদ্যম দেখে তাঁর চাকরির মেয়াদ কিছুকাল বৃদ্ধি করা হয়। এতে তিনি কলেজের জন্য আরও কিছু ভালো কাজ করার সুযোগ পান এবং সেই সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কলেজ এর গৌরব জনক অবস্থানে ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিত ভাবে ফিরে আসতে থাকে।

১২. জনাব সালমন চৌধুরী এম.এ.; বি.টি. (১৩.৩.১৯৫১-২১.১০.১৯৫২)ঃ

জনাব সালমন চৌধুরী ১৯৩৪-৩৫ শিক্ষাবর্ষে এই কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি বি.টি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর সময় অধ্যক্ষ ছিলেন বাবু গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য। জনাব সালমন চৌধুরী এ কলেজের অধ্যাপক রূপেও বহু দিন কাজ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বহুদর্শী ব্যক্তি। অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাকের অবসর গ্রহণের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং কলেজের পূর্ব সুনাম বর্ধনের জন্য বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু করে দেন। তাঁর কর্ম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কলেজের অধ্যাপকগণ কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। তিনি যুদ্ধোত্তর কালীন পুনর্গঠন স্কীমে এই কলেজের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের প্রচেষ্টা চালান এবং কলেজটিকে আরমানীটোলা থেকে স্থানান্তরিত করে ধানমণ্ডিতে নির্মাণ করার প্রস্তাব পেশ করেন বটে; কিন্তু প্ল্যানিং এডভাইজার কলেজটিকে পূর্ব স্থানে রেখেই এর উন্নয়ন কার্য সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সৌভাগ্যবশতঃ অধ্যক্ষ সালমন চৌধুরীর নিজ জেলা সিলেটের জনাব আবদুল হামিদ তৎকালে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে পুরাতন স্থানের বহুবিধ অসুবিধের কথা সম্যক রূপে বুঝিয়ে ধানমন্ডির বর্তমান মনোরম স্থানে কলেজটি স্থানান্তরিত করার সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। ধানমন্ডির নতুন স্থানে এই কলেজ স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে অধ্যক্ষ সালমান চৌধুরীর অবদান অম্লান ও চিরস্মরণীয়।

www.pathagar.com

১৩. জনাব মুহম্মদ ওসমান গনি, বি.এ. (অনার্স). এম. এ. বি.টি. (ঢাকা); টি.ডি. (লন্ডন) ২১.১০.১৯৫২-৩১.৫.১৯৬৮)ঃ

জনাব মুহম্মদ ওসমান গনি এ কলেজের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন। তিনি এ কলেজে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল অধ্যক্ষরূপে কর্মরত ছিলেন। ডঃ মাইকেল ওয়েষ্ট যেমন স্বমহিম মহাত্ম্যে কলেজের একজন যুগস্রষ্টা অধ্যক্ষ হিসেবে গণ্য হতে পেরেছিলেন, অধ্যক্ষ মুহম্মদ ওসমান গনিও তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্য, ক্ষুরধার মনীষা, বিরাট ব্যক্তিত্ব ও পরিপক্ক প্রজ্ঞাজ্ঞান দ্বারা একটি নতুন যুগের সৃষ্টি করে অনন্য স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এ যুগস্রষ্টা মনীষীর অমূল্য অবদানে কলেজ পুনরায় স্ব-মহিম মর্যাদার উচ্চস্থান লাভ করেছিল। তাঁর সময় কলেজের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। সে সময় টিচার্স ট্রেনিং কলেজ বলতে বোঝাতো ওসমান গনি সাহেবকে এবং ওসমান গনি সাহেব বলতে বোঝাতো টিচার্স ট্রেনিং কলেজকে। তাঁর সময়ে ধানমন্ডির নতুন স্থানে ১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে মহাসমারোহে নবনির্মিত কলেজের উদ্বোধন হয়। এ প্রসংগে উল্লেখ্য, ১৯৫৬-৫৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে বি.টি. ডিগ্রীর নামকরণ 'বি.এড.' ডিগ্রী করা হয়। কলেজ সংলগ্ন গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের নামকরণ ওসমান গনি সাহেবই করেন। ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের তিনি ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার। তিনি ছিলেন কলেজগত প্রাণ। এ কলেজকে তিনি এত ভালোবেসেছিলেন যে তাঁর সময় সারাবর্ষ ব্যাপী বৈচিত্রমন্ডিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি লেগেই থাকতো অথচ শিক্ষাদানে তা মোটেই বিঘ্ন সৃষ্টি করতোনা; বরং শিক্ষাকে করে তুলতো আরও অর্থবহ, অন্তরঙ্গ. আনন্দময়তায় আরও দার্শনিক। তিনি একজন সুলেখক, সুবক্তা ও বাগ্মী ছিলেন। তাঁর এই সকল গুণের জন্য প্রেসিডেন্ট থেকে খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহান'– তাঁর সম্পর্কে এর অধিক আর কিছু না বললেও চলে। এই মনীষী ১৯৮৩ সনে মৃত্যু বরণ করেন।

১৪. ডঃ মুহম্মদ নুরুল হক, বি.এ. (অনার্স)ঃ এম. এ. লুই মেডালিষ্ট এন্ড প্রাইজম্যান (ঢাকা); ইডি. ডি. (হিউষ্টন, টেক্সাস) (২৭.৮.১৯৬৯-৬.১১.১৯৭২) ঃ

ডঃ মুহম্মদ নুরুল হক দীর্ঘদিন ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অধ্যক্ষ মুহম্মদ ওসমান গনির অবসর গ্রহণের পর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য সরকার তাঁকেই যোগ্যতম ব্যক্তি বলে বিবেচনা করে কলেজে বদলি করে আনে। সত্যিকার অর্থেই তিনি ওসমান গনি সাহেবের যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন। তিনি এ কলেজের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য বহু নির্মান কাজ সহ নানা উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতেও পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। এ কলেজে একটি নব ধারার প্রবর্তন করেছিলেন তিনি। তাঁর উদ্ভাবনী ও সাংগঠনিক শক্তি ছিল অপ্রমেয়। তাঁরই

www.pathagar.com

একান্ত প্রচেষ্টায় মহা সমারোহে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ পালন করেছিলেন এবং এ উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশ থেকে বহু নামজাদা শিক্ষাবিদের সমাগম হয়েছিল তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায়। এ কলেজের সৃষ্টিকাল থেকে কখনও কোন জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়নি। তিনি অতি জাঁকজমকের সঙ্গে হীরক জুবলী পালন করেছিলেন এবং এই উপলক্ষে কলেজের ষষ্ঠদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী প্রকাশ করেছিলেন। এ কলেজে তাঁর কার্যকাল ছিল বেশ ঘটনা বহুল। তাঁর সময়েই মুক্তি যুদ্ধ শুরু হয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ নূরুল হক যুদ্ধের ধ্বংস থেকে কলেজটিকে রক্ষা করেন।

১৫. ডঃ আবুল হাশেম মুহম্মদ করিম, বি.এ. (অনার্স); এম.এ. বি.টি. (ঢাকা); এম.এ. (বৈরুত); ইডি. ডি. (কলরাডো); (২৫.১১.১৯৭২–১৭.২.১৯৭৭) ঃ

ডঃ আবুল হাশেম মুহম্মদ করিম ১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে এ কলেজের একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। তিনি বি.এড. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অধ্যক্ষ মুহম্মদ ওসমান গনি সাহেবের একজন সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন এবং অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে সতত সচেষ্ট ছিলেন। এ কলেজের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু সংস্কার মূলক কাজ করেন তিনি। কলেজের শিক্ষাক্রমেও বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর কালে দেশ খুব আর্থিক সংকটে নিপতিত হওয়ার জন্য তিনি তাঁর সমুদয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারেন নি। তথাপি কলেজের মসজিদটিকে বেশ সম্প্রসারিত করন এবং কলেজ প্রাঙ্গনে ছাত্রীনিবাস নির্মাণ তাঁর প্রচেষ্টায়ই সম্ভব হয়েছিল। তিনি ১৯৭৭ সনে ইউ. কে.-তে বাংলাদেশের দুতাবাসে এডুকেশন এ্যাটাশের পদে যোগদানের জন্য লন্ডন চলে যান। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সরকার তাঁকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদে নিযুক্ত করে। তিনি ছিলেন দেশের একজন বরেণ্য শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক ও বাস্তবমুখী চিন্তাবিদ। কিছুদিন পূর্বে তিনি মহাপরিচালকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য অবদান আজও তিনি গতিশীল রেখেছেন।

১৬. ডঃ এ.এ. এম. ওবায়েদ উল্লাহ, বি.এস.সি. (অনার্স); এম.এস. সি.; বি. এড. (ঢাকা); পি. এইচ. ডি. (লিড্স); (১৪.৫.১৯৭৭–২.১০.১৯৭৯)ঃ

জনাব ড.এম এম ওবায়েদ উল্লাহ এই কলেজের একজন প্রতিভা-ভাস্বর ছাত্র। ১৯৭২ সনে অনুষ্ঠিত বি. এড. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি মুহম্মদ ওসমান গনি সাহেবের আদর্শানুসারী ছিলেন এবং কলেজে তাঁর সময়কার একটা আবহের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি কলেজের বিভাগীয় ক্লাবগুলোর স্রষ্টা। এই ক্লাবগুলো কলেজের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় আজও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। তাঁর বলিষ্ঠ

www.pathagar.com

নেতৃত্বে কলেজটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। এ কলেজ থেকেই পদোন্নতি পেয়ে তিনি নায়েম–এ বদলি হয়ে যান এবং নায়েম–এর মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে অকালে (১১.১২.৮৮) মৃত্যু বরণ করেন।

১৭. ডঃ মালিহা খাতুন বি.এ. (অনার্স); এম.এ. (ডাবল); বি.টি. ডিপ-ইন-এড.(এডিনবরা);পি.এইচ.ডি.(ঢাকা);(২.১০.১৯৭৯–২১.৭.১৯৮১)ঃ

ডঃ মালিহা খাতুন দীর্ঘদিন ময়মনসিংহ মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর পর নায়েম-এর উপ-পরিচালক নিযুক্ত হন। সেখান থেকে বদলি হয়ে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তিনিই ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রথম মহিলা যিনি অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করার দুর্লভ সম্মান লাভ করেন। এ দেশে নারী-জাগরনের প্রত্যুষলগ্ন থেকেই তিনি শিক্ষার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে এসেছিলেন। তাঁর সেই দীর্ঘ দিনের ভূয়োদর্শিতা, দক্ষতা ও পরিপক্কতা চাকুরি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি এ কলেজে যথোপযুক্ত রূপে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি একজন নিবেদিত-প্রাণ শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা-প্রশাসক রূপে অম্লান খ্যাতি অর্জন করেন। বাঙলা সাহিত্যের তিনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত লেখিকা। সাহিত্যের বিভিন্ন বিচিত্র শাখায় বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার জন্য অনেক খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। অধ্যক্ষ হিসেবে এ কলেজে বিশেষ অবদান রাখার জন্য অবসর গ্রহণের পরও সরকার তাঁকে পুনরায় প্রফেসর হিসেবে কাজ করার সুযোগ দান করে।

১৮. জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, এম,এস, সি, (ক্যাল); বি.টি. (ঢাকা); এম.এস. ইন. এড. (ইলিনয়) (২.৯.১৯৮১–৩১.১২.১৯৮৩) ঃ

জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে এ কলেজে বদলি হয়ে আসেন। তিনি এ কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। অধ্যক্ষ ওসমান গনি সাহেবের আমলে সুদীর্ঘ কাল ধরে এ কলেজ স্থানান্তরিত হলে কলেজের কাজ বহুগুণ বেড়ে যায়। তিনি সব্যসাচীর মতো ওসমান গনি সাহেবকে এই কাজে সাহায্য করেন। দেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, শিক্ষা-প্রশাসক ও শিক্ষা-গবেষক জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ৮.৪.৯৩ তারিখে মৃত্যু বরণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নানা কাজে এ কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন গভীরভাবে।

১৯. প্রফেসর রাশিদা বেগম, বি.এ, (অনার্স), এম. এ.; এম.এড. (ঢাকা); এম. এ. (শিকাগো) সার্টিফিকেট অব এ্যাডভান্সড ষ্টাডি ইন এডুকেশন (শিকাগো) (১৯.৩.১৯৮৪-) ঃ

প্রফেসর রাশিদা বেগম ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপিকা, নায়েম-এর উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, ময়মনসিংহ মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপিকা,

www.pathagar.com

জনশিক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানের উপ-পরিচালক এবং কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ রূপে দীর্ঘদিন কর্মরত থাকার পর ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন। তিনি কলেজে এম. এড. কোর্স প্রবর্তন করেছেন এবং বি.এড. (অনার্স) কোর্স প্রবর্তনের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। তাঁর উদ্ভাবনী ও সাংগঠনিক শক্তি অদ্ভূত। স্পষ্টবাদী, অসীম সাহসী ও নীতির প্রশ্নে আজীবন আপোষহীন। তাঁর ছিল চিত্ত-বৈদগ্ধ্য, পরিশীলতা, পরিশুদ্ধ, ও সংবেদনশীল মন। বি.সি.এস. শিক্ষা সমিতির সভাপতি রূপে তিনি বি.সি.এস. ক্যাডার ভুক্ত অধ্যাপকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন তা ভুলে থাকা দুঃসাধ্য। তিনি একজন উৎসর্গীকৃত প্রাণ শিক্ষক, যশস্বী শিক্ষাবিদ ও দক্ষ শিক্ষা প্রশাসক। তিনি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বি.এড. কোর্সের পুস্তক প্রণেতা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত বিভিন্ন শিক্ষা-বিষয়ক পুস্তকের রচয়িতা। এছাড়া 'সফল শিক্ষক' নামক তাঁর একখানা উৎকৃষ্ট পুস্তকও রয়েছে।

[স্মরণিকা -১৯৯৫, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ঢাকা, পৃঃ ৮৪-৯১-এর সৌজন্য।]

বি.এড. কলেজ ঃ একটি সমীক্ষা

ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ঐতিহ্যবাহী এই ইতিহাস পটভূমি হিসেবে স্মরণ করে এবার বাংলাদেশের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালগুলোর অস্তিত্ব ও অবদানের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক।

বাংলাদেশের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজগুলোর সামগ্রিক ফলাফল সম্পর্কিত চিত্র ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সহকারী জনাব অধ্যাপক আবু সাইদের "বি.এড. পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়" শীর্ষক প্রবন্ধটি Base হিসাবে ধরা যাক যা থেকে সহজেই আঁচ করা যাবে এদেশের শিক্ষক সমাজের প্রশিক্ষণগত কর্ম দক্ষতা ও তাঁদের শিক্ষা ভুবনে অবদান কোন পর্যায়ে রয়েছে। নিম্নে জনাব আবু সাইদের প্রবন্ধটি হুবহু উদ্ধৃত করা হলো।

শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ শিক্ষকের সুষ্ঠু পেশাগত প্রশিক্ষণের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা। কাজেই একজন দক্ষ ও আলোকিত শিক্ষক গড়ে উঠতে পারেন উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। আর মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য বি. এড. প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে ১১টি টিচার্স কলেজ বি.এড. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ১১টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতি বছর প্রায় ৬০০০ হাজার শিক্ষককে বি. এড. প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। তবু আজও লাখ লাখ শিক্ষক বি.এড. প্রশিক্ষণবিহীন অবস্থায় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছেন।

www.pathagar.com

বেসরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা

যেহেতু লাখ লাখ শিক্ষক বি.এড. প্রশিক্ষণবিহীন এবং লাখ লাখ মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী চাকুরীর জন্য অপেক্ষা করছে ঠিক সেই মূহূর্তে বর্তমানে ৪৮টি (২০০৪ সাল পর্যন্ত) প্রাইভেট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ গড়ে উঠেছে। খোদ ঢাকা শহরে গড়ে উঠেছে ১৫টি প্রাইভেট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। ঢাকা শহরে গড়ে উঠা প্রাইভেট টিচার্স ট্রেনিং কলেজের গুণগত মান, অবকাঠামো ইত্যাদি মানসম্পন্ন হলেও ঢাকার বাইরের কলেজগুলোর গুণগত মান সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে; বিশেষ করে পরীক্ষার ফলাফলের বিচার্যে।

ফলাফল বিপর্যয়ের কারণসমূহ

১। কলেজ রেকর্ড ও চূড়ান্ত পরীক্ষায় আলাদাভাবে পাশের নিয়ম প্রবর্তিত হওয়া। উল্লেখ্য, ২০০০ সাল থেকে প্রতি বিষয়ে কলেজ রেকর্ডে ৪০ এর ভিতর ১৪ এবং ৬০ এর ভিতর ২২ নম্বর পেতে হয়।

২। প্রাইভেট টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত ক্লাশে উপস্থিত হয় না।

৩। ২০০০ এবং ২০০১ সালের বি.এড. পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে শিক্ষার পরিমাপ ও মূল্যায়ন বিষয়ে সব চাইতে বেশী সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হয়।

৪। যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব।

বিগত ৫ বছরের বি.এড. পরীক্ষার ফলাফলের পরিসংখ্যান

সাল	মোটপরীক্ষার্থীও সংখ্যা	উপস্থিতির সংখ্যা	প্রথম শ্রেনী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	মোট পাশের হার	পাশের শতকরা হার
২০০২							
২০০১	১৭৩৮৮	১৭৩৮০	২২৪৬	৭৫০৮	০৪	৯৭৫৮	৫৬.১৪%
২০০০	১৩২২৬	-	১৩০০	৬৬১০	১৯	৭৯২৯	৫৯.৯৫%
১৯৯৯	৮৭১৯	-	৯৫	৬৭৯২	৪৬	৭৭৩৩	৯৩২৯%
১৯৯৮	৭৫৮৭	৭৫৭৯	৮৫৯	৬২৩৮	৩৪	৭১৩১	৯৪.০৮%
১৯৯৭	৬২১	৬১০	৯১	৪৭৮	০২	৫৭১	৯৩.৬০%

বিঃ দ্রঃ ২০০০ সাল থেকে বিষয় ভিত্তিক আলাদা ভাবে পাশ নম্বর পেতে হবে বিধান চালু হওয়ার পর থেকে পাশের হার অনেক কমে যায়। উদাহরণ স্বরূপ ২০০০ ও ২০০১ সালের পাশের হার যথাক্রমে ৫৯.৯৫%, ৫৬.১৪%। পক্ষান্তরে ১৯৯৯ সালে (সে সময় কলেজ রেকর্ড ও চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৩৬ পেলে পাশ হত) পাশের হার ছিল ৯৩.২৯%।

www.pathagar.com

সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহের ফলাফল

ক্রমিক নং	কলেজের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	স্থগিত	পাশের শতকরা হার
১	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	৫৯৮	১৫৩	৩২৯	-	০৫	৮১.৪৩%
২	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (পুরুষ) ময়মনসিংহ	৮১২	৪৩	৫১৮	০১	-	৬৯.২১%
৩	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা) ময়মনসিংহ	৬১৮	৪৩	৩৮২	-	-	৬৮.৭৭%
৪	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, চট্টগ্রাম	৬৩১	৫৬	৩৭১	০২	০৫	৬৮.৭৭%
৫	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ফেনী	৫৭১	১৮	২৮৯	-	১৫	৫৬.৩৯%
৬	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুমিল্লা	৭৪০	৮৫	৪১৪	-	১৭	৬৯.৭২%
৭	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী	৭৪৮	১০৫	৪০৩	-	-	৬৭.৯১%
৮	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রংপুর	৭০৯	৭৪	৪৩৯	-	০৪	৭২.৯১%
৯	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, যশোর	৫৮৬	৬৫	৪৫১	-	১৫	৮৯.৭০%
১০	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা	৬৭২	১০৬	৪৫০	-	০৩	৮৩.১৮%
১১	শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, বরিশাল	৩২১	৫৪	১৮৮	-	০৩	৭৬.৩২%

বেসরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহের ফলাফল

ক্রমিক নং	কলেজের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	স্থগিত	পাশের শতকরা হার
১	খান বাহাদুর আহছান উল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, শ্যামলী, ঢাকা	৩৩৭	৪৫	১৮৪	-	০৭	৭০.০২%
২	ন্যাশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ঢাকা	২৯০	৭৯	১২৪	-	০৩	৭১.০৩%
৩	এডুকেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট ইন্সটিটিউট উত্তরা, ঢাকা	৩১৩	৪৬	৭৭	-	-	৩৯.২৯%
৪	বাংলাদেশ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ইন্দিরা রোড, ঢাকা	২৯০	৮৬	৮১	-	০১	৫৭.৯৩%
৫	মহানগর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	২৫৩	৪৭	৭৪	-	-	৪৭.৮২%
৬	মেট্রোপলিটন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	৫১১	১৭৬	১১০	-	-	৫৫.৯৬%
৭	ইউনিভার্সেল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	২৮৯	২২	৬০	-	০২	৭৬.০৬%
৮	কলেজ অব এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং পুরানাপল্টন, ঢাকা।	২৩৪	৬৩	১১৩	-	০২	৭৬.০৬%
৯	কলেজ অব এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজ, ঢাকা	২১৯	১৯	৯৭	-	-	৫২.৯৬%
১০	শেখ ফজিলাতুন্নেছা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, মিরপুর, ঢাকা	৩৪৮	৫৯	১১৮	-	৪১	৬২.৬৪%
১১	নিউ রাজধানী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	১৯৭	৪৫	৩৪	-	০২	৪১.১১%
১২	শেখ জামাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	১৮০	২৩	৬৭	-	০৬	৫৩.৩৩%

www.pathagar.com

১৩	শেরে বাংলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	৯৫	৩০	৩৫	-	০১	৬৯.৪৭%
১৪	মডার্ন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	১৬০	৩৬	৫৮	-	০২	৬০.০০%
১৬	টাঙ্গাইল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, টাঙ্গাইল	৩১৯	২৩	১৪৪	-	০৪	৫৩.৬০%
১৬	সানফ্লাওয়ার টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ফরিদপুর	১২৫	২৬	৩৭	-	০১	৫১.২০%
১৭	এম. এ. রউফ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ গোপালগঞ্জ	২৮৭	২২	১২৩	-	০২	৫১.২১%
১৮	খান সাহেব আবদুল আজিজ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, নেত্রকোনা	১৪৫	০৩	৫২	-	০৭	৪২.৭৫%
১৯	রিসার্চ ফর এডুকেশন এন্ড ম্যানেজম্যান্ট একাডেমী চট্টগ্রাম	২৯২	০৯	১৬০	০১	০৮	৬০.৯৫%
২০	এডুকেশন কলেজ, কুমিল্লা	২৩৫	৪৩	৪৯	-	২৫	৪৯.৭৮%
২১	উত্তরবঙ্গ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী	২৬৫	৪২	৯৮	-	০১	৫৩.২০%
২২	আদর্শ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী	২৪৯	০৯	৯০	-	-	৩৯.৭৫%
২৩	প্রগ্রেসিভ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী	৫৬	-	১৩	-	-	২৩.২১%
২৪	শহীদ মোনায়েম হোসেন বি. এড. কলেজ, বগুড়া	৩৩০					
২৫	শহীদ মোস্তাফিজুর রহমান বি. এড. কলেজ. বগুড়া	৩০৭	২০	২০১	-	০১	৭২.৩৭%
২৬	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রংপুর	২৬৯	০৮	৭০	-	০১	২৯.৩৬%
২৭	দিনাজপুর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, দিনাজপুর	৭২২	৩১	১২৬	-	০৮	২২.৮৫%
২৮	নরসিংদী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, নরসিংদী	৮২	১৩	৩৪	-	০৬	৬৪.৬৩%
২৯	গোবিন্দগঞ্জ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, গাইবান্ধা	৫৪৭	১৩	৭৪	-	৩২	২১.৭৫%
৩০	সিরাজগঞ্জ বি.এড. কলেজ. সিরাজগঞ্জ	১৯৬	০৬	১১৪	-	০২	৬২.২৪%
৩১	পাবনা বি.এড. কলেজ, পাবনা	৯৫	১৫	২৫	-	০২	৪৪.২১%
৩২	আলাউদ্দিন আহমেদ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুষ্টিয়া	৩৩৪	৫৮	১২৮	-	০৭	৫৭.৭৮%
৩৩	সারোয়ার খান টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা	৬৫	১৯	৩৪	-	-	৮১.৫৩%
৩৪	কলেজ অব এডুকেশন, বরিশাল	২২৫	০৫	১৫৬	-	০৫	৭৩.৭৭%
৩৫	কলারোয়া টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, সাতক্ষীরা	১৭৭	৮৬	৫৭	-	০৬	৮৪.১৮%
৩৬	পটুয়াখালী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পটুয়াখালী	২২৯	৩০	৮৯	-	০৬	৫৪.৫৮%
৩৭	দক্ষিণবঙ্গ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মৌকরন, পটুয়াখালী	১৫৪	৩৩	২২	-	০৪	৩৮.৩১%
৩৮	কলেজ অব এডুকেশন, ঝালকাঠি	১৬৯	০৮	৬৫	-	০৭	৪৭.৩৩%
৩৯	জালালাবাদ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, সিলেট	১৮০	০৩	৭৯	-	-	৪৫.৫৫%
৪০	লালমিয়া টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, বরগুনা	১০৫	৬০	০৬	-	০৩	৬৫.৭১%

www.pathagar.com

উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সরকারী কলেজের শতকরা পাশের হার ৭৩.১৭%। সর্বনিম্ন পাশের হার ৫৬.৩৯% (ফেনী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ) এবং সর্বোচ্চ পাশের হার ৮৯.৭০% (যশোর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ)।

বেসরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সর্বনিম্ন পাশের হার ২১.৭৫% (গোবিন্দগঞ্জ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, গাইবান্ধা) এবং সর্বোচ্চ পাশের হার ৮৪.১৮% (কলারোয়া টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, সাতক্ষীরা)।

উপসংহার ঃ বি.এড. প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হল মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন। এজন্য বি. এড. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। যে কোন স্তরেই শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রমের মান উন্নয়ন সর্বোপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদি ও মান উন্নয়ন করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ধারাবাহিক মূল্যায়নের কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক। সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে মান নিয়ন্ত্রণের উপর কিছুটা জোর দেওয়া হলেও অধিকাংশ বেসরকারী কলেজে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও একাডেমিক নিয়ন্ত্রক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে গেলেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন সম্ভব।

[সৌজন্য ঃ উদ্ভাসন ঃ বার্ষিকী, ২০০৩, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ঢাকা, পৃঃ ৭-৯]

এ প্রসঙ্গে এটাও লক্ষণীয় টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ঢাকা-এর অধ্যক্ষ পদে শুরু থেকে অর্থাৎ ০৭-১১-১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৮ জন নিয়োগ প্রাপ্ত হন। প্রথম ইংরেজ, প্রথম হিন্দু, প্রথম মুসলমান ও প্রথম মহিলা অধ্যক্ষদের নাম এদের ও কার্যকালের তালিকা সহ বর্তমানে কর্মরত অধ্যক্ষের তালিকাক্রম নিম্নে দেয়া হলো। এ জন্য যে থেকে এই কলেজের জন্ম থেকে অদ্যবধি প্রশাসনিক প্রধানদের একটি ধারাবাহিকতার একটি রূপরেখা আঁচ করা যায় অনায়াসে।

	অধ্যক্ষের নাম	ক্রম	চাকুরীর মেয়াদকাল
১.	মি. ইভান ই. বিস আই. ই. এস (১ম)	১ম	০৭/১১/১৯০৯-২১/০৯/১৯১৬
২.	বাবু গুরু বন্ধু ভট্টাচার্য বি.এ. বি. টি	৫ম	১৪/০৭/১৯৩২-০৬/১২/১৯৩৪

www.pathagar.com

৩.	খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান এম.এ.বি.টি.	৬ষ্ঠ	০১/০৭/১৯৩৬-৩১/০৫/১৯৩৯
৪.	ড. মালিহা খাতুন বি.এ. অনার্স, এম.এ.বি.টি ডিপ.ইন.এডুকেশন (এডিনবরা) পি.এইচ. ডি. (ঢাকা)	১৭ তম	০২/১০/১৯৭৯-২১/০৭/১৯৮১
৫.	প্রফেসর মোঃ সাইদুর রহমান	২৮ তম	২২/৬/২০০৩- (কর্মরত)

গ্রন্থপঞ্জি ও উৎস

১. আমার জীবন-আবদুর রহমান খান, খান বাহাদুর
২. আমাদের শিক্ষা -ঘোষ, ক্ষেত্রপাল দাস
৩. ষষ্ঠিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী- ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রকাশিত
৪. বিভিন্ন শিক্ষা বর্ষের কলেজ বার্ষিকী-ঐ
৫. বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের গবেষণা সন্দর্ভ-ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রী প্রণীত
৬. স্মরণীকা- ১৯৯৫, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ঢাকা
৭. কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা ও তাঁদের লেখা প্রবন্ধাদি

২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

২০০৩ এর ডিসেম্বর সুবর্ণ জয়ন্তীর ৫০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে ভি.সি. প্রফেসার ফাইসুল ইসলাম ফারুকীর প্রদত্ত স্বাগত ভাষণের আলোকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ

স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে মহিমান্বিত করার জন্য সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে যে সকল মত ও পথ সবচেয়ে বেশি সমাদৃত হয়েছে, জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণ তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। বিশ্ববিদ্যালয় হলো বিশ্বের সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গন। পাঠদান ও গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন এবং সমাজের কল্যাণে সেই জ্ঞানের ব্যবহারই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই সম্ভাবনা আর প্রত্যাশা সামনে রেখে ৫০ বছর পূর্বে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাদপীঠ এবং সুফী আওলিয়া হযরত শাহ মখদুম (রহঃ)-এর পূর্ণ স্মৃতি বিজড়িত স্থান রাজশাহীর বরেন্দ্রভূমিতে, ১৯৫৩ সালের ৬ জুলাই স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ-এর উপর ভিত্তি করে রাজশাহীর কৃতিবিদ আইনজীবি ও জননেতা জনাব মাদার বখ্শ ও ইংরেজি সাহিত্যের সুপন্ডিত রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ইফরাত হুসেন জুবেরীসহ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রারম্ভে ৭টি একাডেমিক বিভাগে ১৬১ জন শিক্ষার্থী নিয়ে

www.pathagar.com

এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪টি বিভাগ ও ৫টি গবেষণা ইন্সটিটিউটে প্রায় ২৪ হাজার শিক্ষার্থী এবং ৯০০ শিক্ষক আছেন। রয়েছে ৮টি অনুষদ ১৫টি ছাত্রাবাস; তন্মধ্যে ১১টি ছাত্রদের ও ৪টি ছাত্রীদের জন্য। সুবর্ণ-জয়ন্তীর অনুষ্ঠানের দিন আরো ১টি ছাত্রী হলের ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিগাঁথা ধরে রাখার জন্য নির্মিত হয়েছে সুদৃশ্য সুবর্ণ জয়ন্তী টাওয়ার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঐদিনই উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করেন।

উত্তরাঞ্চলের সর্ববৃহৎ এবং দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অগণিত শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলছে। বিগত ৫০ বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিপুল সংখ্যক স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। আন্তর্জাতিক বিশ্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্র ঈর্ষনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও রয়েছে ঈর্ষনীয় সাফল্যের স্বাক্ষর।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা সর্বদাই সোচ্চার অ-ন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ১৯৬২ সালে বিতর্কিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে এবং ১৯৯০ সালের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর হাত থেকে ছাত্রদের রক্ষা করতে গিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসাবে সর্বপ্রথম প্রাণ উৎসর্গ করেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রক্টর ডঃ শামসুজ্জোহা।

বাংলাদেশের ইতিহাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম-যেখানে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন হয়। দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তির সময়, ১৯৭১ সালে দেশে চলছিল মুক্তিযুদ্ধ। সেই কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে পারেনি।

১১ বছর আগে, ১৯৯২ সালে গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান হিসাবে বেগম জিয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাবাস বাংলাদেশ চত্বর'-এ একটি ছাত্রী হলের ভিত্তিফলক উন্মোচন করেছিলেন। অতীতের যে কোনসময়ের চেয়ে বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অধিকতর সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করছে। এ জন্য যে ছাত্র রাজনীতি এবং সেসনজট এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় নেই বলা চলে। এখানে শিক্ষা ও গবেষণার কাজ যথারীতি চলছে, ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারির মধ্যে সম্প্রীত ও সদ্ভাব বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

[সৌজন্য ঃ ২৮.১২.০৩ ইং তারিখের দৈনিক সংগ্রামঃ শিক্ষাঙ্গন পাতায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।]

যাহোক, এতদসত্ত্বেও বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব সমস্যা এখনো বিদ্যমান তা সংক্ষেপে এই ঃ

১। শহীদ হবিবুর রহমান হলের নির্মাণ ১৯৭৩ সালে কাদার গাঁথুনী দিয়ে প্রাথমিকভাবে শুরু হয়। বর্তমানে এই হলটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। আবাসিক সংকটের কারণে ছাত্ররা ভয়াবহ দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে হলটিতে বাস করছে।

২। শহীদ জিয়াউর রহমান হলের নির্মিতব্য ৩টি ব্লকের মধ্যে মাত্র ১টি ব্লকের কাজ বেশ কয়েক বছর আগে সমাপ্ত হয়। তারপর আর কোন অগ্রগতি হয়নি।

৩। লেখাপড়ার সুবিধার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শীতাতপ নিয়ন্ত্রণসহ পূর্ণ অটোমেশন এখনো হয়নি।

৪। পি-এইচ, ডি, এম, ফিলও বিদেশী ছাত্রদের আবাসন সমস্যা সমাধানে অন্ততপক্ষে ১০০ সিটের ডরমেটরি এবং

৫। মেডিক্যাল সেন্টারের জন্য ১টি এ্যাম্বুলেন্স অত্যাবশ্যকীয়।

দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বুদ্ধিজীবিদের প্রজ্ঞাময় ভূমিকা, শিক্ষক-ছাত্র সমাজের পারস্পরিক সোহার্দ্রের উন্নয়ন ঘটলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দেশ ও জনগনের অনন্য অমূল্য সম্পদ হোক – এই প্রত্যাশাই কাম্য।

৩. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্ব দিকে চট্টগ্রাম জিলার বাণিজ্য বন্দর থেকে স্বল্পদূরে শহরতলীর সৌম্য পর্বতঘেরা শান্ত স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক অক্ষত মনোরম পরিবেশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেসময়কার প্যাকিস্তানের স্বল্পকালীন মেয়াদের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর একক প্রচেষ্টা ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে চট্টগ্রামবাসীদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ বাসনা মূর্ত হয়ে উঠে।

মাত্র ৪টি ডিপার্টমেন্ট ও ২টি ফ্যাকাল্টি নিয়ে সূচিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বর্তমানে ৬টি ফ্যাকলটিতে বিবর্দ্ধিত হয়েছে। ২৮টি ডিপার্টমেন্ট, ৩টি ইনস্টিটিউট ও ২টি রিসার্চ সেন্টার নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রায় ১৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চ-শিক্ষা লাভের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। এর মধ্যে ৩৫% জনই ছাত্রী।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ৬টি ফ্যাকাল্টি

১. কলা ২. বিজ্ঞান ৩. সমাজ বিজ্ঞান ৪. বাণিজ্য ৫. আইন ৬. ঔষধ বিজ্ঞান।

সীমানা ঃ চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম অঞ্চলভুক্ত ১২৪৪.৭৩ একর জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা।

আবাসিক হল ঃ ৬টি ছাত্র হল, ২টি ছাত্রী হল এবং নতুন ১টি হল উদ্বোধনীর অপেক্ষায় (জুন ঃ ২০০৫ পর্যন্ত)।

একাডেমিক সেসন ঃ ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত।

ফেলোশীপ ও স্কলারশীপের সংখ্যা সর্বমোট = ১৫টি

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পেয়ে থাকেন মাসিক ২০০০/- (দুই হাজার টাকা)

মাসিক মেরীট স্কলারশীপের বরাদ্দকৃত টাকা ৫০০/- (পাঁচশত টাকা)

এক কালীন ১৫০০/- এক হাজার পাঁচশত টাকা)

মাসিক সরকারী স্কলারশীপের পরিমাণ ১০০০/- (এক হাজার টাকা)

মাসিক সাধারন স্কলারশীপের পরিমাণ ২৫০/- (দুই শত পঞ্চাশ টাকা)

মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্কলারশীপের পরিমাণ ৭৫/- (পঁচাত্তর টাকা)

লক্ষ্যণীয় ঃ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের প্রথম ও প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব বলয় থেকে পরিমুক্ত নয় বিধায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ প্রসূত ছাত্র-রাজনীতির ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে মুক্ত নয়। সেসন জট, আকস্মিক বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, ইত্যাদি এই বিশ্ববিদ্যালয়কেও ঘিরে রয়েছে।

৪. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

২০০৩ এর নভেম্বরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪ বছর পূর্তি করেছে এক দুই করে দীর্ঘ দু'যুগ অতিক্রান্ত করে। এই ব্যতিক্রমী বিশ্ববিদ্যালয়টি নিভৃত পল্লীর এক সময়ের ঘন অরণ্য আর বন-বাদারে ঘেরা কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ জেলার সীমান্ত সংলগ্ন শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরের নির্জনে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি স্বাধীনতা পরবর্তীকালের প্রথম সরকারি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উদ্যোগ ও ঘোষণার ধারাবাহিকতার প্রেক্ষাপটে সৌদি আরব ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ের এক নতুন ধারার যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে জন্ম নেয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বর বর্তমান স্থানে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর

www.pathagar.com

রহমান কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সরকারের এক আদেশবলে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল রাজধানী ঢাকার নগরীর অদূরে গাজীপুরের বোর্ড বাজারস্থ ক্যাম্পাসে। ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে মাত্র ২টি অনুষদের ৫টি বিভাগে ৩শ' জন ছাত্র নিয়ে (ছাত্রী ভর্তি শুরু হয় '৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে) এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯০ সালে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়টি গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়া শহরের কয়েকটি ভাড়া করা প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত অস্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৯২ সালের ১ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টি এর ১৩ বছরের যাযাবর জীবনের অবসান ঘটিয়ে চলে আসে এর পূর্বস্থান বর্তমান কুষ্টিয়া-যশোহর সীমান্ত **শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরের মূল** ক্যাম্পাসে।

বর্তমানে ৫টি অনুষদের অধীনে ১৯টি বিভাগে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এম. ফিল (মাষ্টার অব ফিলোসফি) ডিগ্রিতে প্রায় তিনশ এবং পিএইচডিতে দেড় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী গবেষণারত। অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পূর্ণতা দিয়েছে। ৫টি অত্যাধুনিক আবাসিক হল, অডিটোরিয়াম, জিমনেশিয়াম, লাইব্রেরিসহ অন্যান্য আকর্ষণীয় ভবনের সাথে দু'টি ভাস্কর্য ক্যাম্পাসে নবতর রূপের অঙ্গন সৃষ্টি করেছে।

এযাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এর ১০টি ব্যাচ শিক্ষাকার্যক্রম শেষ করেছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বৃত্তিও পেয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীরা। বিগত ২ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি অহরহ অনির্ধারিত বন্ধ, সন্ত্রাস আর ভয়াবহ সেশনজটের দুর্নাম ঘুচিয়ে সম্প্রতি সেশনমুক্ত হয়ে এর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের পথ অনেকটা সুগম করেছে।

দু'যুগের দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই-পথ অতিক্রান্ত করার পরও এখনো অনেক সমস্যা এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে প্রায়শই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যেমন ঃ সম্পূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও সম্প্রতি মাত্র ২০/২৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারি আবাসিক সুবিধা পাচ্ছেন। নোংরা শিক্ষক রাজনীতি, শিক্ষকদের ক্লাস ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা, যথাসময়ে কোর্স সম্পন্ন না হওয়া, ফল প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্ব, পরিবহন সংকট, বাজেট ঘাটতি, শিক্ষক নিয়োগে দলীয় চাপ, অবৈধ উপায়ে ভর্তি, প্রশাসনে দুর্নীতি, সিংহভাগ ছাত্র-ছাত্রীর লাইব্রেরির পরিবর্তে ফটোকপি নোটভিত্তিক লেখাপড়ার চর্চা, মানসম্পন্ন শিক্ষা কাঠামোর অভাব, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, চরমপন্থীদের উৎপাত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ ও শিক্ষাদানে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে রেখেছে। বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান।

www.pathagar.com

৫. শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

দেশের প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ১২০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। ইতিমধ্যে ৫টি ব্যাচ সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে গেছে। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সেশনজট ছিল না। এরপর থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতেও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নানা উপসর্গ প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন ঃ

৯৬ সালের ১১ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের এক ছাত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত যাত্রী নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজন বেবিট্যাক্সি চালকের সংঘর্ষ হয় এবং পরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে এলাকাবাসীর বিরোধ দেখা দেয়। এই উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় তখন প্রায় এক মাস বন্ধ থাকে। ৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্যাম্পাসের শহীদ মিনারে ফুল দেয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের রেশ চলে '৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এ সময় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের রেষারেষির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পাঠদান ব্যাহত হয়। উভয় সংগঠনের নেতা-কর্মীদের দীর্ঘ বিরোধের এক পর্যায়ে '৯৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাত্রদলকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করে। সে সময়েই ছাত্রলীগ তাদের ৫ দফা দাবি আদায়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট ডাকে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় আবার প্রায় তিন মাস বন্ধ থাকে।

এরপর '৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বন্যা দেখা দিলে পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলনে নামে। ফলে তাদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুমাস শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকে। '৯৯ সালে হঠাৎ সিলেটে উগ্রপন্থীরা নামকরণ বিরোধী আন্দোলনে নামে। এর ফলে ঐ বছরের নভেম্বর থেকে '২০০০ সালের মে পর্যন্ত ১৬৪ দিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়ে। ২০০০ সালের ৪ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আনন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষ ভাংচুর করে। এতে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সম্পর্কের পুনরায় অবনতি ঘটে, এবং এর জের ধরে কিছুদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষিত হয়। ২০০১ সালের ১৮ জানুয়ারিতে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেডিং পদ্ধতির জন্য নবতর আন্দোলন করে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় দুইসপ্তাহেরও বেশি সময় বন্ধ

www.pathagar.com

থাকে। একই বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই নামধারী কিছুকংখ্যক ছাত্রের অপতৎপরতায় ক্যাম্পাস অশান্ত হয়ে উঠে। তারা হল দখলের পাশাপাশি ব্যাপক চাঁদাবাজি শুরু করলে ক্যাম্পাস দীর্ঘদিন অশান্ত থাকে। ২০০২ সালের ১৭ মে — শহরের মদিনা মার্কেট এলাকা ও পরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশ-ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ১৭ মে রাতে সংঘটিত ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকে বেশ কিছুদিন।

এর রেশ ধরে ১৭ মের ঘটনায় জড়িত কতিপয় ছাত্রের শাস্তি দাবি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন, সভা-সমাবেশ-মিছিলও তারা করেন। কিন্তু তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করতে দেরি করায় শিক্ষকরা এর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করেন। ২০০৩ সালের ৬ মার্চ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র শিক্ষক সংকট নিরসনে নতুন শিক্ষক নিয়োগ না দেয়া, দীর্ঘদিন শিক্ষকদের পদোন্নতি না হওয়া, উপাচার্যের পদত্যাগ ইত্যাদি দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামেন এবং এসব দাবি মেনে নেয়ার জন্য সময়সূচী বেঁধে দেন ৯ মার্চ। বেঁধে দেয়া সময়সূচির মধ্যে দাবিসমূহ আদায় না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি কর্মবিরতির কর্মসূচি পালন করেন। দুর্ভাগ্য, এর ফলে এক মাসের অধিককাল শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

ইত্যাদি কারণে ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বর্ষের সকল সেমিস্টারের চূড়ান্ত পরীক্ষা নেয়া হয়। এরপর আবার ক্লাস শুরু হলেও কার্যত দেখা যায় সকল বিভাগের সকল সেমিস্টারে পূর্ণাঙ্গ ক্লাস হচ্ছে না শিক্ষক সংকটের কারণে। শিক্ষকরা বাড়তি ক্লাস নিতে অনীহা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম খুবই ধীর গতিতে এগুচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনও শোনা যায় সেমিস্টারের একাডেমিক ক্যালন্ডার অনুযায়ী তখনও ক্লাশ শুরু হয়নি বিধায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের সকল ছাত্রছাত্রীর দাবির প্রেক্ষিতে উপাচার্য চলতি সেমিস্টারের চূড়ান্ত পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করতে বাধ্য হন। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বর্ষ অর্থাৎ ২০০৪ সাল শুরু হয় এভাবেই। এই হচ্ছে সংগ্রামী শাহ সুফী দরবেশের নামকরণে প্রতিষ্ঠিত শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈরাজ্য বিধৃত প্রশাসন ও পড়ালেখার বর্তমান চিত্র।

www.pathagar.com

৬. ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আই, ইউ, টি) ঃ

এটি ৫৭টি মুসলিম দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার একটি অংগ সংগঠন। এর ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেছিলেন মহামান্য প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান ১৯৮১ এর ২৭ মার্চ ICTVTR নামকরণে। এরপর আই, টি টি : (ITT) অবশেষে আই, ইউ, টি (IUT) নামকরণে ২০০৩ সালের ২০ নভেম্বরে আত্মপ্রকাশ করে। পবিত্র মক্কা ঘোষণা অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ইসলামিক সংহতি ও যৌথ ইসলামিক পদক্ষেপ" Islamic University and Joint Islamic Action" –শীর্ষক নামকরণে অভিব্যক্তি ঘটেছে।

বৈশিষ্ট্য ঃ মূলত এটি শিক্ষা ও গবেষণা মূলক প্রাতষ্ঠান যা ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে স্নাতক-পূর্ব ও স্নাতক-উত্তর কর্মসূচি চালু করেছে। এছাড়া ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত ও বিশেষ কোর্সের বিষয়াদিও কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সদস্য রাষ্ট্র সমূহের সাথে প্রযুক্তি, শিল্প, গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও "technical know how" বিনিময় করে থাকে। জাতিসংঘ এবং ও, আই, সি'র যুগ্ম সহযোগিতায় ইসলামিক দেশসমূহ ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় এর সমন্বয় সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা রয়েছে। উপরন্ত এটি সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদানের দায়িত্বও পালন করে থাকে।

উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ঃ এই বিশ্ববিদ্যালয় মূলত শিক্ষা ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত বলে নিম্ন কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে ঃ

- ❒ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনার পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান করা।
- ❒ গাইড-গবেষণার উন্নয়ন ও পরিচালনায় নির্দেশ দেয়া
- ❒ পরীক্ষা গ্রহণ, সনদ অনুমোদন ও প্রদান— ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও এ ধরণের অন্যান্য একাডেমিক সনদ প্রদান করা
- ❒ অন্যান্য রকমের ডিগ্রি বা সনদ বিশেষ কৃতিত্বের জন্য প্রদান
- ❒ প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, বিনিময় ও এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি বিতরণ ইত্যাদি সহ সংক্ষিপ্ত ও বিশেষ কোর্স প্রদান, কর্মশিবির ও প্রকাশনার পদক্ষেপ নেয়া
- ❒ অন্যান্য ইসলামিক দেশসমূহের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করা

www.pathagar.com

- গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্স, সেমিনার, ইত্যাদিতে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ ও প্রবন্ধাদি প্রণয়ন করে অংশ গ্রহণ করা
- আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থার অন্যান্য অঙ্গসংগঠনসহ সেক্রেটারিয়েটকে সহযোগিতা প্রদান করা
- প্রয়োজনবোধে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কর্মকাণ্ডে সথাসময়ে অংশ গ্রহণ করা।

প্রশাসনিক কাঠামো ঃ জয়েন্ট জেনারেল এসেম্বলি, গভার্নিং বডি এবং ভাইস চ্যান্সেলরকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো গঠিত। এর অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় ICFM (Islamic Conference of Foreign Ministers) বা ইসলামিক সম্মেলনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের অনুমোদন এবং ও. আই. সি. এর বিধি-বিধান অনুযায়ী। ভাইস চ্যান্সেলার হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার প্রধান।

একাডেমিক প্রোগ্রাম

১. কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি CIT

১. বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল EEE

১. ইন্সট্রাক্টর প্রশিক্ষণ ও সাধারণ বিষয়াদি ITS

১. মেকানিক্যাল এবং রাসায়নিক প্রকৌশল MCE

শিক্ষার মাধ্যম

- দাপ্তরিক ভাষা ঃ আরবি, ইংরেজি এবং ফ্রেঞ্চ
- বর্তমানে শিক্ষাদানের মাধ্যম ও পরীক্ষার মাধ্যম ঃ ইংরেজি

বিশেষ লক্ষ্যনীয় ঃ আরবি ও ফ্রেঞ্চ ভাষা-ভাষীদেরকে ইংরেজি শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। ছাত্রদেরকে উক্ত ৩টি ভাষার যে কোন একটি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা করা অপরিহার্য। এছাড়া অ-আরবভাষীদের জন্য দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা করাটাও একটি শর্ত করা হয়েছে।

অবস্থান ঃ রাজধানী ঢাকা নগরীর ৩০ কিলোমিটার উত্তরে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কের পশ্চিম পাশে গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজারের সন্নিকটে ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশাল সবুজ চত্বর জুড়ে এটি বিকাশমান। ২০টি সুরম্য ভবনের সমাহার-মসজিদ, অডিটোরিয়াম, প্রশাসনিক ভবন, পাঠাগার ও ক্যাফেটারিয়া, ছাত্রাবাস, ভি,সি,'র বাংলো, ছায়াবীথি ঘন পার্ক, ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ, ইত্যাদি সাজে সুসজ্জিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর ও আঙিনা।

www.pathagar.com

কোর্স-ডিউরেশন ঃ ডিসেম্বর ১৫ থেকে শিক্ষা বর্ষ শুরু হয়। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা বর্ষ ৪ বছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। প্রয়োজনানুযায়ী সংক্ষিপ্ত কোর্স ১/২ সপ্তাহ পর্যন্ত বিস্তৃত।

❑ ইসলামের অনুপ্রেরণা ও মূল্যবোধে শিক্ষার্থীদেরকে উজ্জীবিত করে তাদের মনমানসিকতা ও আচরণ গঠনে সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুশিক্ষিত করার লক্ষ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যয়ী। ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, গবেষণা ও আবিষ্কারে পিছিয়ে পড়া মিল্লাতে ইব্রাহীমের পুনঃজাগরণে এ ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকতা সম্প্রতি গোটা মুসলিম বিশ্বে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

ইসলামিক একাডেমি বাংলাদেশ

১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে এই একাডেমী স্থাপিত হয়।৭৮ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা ৫-এ। ইহা একটি অরাজনৈতিক গবেষণাভিত্তিক Charitable প্রতিষ্ঠান।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শভিত্তিক বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়কে ইসলামী আদর্শ ও প্রত্যয়ে রূপায়িতকরণ;
২. স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম উক্ত আলোকে পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন।
৩. এ উদ্দেশ্যে পাঠ্য-পুস্তক প্রবর্তন ও
৪. একাডেমির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

অন্য কথায় গোটা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা জগতে প্রচেষ্টা চালানোই হচ্ছে এই একাডেমির মূল ও সামগ্রিক লক্ষ্য।

আর্থিক সুযোগ-সবিধা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য ইসলামিক একাডেমি কর্তৃপক্ষ বা পরিচালক বোর্ড একাডেমিটিকে "আশরাফ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের' অন্তর্ভুক্ত করেছেন বিগত ১৩ই মার্চ ১৯৮৪ সালে। শুরুতে একাডেমির পরিচালক, বোর্ডের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে সর্বজনাব আব্দুল হাদি তালুকদার এবং ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ।

পরিকল্পনা

বর্তমানে একাডেমি নিম্নোক্ত পরিকাল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

১. মাসিক সেমিনার ঃ বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যাবলী সমাধানের দিক নির্দেশনাসহ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের উপর আলোকপাতই হচ্ছে এই সেমিনারের মূল লক্ষ্যঃ

২. প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নঃ"ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ" এক্ষেত্রে যে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করেছে তা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে একাডেমি কাজ করে যাচ্ছে।

৩. পাঠ্য-পুস্তক রচনা ঃ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের জন্য পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নের কাজ একাডেমি ১৯৮৪ সন হতেই শুরু করেছে।

৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের দৃষ্টিতে শিক্ষাদানের জন্য নির্বাচিত শিক্ষকদিগকে বি.এড. প্রশিক্ষণ দানের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়েছে। ক্যামব্রিজের ইসলামিক একাডেমির নির্ধারিত বিষয়-সূচি অনুযায়ী এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সম্প্রতি এম. এড. ট্রেনিং এর কোর্স চালু করা হয়েছে।

৫. শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দান ঃ ধর্মে নিষ্ঠাবান ও মেধাবী ছাত্রদেরকে বৃত্তি দেয়া হয়। এই বৃত্তি আশরাফ চেরিট্যাবল ট্রাস্টের পরিকল্পনা ও নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচিত স্কুল কলেজের ছাত্রদেরকে দেয়া হয়।

৬. শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায় প্রশিক্ষণ ঃ শিক্ষকতায় যাঁরা নিয়োজিত আছেন, তাঁদেরকে একাডেমি 'আশরাফ চেরিট্যাবল ট্রাস্ট্রের সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী 'Inservice' ট্রেনিং দেয়া হয়।

ক্যাম্ব্রিজ ইসলামিক একাডেমির সাথে যোগসূত্র আছে বলে এই একাডেমি যুগপৎ পরিকল্পনা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী ও প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকাশমান। দারুল ইহ্সান ইউনিভার্সিটির সূতিকাগার এটি।

৭. বাংলাদেশ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা পাকিস্তান আমল হতেই চলে আসছে। এমনকি এরও বহু পূর্বে বাংলাদেশের মুসলমানদের শিক্ষা ইসলামীকরণের উদ্যেগ মোহামেডান এডুকেশন এডভাইজারি কমিটির (১৯১৪–১৫) কর্মসূচীতে পরিলক্ষিত হয়। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় এই কমিটি যে সম্মেলন করেন, সে সম্মেলনকেই প্রকৃত পক্ষে সরকারি পর্যায়ে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রারম্ভিক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এ কমিটি মুসলমানদের শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের নিকট ১৯৭টি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করে। এর মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলার

www.pathagar.com

মুসলমানদের জন্য দুটি বিশেষ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলিকাতায় কলেজ স্থাপন (১৯২৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর মাদ্রাসা এডুকেশন কমিটি বা মাওলা বক্স কমিটি (১৯৩৮–৪১) কর্তৃক ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক লার্নিং স্থাপনের প্রস্তাবটিকে কেন্দ্র করে তদানীন্তন যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব এ. কে ফজলুল হকের 'আরবি বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের অভিব্যক্তি, মুয়াজ্জম উদ্দীনের মাদ্রাসা সিলেবাস কমিটির (১৯৪৬–৪৭) মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ, ইস্ট-বেঙ্গল এডুকেশনাল সিস্টেম রিকন্সট্রাকশন কমিটির (১৯৪৯–৫১) সভাপতি জনাব মরহুম আকরাম খাঁ কর্তৃক পুনরায় ইউনির্ভাসিটি অব লার্নিং স্থাপনের গুরুত্ব আরোপ; এবং পরিশেষে ১৯৬৩-৬৪ সালে গঠিত ইসলামিক এরাবিক ইউনিভার্সিটি কমিশনের সুপারিশসমূহের অকার্যকারিতার পথ বেয়ে বাংলাদেশে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব মূর্ত হয়ে উঠে। অন্যকথায়, ১৯১৪ সাল হতে ইসলামিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য মুসলমানগণ সরকারিভাবে যে আন্দোলনের সূত্রপাত করে তা প্রায় ৬৩ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৯৭৬ সালের পহেলা ডিসেম্বর সরকারিভাবে স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভে সমর্থ হয়। মরহুম প্রেসিডেন্ট (প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক) জিয়াউর রহমান এ বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপনের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এক দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেন!

বাংলাদেশ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল বারী এ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োজিত হন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কমিটি বাংলাদেশ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ স্থির করেনঃ

১. বিজ্ঞান ও মানবিক বিষয়সমূহের সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধন;
২. ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিশিষ্ট স্নাতক বা গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীর মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধ ও সমাজ জীবনের-পরিবেশ রচনা;
৩. উচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার পথ প্রশস্তকরণের নিমিত্তে পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থাকরণ;
৪. মাদ্রাসা শিক্ষাসহ ইসলামী শিক্ষার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সম্প্রসারণ;

www.pathagar.com

৫. দ্বিমুখী সমান্তরাল শিক্ষা পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে মুসলিম সমাজে একক শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে ঐক্য স্থাপন;

৬. মুসলিম শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে তথাকথিত অনৈসলামিক ও ইসলামিক শিক্ষার বিরোধের অবসান;

৭. মুসলিম পণ্ডিত ও মনীষী সৃষ্টির মাধ্যমে গোটা পরিবেশে ইসলামী শিক্ষার পূণর্জাগরণ ও প্রতিষ্ঠা।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

নিম্ন বিষয়সমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স হিসেবে সন্নিবেশ করে এর শিক্ষাদানের কার্যক্রম শুরু হয়।

১. ধর্ম (Theology) ২. ইসলামিক স্টাডিজ, ৩. মানবিক বিষয়, ৪. সমাজ বিজ্ঞান, ৫. ফলিত বিজ্ঞান।

তাছাড়া ক. সম্মান খ. ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান, গ. পোস্ট ডক্টরেট রিসার্চ ও ট্রেনিং-এর সুবিধাদিও রয়েছে।

শিক্ষার মাধ্যমে

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ৩টি ভাষা থাকবে। সেগুলো হচ্ছে বাংলা, আরবি ও ইংরেজি। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে 'আরবি' ভাষার প্রবর্তন এটাই প্রথম।

ছাত্র সংখ্যা

আপাতত দু'হাজার ছাত্রের অধ্যয়নের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে ৩০০টি আসন থাকবে বিদেশী ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত। ছাত্র-ছাত্রীদের আসন বণ্টনের সংখ্যা হবেঃ ছাত্রদের আসন ১৩০০টি, ছাত্রীদের ৪০০টি, বিদেশী ছাত্রদের আসনে অনুরূপ কোন কোটা নেই।

বাংলাদেশ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় গোটা জাতির শিক্ষা জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায় সংযোজন করেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে একদিকে যেরূপ ইসলামী শিক্ষার বাস্তব স্বীকৃতি ও কার্যক্রম শুরুর পদক্ষেপ রচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে এরই মাধ্যমে গোটা বিশ্ব তথা ইসলামী বিশ্বে বাংলাদেশের আদর্শিক স্বাতন্ত্র ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে অনুপম ও পরমভাবে। এ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক শিক্ষার প্রকৃত পরিস্ফুটন ও পরিচর্যার এক অনুপম অবদান রেখে যাবে গোটা বিশ্বে—এ প্রত্যাশা শুধু বাংলাদেশের মুসলমানই নয়; বরং গোটা উম্মতে মোহাম্মদীও কায়মনোবাক্যে এর পুলক শিহরণ অনুভব করছে বৈকি!

www.pathagar.com

৮. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের শিক্ষাজগত নানা সমস্যার আবর্তে নিপতিত হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার নানাবিধ সংকটের তীব্রতা ও জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এরই জের হিসেবে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও উচ্চ শিক্ষার পরিবেশ নানাবিধ জটিলতায় চরম আকার ধারণ করে। বিশেষ করে কলেজের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা বৃদ্ধি, ও এতদসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন কলেজের অধিভুক্তি, ছাত্র-ভর্তি, রেজিষ্ট্রেশন, কোর্স নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার মান সংরক্ষণ, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনাও নিয়ন্ত্রণে সনাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হিমশিম খাচ্ছিল। এহেন পরিস্থিতির সুষ্ঠু মোকাবেলা ও সমাধানের নিমিত্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালের জাতীয় সংসদে পাশকৃত ৩৭ নং আদেশ বলে। ফলে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত প্রায় সব কলেজেরই ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যাস্ত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, উচ্চ শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে।

অবস্থান

ঢাকা মহনগরী তথা রাজধানী থেকে ৩০ কি. মি. দুরে গাজীপুরে এই বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত। প্রশাসনিক ভবন, ডরমিটারী ভবন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ভবনসহ বিশাল ক্যাম্পাস নিয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত। এর উত্তর পাশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণে ইসলামিক ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (২০০৩ ইং) আরো দুটি বিশালকায় ভবন নির্মাণের কাজ পুরোদমে চলছে।

প্রশাসন ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। তিনি ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও ট্রেজরার নিয়োগ করে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদাধিকার বলে ১. সিনেট ২. সিন্ডিকেট এবং ৩. একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

কোর্স বা পাঠক্রম

১. বি, এ, (পাস), বি, এস,এস, বি, কম (পাস), বি, এস, সি.

১. বি. এড.	২. এল. এল, বি.
৩. এল, এল. বি.	৪. এম. কম.
৫. এম. এ.	৬. এম. এস, এস
৭. এম. এস. সি	৯. পি. এইচ. ডি.

অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান

[জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৩ ইং সালে প্রকাশিত পরিচিতি অনুযায়ী-এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের চিত্র নিম্নরূপ ঃ]

সারাদেশের প্রায় ৯ শতাধিক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। এগুলো হচ্ছে ঃ

১. সাধারন কলেজ = ৮৪০টি
২. আইন কলেজ = ৪৭টি
৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ = ৪২টি
৪. ইনষ্টিটিউট = ৩টি
৫. চারুকলা কলেজ = ৩টি
৬. সংগীত কলেজ = ১টি
৭. সেনাবাহিনী ষ্টাফ কলেজ = ১টি
৮. গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ = ১টি

গোটা দেশের প্রায় ৮৫% শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে।

লক্ষ্যণীয় ঃ দেশের এই সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়টির বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড পরিচালন ও প্রশাসনে গোটা জাতি যে দক্ষতা, উপযোগিতা ও সাফল্য আশা করছিল, সেই অনুপাতে এর তেমন কৃতিত্ব প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি বললে অত্যল্পই বলা হবে। সৎচরিত্র ও যোগ্যতা বিবেচনায় দায়িত্ব পালনের বিবেককে দাফন দিয়ে দলীয় করণ, আত্মীয়করণের মাপ কাঠিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারী এমনকি নিম্ন কর্মচারীদেরকে নিয়োগ দেয়ায় গোটা বিশ্ববিদ্যালয়টি দুনীর্তির আখড়ায় পরিণত হয়েছে; প্রায়শই এর লজ্জাকর ও নিন্দিত প্রমাণ পাওয়া যায়। বিগত ২৮শে আগষ্ট, ২০০০ ইং সালের দৈনিক ইনকিলাবের ১১ পৃষ্ঠার পূর্ণ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি বিষয়ক যেসব তথ্য বিশদভাবে প্রকাশ করা হয়েছে প্রতিভাত মনে হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের উচ্চ শিক্ষা জগতে দুর্নীতিকে জাতীয় ভাবে সহনশীল করে তুলেছে। এছাড়া এমনি ধরণের দুর্নীতির আরো সংবাদাদি প্রায়শই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। যেমন ১৬/৯/০২ ইং তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকে "এর নাম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঃ হারিয়ে গেছে পরীক্ষার খাতা, প্রশ্ন পত্রে ভুল" শীর্ষক সংবাদটি। ইত্তেফাকের অপর একটি সংবাদ আরো দুঃখজনক। এই পত্রিকার ২৯/১০/০২ তারিখে প্রকাশিত " কিছু না লিখেই ৯৮ জনের ডিগ্রী লাভ" শীর্ষক ন্যাককার জনক সংবাদটি, নাট্যচর্যা তৃতীয় ক্লাস প্রাপ্ত অমুক কর্তৃক জনাব অমুককে ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে নিয়োগটি হচ্ছে এ ধরণের দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অযোগ্যতা ও অথর্বতার আর একটি চরম দৃষ্টান্ত।

www.pathagar.com

কলেবর বৃদ্ধি না করে সংক্ষেপে এই বলা যায় যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গুটি কয়েক সৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছেন বটে, তবে এরা হয়ত চাকুরী ভীতু, নয়ত নৈতিকতায় কাপুরুষ ও অযোগ্য। এদের বিপরীতে যারা দক্ষ অথচ দুর্নীতিপরায়ণ, তাদের কাছে জিম্মী হয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়। এর অবস্থাঃ "সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা?"

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে টি. টি. কলেজের মান উন্নয়ন কর্মশালা ও এর আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি ও চরিত্র

গোটা বাংলাদেশের টি. টি. কলেজসমূহের শিক্ষক-প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজগুলোর অধ্যক্ষবৃন্দের একদিনব্যাপী এক কর্মশালা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত ধরাবাধা প্রশাসন ও কর্মকাণ্ডে এ ধরনের কর্মশালার সংযোজন অবশ্যিই একটি কল্যাণকর নতুন পদক্ষেপ। এ ধরনের চিন্তামূলক ও সৃজনশীল কর্মসূচী চালু হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা সংশ্লিষ্ট সবার নিকট আরো সমাদৃত হচ্ছে, বিশেষ করে এই দৃষ্টিতে যে শুধু Theory নয়, বরং প্রত্যক্ষ Applied দিক নির্দেশনায় বিশ্ববিদ্যালয় এমনিভাবে শিক্ষা প্রপীড়িত বাংলাদেশকে কার্যকরী শিক্ষা নির্দেশনায় উত্তরোত্তর যথেষ্ট অবদান রাখার প্রয়াস পাচ্ছে। এই কর্মশালায় অন্যূন চল্লিশটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার Theme ছিল ঃ Developing the Quality of Initial Teacher Education বা প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন।

২০০৩-এর ২৪শে মার্চ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এই কর্মশালা পরিচালিত হয়। Resourceful person হিসাবে দশজন বিশেষজ্ঞ 'শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ' সংক্রান্ত ১০টি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। নিছক রেওয়াজ অনুযায়ী শুরুতে অর্থসহ পবিত্র কালাম-এ পাক হতে কিয়দংশ তেলাওয়াত শেষে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর এম আমিনুল ইসলাম স্বাগত ভাষণ দেন। এরপর চেয়ারপার্সন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রদ্ধাভাজন প্রফেসর ড. আব্দুল মমিন চৌধুরীর বক্তৃতা শেষে 'কর্মশালা'-এর আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়ে ৩টি সেশনে সমাপ্ত হয়। বিদেশী বিশেষজ্ঞ হিসাবে কর্মশালায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানে সবাইকে ধন্য করেন SESIP (Secondary Education Sector Improvement Project)-এর শিক্ষক-শিক্ষা পাঠক্রম পরামর্শ বিশেষজ্ঞ মি. রস তাসকার ও ড. জন উইলসন।

www.pathagar.com

সূচনা ও উপসংহারে চেয়ারপার্সন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল মমিন চৌধুরীর প্রজ্ঞাবিধৃত প্রাণবন্ত আলোচনায় কর্মশালার পরিবেশ নবতর উৎসাহ উদ্দীপনায় বিধৃত ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। খটথথকা ও অস্বস্তি যেটুকু অনুভূত ও অভিব্যক্ত হয়েছে তা হচ্ছে ঃ গোটা অনুষ্ঠানটি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পরিচালনা ও পরিবেশনায়। অচর্চা ও অনভ্যাসে বিদ্যা ও দক্ষতা হ্রাস পাওয়ার মত ইংরেজিতে বক্তৃতা দেয়ার সময় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই নিজের ভাব যথাযথ ও সাবলীলভাবে প্রকাশে তেমন 'পারগ' হননি। দ্বিতীয়ত, ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত যেসব Printed Materials দেয়া হয়েছিল সেসবের উপর চোখ বুলিয়ে যথাযথভাবে পূর্বাহ্ন প্রস্তুতির সময়টুকু ছিল অতি সামান্য। অধিকন্তু, বিদেশী অতিথিদের খাঁটি ইংরেজি উচ্চারণ ও অভিব্যক্তিও অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীদের নিকট অপরিচিত বা আনকোরা থাকায় 'ওয়ার্কশপ'টি আশানুরূপ উৎসাহব্যঞ্জক হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাছাড়া ভিডিওকৃত গণিত শিক্ষা শিক্ষণ ক্লাসটিও আকর্ষণীয় হয়নি স্বাভাবিকত্বের কলাকুশলতার অভাবে।

শিক্ষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই কর্মশালা বা ওয়ার্কশপের বিশেষ কল্যাণকর দিকগুলো হচ্ছে ঃ

১. সরকারি ও প্রাইভেট টি. টি. কলেজের মধ্যে মর্যাদা ও মনমানসিকতায় সুহৃদ ঐক্য ও সহমর্মিতায় চমৎকার প্রভাব সৃষ্টির সহায়ক।

২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শুধু প্রশাসনিক কর্মকর্তাই নয়, বরং পেশাগত ক্ষেত্রে টি. টি. কলেজের উন্নয়নের পৃষ্ঠপোষকও;—এই দৃষ্টিভঙ্গী রচনার আন্তরিক প্রসার ঘটলে দুর্নীতিপরায়ণ 'আমলাতান্ত্রিক' প্রশাসনের ক্রমোচ্ছেদ ঘটবে। মানুষের মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি অপঘাতের জন্য শিক্ষা প্রশাসনসহ এ দেশের প্রশাসন যে যথেষ্ট দুর্গতি বয়ে আনছে জাতির জীবনে, এই বোধদয়েরও উন্মেষ ঘটবে চমৎকার ভাবে।

৩. Question and Discussion সেশনের মাধ্যমে পরিচালক ও পরিচালিত, অথবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও তদীয় অধীনস্থদের মাঝে প্রাণখোলা ভাব-বিনিময়ের যে ব্যবস্থা রয়েছে এতে মানসিক ও প্রশাসনিক অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা সংশ্লিষ্ট সবার অনেকটা বিদূরিত হবে এবং পাশাপশি নানাবিধ ভাবী স্বচ্ছ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথ সুগম হবে।

www.pathagar.com

৪. Privatisation of Education/ Educational Institution -এর ব্যবস্থাপনায় যেসব দোষক্রটি, দুর্নীতি ও প্রতারণা মাঝে মাঝে ধরা পড়ে, বা বিদ্যমান থাকে, এসবের সার্থক মোকাবিলায় এই ধরনের প্রোগাম বাস্তব ও প্রায়োগিক পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদানে বিস্ময়কর অবদান রাখতে পারে।

এতদ্‌সঙ্গে এটুকু স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা ও লজ্জাবোধ করা উচিত নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিতে কর্তৃপক্ষের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের 'আশীর্বাদ' ও রয়েছে নিপুণভাবে। এরা সৎ-ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের প্রতিষ্ঠানসমূহের জীবনীশক্তি ধ্বংস বা জরাগ্রস্ত রাখার অপ্রয়াস চালিয়ে যায়; যেমনটি আগাছা 'ফলবান বৃক্ষের' উন্মেষ ও বিকাশকে ব্যাহত করে। তাই আগাছার মতো দুর্নীতিপরায়ণদের সংশোধন করার নিমিত্তে **'জনসেবা ও নৈতিকতা'** বিষয়ক 'কর্মশালা'র আয়োজন করার পরিকল্পনাও নেয়া যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে 'ফাইল চালনা'র (Put up) সময় অঋজু নোট বা মন্তব্য প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পত্রালাপ ও যোগাযোগে চাতুর্য বা অস্পষ্টতা বা ওকালতি শব্দ পরিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে 'সূত্র'-এর রং ও প্রকৃতির পরিবর্তন, অহেতুক বিলম্বে পত্রালাপকরণ ইত্যাদি মারপ্যাঁচের অবসান ঘটিয়ে প্রশাসন ও পরিচালনায় স্বচ্ছতা, সততা ও ক্ষিপ্রতা আনয়নের চেষ্টাও চালাতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন হলে বরং আবশ্যিকভাবে Vigilance Team দিয়ে আকস্মিকভাবে ফাইলপত্র পরিদর্শন ও সংশিষ্ট কাজের পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। দুর্নীতি বিযুক্ত বা অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যেরূপ শাস্তি বা প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়; ঠিক তেমনি এই প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিপরায়ণ দফতরগুলোর তদন্ত হওয়া এবং প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ শুধু অত্যাবশ্যক নয়, বরং নৈতিক ও পেশাগত কর্তব্যও বটে। নইলে পঁচা ইঁদুর কূপে রেখে পানি পরিষ্কার করার মতো পঁচা পানি খেয়ে অসুস্থ থাকার মতোই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দশা অনড় থাকবে বৈকি।

সবশেষে এই কর্মশালাকে ভিত্তি করে উপসংহারে চেয়ারপারসন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী যে বক্তব্য রেখেছেন এর সার-সংক্ষেপও প্রণিধানযোগ্য।

শ্রদ্ধেয় উপাচার্য অত্যন্ত আবেগময় কণ্ঠে বলেনঃ

১. ১৯৯৮ ইং সাল হতে হঠাৎ করে অনেক টি. টি. কলেজ আত্মপ্রকাশ করায় 'Why'-এর জন্ম দিয়েছে। কেন এমনটি হলো 'ask yourself' নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, দেখবেন এই উত্তর শিক্ষান্নোয়ন ভিত্তিক নয়।

www.pathagar.com

২. আজকের 'কর্মশালায়' অনেক ভালো মন্দ কথা হয়েছে টি. টি. কলেজ সম্পর্কে। এসব ভুলে গিয়ে প্রকৃত অর্থে টি. টি. কলেজগুলোর উন্নয়নে তিনি সবাইকে নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানান।

৩. শিক্ষকগণ বিশেষ করে শিক্ষকদের শিক্ষকগণ হচ্ছে 'Vital factor in the whole national life'. এই অবস্থায় তাদের কথাবার্তায় শালীনতা, চালচলনে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নৈতিকতার অভিব্যক্তি,body language অবশ্যই refined হতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষকদেরকে morality and professional ethics সমুন্নত রাখার বিশেষ আহ্বান জানান।

৪. সবশেষে তিনি বলেন, গোটা বিশ্ব আমাদের চেয়ে সবদিক দিয়ে এগিয়ে, শিক্ষা ক্ষেত্রেও। এই অবস্থায় তাঁর আবেদনঃ Let teachers stand up with their education and morality and offer us a nation flourishing in matter and mind indeed.

উপাচার্য মহোদয়ের এই আহ্বানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ও প্রকৃতির একটি Prismatic চিত্র ফুটে উঠেছে, যা থেকে সহজেই আঁচ করা যায়, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালমন্দ দিকমসূহের পরিণাম ও পরিণতি। এ প্রসঙ্গে এই সত্যটুকুর প্রমাণও পাওয়া যাবে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি একটি 'open secret' এবং এর বিশদ প্রতিবেদন দৈনিক ইনকিলাবের ২৮শে আগস্ট, ২০০০, সংখ্যার "দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও দুর্নীতির আখড়া ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" শীর্ষক ক্রোড়পত্র প্রতিবেদটিতে। বিবিধ ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দু-প্রকৃতির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর আধিপত্য বেশি: ১. দক্ষ অথচ দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও এদের অনুচর ২. সৎ অথচ অথর্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ; এই ধরণের মন্তব্য সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগীদের।

৯. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

রাজধানী ঢাকার উত্তরে ৩২ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত ৩৫ একর জমির উপর সুন্দর সবুজ মনোরম প্রকৃতির অঙ্গনে সুবৃহৎ আধুনিক ভবনের সমাহার এই বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্যের বাসভবন, সেক্রেটারিয়েট ভবন; স্কুল ভবন, লাইব্রেরি ভবন, ইত্যাদি। দুরশিক্ষণ কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রথম ১৯৫৬ সালে ২০০ রেডিও সেট বিতরণের মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৬২ সালে অডিও ভিজ্যুয়েল সেন্টার স্থাপন ও পরে স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে ১৯৭৮ সালে স্কুল ব্রডকাস্টিং পাইলট প্রজেক্ট, এরপরে ১৯৮৩ সালে জাতীয় শিক্ষা ও প্রযুক্তি সম্প্রচার

www.pathagar.com

ইনষ্টিটিউট (National Institute of Education Media and Technology: NIEMT), এবং সবশেষে তদস্থলে BIDE (Bagladesh Institute of Distance Education) বা বাংলাদেশ দুর শিক্ষা সম্প্রচার ইনষ্টিটিউট স্থাপন করে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, Bangladesh Open University [BOU] গাজীপুরে মূর্তিত হয়। ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদে Bangladesh Open University Act পাস হওয়ার পর এই বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোতভাবে বাস্তবতা লাভ করে।

উদ্দেশ্য ঃ Drop-outs বা খসে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের ইচ্ছা ও আগ্রহ অনুযায়ী প্রকার ভেদ সর্বাবিধ জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে গোটা দেশে শিক্ষার বিস্তার ও বেকার সমস্যা সমাধানে কর্ম নিয়োগের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ-ই হচ্ছে এর প্রধান লক্ষ্য।

কোর্স

➤ মুক্ত স্কুলের মাধ্যমে এস, এস, সি, ও এইচ, এস, সি, পাঠক্রম

➤ বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সমাজ বিজ্ঞান, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

মানবিক বিষয়াদি ও ভাষা প্রশিক্ষণ-এর উপর স্কুল চালু করা হয়েছে। ফলে শ্রমিক, মজুর, গৃহিনী প্রমুখ এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সুযোগ মতো লেখাপড়ার সুবিধা পেয়ে শিক্ষিত ও স্বনির্ভর জীবন যাপনে আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাবলম্বী হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে প্রয়াসী হচ্ছে।

একমাত্র প্রাপ্ত ২০০১ সালের প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয়ের "পরিচিতি"-তে দেখা যায় ২,৪৯,৬০৬ জন শিক্ষার্থী শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য নাম রেজিস্ট্রারিভুক্ত করেছে। ১৮টি 'ফরমাল' ও ১৯টি "নন ফরমাল" কর্মসূচির মাধ্যমে উক্ত শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন বিষয়ের উপর সার্টিফিকেট বা সনদ প্রদান করে ঃ

১. সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন

২. বি.এড.,এম.এড. ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসন প্রমুখ প্রফেশনাল-দেরকে ম্যানেজমেন্ট ও এম. বি. এ. তে ডিপ্লোমা

৩. আরবি, ইংরেজি ভাষার শিক্ষাও

৪. কৃষি, বিজ্ঞান, হাঁস মুরগি, খামার, পুষ্টি ইত্যাদির উপর সার্টিফিকেট প্রদান করে।

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীদেরকে পড়াশুনায় সাহায্য দান

১. ছাপানো বই পত্র ও কোর্সের সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়
২. নির্দিষ্ট সময়ে রেডিও টেলিভিশনে পাঠদান
৩. ১২টি অঞ্চলের ৮০টি স্থানীয় এবং ৪০টি টিউটরিয়্যাল কেন্দ্রে ক্লাস গ্রহণ
৪. অডিও ভিজ্যুয়েল প্রোগ্রামের মাধ্যমে অঞ্চল ভিত্তিতে পাঠদান
৫. বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া সেন্টার এর সাহায্যে Internet- এর ব্যবহার,
৬. পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা
৭. ওয়ার্কশপ
৮. ময়দান বা বাস্তব কর্মানুশীলন, ইত্যাদি।

প্রশাসন কাঠামো

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্র প্রধান হচ্ছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, যিনি ঃ
২. উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেন।

উপাচার্য প্রশাসন প্রধান। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ১২টি স্ট্যাটিউটারি কমিটি রয়েছে। একাডেমির পরিষদ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদনের ক্ষমতা এই পরিষদের উপর ন্যস্ত।

১০. বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমাচার ঃ

সম্প্রতি দৈনিক ইত্তেফাকের (আশ্বিন ১৪, ১৪১০ বাং) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রতিবেদনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি সরেজমিন চিত্র তুলে ধরা হয়। তাতে বলা হয়, স্যাঁত-স্যাঁতে অস্বাস্থ্যকর অপরিসর ভবন, সরুগলিতে ভাড়া বাড়ির স্বল্প পরিসরেও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড ঝুলান হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন গ্রহণের ক্ষেত্রেও এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন নীতিমালা নেই, যে যেমনভাবে পারে বেতন গ্রহণ করছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী প্রতিষ্ঠানে উপর তলায় 'ফ্যামিলি কোয়ার্টার', নীচতলায় প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন, এমনকি ক্লাসও গ্রহণ করা হচ্ছে। সর্বাধিক উদ্বেগজনক বিষয় হলো, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.pathagar.com

ক্লাস না করেও সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিস্থিতি পর্যালোচনার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে গঠিত একটি তদন্ত কমিশন বর্তমানে কাজ করছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাসের পর বর্তমানে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১। তন্মধ্যে ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪টি হলেও কেবল গত দুবছরে ৩০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হয়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, ঢাকার একই এলাকায় ২টি কখনো বা ৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি দৃষ্টিগোচর হয়। যুগের চাহিদা মিটাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হলেও তাদের অধিকাংশেরই নিজস্ব শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা শিক্ষকগণ উচ্চ বেতনে এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোর্স সমাপ্ত করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের ব্যাখ্যায়, 'প্রয়োজনের তাগিদে দেশে ব্যবসায়ী মানসিকতার নয় বরং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব ঘটলেও নিয়মনীতি উপেক্ষা করে ব্যাঙের ছাতার মত যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছড়িয়ে উঠবে, ইহা মেনে নেয়া যায় না।' যদি তাই হয়; তাহলে এমন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে যাচাই-বাছাই না করে অনুমোদন দেয়া হয় কি প্রকারে?

যুগের চাহিদা মিটাতে আমাদের শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হওয়া অত্যাবশ্যক। আর সেই কারণেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যবসায়ী মানসিকতার নয় বরং সত্যিকার অর্থেই উচ্চ শিক্ষার মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠুক ইহাই সকলের প্রত্যাশা। কিন্তু এই আকাঙ্খার সাথে বাস্তব অবস্থার দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশের অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের শিক্ষাদানের কোন সুযোগ গড়ে উঠেনি। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো যথোপযুক্ত নহে। দেশে আন্তর্জাতিকমানের বিশ্ববিদ্যালয় একান্ত অপরিহার্য। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিকমানের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে তোলা যেতে পারে।

লক্ষণীয়, ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১০-১২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম উন্নতমানের। এর মধ্যে মাত্র ২-৩ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌছেছে বটে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্পন্ন না হওয়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সুনাম রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আর না বাড়িয়ে উহাদের উন্নয়ন কিভাবে করা সম্ভব তা ভেবে দেখা জাতীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকার অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট অবকাঠামো ছাড়াও সকল শিক্ষায়তনে মঞ্জুরি কমিশন নির্ধারিত একটি সুষম নিবিড় শিক্ষা কার্যক্রম থাকা প্রয়োজন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতনক্রম এবং শিক্ষার্থীদের নিকট হতে গৃহীত বেতনের হার বাস্তব সম্মতভাবে নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। উল্লেখ্য, পূর্ণকালীন শিক্ষক, লাইব্রেরি, গবেষণাগার, স্থায়ী মূল ক্যাম্পাস ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত হতে পারে না। সম্প্রতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম খতিয়ে দেখার জন্য যে ৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে, আশা করা যায় উক্ত কমিটি বাস্তবতার নিরিখে তাদের সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন এবং তা' বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়ক হবে। (সম্পাদকীয় ঃ আশ্বিন ১৮, ১৪১০ এর আলোকে পরিবেশিত।)

উল্লেখ্য, সংসদে ১৯৯২ সালে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। ফলে ঃ
'৯২-৯৬ সাল পর্যন্ত অনুমোদন প্রাপ্ত ১৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিএনপি আমলে,

'৯৬ -০১ সাল পর্যন্ত অনুমোদন প্রাপ্ত ০৩ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আওয়ামী লীগ আমলে,

'৯৬ সালে সাল পর্যন্ত অনুমোদন প্রাপ্ত ০২ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে

২০০১ সাল পর্যন্ত অনুমোদন প্রাপ্ত ০২ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এবং

২০০১-২০০৩ সাল পর্যন্ত অনুমোদন ,, ৩০ টি বর্তমান বি. এন. পি সরকারের আমলে (২০০৪ সালে)

এভাবে সর্বমোট ,, ৫১টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

[সূত্র ঃ শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুকের সংসদে প্রদত্ত বক্তব্য ১৬-০৯-০৩ ইং তারিখ।]

www.pathagar.com

লক্ষণীয় ঃ প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষার জাতীয় কোন শিক্ষানীতি আজ পর্যন্ত মূর্ত হয়ে উঠেনি। এর কারণঃ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ৩২ বছরে বাংলাদেশে মোট ৬ বার শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। এগুলোর একটিও ছাত্র আন্দোলন এবং রাজনীতির পট পরিবর্তনে তোড়ে কার্যকরী হয়নি। এই ৬টি শিক্ষানীতির "সামারী" চিত্র হচ্ছে এইঃ

ক্রমিক নং	ইং সাল	শিক্ষানীতি/ কমিশনের নাম	ব্যর্থ/ অকার্যকরী হওয়ার কারণ
১.	১৯৭২	ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন	শেখ মুজিব হত্যার ঘটনা
২.	১৯৭৭	শিক্ষা মন্ত্রী কাজী জাফরের নেতৃত্বে ১টি পৃথক শিক্ষা কমিশন	কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা
৩.	১৯৮৩	মজিদখান শিক্ষানীতি	ছাত্র আন্দোলনের তোড়ে ব্যর্থ হওয়া
৪.	১৯৮৮	মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন	অকার্যকর ভূমিকার জন্য ব্যর্থ হওয়া
৫.	১৯৯৭-জানু	অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন	রাজনৈতিক পট পরিবর্তনঃ আওয়ামী লীগের পর জোট সরকারের আগমন
৬.	২০০১	ড. বারির নেতৃত্বে শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন,	ড. বারির মৃত্যুতে বর্তমানে শ্রদ্ধেয় জনাব অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত আছে।

☆ ফলে ভাগ্য বিমুখ বাংলাদেশের শিক্ষা চলছে শিক্ষানীতি বিহীন অবস্থায়। আর এর সুযোগ নিয়ে বিদেশী শক্তিগুলো নিজেদের ও দেশীয় দেশদ্রোহীদের যোগসাজসে এদেশের শিক্ষা জগতে দুর্নীতি, সশস্ত্র আন্দোলন, সহিংসতা, হত্যা, চরিত্রহীন কার্যকলাপ ইত্যাদি অনুপ্রবেশ

www.pathagar.com

করিয়ে এক চরম বিভীষিকা ও বিপর্যয়ের কুটিল ও জটিল পরিবেশ কায়েম করে রেখেছে। উল্লেখ্য, উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার মান ও শিক্ষার পরিবেশের অবনতি ঘটায় বিদেশী ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তির সংখ্যা প্রায় শতকরা ৭৫% ভাগ হ্রাস পেয়েছে বলে সুধিজনের অভিমত।

১১. এশিয়ার প্রথম "আন্তর্জাতিক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়" ঃ

সম্প্রতি বাংলাদেশে এশিয়ার সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ও আবাসিক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৩/২/০৪ তারিখে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের পাশে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এলাকায় এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থ সাহায্যে এবং প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর সর্বাধুনিক ক্যাম্পাস নির্মাণ করা হচ্ছে বায়েজিদ বোস্তামীর অদূরে উত্তর পাহাড়তলীর ১০৪ একর খাস জমিতে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন (এ.ইউ.ডব্লিউ) নামে অভিহিত এই উচ্চ বিদ্যাপীঠের আড়াই হাজার ছাত্রীর শতকরা ৮০ ভাগই আসবে বিভিন্ন দেশ থেকে। এই ভার্সিটিকে কেন্দ্র করে নতুন শহর এবং 'হাই-টেক ভিলেজ' গড়ে তোলা হচ্ছে। ক্লাস চালু হচ্ছে ২০০৬ সাল থেকে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সহায়ক কমিটির কো-চেয়ারপারসন। দাতা সংস্থা এডিবি এর লক্ষ্য, এই অঞ্চলে বিশেষত মেয়েদের মধ্য থেকে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠুক। এই লক্ষ্যেই এই সংস্থা মহিলা ভার্সিটি প্রতিষ্ঠায় বিরাট অঙ্কের অর্থ দিয়ে এগিয়ে আসছে। অপর দাতাসংস্থা বিশ্বব্যাংকের উদ্যোগে এশিয়ায় স্থাপিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজীর (এ আইটি) পরই চট্টগ্রামের নির্মিয়মান এই ভার্সিটির অবস্থান। এটিকে গড়ে তোলা হবে ব্যাংককের এআইটির আদলে। বিশ্বব্যাংক-এডিবি এর আগে এই মহাদেশে মহিলাদের জন্য আর কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেনি।

চট্টগ্রাম শহরের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ঘেরা, শ্যামলিমাপূর্ণ এলাকাটিকে ক্যাম্পাসের জন্য সর্বাধিক উপযোগী হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মহিলাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র হবে আন্তর্জাতিক। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় কিংবা আর্থ-সামাজিক পটভূমির ক্ষেত্রে কোন ভেদ-বৈষম্য প্রশ্রয় পাবে না। এখানে সুবিধা-বঞ্চিত প্রান্তিক মহিলাদেরকে গুরুত্ব দেয়া হবে বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিমুক্ত।

স্বাধীনভাবে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য 'এশিয়ান ভার্সিটি ফর উইমেন' শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকবেন ৩শ। আর শিক্ষার্থী ২৫শ। সিলেবাসে বিশেষ গুরুত্ব পাবে আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষা। পড়ানো হবে তথ্য প্রযুক্তি, পরিবেশ প্রকৌশল, টেকসই উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, জনসংশ্লিষ্ট নীতি (পাবলিক পলিসি), প্রভৃতি। এসব ক্ষেত্রে পেশাগত প্রশিক্ষণের ভিত্তি হিসাবে লিবারেল আর্টস বা উদার মানবিক বিষয়াদি এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হবে। এই প্রতিষ্ঠান চালু করা হবে ৫ বছর মেয়াদী বি.এ.-এম. এ. যৌথ প্রোগ্রাম।

তাছাড়া, যেসব সম্ভাবনাময় ও প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্রীদেরকে এখানে ভবিষ্যতে অধ্যয়নের জন্য অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, তাদেরকে ইংরেজি, গণিত ও কম্পিউটার বিষয়ে একবছর মেয়াদী এসএসসি পূর্ব শিক্ষা দেয়া হবে।

এশীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মতো শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারিও নেয়া হবে বিভিন্ন দেশের। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় প্রক্রিয়ায় এই নিয়োগ প্রদান করা হবে তিন বছরের অভিজ্ঞ 'বিশ্বমানের' শিক্ষাদানকারী ও প্রশাসক বাছাই করে।

এশীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারপ্লান বা মহাপরিকল্পনা তৈরির কাজ একাধিক পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। নির্মাণ কাজ চলতি ২০০৫ সালে শুরু হচ্ছে। প্লানের আওতায় শ্রেণী কক্ষ, ছাত্রী হল, শিক্ষকদের কোয়ার্টার সহায়ক সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি রয়েছে। মহাপরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে ইনডোর ও আউটডোর উভয় ধরনের ক্লাসরুম, পার্কিং প্লেস, প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্য ইত্যাদির সন্নিবেশ রয়েছে। ক্যাম্পাসের পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে রাস্তা তৈরি হবে শুধু কংক্রিট দিয়ে। ভার্সিটির জন্য একটি নিজস্ব ছোট হাসপাতালও থাকবে।

মূলত সরকারি খাস জমিতেই আন্তর্জাতিক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কিছু বেসরকারি জমিও অধিগ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) ভার্সিটিকে ঘিরে ১২০ ফুট চওড়া ও ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ অত্যাধুনিক সড়কের কাজ হাতে নিয়েছে। এতে ব্যয় হবে ৩৩ কোটি টাকার মতো। এখানে

www.pathagar.com

রেললাইনের ওপর ওভারব্রিজ থাকবে প্রায় এক কি.মি. জুড়ে। খরচ হবে অতিরিক্ত ৮ কোটি টাকা। ক্যাম্পাসের সাথে বাইরের দু'পাশ দিয়ে যাতে সংযোগ থাকে, সে জন্য বায়েজিদ বোস্তমী এলাকায় চা বোর্ডের সদর দফতরের গা ঘেঁষে সড়ক তৈরি হবে অনেক দূর পর্যন্ত। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সঙ্গে এই পথ সংযুক্ত হবে নগরী থেকে ১০ কি. মি. দূরে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ এলাকা।

ইউনিভার্সিটির কাঠামোগত ডিজাইনসহ সার্বিক কার্য্যক্রমে নিয়োজিত থাকবে মার্কিন নির্মাণ প্রতিষ্ঠান 'এলিজাবেথ'। এর প্রকৌশলীদের একটি নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ কনসালট্যান্টস লিঃ। এই প্রতিষ্ঠানই যমুনা সেতুর কনসাল্টিং ফার্ম।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম কমার্স এ্যন্ড ইন্ডাস্ট্রির বর্তমান সভাপতি আমীর হুমায়ুন মাহমুদ চৌধুরী 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন' প্রকল্পের স্থানীয় সমন্বয়কারী।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন সাপোর্ট ফাউন্ডেশনের দফতর নিউইয়র্কের ৯৫ ওয়ালস্ট্রীট (১১ তলায়) অবস্থিত। এটি বিভিন্ন তথ্যসমেত ওয়েব সাইট খুলেছে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছেন, এমন ব্যক্তি এই শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হবেন যিনি মেয়েদের শিক্ষাসহ সামাজিক সুবিচারের লক্ষ্যে 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অধিকারী,' যিনি সর্বাধিক সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখেন; বিশেষ করে বহুজাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্তত ১২ বছর কাজ করেছেন এবং স্বাধীনভাবে কাজ পরিচালনায় সক্ষম। এই সৌভাগ্যবান মহান ব্যক্তিটি কে তা জানা-শোনার জন্য উদগ্রীব ভাবে প্রতীক্ষায় রয়েছে দেশবাসী।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

৮ম অধ্যায়

বিবিধ সংযোজন

[পূর্বের অধ্যায়সমূহে যেসব তথ্য যথাসময়ে সন্নিবেশ করা সম্ভব হয়নি, সেসব তথ্যের সংগ্রহ সংকলন 'পরিশিষ্ট' হিসেবে এ অধ্যায়টিতে সংযোজিত হয়েছে- গ্রন্থকার]

মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি দেওবন্দ মাদ্রাসা

দারসুন বা 'পাঠ' শব্দ হতে মাদ্রাসা বা শিক্ষাগার শব্দটির উৎপত্তি। পূর্বে লেখাপড়ার জন্য মাদ্রাসা বা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল না। বহু শিক্ষক নিজের গৃহেই ছাত্রদেরকে লেখাপড়া শেখাতেন। সুন্নী মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিস্তারিত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম মাদ্রাসার উৎপত্তি বলে অনুমান করা হয়। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষদৃষ্টে মনে হয় আবু হাতিম আল বুসতী (জন্ম ৮৯০খৃ.) তাঁর আপন শহরে একটি 'বিদ্যালয়' বা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারসহ ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। অনুরূপ ধরনের শিক্ষায়তন আবূ আল-হুসায়নীয়ও প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন দশম খ্রিস্টাব্দে, হাদীস শরীফ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে।

সালজুক সুলতান আলপ আরসালান এবং মালিক শাহের প্রধানমন্ত্রী নিজাম আল-মূলকের মাদ্রাসা 'নিজামিয়া মাদ্রাসা' ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এই মাদ্রাসায় সর্বপ্রথম বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সুযোগ ও রীতি প্রচলিত হয়। এতে আবাসিক ব্যবস্থাও বিদ্যমান ছিল। অধুনা আমরা যেসব আবাসিক শিক্ষা-ব্যবস্থাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও বিকাশ দেখতে পাই, তা ঐতিহাসিক নিজামিয়া মাদ্রাসারই অনুসৃত পদ্ধতির একটি বিশেষ ফল। ষষ্ঠ শতকে ইবনে যুবায়রের বর্ণনানুযায়ী বাগদাদ নগরীতে ৩০টি মাদ্রাসা ছিল। খলীফা আল-মুনতাসিরও স্বীয় নামানুকরণে 'মুনতানসিয়া মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ মাদ্রাসায় ৭৫ জন ছাত্র পিছু একজন অধ্যাপক পবিত্র কুরআন, হাদীস শিক্ষা দিতেন। তাছাড়া শিক্ষক ও ছাত্রদের স্বাস্থ্য তদারক ও চিকিৎসা

www.pathagar.com

করার জন্য চিকিৎসকও নিয়োজিত থাকতেন। এ প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন একটি চিকিৎসালয়, একটি গ্রন্থাগার ও কতিপয় রন্ধনশালা ছিল। শোভা বর্ধনের জন্য মাদ্রাসাটির সম্মুখে একটি উদ্যানও রচনা করা হয়েছিল। এর প্রবেশদ্বারে ছিল একটি প্রকাণ্ড ঘড়ি।

দামিশক নগরীও শোভিত হয়েছিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায়। সুলতান নূর আলদীন ইবনে মাংগী ও সুলতান সালাহ আল-দীনের অকৃত্রিম বদন্যাতাই এসব মাদ্রাসার সৃষ্টি ও সমৃদ্ধির প্রধান উৎস। এই দুই সুলতানের আমলে রাজ্যের আমীর-উমরাহ ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ অকাতরে টাকা-পয়সা দান করে বহু মাদ্রাসা স্থাপনে সাহায্য করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁদের পদাঙ্কানুসরণে মাগরিব তথা পশ্চিমাঞ্চলে বহু মাদ্রাসা গড়ে ওঠে।

লক্ষণীয়, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় শুধু পুরুষই নয়, বরং বিদুষী মহিলাদেরকেও সাগ্রহে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। হালাকু খানের জননী বুখারাতে দুটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। অনুরূপভাবে তীমুরের পত্নীও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার জগতে অনন্যা বিদুষী হিসেবে চিরঅক্ষয় হয়ে রয়েছেন। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন তদানীন্তন মাদ্রাসার সমুদয় বিষয়কে দুভাগে বিভক্ত বলে উল্লেখ করেন। এ দুটি ভাগ হচ্ছে ঃ

১. উলুম আল-তাবীঈয়্যা বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান।

২. উলুম আল-নাক্‌লিয়্যা বা ঐশী জ্ঞান।

বর্তমান ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদগণ এ দুটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে Acquired knowledge বা লব্ধজ্ঞান এবং Perennial knowledge বা চিরন্তন জ্ঞান।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

মাদ্রাসায় শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. বক্তৃতা দান পদ্ধতি ;

২. তালকীন বা মুখস্থকরণ পদ্ধতি ঃ

৩. শ্রুতলিপি বা ইমল্যা;

৪. লিপিবদ্ধ করান;

৫. উত্তম ছাত্রদের সাহায্যে শিক্ষাদান।

পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে প্রথম হামদ বা আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের নামে দরূদ পড়ে পাঠদানে নিয়োজিত হতেন।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে দীনি ইলম শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে মসজিদ ও মাদ্রাসায় বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। মসজিদে নামায আদায় এবং 'জুম্মা' পড়া ছাড়াও হাদীস কুরআন- তাফসীর পড়ানোর রেওয়াজ ছিল। মাদ্রাসায় উক্ত বিষয় ছাড়াও মানতিক (তর্কশাস্ত্র), ফিক্‌হ (আইনশাস্ত্র), ফল্‌সফা বা দর্শন শিক্ষা দেয়া হতো।

খানকাহ্‌ ঃ খানকাহও ছিল অতীতে আবাসিক ব্যবস্থাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাগতিক অপেক্ষা ধর্মীয় ও আত্মিক উন্নয়নে শিক্ষার্থিগণ নিয়োজিত থাকতেন। মসজিদ সংলগ্ন বা মিনারের কোন প্রকোষ্ঠ অথবা আবাসিক ভবন বা গৃহের পৃথক কোন কক্ষ 'খানকাহ্‌' হিসেবে ব্যবহার করা হতো। খানকাহ্‌ অর্থ হচ্ছে চার দেয়ালে আবদ্ধ কক্ষ।

খানকায় অবস্থানরত শিক্ষার্থিরা কৃচ্ছ সাধনায় দেহের উপর আত্মা এবং বিবেকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় নিরত সচেষ্ট থাকেন। পাক কুরআন, হাদীস ও উসূলে হাদীসসহ বক্তৃতা দ্বারা পাঠ দান ও গ্রহণের রেওয়াজ রয়েছে। তাছাড়া যিকির -আজকারের প্রচলনও খানকায়ে বিদ্যমান। বর্তমানে যেসব খানকাহ্‌, মসজিদ, এতদসংলগ্ন এলাকায় দেখা যায়, তা অতীতের ঐতিহ্য বৈ নতুন কিছু নয়। ইবনে বতুতা ইরাক ও পারস্যের খানকাসমূহের উল্লেখ করেছেন তাঁর সফর কাহিনীতে। ৭০৬ সনে বারবারস -এর নাম উল্লেখিত রয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকায়ে প্রায় চারশত শিক্ষার্থী ছিল। খানকায়ে শিক্ষার্থিগণ সুফী হিসেবে আখ্যায়িত হন।

শিক্ষার বিষয়

১. আল- কুরআন ও হাদীস।
২. ফিক্‌হ ও কালামের বিষয়।
৩. নাহ্‌ ও বা আরবী বাক্যপ্রকরণ ভাগ।
৪. ভাষাতত্ত্ব ও গবেষণা।
৫. তাফসীর ও তাজদীদ।
৬. আল-মানতিক বা তর্কশাস্ত্র।
৭. আল-আরিছ্‌ ম্যাতীকী বা অঙ্ক।
৮. আল-হানদামা বা জ্যামিতি।
৯. আল হায়াআঃ বা জ্যোতির্বিদ্যা।
১০. ইলমে আল-তাবীঈয়্যাত বা বস্তুসমূহের গতি ও স্থিতিবিদ্যা।

www.pathagar.com

১১. আল-ত্বিব বা ভেষজ বিদ্যা।

১২. আল-ফালাহ্ বা কৃষিবিদ্যা।

১৩. ইলম্ আল-ইলাহিয়াত বা অধিবিদ্যা।

১৪. ফল্সফা বা দর্শন।

এ চৌদ্দটি বিষয়ের উল্লেখ ইসলামী বিশ্বকোষে (২য় খণ্ড) রয়েছে। একই মাদ্রাসায় এসব কটি বিষয় পাঠদান করা হত কিনা তার উল্লেখ নির্দিষ্টভাবে নেই। তবে এটা সত্য যে, মাদ্রাসা আধুনিক স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মত জ্ঞানচর্চায় পূর্ব থেকেই উন্নত ও বিভিন্নমুখী ছিল। অন্য কথায় বলা যায় যে, মাদ্রাসার এই ঐতিহ্য হতেই বর্তমান আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগসহ শিক্ষাদানের ধারণা লাভ করেছে। এতে সংশয় নেই।

মাদ্রাসার ছাত্রদের বৈশিষ্ট্য

শিক্ষকগণ সচরাচর সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত এবং আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত পাঠদানে নিয়োজিত থাকতেন; অর্থাৎ মাদ্রাসার শিক্ষা আধুনিক স্কুল কলেজের মত একবেলায় পাঠদানে সীমিত ছিল না। শিক্ষার্থীরা দূর-দূরান্ত হতে প্রখ্যাত শিক্ষকদের দরবারে এসে হাযির হতো এবং অনুমতি লাভের পর তাঁর সাহচর্যে থেকে ৪/৫ বছর, এমনকি আজীবন কাটিয়ে দিত জ্ঞানার্জনে। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক ছিল তখন পিতা-পুত্রের সমতুল্য। শিক্ষকের হস্ত চুম্বন করে ছাত্র তার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করত শিক্ষকের জ্ঞান ও চরিত্রের প্রতি। পর্দা বজায় রেখে মহিলারাও কোন কোন মাদ্রাসায় পড়ালেখা করতেন।

কোন কোন ছাত্র শিক্ষকের সাথে বসবাস করে ও তাঁর সেবা শুশ্রূষা করে পড়ালেখা করতেন। আবার এমনও দেখা যায় যে, বিশিষ্ট বিত্তশালী ব্যক্তিগণও বিদেশ- বিভূঁয়ের ছাত্রদিগকে নিজ গৃহে থাকা-খাওয়ার সুযোগ দিয়ে বিদ্যার্জনের পথ সুপ্রশস্ত করেছেন। কৃতি ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের নিকট হতে জ্ঞান ও সুচরিত্রের স্বীকৃতিস্বরূপ পাগড়ী পেতো। পরে সনদ বিতরণের রেওয়াজও প্রচলিত হয়।

আর একটি উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, শিক্ষার্থীগণ তাদের পছন্দমত বিষয় নির্বাচন করে সেই নির্বচিত বিষয়ের শিক্ষকদের নিকট গিয়ে অধ্যয়ন করত। এক শিক্ষকের নিকট একটি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পর অন্য বিষয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের শরণাপন্ন হতো। এ জন্য প্রয়োজনবোধে ছাত্ররা দেশ-বিদেশ সফর করতেও মোটেই ক্লেশ বা কুণ্ঠাবোধ করতো না।

www.pathagar.com

এই উদ্দেশ্যাবলি অর্জনা শিক্ষা প্রচার মিশনের বেশ কয়েকটি প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে জরাজীর্ণ ও অবহেলিত মক্তব-পাঠশালা-বিদ্যালয় উন্নয়ন ও ছিন্নমূল শিশু-কিশোরদের শিক্ষাদানের জন্য এককালীন দান, অনুদান, বস্তুগত দান ও ক্ষেত্র বিশেষে পরিচালনা ভার গ্রহণ।

'ইকরা"– পড়। পড়া বা "শিক্ষা" ফরয, বিপরীতে 'অশিক্ষা মহাপাপ'। অশিক্ষাই মুসলিম জাতির অধঃপতনের কারণ। এ অশিক্ষা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এই মিশন গোটা বাংলাদেশ ব্যাপী কার্যক্রম বিস্তৃত করার প্রয়াসী।

দারুল আমান ট্রাস্ট, পাবনা

দারুল আমান ট্রাস্ট পাবনা, ১৯৯১ সনে পাবনার কিছু নিবেদিত প্রাণ সমাজকর্মী প্রচেষ্টায় গঠিত হয়। আলহাজ্জ অছিরুদ্দিন সাহেব সাড়ে ছয় বিঘা জমি দান করেন এবং পরবর্তী কালে আরও জমির সংযোজনে বর্তমান সাড়ে পাঁচ একর জমির উপর এই ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত। পাবনার প্রবীনতম সমাজসেবী সাবেক ও বর্তমান এম, পি, এবং বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান এই ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান। একটি ট্রাস্টি বোর্ড ও একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে ইহা পরিচালিত।

বাস্তবায়িত প্রকল্পের পরিচিতি

১. জামে মসজিদ ঃ ৫৫ × ৩০ ফুট মাপের তিন তলা বুনিয়াদ বিশিষ্ট একতলা পাকা মসজিদ নির্মিত হয়েছে। নির্মাণ কাজে সাড়ে সাত লাখ টাকা খরচ হয়েছে। ইসলামী ওয়ার্ল্ড কমিটির আর্থিক সহায়তায় জামে মসজিদটি নির্মিত। বর্তমানে জনসাধারণের সাহায্যে আরও সাড়ে ৫ লাখ টাকা ব্যয়ে এর ২য় তলার নির্মাণ কাজ চলছে।

২. পাবনা ইসলামিয়া হেফজ খানা ঃ দুজন কোরআনে হাফেজ ও একজন ক্বারী দ্বারা এই হেফজখানায় পবিত্র কোরআনের হেফজ ও নাজেরা ক্লাস শুরু হয়েছে। মসজিদের দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পূর্ণ হলে হেফজখানা মসজিদের উপর তলায় স্থানান্তরিত করা হবে।

www.pathagar.com

৩. পাবনা ইসলামিয়া মাদ্রাসা ঃ একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসার মাধ্যমে এর প্রাথমিক কাজ শুরু হয় ১৯৯৩ সালে। বর্তমানে মাদ্রাসাটি দাখিল পর্যন্ত উন্নীত এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে মঞ্জুরী প্রাপ্ত। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রতিটি পরীক্ষায় শতকরা ১০০ ভাগ ছাত্র ছাত্রীই কৃতকার্য হচ্ছে। ফলাফলে কোন ছাত্র-ছাত্রীই এ পর্যন্ত তৃতীয় বিভাগে পাস করে নি। মাদ্রাসাটি 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ -৯৭ পাবনা কমিটি' কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে। কামিল (টাইটেল) আবাসিক মাদ্রাসা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আলীম ক্লাশ পর্যন্ত খোলার সিদ্ধান্ত সম্প্রতি নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কয়েকশত ছাত্র/ছাত্রী পড়াশুনা করছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিদের সাহায্যে ১৩০×২৮ ফুট, ১১০×৩০ ফুট, ও ১০০ ×৩২ ফুট ৪ তলার বুনিয়াদ বিশিষ্ট ৩টি বিল্ডিংয়ের ১ম তলার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইহার নির্মাণ খরচ ৪৫ লক্ষ টাকা।

৪. পাবনা ইসলামিয়া ইয়াতিমখানা ঃ ১৫০ জন ইয়াতিমকে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা দিয়ে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রথমে ৪০ জন ইয়াতিমকে এ প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বর্তমানে ৮০জন ইয়াতিম এই ইয়াতিমখানায় লালিত পালিত হচ্ছে। ইয়াতিমদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা বাবদ মাসে প্রায় ৮০ হাজার টাকা খরচ হয়। ইসলামিয়া হেফজখানাটি এই ইয়াতিম খানা প্রকল্পের মধ্যেই শামিল করা হয়েছে। কুয়েতস্থ ইসলামিক ওয়ার্ল্ড কমিটি (I.W.C) ইয়াতিমখানার জন্য ৯২×২৮ ফুট আয়তনের একটি ৪ তলা বুনিয়াদ বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন নির্মাণ করেছে। এতে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

৫. ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ঃ ইয়াতিম ও গরীব ছাত্রদের Basic Trade, যেমন টেইলারিং, কাঠের কাজ, মোটর মেকানিক, ওয়েল্ডিং, মোটর ড্রাইভিং, রেডিও, টিভি মেরামত, রেফ্রিজারেটর ও এসি মেরামত ইত্যাদি কাজ শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য ঃ দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা এবং বেকারত্বের অভিশাপ মোচন করা। এজন্য এ পর্যন্ত ৪ তলার বুনিয়াদ বিশিষ্ট ৫০ × ৩২ ফুট আয়তনের দ্বিতল বিল্ডিং নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। অদূর ভবিষ্যতে আরও ২ তলা ভবন নির্মাণ করে অন্যান্য কোর্স চালু করা হবে।

www.pathagar.com

শিক্ষকমণ্ডলী ঃ মাদ্রাসার শিক্ষকগণও বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা এক একজন ছিলেন এক এক বিষয়ের জ্ঞানের জাহাজ। নির্দিষ্ট কোন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করা ছাড়াও কোন কোন শিক্ষক দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে নিজের জ্ঞান ও চারিত্রিক মহিমা ছড়িয়ে দিতেন শিষ্যবর্গের মাঝে।

নিষ্ঠাবান শিক্ষকবৃন্দ অধিকাংশ সময়ই মসজিদে ইবাদত-বন্দেগীতে সময় কাটাতেন। ইস্পাত কঠিন চরিত্র ও জ্ঞানদীপ্ত কান্তির জন্য বিত্তশালী ও রাজশাসকবর্গ তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদাসহ নানা প্রকার উপঢৌকন প্রদান করতেন। কৃচ্ছ-সাধনায় নিরত শিক্ষক শিক্ষাদানের পর কায়িকশ্রম- যেমনঃ জুতা সেলাই, ইত্যাদি কাজে অর্থোপার্জন করে জীবিকা নির্বাহে অগৌরব বোধ করতেন না।

এশিয়ান 'আযহার' দেওবন্দ দারুল উলুম সম্পর্কে পূর্বে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কতিপয় বিষয় প্রাসংগিক আংগিকে অবতারণা করা হলো। এই মাদ্রাসাটি পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশের বৃহত্তম বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

তদানীন্তন ভারতের মুসলমানদের ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ক্রুসেডীয় আক্রমণ ও সভ্যতার প্রভাব এবং গোলামী হতে রক্ষা করার বলিষ্ঠ লক্ষ্যেই এ মাদ্রাসার জন্ম ও বিস্তৃতি।

এ মাদ্রাসার কৃতি ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে অন্যতম ছিলেন নিম্নোক্ত ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিপ্লবী শিক্ষাবিদ তথা যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতপ্রবর ঃ

১. শায়খ আল-হিন্দ মাহবুব আল-হাসান (১৯২০ খৃঃ)

২. শায়খ আল-ইসলাম হুসায়ন আহমদ্ মাদানী;

৩. হযরত আশরাফ আলী থানবী (১৮৬২- ১৯৪৩ খৃঃ)

৪. হযরত খলিল আহমদ সাহারানপুরী ;

৫. হযরত মুফতী কিফায়্যত উল্লাহ।

৬. হযরত ওবায়দ আল্লাহ্ সিন্দী।

৭. হযরত শাব্বীর আহমদ ওসমানী।

৮. হযরত মাওলানা আতহার আলী।

৯. হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী।

ধর্মবিমুখতার পাশ্চাত্য বলয় হতে মুসলমানদের ঈমান ও আকীদা সংরক্ষণে এসব ব্যক্তিত্বের কুরবানী অতুলনীয়।

www.pathagar.com

সুদুর আফ্রিকা মহাদেশের মিসর ও ইউরোপ মহাদেশের ফ্রান্স হতে শুরু করে গোটা ভারত উপমহাদেশের অসংখ্য শিক্ষার্থী এ মাদ্রাসায় প্রতিবছর অধ্যয়ন করতে আসেন। বিরাট মসজিদ, পৃথক পাঠাগার ও প্রশাসনিক ভবন এবং শ্রেণীকক্ষ ব্যতীত প্রায় দেড় হাজার ছাত্রের থাকা-খাওয়ার ব্যয়ভারও মাদ্রাসা নিজেই বহন করে থাকে।

দারুল উলুম নদওয়া

লক্ষ্ণৌতে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুম নদওয়াতুল উলেমাও অনুরূপ মুসলিম বিদ্যাপীঠ। প্রকৃত জ্ঞানই মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে। প্রকৃতজ্ঞানের মূল আধারই হচ্ছে ধর্মজ্ঞান। এহেন চিন্তা-দর্শন ও ভাবনাকে কেন্দ্র করেই এই মাদ্রাসার আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটেছে মহাকালের অংগনে। প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে ভ্রান্তি ও অপবিত্রতা সম্পর্কে জ্ঞান দানে সত্য ও পবিত্রতার অনুসারী করা। তাই "ধর্মীয় শিক্ষার সম্প্রসারণ, বিদাতের মূলোৎপাটন এবং বিদেশী (ফিরিঙ্গি) শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জিহাদ" করে দেশও জনগণকে পূত-পবিত্র পরিবেশে জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা। P. Hardy তাঁর "The Muslims of British India" গ্রন্থে এ সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করেন তা লক্ষণীয়। তিনি বলেন ঃ

"The course of study was rictly traditional Arabic, Prosody, Rhetoric, Logic, Kalam (Dogmatic theology) Fiqh, Tafsir, Tibb (medicine) and little philosophy." [Gambridge, Ed, 1972, p= 170]

ফলে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে ইসলাম সম্পর্কে অধিক জ্ঞান, প্রত্যয় ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতো। মাদ্রাসায় জ্ঞান চর্চাও এর প্রভাবে মুগ্ধ মিশরের আল্লামা রশিদ রেযার মন্তব্য হচ্ছে"--- এখানে আরবি সাহিত্যসহ ধর্মীয় শিক্ষা চর্চা পূর্ণভাবে বিদ্যমান।" [মাসিক আর-রশীদ, ফেব্রু. ১৯৭৬, পৃঃ ৪৮৮]

প্রাচীন মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তথা ইসলামী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিকোণ রক্ষা ও পরিচর্যার উদ্দেশ্যে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদানীন্তন ভারতে গড়ে উঠে। এটা অনস্বীকার্য যে এ ধরনের মাদ্রাসা, মকতব ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব ও প্রশিক্ষণের ফলেই ভারত চীরে কালক্রমে 'পাকিস্তান' জন্মের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠা ঘটে।

[দ্রষ্টব্য ঃ –শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস ঃ অরুণ ঘোষ]

www.pathagar.com

শিক্ষাদানে দেওবন্দ মাদ্রাসা ও আলীগড় কলেজের দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

এপ্রেক্ষিতে দেওবন্দ মাদ্রাসা ও আলীগড় কলেজের শিক্ষা-দৃষ্টিভংগীটুকু স্মরণীয়।

তদানীন্তন ব্রিটিশ আমলে অর্থনৈতিকভাবে নিপীড়িত, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে নির্যাতিত মুসলিম সমাজকে তাদের নিজস্ব তাহজীব-তমদ্দুনসহ রাজনৈতিক ভাবে পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে দেওবন্দের দারুল উলুম মাদ্রাসা এবং পরবর্তীতে আলীগড় কলেজের অবদান অনন্য ও অপরিসীম। এ দুধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এই উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে ধর্মীয় চেতনা, ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে ফিরিঙ্গি ও ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা পৌত্তলিকতার অক্টোপাস থেকে পরিমুক্ত হওয়ার শক্তি ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। এই দুটো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অভিন্ন হলেও এদের শিক্ষা দর্শন ছিল কতিপয় বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে ভিন্নতর। যেমন ঃ

দেওবন্দের নেতৃবর্গ – মাওলানা কাসেম নানুতাবী, মাওলানা মাহমুদ হাসান, মাওলানা হুসাইন আহমদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই প্রত্যয় পোষণ করতেন যে, ঔপনিবেশিকবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে মুক্তি পেতে হলে 'ইসলাম'-কে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। কারণ পাশ্চাত্য ও পৌত্তলিক আগ্রাসী সভ্যতা ও সংস্কৃতির মোকাবেলায় সূচনাতেই মুসলমানদেরকে আপন ধর্ম-ও ঐতিহ্যে দৃঢ়ভাবে সুসজ্জিত হতে হবে, এবং বৈরী শক্তির সাথে আপোষ নয় বরং সংগ্রামের মাধ্যমেই মুসলামানদের সম্মান ও শক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য। ইংরেজি শিক্ষাকেও প্রতিহত করতে হবে। অপরদিকে আলীগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবক্তা যেমন স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আবদুল লতিফ প্রমুখ ব্যক্তিত্বের বিশ্বাস, ইংরেজ শাসকদের সাথে সংঘর্ষ নয়, বরং তাদের সাথে আপোষকামিতা সংরক্ষণ করে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদের দুর্বল জাতীয় মেরুদন্ড দৃঢ়ভাবে মজবুত, কঠোর ভাবে ঋজু করতে চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য মুসলমানদেরকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাসহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানও অধ্যয়ন করা অপরিহার্য বলে তারা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করতেন।

www.pathagar.com

এ দুটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি পাশাপাশি চালু থাকার ফলে কালক্রমে ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামের বিষয়বস্তু পাঠ্যসূচি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হতে থাকে; পাশাপাশি আরবি প্রতিষ্ঠান তথা মাদ্রাসাগুলোতেও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক বইপুস্তক পাঠ্যভুক্ত হতে থাকে। এরই পরিণাম স্বরূপ এই দুটি ধারার প্রভাবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রথম বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান ও পরে টুকরো হয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্ম হয়। "মুসলমান" হিসাবে নিজদেরকে প্রতিষ্ঠার অদম্য চেতনা ও ত্যাগ তিতীক্ষার এই দীক্ষা উক্ত দুটো প্রতিষ্ঠানেরই অন্যতম স্বর্ণ ফসল।

শিক্ষা প্রচার মিশনঃ এই মিশনের জন্ম ১৯৮৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর। সেদিনটি ছিল সাক্ষরতা দিবসের দিন। এ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন জনাব মোঃ সুজাত আলী এডভোকেট।

মিশনের দপ্তর ফার্ম ভিউ সুপার মার্কেটের ৪ তলায়। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে ঃ

ক. শিক্ষায় গুরুত্ব সম্পর্কিত পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য সাধারণ্যে প্রচার করা

খ. সাধারণ্যে বিশেষ করে বাংলাদেশের অবহেলিত ও শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগণের কাছে শিক্ষার আলো সম্প্রসারিত করা

গ. শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকাসমূহে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করা

ঘ. দুর্দশাগ্রস্ত ও আর্থিকভাবে অভাবগ্রস্ত শিক্ষায়তনকে সাধ্যমত সক্রিয় সাহায্য প্রদান করা

ঙ. সরকারি শিক্ষানীতিতে ইসলামী ভাবধারা প্রবর্তনে সহায়তা করা

চ. সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারে সরকারি অর্থবরাদ্দের এবং আনুষঙ্গিক শিক্ষা সরঞ্জাম সহজলভ্য করার প্রচেষ্টা চালানো।

ছ. দেশের সাদামাটা জনসাধারণের কল্যাণার্থে যে কোন অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে একাত্মতা ঘোষণা দিয়ে অংশ গ্রহণ করা

জ. ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করা

www.pathagar.com

৬. পাবনা ইসলামিয়া কলেজ ঃ ১৯৯৩ সনে একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে কলেজ চালু করা হয়। পরবর্তীতে ট্রাস্টের নিজস্ব জমিতে ১২০ ফুট লম্বা টীন সেডের ঘরে কলেজ স্থানান্তরিত করা হয়। কলেজটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। বর্তমানে বানিজ্য, মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া কম্পিউটার সাইন্স এবং সেক্রেটারিয়েল সাইন্স খোলা হয়েছে। কলেজের সমস্ত বিভাগে সেমিস্টার সিস্টেমে লেখাপড়া করানো হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কলেজটির উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত ১০০×৩২ ফুট আয়তনের দ্বিতল ভবন নির্মাণের কাজটি প্রায় সমাপ্তির পথে। অচীরেই স্নাতক শ্রেণীর বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা কোর্সসমূহ চালু করার জন্যও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ঃ উত্তর বঙ্গের প্রবেশদ্বার পাবনা শহরে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দারুল আমান ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রাস্ট কোরআনিক সাইন্স, ইসলামিক স্টাডিজ, ব্যবসায় প্রশাসন (B.B.A), কম্পিউটার সাইন্স এণ্ড টেকনোলজি, পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ডিপ্লোমা ইন অ্যারাবিক, ফার্সী, উর্দু ও অন্যান্য ফ্যাকালটিজ চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৮. লাইব্রেরি ও অডিটোরিয়াম ঃ জ্ঞান আহরণ ও চর্চার জন্য এই প্রকল্প। একটি সুবৃহৎ লাইব্রেরির মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বই পুস্তক সংগ্রহ ও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার বই পুস্তক, ক্যাসেট, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদির মাধ্যমে এই লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। জ্ঞান চর্চার সহায়তার জন্য একটি সুবৃহৎ অডিটোরিয়াম নির্মাণ করার সিদ্ধান্তও বাস্তবায়িত করা হচ্ছে।

[সূত্রঃ দারুল আমান ট্রাস্ট সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।]

www.pathagar.com

শিক্ষাক্ষেত্রে কতিপয় মনীষীর অবদান

সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাসের শিক্ষা বিষয়ক সংশ্লিষ্ট ভাষণ ঃ

সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস বিগত ১৯শে মার্চ ১৯৯৬ -এ রাষ্ট্রপতির ভাষণে "শিক্ষা" বিষয়ক পরিসংখ্যান সহ যে Comprehensive 'বক্তব্য' দিয়েছিলেন, এরই ভিত্তিতে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সংস্কার আজও চলছে বললে অত্যুক্তি হবেনা। সরকারী পর্যায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার খাতিরে তাঁর বক্তব্যের শেষে জোট সরকারের শিক্ষা বিষয়ক সাম্প্রতিক কার্যাবলীর বর্ণনাও সংযোজন করা হয়েছে এতদসংগে।

তিনি বলেন, "সবার জন্য শিক্ষা হ'ল জাতীয় অগ্রগতির চাবিকাঠি। বাংলাদেশের সংবিধানে সব নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অর্পিত। এই দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে ৬৪টি জেলার ৬৪টি থানায় এবং ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে সারা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষাখাতে ৩৬৮৯৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। তন্মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬৮ লক্ষ। ১৯৯৫ সালে ৯২ শতাংশ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পড়াশুনা করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৯৫ ভাগ শিক্ষকদেরকে এক বছর মেয়াদী সি. ইন. এড. প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ১ লক্ষ ৯২ হাজার শিক্ষককে নতুন পাঠ্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১ হাজার ১শ ৩৪টি বিদ্যালয় নির্মাণ, ৭ হাজার ২শ ৩২টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ১৫ হাজার ৫শ ৮৪টি বিদ্যালয় পুননির্মাণ এবং ৫শ ৮০টি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়সহ ১১ হাজার ৩শ ৭৭টি বিদ্যালয় মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি থানায় একটি বিদ্যালয়কে মডেল স্কুল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে দেশের ৪শ ৬০টি ইউনিয়নে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয় এবং ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে তা এক হাজার ইউনিয়নে সম্প্রসারণ করা হয়। এ কর্মসূচী ১৯৯৫-৯৬ সালে ১ হাজার ২শ ৫০টি ইউনিয়নে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীকে ক্রমশ সম্প্রসারণ করে দু'হাজার সালের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার হার ৬২ শতাংশে উন্নীত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। "সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন" নামে একটি কর্মসূচী

www.pathagar.com

গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লালমনিরহাট জেলাকে গত বছরের ২৬শে সেপ্টেম্বর নিরক্ষর মুক্ত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যে ভোলা জেলার সদর থানা নিরক্ষরমুক্ত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলাকে বর্তমানে "সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন" কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য এলাকাকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে।

সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করছে এবং সাথে সাথে কারিগরী শিক্ষা সম্প্রসারণে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে ৬শ ৪৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি থানায় গড়ে ১২টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩টি মাদ্রাসা এবং কমপক্ষে ১টি বালিকা বিদ্যালয় ও ১টি কলেজসহ সর্বমোট ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫ হাজার ৪শ ৬৫টির কাজ শেষ হয়েছে। টংগীর পাশে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মিত হচ্ছে। নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পৌর এলাকার বাইরে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদেরকে পর্যায়ক্রমে বেতন মওকুফ, নগদ বৃত্তি ও বেতন ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পৌর এলাকার ছাত্রীদেরকেও বর্তমান শিক্ষা বর্ষ থেকে এ সুবিধা প্রদান করা হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭ হাজার স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, স্থাপনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। দেশে ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৬টি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও ২টি দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বেসরকারি খাতে গড়ে উঠেছে। যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষার উত্তর পত্র মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এজন্য আধুনিক সরঞ্জামাদিসহ ঢাকায় কম্পিউটার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৫ সাল থেকে ডিগ্রি পর্যায়ে ইংরেজি বিষয় পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে। .... প্রতি বছর নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে। অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পর্যায়ে মর্যাদার আসন দেয়ার উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। ১৯৯৫ সালের ৭ অক্টোবর প্রথমবারের মতো বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসীনের অবদান ঃ

অবিভক্ত ভারতের নিগৃহীত ও পশ্চাদপদ মুসলমানদেরকে শিক্ষার আলো ও জ্যোতিতে অবগাহিত করানোর ক্ষেত্রে হাজী মোহাম্মদ মহসীনের বলতে গেলে সর্বস্ব ত্যাগ ও দান ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে উদ্ভাসিত থাকবে অনন্তকাল। তাঁর এহেন অকাতর দানের জন্য 'বাংলার হাতেম তাঈ' উপাধিতে তিনি ভূষিত হয়েছেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত একাডেমিক লেখাপড়া তাঁর ছিল বটে, তবে আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত ও সংগীতের পাঠক্রম তিনি অল্পবয়সেই সমাপ্ত করেছিলেন। তাঁর অধ্যয়ন জীবনের বিশেষ উজ্জ্বল দিকটি ছিল এই যে তিনি পবিত্র কোরআন ও হাদীস কণ্ঠস্থ করেছিলেন। ফলে তাঁর এই সম্যক জ্ঞান হয়েছিল যে, এ উপমহাদেশের, বিশেষকরে বঙ্গের মুসলমানদের শিক্ষান্নোতি ব্যতীত মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাগ্যের সুপরিবর্তন ও সৌভাগ্য অর্জনের বিকল্প পথ নেই। তাঁর এই চেতনা ও মর্মবোধ আরো সমৃদ্ধ হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্য সফরের ফলে। ইরান, তুরস্ক ও মিশরসহ আরো কতিপয় দেশ তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। ১৭৮৯ সালে পবিত্র হজ্জও করেছিলেন তিনি। হুগলী অধিবাসী ব্যবসায়ী পিতা ফয়জুল্লাহ্‌র বিষয় সম্পত্তি এবং বিশেষ করে সন্তানহীনা বিধবা সৎবোন মন্নুজানের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসাবে বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তিনি। প্রকৃতিগতভাবে বিলাসিতা বিমুখ, সরল, উদার ও ধর্মপরায়ণ জীবনে অভ্যস্ত হাজী মহসীন মুসলমানদের শিক্ষা ও কল্যাণের জন্য সমস্ত সম্পত্তি দান করেন; যা থেকে অমুসলিম দারিদ্র ক্লিষ্টরাও তাঁর এহেন দান থেকে বঞ্চিত হয়নি। তাঁর এই বিপুল সম্পত্তি শিক্ষা ও জনকল্যাণে ব্যয় করার জন্য ১৮০৬ সালে 'মহসীন ট্রাস্ট' কলকাতায় গঠিত হয় যার মূলধন সেই সময়ের মূল্যমানে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। এই অর্থ সম্পদ থেকে ব্যয় করে তিনি 'হুগলী কলেজ', 'হুগলী মাদ্রাসা' ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন যার ব্যায়ের পরিমাণ আলফ্রেড নোবেলের দানকৃত নোবেল পুরস্কারের অর্থের তুলনায় নগন্য নয়। জনসেবার কাজে তাঁর "ইমাম বাড়া-ও আর একটি উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠান।

১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করার পর এই শিক্ষাপ্রেমী, বিদ্যুৎসাহী, মানব দরদী ব্যক্তিত্ব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রায় ৮০ বছর জীবন যাপন শেষে, ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে। হাজী 'মহসীন ট্রাস্ট" -এর শিক্ষা ও জনকল্যানের দান আজও পুর্ণমাত্রায় চালু রয়েছে। এই মিতব্যয়ী, অনাড়ম্বর প্রিয় ব্যক্তির "হাতেম তাঈয়ী"

www.pathagar.com

হৃদয়ের জন্য তদানীন্তন মুসলমানরা শিক্ষাগ্রহণে কী অপূর্ব সুযোগই না লাভ করেছিলেন। এই সুযোগ-ই সেদিনকার মুসলমানদেরকে স্বাধীনচেতা জ্ঞান ও চরিত্র দান করেছিল ভাবীকালে ব্রিটিশ খেদাও ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ বেয়ে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ ও সাফল্য অর্জনে। বাংলাদেশ অর্জনেও এই চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল বললে অত্যুক্তি হবেনা নিশ্চয়ই।

বিদুষী নওয়াব ফায়জুন্নেছার অবদান ঃ

নারী সমাজের মাঝে শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কতিপয় বিদুষীদের অবদান সবিশেষ ভাবে প্রণিধাণযোগ্য। হাজী মহসীনের মতো উত্তরাধিকার সূত্রে স্বামী ও পিতার বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হয়ে যিনি শিক্ষা ও সমাজ সেবার খাতে অকাতরে অর্থ-সম্পত্তি দান করেছেন তিনি হচ্ছেন কুমিল্লা জেলার পশ্চিমগাঁও-এর সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারের নওয়াব ফায়জুন্নেছা। এই শিক্ষানুরাগী মহিলা পারিবারিক ভাবে পড়া-লেখা করে স্বীয় প্রচেষ্টায় আরবি, ফার্সি, বাংলা এমন কি সংস্কৃত ভাষায় নিজেকে অত্যন্ত দক্ষ ভাবে গড়ে তুলেছিলেন। এই মহিয়সী নওয়াব উপাধিতে ভূষিত হওয়ার একটি চমৎকার সত্য-কাহিনী রয়েছে। সংক্ষেপে তা হচ্ছে এইঃ

কুমিল্লা জেলার তদানীন্তন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট 'ডগলাস' কোন একটি সমাজ কল্যাণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে গিয়ে চরম অর্থাভাবের সম্মুখীন হন। আশপাশের জমিদারদের নিকট কোনরূপ সাহায্য না পেয়ে যখন তিনি ব্যর্থ মনোরথ, তখন ফায়জুন্নেছা এক বান্ডিল টাকা নিছক দান (থরটর্ভ-ধভ-টধচ) হিসাবে পাঠিয়ে দিলে 'ডগলাস' অত্যন্ত অভিভূত হন এবং রানী ভিক্টোরিয়াকে ফায়জুন্নেছার "Unique personality, bravity, generousity and benignity" সম্পর্কে অবহিত করলে, বিমুগ্ধ রানী ফায়জুন্নেছাকে "নওয়াব" পদবীতে ভূষিত করেন।

নওয়াব ফয়জুন্নেছা "is a shining star in the heaven of British India for her glorious dedication to the arena of social welfare and humamitarian services. She realized it by heart that without the spread of education the progress and prosperity of the people of this country are not possible. She also felt it that without spreading female education, only education for the male would fail to bring about all-round progress and

www.pathagar.com

prosperity". [Philanthropic Alauddin Ahmed : Life and Literature by Dr. Khondaker Reazul Hoq— translation by Mohammad Alamgheer.]

মোটামুটি এই ছিল নওয়াব ফয়েজুন্নেছার মন-মানসিকতার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র। ফলে দেখা যায় নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার "ফয়েজুন্নেছা গার্লস স্কুল"–যা বর্তমানে কলেজে উন্নীত হয়ে উচ্চ শিক্ষার আলোকবর্তিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, একটি এম.ই. স্কুল, একটি সিনিয়র মাদ্রাসা ও বালিকা বিদ্যালয়– যা বর্তমানে "নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ" হিসাবে উন্নীত হয়ে সহ-শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করেছে, ইত্যাদি তাঁর শিক্ষানুরাগের অপূর্ব নিদর্শন। শুধু তা-ই নয়। ১৮৯৪ সালে কন্যা বদরুন্নেছা ও তদীয় জামাতাসহ পবিত্র হজ্জ্ব পালন কালে মক্কা শরীফে তিনি প্রবাসী হাজীদের জন্য একটি মুসাফির থানা ও এতদসংলগ্ন একটি "মকতব" স্থাপন করেন, যার ব্যয়ভার তাঁর "ওয়াকফ্‌কৃত সম্পত্তি" থেকে বহন করা হচ্ছে। সমাজ-সেবা ও জনকল্যাণে-ও তাঁর অপূর্ব কীর্তি মূর্তমান।

প্রায় সর্বগুণে গুণান্বিতত এই বিদূষী মহিলা ১৯০৩ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বটে কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও সমাজ সেবার অপূর্ব কীর্তির মাঝে অবশ্যিই তিনি অবিনশ্বর হয়ে রয়েছেন কালের ভুবনে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শের-ই-বাংলার অবদান ঃ

মুসলমানদের মাঝে শিক্ষার জ্যোতি ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে শের-ই-বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের অবদান অপরিসীম। ব্রিটিশ আমলে তদানীন্তন বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ১৯০৩ সালে যে 'মুসলিম শিক্ষা সম্মিলন' -এর আয়োজন করা হয়েছিল, সেই সম্মেলনের আয়োজকদের অন্যতম ছিলেন তিনি। ১৯১২ সালে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তিনিই প্রথম "শিক্ষা পরিকল্পনা বিল" উপস্থাপন করেছিলেন; যা পরবর্তীতে মুসলিম নর-নারীদের মাঝে বিভিন্ন স্তরের স্টাইপেণ্ড বিতরণের পথ সুগম করেছিল। এই স্ট্যাইপেণ্ডের অর্থ তদানীন্তন বাংলার গভর্নরের নিকট থেকে মঞ্জুর করা হয়েছিল।

১৯১৬ সালে কলকাতায় কারমাইকেল ও টেলর হোস্টেল নির্মাণে তাঁর সাহায্য ছিল বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়। এমনি ভাবে ১৯২০ এবং ১৯২১ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে তাঁর ভূমিকা ছিল

www.pathagar.com

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৪ সালে যখন শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন, শের-ই-বাংলা সেই সময়টিতে কলকাতায় 'ইসলামিয়া কলেজ' স্থাপন ও 'মুসলিম শিক্ষা তহবিল' নামকরণে একটি ফাণ্ড রচনা করেছিলেন। এই ফাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র প্রপীড়িত মুসলিম ছাত্রদেরকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করা। মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি সরকারি ও বেসরকারি স্কুলসমূহে 'মৌলভী' বা ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছিলেন। বাংলার মন্ত্রী থাকাকালীন মুসলিম মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 'লেডী ব্রেবর কলেজ।' এই কলেজ স্থাপনের সময়কালটি ছিল ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত। বরিশালের 'চাখার কলেজ', ঢাকার 'ইডেন কলেজ' ও 'ফজলুল হক হল' নওয়াব গঞ্জের 'আদিনা ফজলুল হক কলেজ' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান তাঁরই বদান্যতা ও দানশীলতার জন্যই সম্ভব হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান মূর্ত ও বিকশিত হওয়ার ফলে এতদাঞ্চলে শিক্ষার নব দিগন্তের উন্মোচন ও প্রসার ঘটেছে। তাঁর মন্ত্রীত্বকালেই 'স্কুল বোর্ড ও ইন্টারমিডিয়েট' বোর্ড সৃষ্টির জন্য 'বিল' তদানীন্তন সরকারের দৃষ্টি দিগন্তের পরিসীমায় আনা হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর 'সেন্ট্রাল উইমেনস্ কলেজ', 'বাংলা একাডেমি', 'ললিত কলা একাডেমী', 'তেজগাঁও এগ্রিকালচার কলেজ' তাঁরই মন্ত্রীত্ব কালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসংঙ্গে এটাও লক্ষণীয়, এটি শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হকই যিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম ভারতীয় প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে মিঃ বি. এম, সেনকে নিয়োগ দানে অসাম্প্রদায়িকতার নির্মল ও নিঃস্বার্থ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তদানীন্তন ভারতের সেই দুর্যোগ ঘনঘটা কালে; যখন ব্রিটিশ ও কংগ্রেস যৌথভাবে সে সময়কার ভারতীয় মুসলমানদেরকে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনসহ আর্থ -সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পদানত করার কূটষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল। এ থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়, তদানীন্তন অবিভক্ত ভারতের বর্তমান বাংলাদেশ সহ মুসলমানদেরকে স্বীয় শিক্ষা-দীক্ষায়, সমুন্নত ও স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে শের-ই-বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের অবদান কতইনা আশীর্বাদপুষ্ট ছিল। তিনি তাঁর এহেন অনন্যও আকৃত্রিম অবদান ভারতীয় মুসলমানসহ বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে কী পরিমাণই না ঋণী করে গেছেন তিনি তাঁর এহেন অনন্যও আকৃত্রিম অবদান কালের ভুবনে!

www.pathagar.com

শিক্ষা ক্ষেত্রে মরমী কবি সাবির আহমেদ চৌধুরীর অবদান ঃ

নীরব নিভৃতে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ শিল্পে যিনি আর্থিক ও লেখনীর সাহায্যে বাংলাদেশের স্বকীয় চরিত্র স্ফুরণ ও বিকাশে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছেন তাঁদের মরমী কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী অন্যতম।

পড়া লেখায় প্রকৌশলী, মননশীলতায় মরমী কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বহু স্কুল কলেজ ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক, ব্যক্তিগত পর্যায়ে দরিদ্র ছাত্র শিক্ষক-সংস্কৃতিসেবীদের নীরব নিভৃতে সাহায্য দাতা সাবির আহমেদ চৌধুরী সম্প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতে একটি অনন্য ব্যক্তিত্ব।

তদানীন্তন বৃটিশ শাসিত ভারতে যখন অবিভক্ত বাংলাদেশ সহ গোটা ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি ও ধর্মীয় অনুশাসনের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ মুসলিম বিদ্বেষী এ্যাংলো-হিন্দুদের স্বৈরশাসনাধীন ছিল, সেই সময়ে এই দেশের মূমুর্ষ ও পশ্চাদপদ মুসলমানদেরকে স্বীয় শিক্ষা-সাহিত্যও সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে কবি সাবিরের এর ত্যাগ ও শ্রম সবিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ৫০ দশকের মধ্যভাগে শিশু সংগঠন মুকুল ফৌজ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কবীর চৌধুরী, সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব বশির আহমেদ মান্না হক, বিখ্যাত সাহিত্যিক বরকতুল্লা, কবি তালিম হোসেন, প্রমুখকে নিয়ে 'ইতিহাস পরিষদ' গঠন, স্বীয় অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগে ধানমন্ডি বয়েজ স্কুল স্বীয় প্রয়াত স্ত্রীর নামে মেহেরুন্নেসা স্কুল এণ্ড কলেজ, এবং 'আইডিয়েল কলেজ বাংলাদেশ' ল' কলেজ, 'আবুজর গিফারী কলেজ', 'মতিঝিল আইডিয়াল কলেজ', 'হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ' প্রতিষ্ঠায় অর্থদান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদেরকে অনুরূপ কর্মকান্ডে অংশীদার করেন তিনি স্বীয় অর্থে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে প্রথম নজরুল একাডেমীও পরবর্তীতে এই বাড়িটিতেই 'নজরুল শিক্ষালয়' এর বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা তাঁরই বদৌলতে হয়েছে। সূচনায় এবং মাঝখানে কিছু সময় ব্যতীত তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে অদ্যাবধি অধিষ্ঠিত আছেন। নরসিংদী জেলার স্বীয় গ্রাম হরিসংগায় ১৯৬৫ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হরিসঙ্গা হাই স্কুলের ম্যাট্রিক ও এস, এস, সি, পরীক্ষায় এ পর্যন্ত কোন ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেনি। মনোহরদী থানায় ওয়ালিউদ্দিন কলেজটিতে ও তাঁর বিপুল আর্থিক সাহায্য রয়েছে। দরিদ্র অসহায় মেডিকেল কলেজে পড়ুয়া ছাত্রদেরকে অর্থ সাহায্য দান, গরীব মেধাবী ছাত্রদেরকে ১৯৫৫

www.pathagar.com

সাল থেকে নিয়মিত 'সাবির বৃত্তি' প্রদান ছাড়াও অনেক নমস্য অথচ দুঃস্থ কবি-সাহিত্যিককে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে বিপুল পরিমাণ সাহায্য করে আসছেন আজও। তাঁর বিশ্বমানবতার জয়গান বিধৃত "কাব্যরচনাবলী"- যেটি কালজয়ী সূচনা ভিত্তিক সাহিত্য হিসাবে সমাদৃত হওয়ার জন্য সৃষ্টির জন্যে তিনি ১৯৯২ -৯৩ ঈসায়ী বর্ষে Man of the year হিসাবে ভূষিত হওয়া ছাড়াও দেশ-বিদেশের প্রচার মাধ্যমে সম্প্রতি অনুপম ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিস্ফুটিত, সম্মানিত ও স্মরণীয় এই বিদ্যুতসাহী কবি বর্তমানে ৮২ বছর বয়সে উপনীত হয়েও তারুণ্যের তেজোদীপ্ত উদ্যমে আপন অর্থে জাতীয় প্রতিষ্ঠিত অনিন্দ অট্টালিকা মম "ব্রাইটন হোটেল" এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী হিসাবে সুচারুরূপে দায়িত্ব সম্পাদন করে যাচ্ছেন। এর মরমী কবি শুভ জন্ম ঃ জুলাই ১৫,১৯২৪ সালে।

ড. খোন্দকার রিয়াজুল হকের কথায় ঃ It can be safely remarked that poet Sabir's achievements are glorious and udying and he is still alive by the grace of Almighly Allah to see his mortal being going to be immortatized through his such noble deeds and sacrifices".

উল্লেখ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও শিল্পকলা বিভাগে তাঁর 'শিক্ষা ও কাব্যের' উপর পাঠক্রম সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং জীবদ্দশায় তিনি তাঁর সাহিত্যে কর্মের উপর ড. খন্দকার রিয়াজুর হককে কোলকাতা থেকে পি.এইচ. ডিগ্রী অর্জন করতে দেখে স্রষ্টার প্রতি বিনম্র চিত্তে সদা কৃতজ্ঞ। এই প্রথিত যশা মরমী কবি বড়ই Inteospective বিধায় তাঁর কীর্তি তেমন ভাবার নয়।

শিক্ষানুরাগী আলাউদ্দিন আহমেদ-এর অবদান ঃ

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এদেশের শিক্ষান্নোয়ন ও প্রসারে যে মানুষটি নীরব-নিভৃতে প্রভূত অবদান অদ্যাবধি রেখে যাচ্ছেন; তিনি হচ্ছেন কুষ্টিয়ার স্বনামধন্য তথা গোটা বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব আলাউদ্দিন আহমেদ। আয়কর উপদেষ্টা হিসাবে কর্মজীবনের সূচনা করে এই ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশের শিক্ষা ও সমাজ সেবার, বিশেষ করে পশ্চাদপদ উত্তর বঙ্গের শিক্ষা সহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর অদ্যাবধি স্থাপন রচনা করেছেন তা সত্যিই পরম বিস্ময়কর।

ড. খন্দকার রিয়াজুল হকের গবেষণাধর্মী ৩০০ পৃষ্ঠার্দ্ধো বিশাল গ্রন্থ "আলাউদ্দিন আহমেদ; জীবন ও সমাজ সেবা" পাঠে জনাব আলাউদ্দিনের যে বিরাট হৃদয়ের পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায় তা সত্যিই-,- যেরূপ লোকে বলে, তিনি বাংলাদেশের "হাজী মহসীন" বা দ্বিতীয় "হাতেম তাঈ"।

www.pathagar.com

ইংরেজী অনুবাদকৃত এই গ্রন্থের শেষ দিকে জনাব আলাউদ্দিন আহমেদের শ্রম ও অর্থ ব্যয়ে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ছাত্রাবাসও মসজিদ নির্মিত হয়েছে এর ছবিগুলো অতীব মনোমুগ্ধকর। জনসাধারণ কর্তৃক তাঁর নামানুসারে তাঁবু নির্মিত "আলাউদ্দিন নগর" বলতে গেলে ক্ষুদ্র পরিসরে যেন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ব। ক্ষেত-কৃষি-খামার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, পাঠাগার, মাদ্রাসা-ছাত্রাবাস, সবই রয়েছে এই নগরীতে। তাঁর নির্মিত অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যতম নিদর্শনগুলো হচ্ছেঃ

১. আলাউদ্দিন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
২. দ্বিতল বিশিষ্ট সুদীর্ঘ শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
৩. চারতলা বিশিষ্ট আলাউদ্দিন আহমেদ উচ্চ বিদ্যালয়
৪. একতলা বিশিষ্ট আলাউদ্দিন আহমেদ প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫. দ্বিতল বিশিষ্ট আলাউদ্দিন আহমেদ ডিগ্রি কলেজ
৬. চাঁদ চক্রগুয়া মাদ্রাসা
৭. শাহ্ মখদুম খোরশেদ মাদ্রাসা
৮. আলাউদ্দিন আহমেদ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ছাত্রাবাস, শরীরচর্চা, খেলাধুলা, বিনোদন ও হাসপাতালের জন্য তাঁর নির্মিত স্থাপনাগুলো ও মনোহরিণী। বিশেষ করে নির্মিত আলাউদ্দিন নগরীর

১. তদীয়দানশীলা মহিয়সী স্ত্রী তাহিরুন্নেসার নামানুসারে "তাহিরুন্নেছা হাসপাতাল।
২. শিলাইদহের পর্যটন স্পট বা কমপ্লেক্স
৩. আলাউদ্দিন নগরের অডিটোরিয়াম ও জিমনাসিয়াম, সুইমিং পুল।
৪. ছাত্রী হোস্টেল।
৫. আলাউদ্দিন আহমেদ ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউট
৬. বাহার ছাত্রাবাস
৭. মসজিদুল বাহার
৮. বয়ারহাট মাদ্রাসা জামে মসজিদ, সবিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আলাউদ্দিন আহমেদের বাবা ও শ্বশুর উভয়েই জ্ঞান-পিপাসু ও সমাজ সেবায় সংবেদনশীল ছিলেন প্রচন্ড ভাবে। তাঁর স্ত্রীও শিক্ষা এবং সমাজ সেবায় স্বামীর কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয়ে ও স্বীয় শ্রমও সময় ব্যয়ে স্বামীকে উৎসাহ এবং

www.pathagar.com

অনুপ্রেরণাদানে সদা সক্রিয় ছিলেন। ফলে জনাব আলাউদ্দিনের একাকী প্রচেষ্টায় কুষ্টিয়াসহ এর চতুরপার্শ্বের এলাকা শিক্ষা সংস্কৃতি, কৃষি, খামার এমনকি, ব্যবসা বাণিজ্যে অপূর্ব সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছিল। এছাড়া আলাউদ্দিন-পরিবার ব্যক্তিগত ও পরিবারিকভাবে উভয় ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে শুধু ধর্মপরায়ণ ও ধর্মানুশীলনে নিষ্ঠ নন, বরং সামাজিক ভাবেও দায়িত্বশীল বলে এই সাফল্য একাধারে মানসিক, নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক সর্বক্ষেত্রেই সহমর্মিতা ও সদিচ্ছায় সুপ্রতিষ্টিত ও বিকশিত হয়েছে।

আলাউদ্দিনের আহমেদের শিক্ষা-দর্শনও লক্ষণীয়। তাঁর শিক্ষা-দান ও দৃষ্টির লক্ষ্য সংক্ষেপে এই ঃ

১. শিক্ষার আলো সর্বত্র ছড়াতে হবে

২. শিক্ষার ব্যয় মিটানোর জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করতে হবে; স্থানীয় ভাবে কৃষি, খামার, জলসেচ, মাছ চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে

৩. ধনী ও বিত্তশালীকে শিক্ষা ও সমাজ সেবা এই দু'খাতে দানশীলতার মনমানসিতার উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও দানের পরিমান বাড়াতে হবে।

৪. সরকার নির্ভর নয় বরং নিজেদের মাঝে কো-অপারেটিভ সিস্টেমের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন ও ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াতে হবে।

প্রসঙ্গ ঃ স্কুল-কলেজ পর্যায়ে ২০০৪ সাল থেকে শিক্ষার মান -উন্নয়ন ঃ

২০০৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ; ২০০৪ সাল থেকে দেশের প্রতিটি স্কুল-কলেজকে তিন মাস অন্তর সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। বাজার থেকে প্রশ্নপত্র কিনে পরীক্ষা নেয়া যাবে না। উপজেলার মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা নিতে হবে এক ও অভিন্ন রুটিন অনুসরণ করে। মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে সরকার এই নির্দেশনা প্রদান করেছে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত দুটি সার্কুলার জারি করে।

মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে এবং নকলমুক্ত পরিবেশে বার্ষিক পরীক্ষা ও দশম শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষা পরিচালনার জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দু'টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বাধীন ১১ সদস্যের জেলা কমিটিতে সদস্যরা হলেন জেলার এমপি, সিভিল

www.pathagar.com

সার্জন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা), জেলার চারটি সরকারী-বেসরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, আনসার ভিডিপি অফিসার ও শিক্ষা অফিসার। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বাধীন ৯ সদস্যের উপজেলা কমিটিতে আছেন সহকারী কমিশনার (ভূমি), সরকারী স্কুলের দু'জন প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, আনসার ও ভিডিপি অফিসার, সদরের ইউপি চেয়ারম্যান ও প্রকল্প অফিসার।

উপজেলা ও জেলা কমিটি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষা ও নির্বাচনী পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবে। বার্ষিক পরীক্ষা ও নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণের জন্য অভিন্ন রুটিন প্রণয়ন করবে। এ দু'টি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র স্কুলগুলো নিজেরা প্রণয়ন করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অপর সার্কুলারে বলা হয়, শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্থ এসএসসি, এইচএসসি, এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল, পরীক্ষার প্রশ্ন বিভাগীয় কমিশনারগণ বিভাগওয়ারী সংগ্রহ করবেন এবং জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে বিতরণ করবেন। নির্বাচনী (টেস্ট) পরীক্ষায় একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য কোন ছাত্র-ছাত্রীকে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।

পর্যালোচনা

সরকার যেসব পদক্ষেপ কার্যকরী করতে যাচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও কল্যাণকর। কিন্তু এরপরও যেসব বিষয় সরকারের বিবেচনায় আনতে হবে তা হচ্ছে সংক্ষেপে এই ঃ

১. দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য শিক্ষক থেকে শিক্ষাঙ্গণ মুক্ত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে শিক্ষার মান উন্নয়ন ত হবেই না বরং এতে ছাত্র সমাজের মেধা ও চরিত্রের আরো অধঃপতন ঘটবে একাডেমীর সুযোগ সুবিধার আবরণে।

২. নৈতিক চরিত্রন্নোয়ন মূলক পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন ও পাঠ্যভুক্ত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্মোহ ভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ বর্তমানে ডোনেশনের নামে টাকা পয়সা খেয়ে বাজে বই-পুস্তক পাঠ্যভুক্ত করা, জাতীয় স্বার্থ ও আদর্শ বিরোধী বিদেশী বই কমিশন প্রাপ্তিতে সমাদৃত করা একটি open secret হয়ে দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

৩. গাইড বুক, সাজেশন, সিওর সাকসেস ইত্যাদি বাণিজ্যিক প্রকাশনা উচ্ছেদ করে মূল Text Book পড়ানোর পরিবেশ রচনায় কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই জ্ঞান ও মেধার পরিচর্যাগার। এজন্য সরকার ও জনগণ অর্থ-শ্রম বিনিয়োগ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েন। এরপর আবার কোচিং সেন্টার, Guide Book ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে ছাত্র-অভিভাবক পাশের রকমারি চিন্তা করবেন; তা চলতে দেয়া যায় না।

৪. ছক বাঁধা প্রশ্ন ও এর উত্তরের সনাতন পদ্ধতি পরিহার করে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষার খাতা বিশেষ করে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল্যায়নে মেধা-চরিত্র ও নিষ্ঠায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বি. এড., এম. এড. ডিগ্রীধারী শিক্ষকবৃন্দকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

৫. পয়সা খেয়ে পরীক্ষক নিয়োগ তথা বিষয় ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষক ব্যতীত অনভিজ্ঞ ও অপদার্থ শিক্ষককে পরীক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষার মান নির্ণয়ে জাতীয়ভাবে যে খেসারত ঘটছে এর বিহিত করাও অত্যাবশ্যক।

সর্বোপরি কথা এই যে, কূপে পঁচা ইদুর রেখে পানি শোধনের মতো আমাদের শিক্ষান্নোয়নের কর্মকান্ড যেন দুর্নীতি জীইয়ে রেখে পন্ডশ্রম না হয় সেটিই কাম্য।

জোট সরকারের ৩ বছরে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন

বর্তমান ৪ দলীয় জোট সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে গত তিন বছরের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিককরণ, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য অবসর সুবিধা ও উৎসব ভাতা প্রদান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বছরের শুরুতেই পাঠ্যপুস্তক পৌছানো নিশ্চিতকরণ, বিসিএসএর মাধ্যমে ৫ হাজার কলেজ শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত, আড়াই হাজার কলেজ শিক্ষক ও ৫শের মতো স্কুল শিক্ষকের পদোন্নতিদান, ৫টি প্রাচীন কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার আইন প্রণয়ন, ৪টি বিআইটিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করন, ২২ হাজার ৩১৬ জন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, এবতেদায়ী মাদরাসার ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই প্রদান, ৫ হাজার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও ভুক্ত করণের মাধ্যমে প্রায় ৫০ হাজার বেকার যুবকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও এমনিভাবে মানব সম্পদ উন্নয়নের পক্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের এসব বিবিধ প্রয়াশ অবশ্যই যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

www.pathagar.com

বর্তমান জোট সরকারের ৩ বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের পর্যালোচনায় দেখা যায় শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষাকে যুগোপযোগীকরণ, জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নয়নের ধারায় নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করাসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণে গত তিনবছরে বাজেটে সরকার শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করেছেন।

শিক্ষা সেক্টরে গত তিন বছরের বড় সাফল্য হচ্ছে পাবলিক পরীক্ষায় নকল বন্ধ যা দেশ ও বিদেশে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে যে ক'টি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সবক'টি প্রায় নকলমুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা প্রকৃত অর্থে ক্লাসে ফিরে এসেছে, শিক্ষার মান উন্নয়ন হয়েছে এবং বিদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে দেশের ভাবমূর্তি। শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যতম বড় সাফল্য হচ্ছে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক হাতে তুলে দিতে পেরেছেন। যা বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৬ মাসেও সম্ভব হয়ে উঠেনি।

এছাড়া গত অর্থবছরে ১ হাজার ১ শ' বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে এসএসসি ভোকেশনাল এবং ৮শ' ৬৬টি প্রতিষ্ঠানে বিএমসি কোর্স চালু করায় আরও প্রায় ৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া চলতি অর্থবছরে এমপিও ভুক্তির জন্য ১৫ হাজার আবেদনপত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

শিক্ষা ব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কারের অংশ হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মেধা ও প্রজ্ঞার বিচারে ভিসি ও প্রো-ভিসি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনকে শক্তিশালী করাসহ শিক্ষার মান উন্নয়নে ২৮টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংস্কারের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিতকরণ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য জাতীয় কারিকুলাম কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারীদের কল্যাণার্থে শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন সংশোধন ও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের কল্যাণ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা ত্বরিত কার্যকরী করেছে। পরিবর্তন আনা হয়েছে টাস্ট্র পরিচালনা বোর্ডেও।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রসারে মাদরাসাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স কার্যক্রম শক্তিশালী করা হয়েছে। নারী শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

উপজেলা পর্যায়ে ১১টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ১০টি রিসার্স সেন্টার, ১৭টি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩১টি উপজেলায় মহিলা হোস্টেল নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। ৫০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে মেধা ও উপবৃত্তি যথানিয়মে প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রায় ৩০ হাজার কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ খাতে মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আইসিটি শিক্ষাদানের জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান আইসিটি স্কলার শিপ এবং ছাত্রীদের জন্য প্রধানমন্ত্রী আইসিটি স্কলারশিপ প্রবর্তন করা হয়েছে। ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাগুরা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কাজও সমাপ্তির পথে।

১১৪ কোটি ৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ১১টি মডেল স্কুল, ৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭১টি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট নির্মাণও সমাপ্তির প্রান্তে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪৬২টি কলেজের একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজও এগিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ইংরেজীভাষা শিক্ষার প্রতি জোর দিয়ে আসছে। এরই আলোকে দেশের ৬৪টি জেলা সদরে অবস্থিত প্রধান প্রধান সরকারী কলেজের নিজস্ব অর্থায়নে ৩ মাস মেয়াদী অবৈতনিক ইংরেজী শিক্ষার সান্ধ্যকালীন 'প্রশিক্ষণকেন্দ্র' ২০০২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে। এছাড়া ৮ কোটি ৯০ লাখ টাকা ব্যয়ে দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে ল্যাংগুয়েজ সেন্টার স্থাপনের কাজও শেষ পর্যায়ে। ২০০২ সালের ২৪ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাজধানী ঢাকার দীলু রোডে অবস্থিত বিয়ামে ঢাকা ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশে কলেজ অব লেদার টেকনোলজির সংস্কার, আধুনিকীকরণ পুনর্গঠন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম বর্ষে ছাত্রভর্তির আসন সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৯০ জন করা হয়েছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ওপরও জোর দেয়া হয়েছে। গত তিনবছরে (২০০১-২০০৩) প্রায় ৩ হাজার স্কুল শিক্ষক, ৫ হাজার কলেজ শিক্ষককে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ, ১ হাজার কলেজ প্রভাসককে প্রশাসন এবং প্রায় দেড় হাজার প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। গাজীপুরে অবস্থিত মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ৩ বছরে ৭ হাজার মাদরাসা শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ২৫০ জন শিক্ষক কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নেও বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এর ফলে নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সমাজে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি

www.pathagar.com

পেয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে এই সরকার এ পর্যন্ত ২৫০৪২ জন সরকারী শিক্ষক, ৩২২০ জন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করেছেন। এছাড়া নবসৃষ্ট ৩৭০১টি সরকারী শিক্ষক পদে লোকবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। আইডিয়ার ও নোরাড প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে ১৬৪৪ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ১২৩ জন থানা শিক্ষা অফিসার ও ২৯০ জন সরকারী থানা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-২ চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পের আওতায় ৩০ হাজার নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, বিভিন্ন পর্যায়ে ৩৭৯৮ জন কর্মকর্তাকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান, উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের কার্যক্রম জোরদার, শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা ছাড়াও এ কর্মসূচীর মাধ্যমে ৩৫ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগ, ৯০ হাজার নতুন ও পুরাতন শিক্ষককে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। শিক্ষা সুযোগ বঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ৩৯০ কোটি ৭২ লাখ টাকা ব্যয়ে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প গ্রহণ করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০টি উপজেলার ৬০০টি ইউনিয়নে ৫২০৬৫টি কেন্দ্র স্থাপন করে ১৯ লাখ ৪৮ হাজার ১২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করা হচ্ছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রতিটি কেন্দ্রে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত মাথাপিছু মাসিক ৫০ টাকা, ৪র্থ শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৬০ টাকা শিক্ষা সহায়ক অনুদান দেয়া হবে। এছাড়া প্রথম শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ২০০ টাকা এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রদের জন্য ২৫০ টাকা হারে ইউনিফর্ম বাবদ প্রদান করা হবে। পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার জন্য ছাত্রপ্রতি ২০০ টাকা প্রদানের ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের যুগান্তকারী এ পদক্ষেপ "শিক্ষা সবার জন্য" বাণীটির সার্থক প্রতিবি--- বৈকি।

মোট কথার্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৪৭৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করেছে। আরও ৩২০৮টির উন্নয়ন কাজ এগিয়ে চলেছে।

উল্লেখ্য প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা ইতোমধ্যে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ২০০৩ বাস্তবায়ন করে বাস্তবদর্শী একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া আগামী পে-স্কেলে বেসরকারী শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত, করে টাইম স্কেল কার্যকর করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রে নিরক্ষর শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ ঃ

প্রায় ২০ বছর আগে থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নিরক্ষরতার হার উদ্বেগজনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আদম শুমারীর বুরো দ্বারা পরিচালিত এক পরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০ বছর ও তদুর্ধ বয়স্ক আমেরিকানদের মধ্যে শতকরা ১০ জনই একটি সাধারণ প্রশ্নের ৪টি উত্তরের সঠিক জবাব চিহ্নিত করতে পারে নি। প্রশ্নটি ছিল ঃ

তোমাদের মেডিক্যাল আইডেন্টিটি কার্ডটি কাহাকেও দেবে নাঃ

ক. ব্যবহারের জন্য খ. নষ্ট হওয়ার জন্য. গ. হারিয়ে যাওয়ার জন্য, ঘ. ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য। [সঠিক উত্তর : ক]

তাছাড়া আরো শতকরা ২০ জন তাদের নিরক্ষরতা-জ্ঞান ধরা পড়ার ভয়ে এই ধরণের টেস্ট দিতে রাযী হয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প দপ্তরের জনৈক কর্মকর্তা বার্নেস এই টেস্টের বিশ্লেষণ করে মর্মাহত হন। তিনি দুঃখ করে মন্তব্য করেন ঃ "আমরা নতুন নিরক্ষর বংশধরদের জন্ম দিচ্ছি।" এই টেস্টের ফলাফল বিশ্লেষণের নিরিখে মিঃ বার্নেস এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যেঃ

১. যুক্তরাষ্ট্রের ১৪ বছর বয়স ও এর উর্ধ্বের প্রতি একশত জনের মধ্যে একজন নিরক্ষর।

২. পঞ্চম শ্রেণী পাস করা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলের এই শ্রেণীতে পড়ুয়াদের অধিকাংশই নিরক্ষর ও বয়স্ক।

৩. পঠন ক্ষমতা নেই–এ ধরনের অনেকেরই বয়স ৫০ বছরের নিচে। এদের অধিকাংশ নিগ্রো বা কৃষ্ণাঙ্গ। পরীক্ষাবিহীন স্বাভাবিক উত্তীর্ণ প্রদান পদ্ধতির জন্য এই দুর্গতি ঘটেছে।

৪. যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ বয়স্ক লোক প্রকৌশলগতভাবে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও অক্ষর জ্ঞানের অভাবে বই পড়ে সার্থক-নাগরিক হতে পারেনি।

টেকসাসে ১৯৭৫ সালে একটি জরিপ চালানো হয়। এই জরিপে দেখা যায় প্রতি ৫ জন আমেরিকানদের ১ জন সুন্দরভাবে বই পড়ে সাধারণ কাজ তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে পারে না। এ প্রদেশের শতকরা ২২ জন খামের ঠিকানা পাঠোদ্ধার করে 'ডাক' সরবরাহ করতে অক্ষম হচ্ছে। শতকরা ৪০ জন স্টোরে কেনাকাটার সময় হিসাব কষতে পারে না। অক্ষরজ্ঞানের এই চরম দুর্গতি দেখে

www.pathagar.com

টেকসাসের জনৈক গবেষক জিম কেটস মন্তব্য করেনঃ "আমরা এখানে আমেরিকার জনসংখ্যার অর্ধেকের কথা বলছি, যারা চরম অবস্থার সীমানায় অবস্থান করছে। এর চেয়ে বড় কোন হুমকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নেই।"

সভ্যমার্কিন রাষ্ট্রের এই দুরবস্থার জন্য কেটস, বার্নেস ও অন্যান্য শিক্ষাবিদ আমেরিকার স্কুলগুলোকে আংশিকভাবে দায়ী মনে করেন। প্রাথমিক স্কুলে বই দেখে পড়ানো অপেক্ষা–

১. সী, জীন রানস– দেখ জীন দৌড়াচ্ছে' এর মত প্রদর্শনমূলক শিক্ষা;

২. নীরস ওয়ার্ড বুকের শব্দ মুখস্ত করানো;

৩. "লুক এণ্ড ছে"ঃ দেখ ও বল, অনুশীলনী পাঠের মাধ্যমে নতুন শব্দ শিখানোর জন্য চাপ প্রয়োগের ফলে, বাক্যে প্রয়োগবিহীন শব্দ শিখে বাক্য গঠন ও এর অর্থোদ্ধার জ্ঞান অর্জনে শিশুরা ব্যর্থতার সম্মুখীন হচ্ছে।

লক্ষণীয়, বাংলাদেশের তথাকথিত বহু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে স্টাইল ও এরিসটোক্রেসি হিসাবে এই পঠন রীতি চালু আছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে যুক্তরাষ্ট্রের খরচের পরিমাণ সঠিকভাবে বলা মুশকিল, তবে সাপ্তাহিক টাইম পত্রিকার ৫ই মে ১৯৮৬ -এর সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছিল বছরে প্রতি ব্যক্তির জন্য ১৭ ডলার পরিমাণ এই খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। এ হিসেবে ফেডারেল সরকারের বছরে বয়স্কদের মধ্যে স্বাক্ষরতা শিক্ষা দানের জন্য বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৮৫-৮৬ বছরে মোট ৩৫২ মিলিয়ন ডলার ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাভিত্তি অত্যন্ত মেথোডিক্যাল এবং এর মূল্যায়ন পদ্ধতি কুইজ টাইপ হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা যান্ত্রিকভাবে অত্যন্ত যোগ্য হচ্ছে বটে, তবে সাবজেকটিভ লেসন ও রচনাকারের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি হ্রাস পাওয়ায় এই দেশের শিক্ষার্থীরা মন-মানসিকতায় সুকুমার বৃত্তির অধিকারী হতে পারছে না। সুস্থ ও মানবিক সমাজ রচনা এবং সংরক্ষেণে এরা ব্যর্থ হচ্ছে দেখে মার্কিন সুধীরা শংকিত হয়ে পড়েছেন।

উল্লেখ্য, ইদানীং আমাদের দেশেও Communicative English শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমদানি করা হয়েছে যার বিষময় ফল অনুরূপই হবে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। এই পদ্ধতি প্রচন্ডভাবে Methodical হওয়ায়, এবং literary element না থাকায় শিক্ষার্থীরা মানবিক ও নৈতিক essnce অর্জনে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের প্রতি ইমাম খোমেনী (র.) এর উপদেশ বাণী ঃ

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের অনন্য নেতা মরহুম আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী (র.) ১৯৮০ সালের ১৮ ডিসেম্বর তেহরানের জামারান মসজিদে বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ছাত্র সমাবেশে যে জ্ঞানগর্ভ ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। এতে পাশ্চাত্য শিক্ষার কু-প্রভাবে জাতি হিসাবে মুসলিম ওম্মাহ্র যে ধর্মীয় ও নৈতিক বিভেদ ও বিকৃতি এবং ধ্বংস সাধন হচ্ছে, এর জীবন্ত মোকাবেলায় নিদের্শনাসহ এটি একটি বিশ্লেষণাত্মক জীবন্ত চিত্র। নিচে তাঁর বিক্তৃতার ইংরেজি অনুবাদের বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত সহ "On Islamization of Education" শীর্ষক আর একটি রচনা ও এতদসংগে পরিবেশন করা হলো। – গ্রন্থকার।

IMAM KHOMENI'S ADVICE TO UNIVERSITY AND THEOLOGICAL STUDENTS.

"In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful." .. What a heart stirring assembly, and what a blessing community! Once our colleges were divorced from our theological schools, and our college students looked upon the theological students as being their enemies, and vice versa, not because they were so but rather due to the prevailing atmosphere. Neither the clergy could tolerate the universities nor could the univesities tolerate the clergy. The idea was that they intended to alienate the two sectors of our society who otherwise had the potential to bring about the unity of all the masses. They insisted that the two should be as much kept aloof from each other and posed against each other lest the the nation might be united. Thanks be to Allah, the Islamic Revolution brought up the unity between the two, and I hope that now neither of the two groups considers itself as being seperate from the other.........

.....Our universities and our theological schools are capable of working as centres contributing to every social progress as much as they are capable of working as centres responsible for every social aberration and wickedness. The universities are potentially capable of originating every

www.pathagar.com

wickedness. If in our universities we attach enough importance to devotion, and if our universities be universities in the real sense of the word, that is Islamic institutions wherein learning is appended by social commitment, such universities and their graduates shall be capable of helping a nation's eventual prosperity. And if our theological schools be cleansed from all impurities, they can rescue a nation. Knowledge in isolation from other faculties can be of no benefit: it might even be a disadvantage. Once if we look carefully to the world around ourselves, we will realise that the universities as centres of learning have been responsible for all calamities which have struck mankind. The roots of all the disasters and misfortunes should be traced in the universities and in the people who acquired their expertise in such institutions. The whole war weapons, the whole implements for ruining mankind, and the whole so-called progrese in the field of manufacturing arms have been brought about by the scientists who were university graduates, graduates from universities wherein ethics and spiritual education was missing. Also the root of all mischief and destruction in any Muslim country should be sought in the theological centres which have been devoid of true Islamic faith, and which have fallen short of executing Islamic cannons. Our universities are capable of ruining the whole world or reforming it in the right path. Should the universities throughout the world put the same emphasis on ethics and humanistic principles as in the nature of man, then the world will be one of enlightenments. And if expertise be divorced from principles of ethics, and spiritual refinement be missing from a person who has academic expertise then he and his likes will not be devoted to human beings. These two entities can be centres simultaneously responsible for all material and spiritual progress in the world. 'Knowledge and practice knowledge' and 'devotion' are as the two wings perfectiong each other's function towards lofty values. You witnessed that for 50 years the past regime had universities in this country who used to have universities

www.pathagar.com

and professors here who threw our country into the lap of the superpowers. This was a catastrophe for our nation to have provided the use and control of its scientific facilities to people who were not devoted to their jobs and to their country. It will be a catastrophe if the care and control of scientific resources are vouchsafed to the people in whom the Islamic principles are absent. There is no difference between universities and theological schools in that if they both function properly, if they couple knowledge with practice, and commitment, and spiritual refinement, they shall then have provided the nation with the two wings of knowledge' and eithics for eventual salvation. If we should only pursue 'knowledge' in isolation from its counterpart, that knowledge will lead us to destruction.

The origins of all troubles in a country should be sought in its universities, and in its theological shcools, and likewise the origins of all material and spiritual progress should be sought in the same institutions. The perseverance shown by the foreign powers in penetrating our universities and our institutes of higher education for leading our youth in the path detrimental to our best interests, boils down to the fact that they know that once they corrupt the universities, they shall have corrupted a whole nation.........

If we persist that our universities and our culture should be reformed, we do not mean to do away with universities capable of working for the country. If we are supposed to have universities serving the U.S. interests, we would be much better advised not to have those universities.

You do not seem to have political insight. The universities throughout the world have been at the service of the superpowers and we intend to put an end to this tradition.

...........In the past our universities did not have such a high performance in terms of academic level. Admittedly we had devoted people in our universities but they were very few and could not work under the heavy fists of the Communists. I say we had dependent universities because if our universities were not dependent we wouldn't now have to send our patients to

www.pathagar.com

Britain for medical treatement. Should our universities resume work in the same vein as beofre, each day the nation will plunge deeper into the corruption. And such universities will certainly plunge us again into the laps of the superpowers. Our bizarre cannot fling us into the laps of the United States or the Soviet Union, our farmers cannot fling us into lap of this or that superpower, nor can the people in our factories, nor can the turban wearers do that although there may be corrupt elements among them. The institutions which are capable of making us dependent to the United States or to the Soviet Union are our universities: Why? Beacuse everything originates in our colleges. Let us then proceed to reform our universities.

Our universities should be the manifestations of the reunion of the highest standards of learning with the highest standard of ethics. Our universities, should be capable of uplifting devotion, eihics and Islamicism. It is equally true of our theological schools. Our theological schools should produce scholars in the true sense of the word. Our theological schools should function as centres for producing men of highest moral standards. We do not mean to have just' a bunch of professors and students in our universities. Such people will never allow the country to be subjected to subjugation.

Now whoever of our patriots today persist in wearing clothes made of Iran-made fabrics and the people who love this country, who love Islam and who love this nation, should pool their efforts for reforming our universities. The universities pose more potential threat to the nation than the cluster bombs. And likewise the potential perils in the theological schools are greater than those in our universities. They should reform themselves, whether they are in our universities or in our theological schools.

I am now in the decline of my life but say all this for the benefit of future generations. I say this so that our future generation will remember to maintain the reunion of these two poles of education, and that the two of them should regard 'knowledge' and practice. Knowledge and spiritual refinement

www.pathagar.com

are two inseparable wings. The next steps will centre around spiritual refinement. A person who leaves our universities at the end of his studies should remember that he has received an education benefiting from the financial resources in his country. He should always remember that he has gained an expertise and reached high status, and therefore, he has the duty to serve his country, and work for its independence. —— The people who themselves are not in the service of foreign powers and who are devoted people should muster their whole experties and energy for the purpose of reforming our universities, so that such institutions will be capable of training experts willing to work in our own country and not taking their expertise to the United States, and then pound a blow on us with the renewed power which his expertise has brought him.

The worst of our experts are those who do not feel indebted to this country. The worst of our experts are those who have not felt that they are for this country, that they have benefited from the resources of this country, and that they should provide the output of their expertise to this same country. If we should produce university graduates devoid of this conscience then our universities will be the worst places, because they will bring about our eventual destruction. Our universities can but follow either of the two ways open to them: the road leading to the inferno and the road leading to prosperity, the road to self-humiliation, slavery and subjugation as well as the road to glory and selfesteem. Our universities in their traditional form are of no use to us.

The more knowledge is accumulated in the brains of the human beings, even though it be knowledge of divinity, it will dirve them further away from Allah, unless they are spiritually refined. Our theological schools should spare no efforts in bringing about the spiritual purification of their students. Our theological schools should be centres uplifting spiritual purification alongside with the teachings of Islamic jurisdiction, philosophy and the like. They should be centres for advancing the progress towards divine truth.——.

www.pathagar.com

You shall not be able to correct others without first purifying yourselves. You shold but start from yourselves. A person who is not himself purified can not purify others.... If a trader is corrupt he will overcharge, but when a scholar is corrupt he will fling a whole city and whole nation into curruption, whether he is a graduate from the university or a graduate from the Theological School of Feyziyyeh.

May Allah Almighty make you more steadfast in your attempts for maintaining the unity between the colleges and the theological schools. But you should also remember that as you proceed in breaking down the barriers which divided you from each other, the invisible and the divisive hands, the hands which had brought about this division between you will operate again to impose the same old division among your ranks........... You should now open your eyes to the realities of our day more than any time before lest they might lead you to corruption even from within the Universities and from within the Theological Schools. You as clergy men and as college students should keep your self open to the realities of our day. Should you one day hear somebody backbitting the college students or the clergymen you should remember that such acts are designed by the enemies of this country in order to bring schims among your ranks and in order to generate pessimism in your minds about merits of the other group. ....

I hope........ with the blessing of the Almighty you will rescue your country from the evil of the parasites which are now busy spreading the seeds of corruptions and from the evil of their descendents.

May the Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you."

[Journal of Islamic Research and Education, pages 81-90, Editor Mohammad Alamgheer who quoted it as; Courtesy from News-Letter, Issue No 29 January 15 1981 bearing the title "The Origin of both Progress & Troubles of a Country is in the Universities & Theological Schools].

www.pathagar.com

On Islamization of Education

The suffix IZATION is very powerful in causing declension of a term like Capital to Capitalization, Social to Socialization, Natural to Naturalization, Europe or European to Europeanization, etc. It means a generalization of something, some idea or some system or ideology.

There had been a nice Professor who used to teach International Economics in the Dhaka University. He was an erudite scholar gifted with a fine art of teaching. He put on European dress sometimes with butterfly tie and was very alert and particular in pronouncing King English during his lecture in the classroom. Sometimes when he sneezed or coughed due to cold, he uttered to the students :"SORRY" or 'EXCUSE ME' to exhibit gentility or politeness in the class room. Moreover, he acquired`menia' like `nodding' and `shrugging' at the time of delivering lecture or participating in talks. In other words, the reverend Professor thus became Europeanized in culture, taste, aptitude and marnner though by birth he was a Bangladeshi, by faith a Muslim. That means, he became a foreigner to his native land and to his people, as well as to his own faith. This happened bacuse of 'IZATION', the suffix that caused declension to his degree.

It means the distinctiveness of an action is vividly being sustained by its education. Or in other words, a people is a nation based on its own distinctive ideals and ideology. The English, for example, are a nation for their distinctive art, culture, faith and tradition. They keep names like Martin, Cleark, John, etc, for calling or naming their children. They believe in Trinity of God, and go to church for offering their weekly prayer under the spiritual leadership of their Father or Bishop. Pork, hem, etc, are their delicious food, wine their favourite drink. That's why we happen to see in their text books; Mr. John to go to church every Sunday, Ann to ask mother to sing and dance; dances like, `Ball' `Disco' or `Twist',

www.pathagar.com

etc. The English sustain this sort of national identity and distinction through the cultivation, preservation and transmission of their nationalistic educational curriculum and syllabus, which are committed to make them reach in thoughts and doings. Here English culture has been cited singularly because as we, the Bangladeshi have had our independence from the English rule, we had it so to say from physical view point only; but culturally and even from the view point of value- concepts of life and thought, we are still dogging their culture or educational traditions in mirroring our life, manner and even posture and gesture. As a result, we are still much English in our taste and treatment, dealings and doings; still so blind in learning English text books like Radiant Way in which (part-3) for example, Bert's dog Sultan does not make us culturally feel insulted yet!

Rather we boast of teaching and learning 'Radiant Way'-like- books to identify our 'Sultan' as a dog till to day. Is not this insulting or humiliating to our identity and culture as a nation? Should such blind stupidity, such worship of foreign values to elevate ourselves to so called educated and modern elite go still unrepudiated? Should we yet claim ourselves as true Muslims having this sort of indoctrination by the agents-local and foreign? It has happened and still been happening because we have always been failing to wisely introduce true Islamic education that is a must for us, for our younger generation and posterity to survive as a distinct and dignified nation on the earth.

Now, the question is; How can we attain Islamic character in our present or existing system of education? Surely it is a hard and critical question to be solved satisfactorily and in absolute manner. But yet it is sanguine enough that at least if the following steps are being honestly implemented by the Islamic and Islamicist Scholars to our education field, we shall insha Allah be in a position to contribute a lot with a sure guidance for others to explore more and more the field in reaching the set-goal of ours i.e. Islamic Education.

www.pathagar.com

These steps are :

1. **Islamization of the contents of the existing text books:** It means the teacher's function is to help learners identify the contents which are (i) Islamic and (ii) which are secular and anti-Islamic. Moreover, he is also supposed to make the students equip with the knowledge of those things that not only prove the superiority of Islamic education and value, but also judiciously counteract non and anti-Islamic contents of the anti-Muslim or anti-Islamic Scholars boldly and justly.
2. **Use of Islamic terms and terminologies in writing answer scripts:** That is,the learners shall be influenced and indocrtinated in using Islamic terms and terminologies in answering their questions both in written and viva forms. This practice shall make our students consequently awaken of the connotation and denotation of Islamic terms like 'Halal', 'Haram' etc, Consiciusally and termendously. Moreover, such uses shall also help them bring about a radical change in their outlook and interpretation of their life situation and environment.
3. **Replacing secular and anti-Islamic text books and reference books by Islamic ones:** All the existing books shall be well rewritten with Islamic terms and terminologies. However, it does not mean that this should be done forcibly like erasing or deforming our beloved mother tongue to eulogise Islamic value at the cost of our native language. Rather like the rebel poet "Nazrul Islam" or the Islamic poet "Farrukh Ahmed", we shall have to enrich our mother tongue aesthetically wedding it to languages like Persi, Urdu and Arabic that are the unique store-houses of Islamic thought and culture, history and heritage.
4. **Islamic Scholars, Ulema and Thinkers to be frequently invited as resourceful persons:** Such people are to be invited to influence our educational arena. It is incumbent because to think to have Islamic shape and spirit in the field of education without the active

www.pathagar.com

participation and contribution of the Islamic personalities is a stupidity like that of a warrior in the battle field without war equipments.

5. **Islamization of education:** It needs the extensive as well as intensive study and cultivation of Islamic literature. To have clear notion and gradually conviction of Islamic thoughts and values, teachers should develop the regular habit of studying the Islamic books so that they may fully acquire the properties of Islamic thoughts and values to be effectively established in the society reforming misleading and distorted culture through proper teaching -art and architecture.

6. **Islamic occasions should be sensibly as well as meaningfully observed:** True education is virtually effective provided it makes life involved in learning activities to help reflect the ideals of the text books taught. Hence the schools should have adequate cultural programs for the students with a view to helping them attain distinctive outlook and gesture by active participation in such studied co-curricular activities.

7. **"Teacher-Parent Day":** This is also a very useful device to build up an ideological rapprochement between them. To make "Islam" a reality both in life and social livings is surely a joint venture of both the parents and the teachers. They are the real authority to exercise and help fruitful implementation of Islamic practices in the student community.

8. **Islamization of School-library:** It is a powerful instrument to help revive Islamic thinking among the school community. All the secular and anti-Islamic as well as unedifying books should be disrespected and removed from the book shelves. To replace these unwanted books and writings, the Islamic thinkers, scholars and researchers be made profusely available.

   The teachers, the parents and the student community be enthusiastically made active in using the school library

www.pathagar.com

frequently. To cater incentive to them seminars, symposia, discussion-meeting be arranged, so that the crises of Islamic culture and values be overcome by the cultivation of the works of Islamic thinkers.

9. **Apprecation procedure be adopted:** That means the students who would be best in answering question-papers from Islamic view point be given highest marks in time of evaluation, Prizes, stipends and scholarships be awarded for proving Islamic merit and performance. Even guradians and teachers of Islamic character and aptitude be also honoured both in cash and kind, Competitions are to be arranged for promoting co-curricula activities from Islamic view-point. Yearly sports, milad and such occasional events also be arranged in Islamic way, and Islamic Days be observed in a befitting manner. That is, all these programmes and events must reflect Islamic taste, beauty and value in our life and doings. Also best prizes are to be selected in such a way that these prizes hold the Islamic view points and ideology.

10. **Islamic Institutions of home and abroad be well linked up:** It is needed both for practical and theoretical rapprochement. This sort of link is an essentiality to exchange views for cultivating Islamic thoughts and researches for complementing the short-comings that use to exist still in the programmes and activities conventions ??? so-called and fashions.

11. **Lastly, the above steps should be made so powerful and weighty :** that both the people and the govern-ment feel the impact fo Islamic education useful as well as unavoidable. of reach such level, contact with the government and the people be made through educational programmes with qualitative directives and dedicating manner and determination.

In fine, if such steps are cordially taken by the truly Islamic Scholars and Educationists, Islamization of Education is not at all an herculean task to be materialised. May Allah help us in attaining this cherished goal. Ameen:

www.pathagar.com

THE EDUCATION POLICY AND THE CURRICULA OF SCHOOLS IN BANGLADESH: AN EVALUATION IN THE LIGHT OF THE MAKKAH DECLARATION.

A. K. M. Azharul Islam.

About the study.

This study was undertaken under the auspices of the Islamic Academy, Cambridge, UK, in order to determine whether the school education in Bangladesh has been reorganized in the light of the Makkah Declaration adopted by the OIC (Organization of Islamic Conference). The study was conducted under the guidance of Dr. Shaikh Abdul Mabud, Director General of the Islamic Academy, Cambridge. The study team consisted of Dr. A. K. M. Azharul Islam, Professor of Physics, Rajshahi University, (R. U.) as the team leader while the members were Dr. M Nazrul Islam, Professor of Physics, R. U, Professor Nazrul Islam of the Department of Geography, Rajshahi College and Mr Mahmud Jamal of Seroil, Rajshahi.

Summary.

To make the research report exhaustive a thorough study was done of the Education Commission Reports and Education Policies of the Government of Bangladesh along with the textbooks used at different levels. Teachers, students, guardinas and educationalists were also interviewed.

The study is divided into 4 chapters. I deal with the Education Commission Reports and Education policies of different Government. Chapter 2 is a review of the school curriculum and textbooks, Chapter 3 is an analysis of the present education system and policy of Bangladesh in the light of the Makkah Declaration. In chapter 4, a brief discussion of Islamisation of the education system is presented.

Chapter I begins with a brief discussion of the reports of different pre-independence (1947-1971) Education and

www.pathagar.com

Education Reform Commissions. They are (a) Report of the East Bengal Education System Reconstruction Committee, Dhaka, 1952, (b) Report of the Education Reforms Commission in East Pakistan, Dhaka 1957, (c) Reports of the Commission on National Education, Government of Pakistan, Ministry of Education, 1959, Report of the Commission on Student Problems and Welfare, Karachi, Government of Pakistan, 1966 and (e) Report of the New Education Policy, Government of Pakistan 1969.

Although the proposals and recommendations of the different committees and commissions lacked the presentation of Islam as a complete code of human life, some elements of an Islamic educational system appeared to be present. In reality none of the recommendations were implemented in full. Nevertheless, they played important and positive roles in the development and advancement of future education policies and helped the creation of physical infrastructure, development of syllabi and curricula, classifications and composition of textbooks etc.

After the emergence of Bangladesh as an independent state the Government had the top priority of framing a constitution. Secularism and socialism were incorporated in the framed constitution among the fundamental principles. This was a tremendous blow to the hopes, aspirations and ideologies of most people of the country. The proof of the malignity of the ruling party can still be found in the educational institutions. In those days there were races and competitions of renaming the universities, colleges and different halls of students, residence. The word Iqra (read) was wiped out of the monogram of the Dhaka University. The monogram of the Rajshahi University containing a verse from the Holy Qur'an was altered. The word 'Muslim' was removed from the name 'Salimullah Muslim Hall' and Jahangir Nagar Muslim University.

www.pathagar.com

Numerous examples like these can be cited.

After gaining independence, the Government felt the necessity of reforming the education system to awaken the nation in a new consciousness. Towards this aim an Education Commission consisting of 19 members led by Dr, Kudrat-e-Khuda, was constituted. The members of the Commission on being invited by the Government of India paid a visit to India for one month. The Commission gained a direct experience of the Educational system of India and submitted a final report to the Bangladesh Government in 1974.

The Kudrat-e-Khuda Commission has a great importance in the sense that all subsequent steps taken to reform and reconstruct the educational system were actually based on the report of this Commission.The Commission had produced their report after untiring research and labour. But unfortunately, the report was open to serious controversy immediately after its publication. There were a good number of recommendations which were epoch-making and beneficial for the nation. On the other hand, there were elements contrary to the ideologies and cultural values held by most people.

The aims and objectives of the Commission's report can be ideologically; divided into two parts.

1. To create workers for the establishment of a socialist society and
2. to instil in people secular thought devoid of religious beliefs and establishment of practical lives in this light.

In fact the ideological foundation of the said Commission was based on Bangali Nationalism, Socialism, Secularism and Democracy. Thus the education policy was framed with the aim creating a socialist society, devoid of religious values and beliefs based on the four basic principles of the state.

Some of the main features of the report aiming to detach the educated mass from the religion were.

www.pathagar.com

1. to compose secular curricula and textbooks;
2. to appoint teachers enlightened with the four basic principles of the state;
3. to free the primary level of education from religious dominance;
4. to make religious instruction non-compulsory at the secondary level; and
5. to place a poor emphasis on religious teaching even in Madrasah Education.

After the historic political change over in 1975, there were several committees formed to frame new education policies. The secular caharcter of the Constitution of Bangladesh was ameneded. The four basic principles of the country changed to 'belief' in the unity of Allah, 'Socialism to mean social justice, Bangladeshi Nationalism' and Democracy' would be the source of inspiration of all the works of the citizen. The reports of these Committees are.

1. Government of Bangladesh, Report of Bangladesh National Committee for Curricula, Courses and Studies, Dhaka. 1976.
2. Government of Bangladesh, Interim Education Policy, Recommendation of Jatiya Shikhya Upadestha, Dhaka, 1979.
3. Ganoprofatontri Bangladesh Sarkar, Bangladesh Jatiya Shikhya Commission Report 1988.
4. Gonoprojatontri Bangladesh Sarkar, Shikhya Sanskar Sankaranto Taskforcer Protibedon, 1994.

The main focus of the different reports was on religious education so that a student's character develops with religious moral values.

In 1996 there was again a political change in the country and the Awami League came to power. The new Government started to form a National Education Policy. A Committee was formed consisting of 56 members headed by Professor M Shamsul Huq in 1997.

www.pathagar.com

A precondition was set by the Government that the new Education Policy would be based on the report of the 1974 Kudrat-e-Khuda Commission. A series of protests were raised by different sectors of the public against the effort. Their arguments were that with the alteration of the fundamental principles of the country through the amendment of the Constitution of Bangladesh, the Kudrat-e-Khuda Commission's report had become obsolete, irrelevant and contrary to the amended cosntitution and so could not be legally accepted as a basis of the new Education policy. Unfortunately. ignoring the protests and public opinion a final report was submitted to the Government. This report was in fact almost the same as that of 1974, an old gift in new wrapping.

The Government appionted a six member Committee to analyse the Shamsul Haq Committee report and to suggest the process of implementation. The report of this six-member committee is termed the National Education Policy 2000. The report descirbes the aims and objectives of educationat different levels, national curricula. textbooks and other relevant topics.

In chapter 2 efforts have been made to analyse the textbooks used in different levels and classes of the school education. As a first step the pieces of the Bengali and English textbooks were categorised subject wise.

In the set texts for Bengali literature, out of 357 pieces (prose and poems) the main emphasis is on topics of Bangladesh (37.54% in content). 21.85% is on nature and environment, poeple. history, literature, sports and culture of the Bangladeshi people and 10.93% on patriotism and awakening the spirit of the Freedom Fight. Topics on Islamic culture and moral values constitute only 6.16% of the total. In the textbooks on English literature, out of 86 pieces (prose and poems) 27.91% is on the social and natural enviroments of the students, 22.09% on science, environment and nature.

www.pathagar.com

Nothing on Islamic moral values is to be found anywhere. The pieces describing Islamic moral values in Bangali textbooks were analysed in the light of the virtues mentioned in the aims and objectives of the Education Policy. It was found that there is a total absence of planning in selecting the topics to be covered in the textbooks. The number of topics deveted to different virtues are disproportionate and very few are on Islamic moral values.

Similarly, textbooks on other subjects such as Environmental Science and Geography, Social Science, etc. which ineluded Political Science and Civics, Economics, History etc were also analysed in these books. A delibrate absence of Islam-based contents was found. Analysis of the books on Islamic Education reveal that these books present the basic elements of prayer and other rituals of Islam, but they fail to present Islam as a complete code of life. The urge for the establishment of an Islamic society i. e. Iqamat-e-Din and presentation of Islam as superior to other ways of life is absent.

In chapter 3, first the relevancy of the present Education policy, the aims and objectives of the curriculum and the topics of the textbooks are analysed. The observed conformity is poor. Again the distribution of topics and subjects are found to be disproportionate. Secondly, the compatibility between the curriculum and the topics in the textbooks, and the Makkah Declaration is analysed.

The following observations can be made from the analysis an examination of the policy, the school curriculum and textbooks.

1. The new education policy of Bangladesh does not reflect the aims and objectives of the Makkah Declaration.
2. Compatibility with the Makkah Declaration cannot be achieved by mere changes and modifications. It requires a reconstruction of the whole education policy.

www.pathagar.com

3. The curricula and textbooks are not based on an awareness of God, the Supreme Being, the need for the Prophetic guidance and the nature of human beings as a spiritual entity. Rather, human beings have been considered as social and economic animals. The different aspect of their lives have been divided into unrelated and incoherent modes of conduct, and emphasis has only been laid upon their material prosperity.
4. The curricula and textbooks are not based on the teaching of the Qur'an and Sunnah of the Prophet (peace be upon him). The books on Islamic Education are partially based on the teachings of Qur'an and Sunnah, but they lack the presentation of Islam as a complete way of life.
5. The curricula and textbooks are based partially on an awareness of the need for vital qulities in human beings, such as Truth, Justice, Righteousness, Mercy, Love, Compassion and Care towards all creation. But the pieces on the awareness of the essential human qualities are based on secular viewpoints. In most of the cases, there is an absence of the religious or divine sanction. Statistically, the occurrence of the above qualities is disproportionately small.
6. It has been observed that the Bangladesh Constitution, the new Education Policy and the contents of textbooks are somewhat contradictory to each other. In the books of History and Social Science, Bangladeshi people and culture have been depicted as stream of the all-Indian civilisation, which is based on the secular and socialist ideology. But in reality, Bangladeshi are a part of the entire Muslim Ummah. In that respect, the curriculum and textbooks, other than books on Religious Education are not based on an awareness of the faith, history, achievements and failures of one's own religious community and the importance of being a member of that community and the development in each individual of the ability to contribute to and evaluate his/her Islamic culture.

www.pathagar.com

7. The curriculum and textbooks do promote to some extent the development of tolerance and concern for the rights and beliefs of others and recognition that all have equal rights and are entitled to justice and compassion. But most of the pieces (except those in Religious Education) are based on a secular point of view, Although Islam is the guarantor of human rights this idea is not found anywhere in the books of social and political sciences.
8. The curriculum and textbooks promote a secular attitude. Secular personalities are promoted in comparison to Islamic ones.
9. The Education Policy and the textbooks include various elements that are subversive of Islamic teachings, sentiments and the Islamic way of life. In some cases they are presented through explicit text and in others through pictures and suggestions.
10. The curriculum and textbooks are not fully conducive to the development of a good moral character; because the religious viewpoint of morality is not emphasised.
11. In many cases, a conspicuous absence of Islamic elements is observed.
12. The curriculum and textbooks do not at all incorporate ideas that enhance and consilidate the concept of a global Islamic community among the Muslim students.
13. In children's stories, the presentation of famous Muslim individuals as role models is negligible in comparison to the secular personalities.
14. Some unconcerted efforts are bing made by different private educational, Cultural and social organisations to demonstrate Islamic models of education, but these are not enough to face the challenge of the present day.

In chapter 4, an outline of the Islamic Education System and some recommendations for the Islamisation of Education are presented.

[Source; Muslim Education Quanterly. Vol. 19, No.1, 2001, the Islamic Academy, Cambridge, UK.]

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জি

১. আল-কুরআন।

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম ও ২য় খণ্ড।

৩. দৈনিক পাকিস্তান ঃ ২২-৭-৬৪।

৪. ইসলামের ডাক, ঢাকাস্থ লিবিয়া, আরব জামাহিরিয়া কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১৯-২।

৫. Encyclopaedia Britannica, Micropaedi, Vol,II Ed, 1982

৬. Oxford Junior Encyclopaedia.

৭. Muslim Education Quarterly, Vol. 19. No. 1. 2001, The Islamic Academy Combrldge, U.K.g

৮. Monthly Al-Islam, Dhaka, Issue. March, 2004.

----

www.pathagar.com

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার

আদর্শিক ভিত্তি

সঠিকভাবে যদি নির্ধারিত না হয়,
তাহলে সে শিক্ষা ব্যবস্থা
জাতিকে আগামী দিনের
কাঙ্খিত নাগরিক ও নেতৃত্ব
সরবরাহ করতে ব্যর্থ হবে।

—শহীদ আব্দুল মালেক

বুক পয়েন্ট
ঢাকা

www.pathagar.com